Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনা

তাপসী রানী ঘোষ
পিএইচ.ডি (সংগীত)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
(পুনঃ)
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

কীর্তন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই। গ্রামে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠার কারণে প্রকৃতির অপার আনন্দময় জগতের সঙ্গে যেমন স্বাভাবিকভাবে পরিচয় ঘটেছিল, ঠিক তেমনিভাবে স্বাভাবিকতায় পরিচয় ঘটেছিল কীর্তন, লোকসংগীত ও লোকনাট্যের সঙ্গে। গ্রামে যে কীর্তন গান হতো সেই বাঁশি, শ্রীখোলের শব্দ, কীর্তনীয়ার তিলক, মালা আমাকে খুব আকর্ষণ করতো। সংগীত পরিবারে জন্ম নেওয়ার সুবাদে কীর্তনের বিভিন্ন পদ শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সময় থেকেই। আমার বাবা প্রয়াত অরবিন্দ ঘোষ, আমার দিদিমা প্রয়াত শৈলবালা দেবী এবং অল ইন্ডিয়া বেতার শিল্পী প্রয়াত দূর্গাপদ সেনের কাছেই কীর্তন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়েছি এবং বিভিন্ন পদ শিখেছি।

সেই সময় থেকেই গভীর নিষ্ঠায়, ভক্তি, শ্রদ্ধায় বাঙলার অমূল্য সম্পদ কীর্তন আমার সাথে জড়িয়ে গিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে আমার গুরুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া প্রয়াত নিলুফার ইয়াসমীনের কাছে কীর্তন শেখার সময় কীর্তন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তাঁর কাছ থেকে বুঝেছি কীর্তন গানকে প্রথমে হৃদয়ে ধারণ করতে হয় তার পরে পরিবেশনা। আর সেখান থেকেই শুরু হয় আমার কীর্তন নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা। আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা ম্যাডাম আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁর তত্ত্বাবধানে 'বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট' শিরোনামে গবেষণা করার। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। এই চার বছর অনেক স্নেহ-মমতায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। আশা করি আজন্ম এই স্নেহ-ভালবাসা পাবো। অনেক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি।

অনেক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে। তাঁর অবদান কোনদিনই ভুলবো না। কীর্তন বিষয়ে সমস্ত বই তিনি আমাকে দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে। প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করেছেন, কখনো এতটুকু বিরক্ত হননি। তাঁর কৃপা পেয়েছি বলেই এই দুরহ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পেরেছি, তাঁর রাতুল চরণে জানাই অনন্ত কোটি সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি সংগীত বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে সহযোগী অধ্যাপক ড. দেবপ্রসাদ দাঁ, সহকারী অধ্যাপক ড. প্রিয়াংকা গোপ, বর্তমান চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপিকা টুম্পা সমদ্দার, সহকারী অধ্যাপক আজিজুর রহমান তুহিন স্যারসহ সকল শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে। সকলের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, ভারতীয় দূতাবাস গ্রন্থাগার, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গ্রন্থাগার, স্বামীবাগ ইসকন মন্দির, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি, উৎস প্রকাশন ও কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তথ্যসংগ্রহের সময় সাহায্য করেছেন আমার বান্ধবী শিপ্রা সরকার। তাঁর প্রতি আমার

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে মহারাজগণ আমাকে দিনের পর দিন তথ্যসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি। এ-সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সদ্ব্যবহার পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। অনেক বই আশীর্বাদ হিসেবে পেয়েছি বীরভূমের বীরচন্দ্রপুর নিত্যানন্দ আশ্রমের সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রী জীবশরণ দাস (শরণ) মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গে তথ্যসংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ের কাজে গিয়ে অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁর পরিবার আমাকে অনেক আপন করে নিয়েছেন। কখনো বুঝতেই পারি নাই আমি অন্য কোন দেশ বা অন্য একটি পরিবারে আছি। দাদা ড. লক্ষ্মণ ঘোষ ও তাঁর পরিবার ভালবাসায় আমাকে আবদ্ধ করেছেন। এই ঋণ কিছু দিয়েই শোধ করবার নয়। শ্রদ্ধা, ভালবাসা জানাই সকলকে। অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্দেশনায় মাঠ পর্যায়ের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছে স্নেহের ছোট ভাই মেঘনাদ, অনিন্দ মিশ্র।

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ের কাজে যখন গিয়েছি তখন আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন নিওলিভা ফার্মা লিঃ কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতি। কীর্তনীয়া অমল ব্যানার্জী, কীর্তনীয়া দুলাল চক্রবর্তীও অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের কৃপাধন্য হয়েছি। প্রণাম জানাই তাদের।

গবেষণা কাজে আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ধার দিয়ে এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ও বিশিষ্ট কবি ড. তপন বাগচী, বাংলা একাডেমির সহপরিচালক সাইমন জাকারিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবপ্রসাদ দাঁ, আমার শাস্ত্রীয় সংগীত গুরু পণ্ডিত শ্রী অনিল কুমার সাহা। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলা একাডেমির প্রকাশন সহকারী মোঃ এমদাদুল হক ভাইয়ের কাছে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে সকলের সহযোগিতা স্মরণ করি। প্রথমই স্মরণ করি আমার মা ও বড় ভাইকে যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে 'কীর্তন' বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই চার বছরে দুজনই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি। আমার জীবন সঙ্গী ও আমার একমাত্র কন্যা উর্বী আমার কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রী উজ্জ্বল পোদ্দার অফিসের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংসারের গোটা দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের দুইজনের অবদানও এই গবেষণা গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আরো যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাপসী রানী ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, *বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে এ বিষয়ে আগে গবেষণা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য রচিত। এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(তাপসী রানী ঘোষ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
(পুনঃ)
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, তাপসী রানী ঘোষ (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮৭, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭, পুনঃ) সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত *'বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট'* শীর্ষক পিএইচ.ডি. পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতোপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

(অধ্যাপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা)
গবেষক তত্ত্বাবধায়ক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ১১-১৩৯
বাংলা গানের ক্রমধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রাচীন যুগ
১.১ চর্যাগীতি
১.২ রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও গীতগোবিন্দ
১.৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস
১.৪ বিদ্যাপতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগ
২.১ বৈষ্ণব পদাবলী
২.২ মঙ্গলগান
২.৩ শাক্তপদাবলী
২.৪ কবিগান
২.৫ বাউল
২.৬ যাত্রাগান
২.৭ টপ্পা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আধুনিক যুগ
৩.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.২ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৩.৩ রজনীকান্ত সেন
৩.৪ অতুল প্রসাদ
৩.৫ কাজী নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪০-২০২
কীর্তন
৪.১ কীর্তনের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ
৪.২ কীর্তনের গান সম্পর্কিত আলোচনা
৪.৩ লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনের ধারা/ঘরানা
৪.৪ কীর্তন গানের বিভিন্ন পরিভাষা
৪.৫ কীর্তনের অঙ্গ
৪.৬ কীর্তনের নৃত্য
৪.৭ কীর্তন গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র
৪.৮ ঢপ কীর্তন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ২০৩-৩০৬
বৈষ্ণব কবি-বৈষ্ণব দর্শন-চৈতন্য পার্ষদ ও বাংলার কীর্তনীয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ
৫.১ জয়দেব
৫.২ চণ্ডীদাস
৫.৩ বিদ্যাপতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব দর্শন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ–শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পার্ষদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ–আদি কীর্তনীয়া
পঞ্চম পরিচ্ছেদ–ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত কীর্তনীয়া

চতুর্থ অধ্যায় ৩০৭-৩৫৫
লোকনাট্য
প্রথম পরিচ্ছেদ–বেদে নাট্যধারার অভিনয় অনুসন্ধান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–উপনিষদে নাট্যবীজ অনুসন্ধান
তৃতীয় পরিচ্ছেদ–পুরাণে নাট্যবীজ অনুসন্ধান
চতুর্থ পরিচ্ছেদ–প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অস্তিত্ব
পঞ্চম পরিচ্ছেদ–খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কীর্তন ও পালাগান

পঞ্চম অধ্যায় ৩৫৬-৪১৫
বাংলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট
৬.১ পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন ও পদাবলী
৬.২ নামসংকীর্তন
৬.৩ কৃষ্ণযাত্রা
৬.৪ অষ্টক গান
৬.৫ মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা
৬.৬ ঘাটু গান
৬.৭ ঢপ যাত্রা
৬.৮ কিচ্ছা গান

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪১৬-৪৫১
ক্ষেত্র সমীক্ষা

পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি ৪৫২-৫০৬

সহায়ক গ্রন্থ ৫০৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

অভিসন্দর্ভের প্রথমে গবেষণার প্রস্তাবনা, গবেষণার পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণার পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি বাংলা গানের ক্রমধারা, বাংলা গানের সূচনালগ্নের ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে। চর্যাগীতির সময় থেকেই বাংলা গানের উন্মেষকালের অনুসন্ধান করা হয়েছে। চর্যাগীতির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনটি যুগ আলাদাভাবে আলোচনা করেছি। রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'কীর্তন' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কীর্তনের উৎস, ইতিহাস, বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় কীর্তন সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'কীর্তনীয়াদের জীবনী' শিরোনামে প্রাক্ চৈতন্যযুগ, চৈতন্যযুগ এবং চৈতনোত্তর বৈষ্ণব সাধক–বৈষ্ণব দর্শন এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কীর্তনীয়াদের জীবনী তুলে ধরে বাংলা গানের পরিমণ্ডলে কীর্তনের ধারাবাহিকতা ও কীর্তনের গুরুত্ব বোঝার সুবিধার্থে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে লোকনাট্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসহ বেদ, পুরাণ, উপনিষদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাট্যধারার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট' শিরোনামে এর বিষয় ও আঙ্গিক আলোচনা সূত্রে কীর্তনের গুরুত্ব, প্রভাব ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা এবং এর আঙ্গিক পরিবেশন, যেমন–ঢপ যাত্রা, লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন, অষ্টক গান, মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা, কিচ্ছা গান, নামসংকীর্তন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র সমীক্ষা' শিরোনামে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট, আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, পরিবেশন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত দল, মূল শিল্পী ও আঙ্গিকের বিচার বিশ্লেষণ পর্যায়ে বাংলাদেশের উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ অঞ্চলের বিশেষ করে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়াণগণ, গাজীপুর, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ, নড়াইল, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলাসহ পশ্চিমবঙ্গে যে কয়জন প্রতিষ্ঠিত কীর্তনীয়া রয়েছেন তাদের মধ্য থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত আট জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং তাদের কীর্তন চর্চা, পরিবেশনের প্রক্রিয়া, দল পরিচিত, 'বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট' এ বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত মতামত হুবহু তুলে ধরেছি।

উপসংহার অংশে রয়েছে সমগ্র আলোচনার সমন্বিত রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সিদ্ধান্ত। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনীত নাটক, লীলা ও পালা, পদকার পরিচয়, অধিক ব্যবহৃত তালের নমুনা, গান ও স্বরলিপি সংযোজন করেছি। গবেষক ও কীর্তনীয়াদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়ের কিছু আলোকচিত্র এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার বিষয়টি যুগপৎ সংগীত, বৈষ্ণব সাহিত্য, যোগাযোগ, লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মূলত গুণাত্মক গবেষণা হওয়ায় নিম্নলিখিত চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে–

ঐতিহাসিক সমালোচনাত্মক পদ্ধতি

সংগীত, নাটক, সাহিত্য, মানববিদ্যা, সমাজবিদ্যা যাই বলি না কেন গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সমালোচনাত্মক পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এই পদ্ধতিতে যে সকল ঘটনা অতীত হয়ে গেছে তার বিরবণ, সমালোচনা ও তুলনা করার জন্য মুদ্রিত দলিলপত্র বা সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যবহার করা হয়। ফলে, অতীতের অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যায় এবং অতীত ও বর্তমানের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ রচনা করা যায়। কীর্তন ও লোকনাট্য যেহেতু বিস্মৃত অতীতে জন্ম লাভ করেছে, তাই ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতিতে এর ঐতিহ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। খ্যাতিমান বৈষ্ণব সাধক বা কীর্তনীয়াদের জীবনী, বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রের রচনা এবং অভিজ্ঞতার বয়ান থেকে কীর্তনের অতীত ইতিহাস উদ্ধার ও তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে আমার গবেষণা বিষয় ‘বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট’ সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর জন্যে সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ, লোকনাট্যের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং কীর্তন বা বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি

কীর্তন ও লোকনাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, গ্রন্থ কিংবা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন একেবারেই কম। তাই ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে কীর্তনশিল্প ও শিল্পীদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা হয়েছে। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর রাজশাহী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নড়াইল, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন কীর্তনের আসরে উপস্থিত হয়ে এ সকল জেলার কীর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে লেখা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কীর্তনীয়া ও কীর্তন গবেষকদের বিষদভাবে তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি এবং আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত নিয়েছি। আমার জীবনে একটি পরম পাওয়া এই সকল গুণীদের সংস্পর্শে আসা, তাঁদের মতামত নেওয়া ও আশীর্বাদ পাওয়া।

সমীক্ষার মাধ্যমে অনেক প্রবীণ শিল্পী ও বৈষ্ণব সাধকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কীর্তন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব যাচাই করা কিছুটা হলেও সম্ভবপর হয়েছে। লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা যে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রেক্ষাপট বা পটভূমি রয়েছে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মতামত তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

গবেষণার সময়পর্বে সরাসরি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আসরে অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ এবং পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তনের পরিবেশন, উপস্থাপন কৌশল, লীলা বা পালাকীর্তনের বিবর্তন অর্থাৎ এই আঙ্গিকের বিভিন্ন লোকনাট্য, অভিনয়রীতির পরিবর্তন, লীলা বা পালাকীর্তন ও লোকনাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

কীর্তন সংশ্লিষ্ট–বিশেষত কীর্তনশিল্পী ও কীর্তন গবেষকদের কাছ থেকে ক্যাসেট রেকর্ডারে এবং নোটবুকে টুকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও কীর্তন সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কীর্তন বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুরসহ দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে অফুরন্ত ভাণ্ডার। 'বাংলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট' গবেষণায় বাংলাদেশ ভূখণ্ড ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। যার ফলে লোকনাট্যে কীর্তনের প্রেক্ষাপট এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কীর্তন গবেষক ও কীর্তন শিল্পীর সাক্ষাৎকারের ওপর ভরসা করতে হয়েছে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগের আগে একাধিক উৎস থেকে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু এটি এদেশে প্রথম কাজ এবং আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী কোনো কাজের নিদর্শন নেই, তাই ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকেই গুরুত্ব দিতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলা গানের ক্রমধারা

বাঙালির জীবনধারা বরাবর একই খাতে প্রবাহমান ছিল না। যুগে যুগে এদেশের সংস্কৃতি ও বাঙালিত্ব ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। বাংলা গানের ক্ষেত্রেও আন্তরভাব ও বহিরঙ্গ অবয়বে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তিত বৈচিত্র যখন স্বাতন্ত্র্যে রূপ নিয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ের সীমানায় চিহ্নিত হয় তখনই বিশেষ যুগের পরিচয় ধরা পড়ে। বাংলা গানের যুগবিভাগের পেছনে সময়ের বৈচিত্র কাজ করেছে। 'বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী রূপ অপভ্রংশ থেকে কোন মুহূর্তে এ ভাষা স্বপরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বিতর্কমূলক হলেও সবাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাগীতিকেই স্বীকার করেছেন। তাই বাংলা গানের ইতিহাস চর্যাগীতি থেকেই শুরু।'[১] বাংলা গানের প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা গানের ইতিহাসকে সাধারণভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক–এই তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে।[২]

প্রাচীন যুগ ৬৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত। অনেকে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়টুকুকে যুগসন্ধি বা অন্ধকার যুগ বলে অবিহিত করেছেন। এ সময়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রমাণ মিলে না।[৩] তথাপিও ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত মধ্যযুগ ধরা হয়েছে। আধুনিক যুগকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১৮০০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়।

বাংলা গানের প্রাচীন যুগ বা আদি যুগের নিদর্শন চর্যাগীতি। Mahamahopadhyaya Haraprsad Sastri made a great breakthrough in the history of Caryagiti, Bengali language and literature, when he discovered in Nepal durbar in 1907.[৪] এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক গ্রন্থের চব্বিশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সাতচল্লিশটি গান চর্যাপদ নামে পরিচিত। এই গানগুলোতে বৌদ্ধধর্মের গুঢ় সাধনপ্রণালীও দর্শনতত্ত্ব নানা প্রকার রূপকের মাধ্যমে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে।

চর্যাগীতির পরে সংগীতশৈলীর অন্যতম নিদর্শন দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ। বাংলার প্রাণের সুরটি তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথম। তিনিই প্রথম তাঁর কাব্যগ্রন্থে,

গানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী বিবৃত করেছেন। কবির মধুর কোমলকান্ত সংগীতের পথরেখায় বাঙালি পেল মধ্যযুগের অনন্য সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী।

মধ্যযুগের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। আনুমানিক চৌদ্দ শতকের শেষার্ধে বা পনের শতকের প্রথমার্ধে কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেন। এ সময়ে মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর পঞ্চদশ শতকে প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন। পনের শতকের শেষার্ধে কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত এবং মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গ্রন্থ। মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল পনের শতকে।[৫] তবে ষোল শতকে এর সর্বাধিক প্রসার ঘটে। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন প্রভৃতি এ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা। মধ্য যুগের শেষ পর্যায়ে আঠারো শতকে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।[৬]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের ফলে বাংলা গানের বা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কাহিনী অবলম্বনে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য জীবনী কাব্য রচিত হয়। এমনিভাবে ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।[৭]

১৮০০ সাল থেকে সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরু। ১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়টুকু প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ সাল থেকে আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগেই বাংলা সাহিত্য বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে ও ভাষায় বিবর্তনে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় বিষয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে এ যুগের সাহিত্য মুক্ত। মধ্যযুগ পর্যন্ত পল্লী বাংলার বুকে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীত গড়ে উঠেছিল আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবে কালান্তর ঘটিয়ে নগরকেন্দ্রিক আসর জমাল।[৮] এই অধ্যায়ে আমি পর্যায়ক্রমে বাংলা গানের ক্রমধারা আলোচনা করবো–

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রাচীন যুগ
(৬৫০ সাল-১২০০ সাল)

১.১ চর্যাগীতি

বাংলাভাষা ও সংগীতের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাগীতি। বাংলা কবিতা সংগীতের আবেশিক শাস্ত্রীয় উপস্থাপনা চর্যাগীতির মাধ্যমেই ঘটে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদগুলো সম্পর্কে ১৯০৭ সালের আগে কোনো তথ্যই জানা ছিল না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।[৯] পরবর্তী সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেখে তৃতীয়বার নেপাল সফর কালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে সে সাহিত্যের কতগুলো পদ আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব–এই চার পুঁথি একত্রে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১০] এগুলোর মধ্যে একমাত্র চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ই প্রাচীন বাংলায় রচিত; অন্য তিনটি বাংলায় নয়, অপভ্রংস ভাষায় রচিত।

১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কারের পর থেকে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। BRIAN HODGSON নামক ইংরেজ গবেষক নেপাল থেকে সর্বপ্রথম তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অনেকগুলো পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Leterature in Nepal' নামক একটি পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন। মহামহোপাধ্যায় ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত গ্রন্থটির নাম–'চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। পুঁথিটির প্রথম বন্দনা শ্লোকে আছে 'শ্রীলুয়চরণাদিসিদ্ধরচিতেপ্যাশ্চর্য্যচর্যাচয়ে'–এখানে পাওয়া যায় আশ্বর্য্যচর্যাচয় শব্দটি।[১১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, '১৯০৭ সালে নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্যাপদ।'[১২] এখান থেকেই চর্যাপদের আলোচনা পর্যালোচনা শুরু।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করে দেখালেন 'বাংলা নিশ্চয়ই বাংলার প্রায় মূর্তি–অবহট্‌ঠের সদ্যোনির্মোক মুক্তরূপ।' ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার এবং ১৯৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সালে তা প্রকাশ করে চর্যার জট উন্মোচন করেন। ড, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯২৭ সালে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব এবং ১৯৪২ সালে চর্যাপদের সঠিক পাঠ নির্ণয় করেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।[১৩]

বিধু শেখরের মতে, গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' সুকুমার সেনের মতে, গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। কোনো কোনো পণ্ডিতগণ এই মত প্রণয়ন করেন যে গ্রন্থখানির নাম হলো–'চর্যাগীতিকোষ'।[১৪]

The world carya means acarana or acara meaning behaviour. It has also been used to mean patha or adhyayana meaning study. Broadly, the word carya has been used in three different senses—

1. For indicating the acara behaviour of the yogis, their rules and laws of adhyatma-Sadhna (spiritual path) to achieve nirvana (salvation),
2. For indicating definite branches of philosophy like yogacara etc. and
3. In music, one of the prabandha style, Viz. caryagiti.[১৫]

চর্যাপদের পদকর্তাদের নাম ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার আনুমানিক কাল স্থির করেছেন তা হচ্ছে–

শবরপাদ	–	৬৮০ সাল থেকে ৭৬০ সাল
লুইপাদ	–	৭৩০ সাল থেকে ৮১০ সাল
বিরূপাদ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
কানুপা	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
ডোম্বীপাদ	–	৭৯০ সাল থেকে ৮৯০ সাল
ভুসুকুপাদ	–	খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ
কুক্কুরীপাদ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
কম্বলাম্বর	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
আর্যদেব	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক (কম্বলাম্বরের সমকালীন)
কঙ্কণ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক (কম্বলাম্বরের বংশজাত অথবা শিষ্য?)
মহীধরপাদ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক (কানুপার শিষ্য)
ধর্ম্মপাদ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক (কানুপার শিষ্য)
ভাদ্রপাদ	–	খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক (কানুপার শিষ্য)
শান্তিপাদ	–	খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমার্ধ
বীণাপাদ	–	খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক।
দারিকপাদ	–	খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক (?)
সরহপাদ	–	খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক।[১৬]

চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যাভাষা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ‘আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যারা সাধন-ভজন করেন, তাঁরাই সে কথা বুঝবেন। এ কারণে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা।’ মুনিদত্ত তাঁর টীকায় সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত, সন্ধ্যা ও ব্যাজ প্রভৃতি শব্দ চর্যার রূপকাশ্রিত দুর্বোধ্য অংশের বা প্রতীকী শব্দের ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বারবার প্রয়োগ করেছেন। ম্যাক্সমুলার বলেছেন, ‘বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব যাতে অন্য ধর্মের লোকেরা বুঝতে না পারে তার জন্য স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন–আলি, কালি, ডোম্বী, শবরী, হরিণী, চন্দ্রসূর্য, গঙ্গা, যমুনা, শাশুড়ী, ননদী ইত্যাদি। তবে সন্ধ্যাভাষা যে দ্ব্যর্থক ও রূপকাত্মক সে বিষয়ে মতানৈক্য নাই।[১৭]

চর্যাপদ রচয়িতাদের সংখ্যা ২৩। ৫০টি পদের ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। আরো একজন পদকর্তার নাম আছে। কিন্তু তার পদটি নেই। সেটি হলে চর্যার গান/পদ সংখ্যা ৫১ এবং পদকর্তার ২৪ জন। গ্রন্থটিতে মোট ৫১টি গান ছিল। মুনিদত্ত ১টি পদ বাদ দিয়েছেন। ৩টি খোয়া গেছে অপর ১টির অর্ধেক নেই। সবদিয়ে ৪৬$^{১}/_{২}$টি পদ এবং ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়।[১৮]

তাঁদের রচিত পদগুলোর সংখ্যার একটা তালিকা দেওয়া হলো :

	পদকর্তা	মোট পদ	পদের ক্রমিক সংখ্যা
১.	আর্যদেব (আজদেব)	১	৩১
২.	কঙ্কণ (কঙ্কণপাদ)	১	৪৪
৩.	কম্বলাম্বর (কামলি)	১	৮
৪.	কাহ্নুপাদ (কাহ্নু, কাহ্নি, কহ্নিল, কৃষ্ণচার্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ ইত্যাদি)	১৩	৭, ৯, ১০, ১১ ১২, ১৩, ১৮, ১৯ ২৪*, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫
৫.	কুক্কুরীপাদ (কুক্কুরীপাদ)	৩	২, ২০ ও ৪৮*
৬.	গুন্ডরীপাদ (গুড্ডরী)	১	৪
৭.	চাটিলপাদ (চাটিল্ল)	১	৫
৮.	জয়নন্দী (জঅনন্দি)	১	৪৬
৯.	ডোম্বীপাদ	১	১৪
১০.	ঢেন্‌ঢণপাদ (ঢেন্‌ঢণপা)	১	৩৩
১১.	তন্ত্রী (তান্তি)	১	২৫*

Dhaka University Institutional Repository

১২.	তাড়ক	১	৩৭
১৩.	দারিক (দারক)	১	৩৪
১৪.	ধামপাদ (ধর্ম্মপাদ)	১	৪৭
১৫.	বিরুবাপাদ (বিরুপা, বিরুআ)	১	৩
১৬.	বীণাপাদ	১	১৭
১৭.	ভদ্রপাদ (ভাদে)	১	৩৫
১৮.	ভুসুকুপাদ (ভুসুকু)	৮	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০ ৪১, ৪৩ ও ৪৯
১৯.	মহীধরপাদ (মহিআ, মহিন্ডা, মহিত্তা)	১	১৬
২০.	লুইপাদ (লুয়ীপাদ)	২	১, ২৯
২১.	লাড়ীডোম্বী (এর একটি পদের উল্লেখ আছে, কিন্তু পদটি নেই)		
২২.	শবরপাদ (সবর)	২	২৮, ৫০
২৩.	শান্তিপাদ (শান্তি)	২	১৫, ২৬
২৪.	সরহপাদ (সরহ)	৪	২২. ৩২, ৩৮ ও ৩৯

[*তারক চিহ্নিত পদগুলো পুঁথি খণ্ডিত থাকার দরুন পাওয়া যায়নি। ২৩ সংখ্যক চর্যাটি ঐ একই কারণে অর্ধেক পাওয়া গেছে।][১৯]

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'চর্যাপদের রচনাকাল দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে'। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'চর্যাপদের ভাষা যেহেতু ৬৫০ হতে ১১০০ সালের সেহেতু চর্যাপদ রচনাকাল ৬৫০ সাল হতে ১১০০ সালের মধ্যে'। রাহুল সংকৃতায়নের মতে, 'চর্যাপদ এবং সরহপাদ যেহেতু রাজা ধর্মপালের সময়কার সিদ্ধাচার্য্য সেহেতু চর্যাপদ রচনার সময়কাল ৭৬৯ হতে ৮০৯ সাল পর্যন্ত।[২০]

সকল পণ্ডিতগণই স্বীকার করেছেন চর্যাগীতির ভাষা মূলতঃ বাংলা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এবং ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখগণ দেখিয়েছেন চর্যাপদের ভাষা মূলতই বাংলা। শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাগীতিতে ৬৫০ হতে ১১০০ সালের ভাষা লিপিবদ্ধ আছে। বলাবাহুল্য ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ কয়েকটি বিতর্ক উত্থাপন করে একবার একটি সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি আলোচ্য বিষয়কে এইভাবে সাজিয়েছেন–'১. ইহা কোনো ভাষা নয়, ২. ইহা অপভ্রংস, ৩. ইহা হিন্দি, ৪. ইহা মৈথিলি, ৫. ইহা উড়িষা, ৬. ইহা আসামী ৭. ইহা বাঙলা। পরিশেষে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে তিনি একে 'প্রাচীন বঙ্গ কামরুপীভাষা বলাই সঙ্গত বলে মনে করেন।'[২১]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি জীবনের সাথে নদী ও নৌকা যে কত ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা চর্যাগীতি হতে আজ পর্যন্ত বহমান বাংলার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি, দেহতত্ত্ব, মারফতি, জারি প্রভৃতি গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্যাগীতির সাধন প্রণালীকে সাধারণ জনজীবনে সহজ করে তুলে ধরার জন্য নদী, নৌকা, হাল, গুন, খোল, খুঁটি, কাছি, পাল ইত্যাদি রূপক ছলে ব্যবহার করা হয়েছে।

'কাঅ নাবড়ি খান্টি মন কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু–বঅণে ধর পতবাল॥'[২২]

আর একটি উপমা দেওয়া হয়েছে–একটি পদ্মের চৌষট্টি পাঁপড়িতে চড়ে ডোম্বী নাচে। অসাধারণ নৃত্য কুশলা এখানে চমৎকার ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে।

'এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি।'[২৩]

হরিণ শিকারীর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, একথার বর্ণনায় বলা হয়েছে–'তরঙ্গেতে হরিণার খুর ন দীসই।[২৪] হরিণের পলায়ন পর মূর্তি পদকর্তাদের বহুল অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, তাঁরা দেখেন–দ্রুত লম্ফ দিয়ে হরিণ যখন পালায় তখন তার খুর যেন অদৃশ্য হয়ে যায়, মনে হয় ঢেউ যাচ্ছে।

'তু লো ডোম্বী হউ কাপালী
তোহর অন্তরে মো এ ঘালিলি হাড়েরি মালী'॥[২৫]

প্রণয়িনী যেখানে সমাজে অস্পৃশ্যা, প্রেমিক যেখানে কাপালিক না সেজে আর করবে কি! প্রিয়ার জন্য গলায় হাড়ের মালা পরে সমাজ ত্যাগ করেছে সে। 'ওলো তুই যেমন ডোম্বী, আমিও তেমনি কাপালিক। তোর জন্যই গলায় হাড়ের মালা ধারণ করেছি।' প্রেম নিবেদনের এই ভাষা অপূর্ব। এই ধরনের অনেক অসাধারণ উপমা দেওয়া হয়েছে চর্যাগীতিতে।

পটমঞ্জরী, মল্লারী, গুঞ্জরী, কামোদ, বরাড়ী, ভৈরবী, গউড়া, দেশাখ, মালসী গউড়া, মালসী, রামক্রী, কুহ, গুঞ্জরী, শবরী, দেশাখ, অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্রী, ধানসী, মালসী ও বঙ্গালরাগ ব্যবহৃত হতো। 'পটমঞ্জরী হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় রাগ।যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো তার মধ্যে পটহ বা ঢোল এবং একতারা ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়া মাদল, করণ্ড, কসাল, ডমরু, বীণা, ডমরুলি (ছোট ডমরু), বাঁশি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হতো।[২৬]

চর্যাগীতি সোজাসুজি আধ্যাত্মিক এবং তত্ত্ব উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত বহন করে। এতে জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের দোলা, মুক্তি পাবার ও অবস্থানরূপ মহাসুখ নিবাসে পৌঁছাবার

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকানা আছে। পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু আনুগতির নির্দেশ আছে। চর্যাগীতির ধর্মনীতিগুলো সবই বৌদ্ধ বলে হরপ্রসাদশাস্ত্রী চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিচারে চর্যাগীতির সবই যে বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজপন্থী, মন্ত্রপন্থী, বজ্রপন্থী যাই বলি না কেন কোনো একটি মাত্র সঠিক গোষ্ঠীর রচনায় চর্যাগীতি তা বলা যায় না। যেমন–ধার্মিক লোক আগম-পুথি পড়তো, কোশাকুশি নিয়ে পূজা করতো এবং মালা জপ করতো। সেকালের সাধারণ ধনীর ঘরে যে পূজার জন্য দেব-প্রতিমা থাকতো তা বোঝা যায় ধামের চর্যাটি থেকে–

॥ [রাগ] গুঞ্জরী-১[ধাম] পাদানাং॥

পদ-৪৭

কমল কুলিশ মাঝে ভই ম মিঅলী[২]
সমতা- জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ॥ধ্রু ॥
ডাহ[৩] ডোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর[৪] লই ষিঞ্চুহূঁ পাণী ॥ধ্রু ॥
নউ খর[৫] জালা ধূম ণ দিশই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥ধ্রু ॥
ফাটই[৬] হরি-হর-বাহ্ম ভ [ড়া রা][৭]
ফীট্টা[৮] হই ণবগুণ শাসন-পড়া ॥ ধ্রু ॥
ভণই ধাম ফুড় লেহুঁ রে[৯]
পঞ্চ নালেঁ[১০] উঠে[১১] গেল পাণী ॥ ধ্রু ॥

পুড়ছে হরি হর ব্রহ্মা ভট্টারক (অর্থাৎ ঠাকুর), পুড়ে গেল নয়খণ্ড (অথবা পইতা) এবং শাসনপট্ট। হরিহর–হরি (বিষ্ণু) + হর (শিব)। বাম্হ < ব্রহ্মা। ভট্টা-ভট্ট (তৎসম) + আ (বিশিষ্টার্থে)। এই পদটিতে স্পষ্টই বিষ্ণু এবং শিবের উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রত্নলিপিগুলোতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণলীলার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বিষ্ণু, নারায়ণের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

শিব ও শিবলিঙ্গ (টেরাকোঠা) পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দির
চিত্র : ১০.১১.২০২০

কাপালিক (বা কাবাড়ি) যোগীর বেশ-ভূষা-আচরণের বর্ণনা নিখুঁতভাবে দেওয়া হয়েছে যে চর্চায় (১১) তার ঠিক আগের চর্যার 'কাপালি জোই' ও 'ডোম্বী' যেন পরবর্তী কালের বাঙলা সাহিত্যে শিব-শক্তির লৌকিক রূপ পূর্বাভাসিত করেছে। শিব নিঃস্ব ('কাপালি') যোগী। তিনি হাড়ের মালা (সতীর অস্থি) পরেন। আর শক্তি ডোমনী বা কোচ-নারী হয়ে নদীতে খেয়া দেন এবং শিবকে ভুলিয়ে যোগভ্রষ্ট করেন। যে সরোবর ঘেঁটে তিনি মৃণাল (পদ্মের শ্বেতবর্ণ ভক্ষণীয় কন্দ) খান, যে চৌষট্টি-দল পদ্মে চড়ে বেচারা ডোমনী (ডোম্বী) নৃত্য করে তাতেই মনসার উৎপত্তি। এখানে শৈব যোগীদের সঙ্গে বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের শিবসঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।[২৭]

আবার সরহ তাঁর দোহাকোষে সহজ-পন্থার উপদেশ দেওয়ার আগে প্রথমে প্রচলিত ধর্ম ও সাধনার মতগুলোর বিচার করেছেন। তিনি এগুলোকে ধরেছেন, ১) ব্রাহ্মণ্যমত অর্থাৎ বেদবাদ ও বেদান্তবাদ, (২) 'অইরিঅ' (অর্থাৎ আর্য) মত–মন্ত্রপূজাদি শৈব ও ভাগবত মত, (৩) ক্ষপণক অর্থাৎ জৈনমত এবং (৪) প্রধান দুই বৌদ্ধমত–সৌত্রান্তিক ও মহাযান। বৌদ্ধমত দুইটি নিরাস করেছেন সরহ এই বলে, 'চেলা ও ভিক্ষু স্থবির-উপদেশে বন্দিত প্রব্রজ্যাবেশ ধারণ করে। কেউ সূত্রান্ত

ব্যাখ্যানে নিবিষ্ট হয়। কেউ বা মাথায় হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন দৃষ্ট হয়, অপরে মহাযানে ধাবিত হয়। এদের একজনের দ্বারাও পরমার্থ সাধিত হয় না।' সুতরাং চর্যাকর্তাদের বিধিমত বৌদ্ধ বলতে পারি না।[২৮]

সুতরাং চর্যা পদকর্তারা যে মতাবলম্বী থাকুক না কেন তাদের অনেকেই যে তান্ত্রিক যোগপন্থী ছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত। চর্যা পদকর্তাদের মধ্যে অধ্যাত্মসাধকদের এই মন্ত্রতন্ত্রের ক্রিয়া ছিল চর্যাপদের সঠিক আধ্যাত্মিক যোগ সাধনার মাধ্যমে পদ রচনা। মনীন্দ্রমোহন বসুর মতে, চর্যাগীতির ধর্মতত্ত্ব প্রধানত দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ চর্যাতে তত্ত্বের আলোচনা থাকলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মাঝে মাঝে তন্ত্র ও যোগের উল্লেখ রয়েছে।[২৮] অতএব চর্যাতে ভাবদর্শনের প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

১.২ রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও গীতগোবিন্দ

শ্রীকৃষ্ণ

বাঙলায় কবি জয়দেবই রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। (তথ্যসূত্র : বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ; পৃ. ২৩, ক্ষুদিরাম দাস)। জয়দেবের রাধার মধ্যে কৃষ্ণভক্তির চূড়ান্ত স্তরের বিকাশ দেখতে পাই, কবির ভক্তি নিবেদিত হয়েছে কেবলমাত্র কৃষ্ণের চরণেই। আর জয়দেবের গীতগোবিন্দই বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও বাঙলা গানের প্রাণের সুরটি ধরিয়ে দিয়েছে। গীতগোবিন্দ নিয়ে আলোচনার আগে রাধাকৃষ্ণ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। পুরাণ লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতের পরিশিষ্ট 'খিল হরিবংশ' থেকে আরম্ভ করে নানা পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ এই কৃষ্ণনামের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই পুরাণ সমূহের আগেও কৃষ্ণনামের নানা উপাদান ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য হিসেবে অভিনন্দিত ঋগ্বেদের মধ্যেও আমরা কৃষ্ণ প্রসঙ্গের প্রাথমিক আভাসটি পেয়ে থাকি। আজ আমরা যে কৃষ্ণকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত দেখি, তার মধ্যে মিলিত হয়েছেন 'বিষ্ণু'. 'নারায়ণ', 'হরি' প্রভৃতি বিচিত্র দেবসত্তা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে তাঁরা ছিলেন পরস্পর পৃথক। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু', এবং 'কৃষ্ণ' আজ অভিন্ন হলেও এঁদের মধ্যে রয়েছেন বৈদিক 'আদিত্য-বিষ্ণু' উপনিষদের 'বাসুদেব-কৃষ্ণ' এবং ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের 'নারায়ণ'।

'আদিত্য-বিষ্ণু' বৈদিক দেবতা, ঋগ্বেদে এঁর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে 'বিষ্ণু' সম্বন্ধে যে মন্ত্রগুলো পাওয়া যায় তার একটি হলো–

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমুলহমস্য পাংসুরে।
ত্রীনি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥
–ঋগ্বদ (হরফ সংস্করণ) ১/২২/১৭-১৮

বিষ্ণু সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ হতে পরিক্রমা করেছিলেন সে প্রদেশ হতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পদে এ জগৎ আবৃত হয়েছিল।

সায়নাচর্যের মতে 'বিষ্ণু'র এই তিন প্রকার পদক্ষেপের প্রসঙ্গ পরবর্তী কালের পুরাণে উল্লিখিত বামনাবতারের পূর্বাভাস। ঋগ্বেদের এই 'বিষ্ণু' সূর্যের সাথে অভিন্ন বলেও কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। গোপবালক কৃষ্ণের একটি ক্ষীণ আভাসও ঋগ্বেদের কোনো কোনো শ্লোকে পাওয়া যায়। আর পুরাণে কৃষ্ণ গোপবেশী বিষ্ণু। অন্য একটি শ্লোকে বিষ্ণুকে বলা হয়েছে 'র্যুবা কুমারঃ'। পুরাণে বৃন্দাবনলীলার কৃষ্ণও গোপশিশু ও কিশোর। ঋগ্বেদেও দেখি দ্যুলোকের বহু ঊর্ধ্ব স্থানে বিষ্ণুর বহু শৃঙ্গ বিশিষ্ট গরু (গোরু) ছিল (যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা অঘাসঃ)।[২৯] ঋগ্বেদে ইন্দ্রের মর্যাদা বিষ্ণুর তুলনায় বেশী হলেও পুরাণে 'উপেন্দ্র' (উপ-ইন্দ্র) নামটি বাদ দিলে বিষ্ণুই প্রধান দেবতা। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, বেদের বিভিন্ন কাহিনী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব সূত্রের অঙ্গীকারে নবতর পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে। বেদে ইন্দ্রের শত্রুদের মধ্যে বৃত্র-অহির উল্লেখ আমরা পাই, যাকে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন। এই অহি-বৃত্র কল্পনাই সহজে কালিয়নাগের কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৩০]

পুরাণে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিরোধসংক্রান্ত দুটি গল্প আছে। একটি পারিজাতহরণ আর দ্বিতীয়টি গোবর্ধন ধারণ। পারিজাতহরণ উপাখ্যান অর্বাচীন, এর কোনও আভাস বৈদিক সাহিত্যে নেই। তবে গোবর্ধন-ধারণের আভাস ক্ষীণভাবে আছে। কৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রতিকূলতা থেকে বৃন্দাবনকে রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন ধারণ করেন, আর বেদে আছে বিষ্ণু পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আকাশকে থামের মতো ধরে আছেন ("যো অস্কভায়দ্ উত্তরং অধস্থম্"), যার তলায় মর্ত্য-অমর্ত্যের বাস। এই 'গোবর্ধনলীলা' সাহিত্যে যেমন মূর্তি-শিল্পেও তেমনি অত্যন্ত সুপরিচিত প্রসঙ্গ। পরবর্তী ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে 'বিষ্ণু' প্রসঙ্গ আরও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায় দেবতাদের কৌশলে নিহত বিষ্ণুর ছিন্নমুণ্ডই আকাশে সূর্যরূপে শোভমান।[৩১] শতপথ ছাড়া 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ও 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে'ও বৈদিক বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে একজন বিশিষ্ট দেবতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। এই বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক এবং ইন্দ্রের দ্বারপাল।

আবার ঋগ্বেদের কাল থেকেই নারায়ণ নামে এক ঋষি- দেবতার উল্লেখ আমরা পেয়েছি। তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।'[৩২] শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত নারায়ণ যে ঋগ্বেদেরই নারায়ণ তাও সহজেই বোঝা যায়। ঋগ্বেদে যাঁর বর্ণনা 'সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্',[৩৩] শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁরই ইচ্ছা—'অতিতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি'[৩৪] এবং শতপথেও বিষ্ণু নারায়ণ দুই পৃথক দেবতা।

কৃষ্ণ নামে একাধিক ব্যক্তির পরিচয়ও আমরা ঋগ্বেদ থেকে পাই। যেমন ৮/৬, ৮/৮৫, ১০/৪২, ১০/৪৩, ১০/৪৪ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ। ৮/৮৬ সূক্তের দ্রষ্টা কার্ষ্ণি বা বিশ্বকায় যিনি কৃষ্ণ-পুত্র। অংশুমতী নদীতীর নিবাসীও এক কৃষ্ণ ঋষি।[৩৫] কিন্তু এঁদের আমরা বাসুদেব কৃষ্ণের পূর্বরূপ বলে গ্রহণ করতে পারি না। মহাভারত, পুরাণাদিতে যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি তাঁর আদিরূপ সম্ভবতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদেই আমরা পাব।[৩৬] এখানে কৃষ্ণের যে পরিচয় তা মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়। উভয়েই ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য এবং উভয়েই দেবকীপুত্র। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের ষোড়শ প্রপাঠকে মানবকুলজাত ইতরার পুত্র মহীদাসের প্রসঙ্গের পরেই রয়েছে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের প্রসঙ্গ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এই কৃষ্ণ মনুষ্য সন্তান। বিষ্ণু যেখানে দেবতা, ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ সেখানে পৃথিবীরই মানুষ।

ঋগ্বেদ কিংবা তার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যসমূহে আমরা বাসুদেব নামের উল্লেখ পাইনি। বহু পরবর্তীকালের পরিশিষ্টমূলক কিছু কিছু সাহিত্যে অবশ্য এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৭] অতএব দেখা যাচ্ছে, আদিতে 'বিষ্ণু', 'নারায়ণ', 'কৃষ্ণ', 'বাসুদেব' প্রভৃতি সত্তাগুলো পরস্পর পৃথক ছিল। কিন্তু কালক্রমে এঁদের সমীভবন ঘটেছে। সমাজশক্তির কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে এই একীভবন সম্ভব হয়েছিল তা আজ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও কালে কালে যে এদের মিশ্রণ ঘটেছে তার চিহ্নসমূহ বিরল নয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম অধ্যায়ে ও মহানারায়ণ উপনিষদের বিষ্ণুগায়ত্রী-মন্ত্রে 'নারায়ণ' 'বাসুদেব' ও 'বিষ্ণু'—এই তিনটি নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। এখানে তিনটি নামই একজন দেবতার। মন্ত্রটি হলো—'ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ'। মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়েও এই 'নারায়ণ' নামটি পাওয়া যায়। এই পর্বাধ্যায়ের একটি আখ্যান থেকে জানা যায় যে, 'নারায়ণ', 'বাসুদেব' কৃষ্ণেরই ভিন্ন রূপ। সেখানে বাসুদেবকে নারায়ণের

'আদি-প্রকৃতি' ও 'পরম পুরুষ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই অংশে আরও বলা হয়েছে, বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষ্ণু ও নারায়ণ, বাসুদেব-কৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ।

বনপর্বে ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, মহাপ্রলয়ের সময় তিনি এক দেব-শিশুর উদরে সারা ব্রহ্মাণ্ডকে অবস্থিত দেখেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, ইনি নারায়ণ (অপাং নারা ইতিপুরা সংজ্ঞাকর্ম্ম কৃতং ময়া। তেন নারায়ণোহস্ম্যুক্তো মম তত্ত্বয়নং সদা॥)[৩৮] এরপর মার্কণ্ডেয় বলেন, যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ও আত্মীয় জনার্দনের এটি অন্য রূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে বাসুদেব কৃষ্ণ এবং নারায়ণ অভিন্নত্ব লাভ করেছেন। জ্যাকোবি মনে করেন, বৈদিক যুগের শেষে বাসুদেব, নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দেবকীপুত্র কৃষ্ণ তখনও সত্য-অনুসন্ধিৎসু একজন মানুষ। আরও পরবর্তীকালে এই মানুষই বিষ্ণুর সাথে সাম্যলাভ করেছেন।[৩৯] আমার মনে হয় বাসুদেব ও কৃষ্ণ মূলতঃ পরস্পর পৃথক ছিলেন। পরবর্তীকালে ভাবনাগত ঐক্যে তাঁরা এক দেবতায় এবং এইভাবে এক অবতারে রূপান্তরিত হন। এই তিনের সম্মেলনকে কোনও নির্দিষ্ট সাল-তারিখে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। বিশাল কাল-পরিধিতে বিবর্তনশীল সংস্কৃতির প্রতিটি স্তর-পরিবর্তনকে ধারণ করে এই একীকরণ সম্ভব হয়েছে। আমাদের অনুমান খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের বেশ কিছু আগে আরম্ভ হয়ে এটি খ্রিস্টীয় কালের আগেই সমাপ্ত হয়েছিল।

এছাড়া, খ্রিষ্টের জন্মের বহু আগে থেকেই কৃষ্ণ যে জনমনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছিলেন তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকে 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্'[৪০]সূত্রটি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, পাণিনির কালেই বাসুদেবের উপাসক ও অর্জুনের উপাসক দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। একালেই কৃষ্ণার্জুনের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। পতঞ্জলিও তাঁর ভাষ্যে পাণিনির এই পৃথক সূত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন—কৃষ্ণার্জুন মহাভারতের ক্ষত্রিয়বীর শুধু নন, দুজন দেবতা (অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ)। গ্রীয়ারসন, ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই পতঞ্জলভাষ্য থেকেই মনে করেন যে, পাণিনির এই সূত্রের মধ্যেই মহাভারতের কৃষ্ণ ও অর্জুনের দেবত্বপ্রাপ্তির ইতিহাস নিহিত আছে। এই সূত্রে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে স্বল্পসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট 'অর্জুনে'র পরিবর্তে অধিকতর সম্মানার্হ 'বাসুদেব' শব্দটি আগে বসেছে। এতেই বোঝা যায় বাসুদেবই অধিকতর সম্মানার্হ এবং তাঁর ভক্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত ছিলেন। পতঞ্জলি পাণিনির আর একটি সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কংসভক্ত ও বাসুদেবভক্তের কথা বলেছেন।[৪১] পাণিনির অন্য একটি সূত্রের ব্যাখ্যার সময়ও পতঞ্জলি 'বাসুদেববর্গ্যঃ' ও 'বাসুদেববর্গীণঃ' এই দুটি পদের উল্লেখ করেছেন।[৪২] এই পদগুলো বাসুদেব-কৃষ্ণ ভক্তের নামান্তর। পতঞ্জলির

দু'শতাব্দীর আগে যে সমস্ত গ্রীক ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বাসুদেবপূজারী গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কুইন্টাস কার্টিয়াস খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক হলেও তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে নেওয়া–সুতরাং প্রামাণ্য। তিনি লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধের সময় পুরুর সৈন্যরা সামনে হেরাক্লিসের মূর্তি নিয়ে বিতস্তা তীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিল।[৪৩] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এই হেরাক্লিসই বাসুদেব কৃষ্ণ। কারণ পৌরব সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে তাঁদের অবস্থান, এবং এই স্থান ত্যাগ করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে অত্যন্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদের শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত প্রথমতঃ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে পুরু নিজে এবং তাঁর সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাসুদেব কৃষ্ণোপাসক ছিলেন।[৪৪] মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থের কিছু অংশ অ্যারিয়ান নামক এক গ্রিক লেখকের রচনায় উদ্ধৃত আছে। সেখানেও মেগাস্থিনিস বলেছেন 'সৌরসেনয়' জাতির লোকেরা 'হেরাক্লিস' দেবতাকে বিশেষ সম্মান করত। এরা 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবারা' নামক দুটি নগরে বাস করত আর এদের দেশের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হত 'জোবারিস' নদী। পণ্ডিত ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, 'সৌরসেনয়' এবং 'হেরাক্লিস' বলতে 'সাত্বত' এবং বাসুদেব কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। এই দুটি নগরী ও নদীর নামও যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর ও যমুনা। কৃষ্ণপুর নগরটি কারও কারও মতে গোকুল, যা কৃষ্ণের ব্রজলীলারই আশ্রয়স্থলী।

লিপিলেখন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও কৃষ্ণনামের উল্লেখ আছে–

বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় রচিত মহাস্থানচক্র লিপি বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনতম প্রত্ননিদর্শন।[৪৫] প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের মতে এটি সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের সমসাময়িক। এই সময় ধরা হলে এর লিপিকাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে।[৪৬] শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি ভগ্ন গুহার গাত্রে খোদিত বিষ্ণুচক্রের নীচে ও পাশে সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ আছে–

> পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিজ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য
> মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
> চক্রস্বামিণঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।

চন্দ্রবর্মার কাল চতুর্থ শতাব্দী। তিনি নিজেকে বিষ্ণুর পূজক বলে অভিহিত করেছেন। পঞ্চম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসনপট্ট থেকে জানা যায় এই শতাব্দীর প্রথম দিকে শিবনন্দী গোবিন্দস্বামীর

দেউল প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪৭] এই গোবিন্দস্বামী নামটিও বিষ্ণুর তথা কৃষ্ণের অপর নাম। হরিবংশেই আমরা ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম পাই।[৪৮]

ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর পট্টোলীতে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।[৪৯] সপ্তম শতকের লোকনাথ পট্টোলীতে ত্রিপুরা জেলায় ভগবান অনন্তনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতেই কৈলান পট্টোলীতে শ্রী ধারণরাতকে পরমবৈষ্ণব বলে অভিহিত করা হয়েছে ও পুরুষোত্তমের ভক্ত বলা হয়েছে। এই সমস্ত নিদর্শন থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে পৌরাণিক বিষ্ণুপূজার প্রসার ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রদ্যুম্ন পৌরাণিক কৃষ্ণের বংশধর এবং বলরাম অনন্তেরই অবতার। সুতরাং প্রদ্যুম্নেশ্বর ও অনন্তনারায়ণের মন্দির বাংলাদেশে পৌরাণিক বিষ্ণু-কৃষ্ণপূজা প্রসারেরই সাক্ষ্যবাহী।

কৃষ্ণনামের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরের প্রত্ননিদর্শন থেকে। বাংলাদেশে কৃষ্ণনাম যে ধীরে ধীরে শিল্পে-সাহিত্যে স্থানলাভ করছিল পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলো থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার বেশ কিছু অংশ পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে।[৫০]

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের স্থাপত্যে যে মিথুন মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে (টেরাকোঠার কাজ–কোড R 2001) তাতে কৃষ্ণের পাশে দণ্ডায়মান নারীমূর্তিটি রাধার কিনা এ নিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। কয়েকটি পুরাণ ও গাথা-সপ্তশতীতে যদিও রাধার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এই মিথুনমূর্তি যে রাধাকৃষ্ণের এ সিদ্ধান্ত করার পেছনেও কয়েকটি যুক্তি আছে। কে.এন. দীক্ষিত বলেন–এই দেবমিথুনের নিকট-সান্নিধ্যে বলরাম-যমুনা প্রসঙ্গ বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই মিথুনও বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত। যদি তাই হয় তবে কৃষ্ণের পাশে অবস্থিত এই নারী নিশ্চয়ই কোনো গোপিনী। কিন্তু তিনি যে সাধারণ গোপিনী নন–তা তাঁর মস্তকের পিছনের দিকের জ্যোতির্মণ্ডল থেকে বোঝা যায়। এই অসাধারণত্ব গোপিনীদের মধ্যে রাধারই ছিল। অতএব এটি রাধারই মূর্তি।[৫১] আমি ২০২০ সালে পরপর দুইবার পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে টেরাকোঠার এই কাজগুলো দেখেছি মন্দিরের গায়ে–

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরে টেরাকোঠার এই কাজটিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বলে অনুমান করেন গবেষকগণ (কোড-R 2001)

কানাই-বলাই

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরে টেরাকোঠার কাজ

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে টেরাকোঠার কাজ
চিত্র গ্রহণের তারিখ : ১৪.১১.২০২০

অষ্টম শতাব্দী পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বিষ্ণু-নারায়ণের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে আছে, মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা নন্ন নারায়ণের দেউল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই নন্ন নারায়ণই বামন বিষ্ণুরই আর এক নাম।[৫২]

নবম শতাব্দীতে কামরূপের বনমালবর্মদেবের শাসনে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে।একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গসমতটের বৌদ্ধরাজা লডহচন্দ্র পট্টিকেরে 'লডহ মাধব' নামে কৃষ্ণ-বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু ভূমি দান করেছিলেন। ময়নামতীতে পাওয়া দুটি তাম্রশাসনে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা আছে।[৫৩]

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে হরিবর্মের মহামন্ত্রী রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রাম নিবাসী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করান।[৫৪] মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তির প্রথমেই বিষ্ণুবন্দনা রয়েছে–

গাঢ়োপ গূঢ় কমলাকুচকুম্ভ পত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।

মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোহস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

পাল এবং সেনযুগে বাংলাদেশের নানা স্থানে বহু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেলেও সেনযুগে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ প্রেমলীলাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, এ যুগের সাহিত্যই তার প্রমাণ।

ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে পাওয়া সমতটের ভোজবর্মার বেলাভ লিপিতে কৃষ্ণনামের দুটি ধারারই রূপায়ণ দেখা যায়।[৫৫] এই লিপিটিকে জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাসের অগ্রপথিক বলা যায়।

সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ।
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ।
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ॥

এই কৃষ্ণবন্দনায় কৃষ্ণনামের চারটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে–(১) কৃষ্ণ-গোপী, (২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা কৃষ্ণ, (৩) ভগবান স্বয়ং নয়–অংশাবতার কৃষ্ণ এবং (৪) ভূভারহরণের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর এই লিপিতেও গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। চৈতন্য প্রভাবিত ঐশ্বর্যবিমুক্ত মাধুর্যমূর্তি এখনও জনমানসে অনাগত বিষয়।

বিস্তারিত আলোচনায় এটি প্রশ্ন থেকেই যায় শ্রীকৃষ্ণ কখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন?

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৭) বলা হয়েছে–*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥* 'হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।' কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন না, তাঁর বিভিন্ন অবতার যথা–পুরুষাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, গুণাবতার,

শক্ত্যাবেশ অবতার ও মন্বন্তর অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি–এ চার যুগকে একত্রে এক দিব্যযুগ বা চতুর্যুগ বলা হয়, একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয় আর চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়।

১ মন্বন্তর = একাত্তর চতুর্যুগ

১৪ মন্বন্তর = (৭১ × ১৪) চতুর্যুগ = ৯৯৪ চতুর্যুগ বা প্রায় এক হাজার চতুর্যুগ।

কলি যুগের সময়সীমা– ৪, ৩২,০০০ বছর।

দ্বাপর যুগের সময়সীমা– ৮,৬৪,০০০ বছর।

ত্রেতা যুগের সময়সীমা– ১২,৯৬,০০০ বছর।

সত্য যুগের সময়সীমা– ১৭,২৮,০০০ বছর।

এক চতুর্যুগের সময়সীমা– ৪৩,২০,০০০ বছর।

৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ = ৪৩,২০০০০ × ৭১ = ৩০৬,৭২,০০০০ বছর = এক মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর অর্থাৎ = ৩০,৬৭,২০০০০ × ১৪ = ৪২৯,৪০,৮০,০০০ বছর ব্রহ্মার একদিন।[৫৬]

এ সময়ের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার আসেন, কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে এক হাজার দিব্য চতুর্যুগ বা চার হাজার যুগে প্রায় চার হাজার যুগাবতার অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর, প্রতি মন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ। তবে শ্রীকৃষ্ণ কোন মন্বন্তরে কোন চতুর্যুগের কোন যুগে অবতীর্ণ হন? তিনি বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের আটাশতম চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
‘বৈবস্বত’-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

– চৈ.চ. আদি ৩। ৫-১০

জ্যোতির্বিদদের গণনা অনুসারে খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০১ সাল থেকে কলিযুগের আরম্ভ, বর্তমানে ২০২০ সাল চলছে, তাহলে কলিযুগের বর্তমান বয়স ৩১০১+২০২০ = ৫১২১ বছর। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের দিন কলির আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর প্রকট লীলা করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ১৫২১+১২৫ = ৫২৪৬ বছর পূর্বে হয়েছিল। ২০২০ সাল থেকে ৫২৪৬ বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

রাধাতত্ত্ব

বৈষ্ণবপুরাণে রাধা হচ্ছেন কৃষ্ণের মহাভাবময়ী হ্লাদিনী শক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাগবতপুরাণে রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। শুধু ভাগবতপুরাণ কেন মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণপ্রভৃতি যে সব প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণচরিতকথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে সে সব গ্রন্থের কোনটিতেই রাধার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, নারদীয়পুরাণ, আদিপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এবং হালের গাথা-সপ্তশতী, ভাসের বালচরিত, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে এক আধটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সব গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র পদ্মপুরাণেই রাধা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছেন। তবে রাধাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণলীলা রীতিমত জমকালো হয়ে উঠেছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যা মন্তব্য করেছেন তা অতিশয় মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, 'ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণব ধর্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণব ধর্মের নামগন্ধ মাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র স্বরূপ। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নতুন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াই গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে বিদ্যপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বাঙ্গালার বৈষ্ণবকবিগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই চৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।'

রাধা নামটি বেদ, পুরাণ বা অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোকগুলোতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে যেমন–

পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক।

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয় দ্রহঃ ॥ ভাগবত ১০.৩০.২৪
শ্লোকার্থ-নিশ্চয়ই সেই রমণী আরাধনা করে ভগবান হরিকে তুষ্ট করেছেন, না হলে গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে তাঁকে নির্জনে নিয়ে গেলেন কেন?

অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্য জন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া॥ বিষ্ণু ১০.১৩.৩৪
বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটিতেও রাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একজন প্রধান গোপিনীর আভাস পাওয়া যায়। শুধু বিষ্ণু পুরাণের মত প্রাচীন পুরাণেই নয়, ঋগবেদের মত প্রাচীনতম গ্রন্থেও রাধা ও রাধস শব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে (ঋগ্বেগ ১.২২. ৭-৮ এবং ঋগ্বেদ ৮.৪৫.২৪ ঋক দ্রষ্টব্য)।

পদ্মাপুরাণের বহু স্থানে রাধার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর "চৈতন্যচরিতামৃতে" ও রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পদ্মপুরাণ থেকে মাত্র দু'একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন–

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব গোপীষু সেবেকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥ উজ্জ্বলনীলমণি, চৈতন্যচরিতামৃত

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী সংজ্ঞকে তিথৌ॥
বৃষভানো র্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা॥ পদ্ম, ৪০, ৪১

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্। পদ্ম, পাতাল খণ্ড ২৯ অধ্যায়

ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যাংশা মূল প্রকৃতিঃ রাধিকা। পদ্ম, পাতাল ২৯ অধ্যায়

অথর্ব বেদ (১৯.১৩), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩.১.১.১১) ও অমরকোষে রাধা শব্দ পাওয়া যায়।

রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। মৎস্য, ১৩.২৮
রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি মৎস্য পরাণাৎ॥ জীব গোস্বামীমৃত ব্রহ্মসংহিতার টীকা।

রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যাং পুরুষং পুরম্।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যঃ যতস্তদ্ গোচরেহ্ভবৎ॥ বায়ুরাণ, ১০৪, ৫২

তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।
স্বনামা বিদিং কুণ্ডং তীর্থমদূরতঃ॥
রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্। বরাহ, ১৬৪. ৩৩-৩৪

লক্ষ্মী-সরস্বতী-দুর্গা-সাবিত্রী-রাধিকা পরা॥ নারদ পঞ্চরাত্র

রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতে ধৃত শ্লোক–
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী
তথাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম॥ আদিপুরাণ।৭০

মুহমারুত্রণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বলবীণ অন্নাণ বি গোরঅং হরসি॥ হাল, গাথা সপ্তশতী,

বৈষ্ণবাচার্যদের অনেকেই 'আরাধিতঃ' বা 'রাধিতঃ শব্দে 'রাধা' নামই দেখতে পেয়েছেন। সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণব তোষণী টীকায় বলেছেন 'অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতম্॥'[৫৭]

পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে স্পষ্টতঃ, 'রাধা'র উল্লেখ আছে। তবে রাধাকৃষ্ণলীলার বিশদ উল্লেখ আছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।[৫৮] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের বিহারবর্ণনায় রতিবিলাস বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্যে মনে হয় গীতগোবিন্দ রচনায় অন্যান্য পুরাণ বা সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাছেই বেশি ঋণী। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রামাণিকতা

সন্দেহের অতীত নয়। এই পুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনায় বহু অংশই হয়তো প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যে সময়ের কথা উল্লেখ আছে তা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হলেও অন্তত একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। এই পুরাণ তখন চলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' কখনো রচিত হতো না। অতএব এই ব্রহ্মবৈবর্ত একাদশ শতাব্দীর পূর্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত না জানি আরো কত কালের।' প্রসঙ্গত ড. আর.সি. হাজরাও মনে করেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তের মূল অংশ অষ্টম শতাব্দীতেই অন্তত রচিত হয়েছিল। বাঙালি পণ্ডিতগণ দশম শতক থেকে এর নব রূপায়ণ আরম্ভ করেন এবং খ্রিষ্টাব্দ ষোড়শ শতকে এটি বর্তমান রূপ লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে উজ্জ্বলনীলমণির রাধা শ্রীরূপের ভক্তিরস প্রাণ দিয়ে গড়া হলেও এর মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। অবশ্য তিনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত ও পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করেননি। শ্রীরূপ রাধাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পূর্বসূরীদের বহু পদ উল্লেখ করেছেন–তবুও তাঁর রাধার প্রেমোন্মাদিনী অবস্থা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রকট হয়েছে বলেই মাধুর্যরসের 'রাধা'র পশ্চাতে যেন শ্রীচৈতন্যের স্পর্শ বর্তমান। জয়দেবের নৃত্যকলাপটিয়সী রাধা, বিদ্যাপতির রাজনন্দিনী রাধা বা চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে তাঁর রাধার তফাৎ অনেক। তবে চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে শ্রীরূপের রাধার কিছু সংহতি আছে তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। যথা–

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।
*　*　*　*
প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে।
*　*　*　*
উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার।[৫৯]

একটা কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, শ্রীচৈতন্যের কাছে বৃন্দাবনলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলারূপে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁর কাছে শ্রীরাধা তখন পরমাধ্য এবং উপাস্যতত্ত্ব আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই প্রকট হয় ভক্তিসাধন দৃষ্টির মূর্ত প্রতীকে। চৈতনোত্তরকালে শ্রীরূপের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'রাধাতত্ত্ব' দর্শন সৃষ্টি করেন। পরমভাগবত, জীব গোস্বামীর 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'প্রীতিসন্দর্ভ' প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থেও বিশেষ করে শ্রীরাধাকে পরমতত্ত্বরূপে দেখিয়েছেন।[৬০]

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও রাসলীলা

পরমার্থত রাধা ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য পৃথক মূর্তি ধারণ করেন। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ সত্ত্বেও ভেদ কল্পিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তে আছে, নবলক্ষ গোপীর সঙ্গে হরি নবলক্ষ গোপরূপ ধারণ করলেন। এই রূপে রাধিকারমণ নানা মূর্তি ধরে প্রতিগৃহে গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে সুরম্য রাসমণ্ডলে রমণ করতে লাগলেন (ব্র. বৈ.৪.২৮.৭৪)। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাই কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃ. ৮৭)

এ যেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কথারই প্রতিধ্বনি।

ব্রহ্মবৈবর্তে কৃষ্ণ রাধিকাকে বলেছেন–

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধা প্রেয়সী শ্রেয়সী পরা।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম্॥
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচনঃ॥
ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপো২হমচ্যুতঃ॥ ॥ ব্র. বৈ. ৪.১৫.৫৭.৬০

তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গল প্রদায়িণী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি সেই আমি, আমাদের কোন ভেদ নেই। যেরূপ দুগ্ধে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। কুমার যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্মাণ করতে পারে না, স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্মাণ করতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধার স্বরূপ, আমি অচ্যুত বীজ স্বরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে–

মূলপ্রকৃতিরেকা সা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ পঞ্চবিধা সা চ বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সর্বাসাং প্রেয়সী কান্তা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥ ব্র. বৈ. ১.৩০.১৭.-১৮
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতি রাধিকা॥ পদ্ম, পাতার, ২৯ অধ্যায়

মূল প্রকৃতি থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধিকা এই পঞ্চ প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে বলা হলেও এই পুরাণেরই বহুস্থলে রাধাই যে মূল প্রকৃতি তা উপলব্ধ হয়।

কৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

মর্মার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
শক্ত্যা বুদ্ধ্যা চ জ্ঞানেন মম তুল্যা চ তেজসা॥ ব্র. বৈ. ৪.১৫.৬৭

তুমি আমার অর্দ্ধাংশ সম্ভূতা মূল প্রকৃতি। তুমি শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধার স্বরূপ এবং তুমি আমার ও সকলের সর্বশক্তি স্বরূপা।

কৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন,

মমাধার সদা তঞ্চ তদাত্মাহং পরস্পরম্।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥ ব্র. বৈ. ৪.৬৭

তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা, যেখানে তুমি সেখানেই আমি, তুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। দুইয়ের একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।

কৃষ্ণ বলেছেন,

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকস্তয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥ ব্র. বৈ. ৪.১৫.৬২

যে সময়ে আমি তোমা হতে বিযুক্ত থাকি তখন লোক সকল আমাকে কৃষ্ণ মাত্র বলে, যখন তোমার সঙ্গে অবস্থান করি, তখন তারাই আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ের রাসলীলার সারাংশ বর্ণনা–

কৃষ্ণকে পতিকামনায় রাধা ও গোপীগণ গৌরীব্রত করতেন। ব্রতপূর্ণ হলে কৃষ্ণ আবির্ভুত হয়ে তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তিন মাস অতীত হলে বৃন্দাবনে রমণীয় রাসমণ্ডলে তোমরা আমার সঙ্গে ক্রীড়া করবে। যেরূপ আমি সেই রূপ তোমরা; আমাদের কোন ভেদ নেই, এটি শ্রুতিতে নির্ণীত আছে। আমি তোমাদের প্রাণ স্বরূপ, তোমরাও আমার প্রাণ স্বরূপা।

ত্রিষু মাসেস্বতীতেষু যূয়ং ক্রীড়াং ময়া সহ।
শ্রীরাসমণ্ডলে রম্যে বৃন্দারণ্যে করিষ্যথ।
যথাহঞ্চ তথা যূয়ং ন হি বেদঃ শ্রতৌশ্রুতঃ।
প্রাণা অহঞ্চ যুস্মাকং যূয়ং প্রাণা মমৈব চ ॥ ব্র. বৈ. ৪.২৭.২৩৪-৩৫

তারপর প্রতিশ্রুতি মত কৃষ্ণ তিন মাস পরে বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে উপস্থিত হন। এই রাসলীলা সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা আছে–

একদা শ্রীহরির্নক্তং বনং বৃন্দাবনং যযৌ।
শুভে শুক্লত্রয়োদশ্যাং পূর্ণোচন্দ্রোদয়ে মধৌ।
যূথিকা মাধবী কুন্দ মালতী পুষ্প বায়ুনা।
বাসিতং কলনাদেন মধুভ্রাণাং মনোহরম্॥ ব্র. বৈ. ৪.২৯.৬-৮

এই রাসলীলা সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে পূর্বে একদিন মধুমাসে শুক্লত্রয়োদশীর রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলে শ্রীহরি বৃন্দাবনে গমন করে দেখলেন যে, সেই বৃন্দাবন যুথিকা, মাধবী, কুন্দ ও মালতী প্রভৃতি পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সুবাসিত ও ভ্রমর সকলের মধুর গুঞ্জনে অতি মনোরম শোভাসম্পন্ন। ঐ প্রদেশ রাসক্রীড়ার উপযোগী মনোহর শোভা সম্পাদন করছে। মধুসূদন (কৃষ্ণ) সেই রাসমণ্ডল দেখে হাসতে লাগলেন। তখন মধুসূদন কৌতুকবশত সেই স্থানে কামুকী গোপিকাদের কামবর্ধনের কারণ-ভূত মূরলীধ্বনি করলেন। রাধা সেই মোহন মূরলীধ্বনি শুনতে পেয়ে কামাধীনচিত্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ মোহিত হলেন। তাঁর মন প্রাণ সেই তানের মধ্যে লয় হল। তিনি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে চেতনা পেয়ে পুনরায় মূরলীধ্বনি শুনতে পেলেন। রাধা উদ্বিগ্নচিত্তে অস্থিরভাবে কুলধর্ম ও গৃহকর্তব্য ত্যাগ করে সেই বংশীধ্বনি অনুসরণ করে গমন করলেন। তাঁর মনোমধ্যে তখন কৃষ্ণ পাদপদ্মই কেবল জাগরিত ছিল। তারপর সুশীলা প্রভৃতি রাধিকার তেত্রিশ জন সখীও বাঁশরীর রব শুনে মোহিত হয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে কুলধর্ম ত্যাগ করে শীঘ্র গৃহ হতে বের হয়ে এলেন। তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রূপ, বেশ, বয়স ও গুণে তুল্যা যে সমস্ত গোপীগণ বেরিয়ে এলেন তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ দুঃসাধ্য। নবলক্ষ গোপীর সঙ্গে হরি নবলক্ষ গোপরূপ ধারণ করলেন। সকলে মিলিত হয়ে অষ্টাদশ লক্ষ গোপগোপিকার সেই রাস মণ্ডলে সমাবেশ হল। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে রমণে তথা রাসলীলায় মত্ত হলেন।

গোপীগণ রাধার কায়বূহ স্বরূপ অর্থাৎ তাঁরই অংশরূপে বিভিন্ন প্রকাশ। গোপীগণ কেন, একমাত্র কৃষ্ণই পরম পুরুষ, আর সবই প্রকৃতি। পুরাণাদি গ্রন্থে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে গোপীদের সংখ্যা শত সহস্র কোটি কোটি এইরূপ অনির্দেশ্য সংখ্যার উল্লেখ আছে। এর অর্থ জীব মাত্রেই প্রকৃতি। তাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তেও প্রেম ধর্মে একমাত্র কৃষ্ণই পরম পুরুষ, আর ভক্ত মাত্রেই প্রকৃতি। ভগবান রমণ, ভক্ত রমণী। পুরুষাভিমান থাকলে 'গোপী-অনুগা' হয়ে প্রকৃতিরূপে পরম পুরুষের সেবা করা যায় না।

এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব যে শুধু পুরাণে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে, তা নয়। এর মূল আছে উপনিষদে–বেদান্তে।

তথ্যসূত্র : : ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত, পৃ. ৪০৬-৪১৮

এখন এই রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের এবং প্রেম-ধর্মের মূলগত বৈদান্তিক তথা দার্শনিক ভিত্তিটি কি, তা নির্ণয় করা যেতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুরুষ কামনা করলেন, আমি এক আছি, বহু হব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে–

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।
স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিস্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং
দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং
তস্মাদিদামর্ধ বৃগলমিব স্ব ইত স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং
সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।
বৃহদারণ্যক, ১ম, অ, ৪র্থ ব্র. ৩ (৪০)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়' একাকী রমিত হলেন না, তিনি দ্বিতীয় হতে ইচ্ছা করলেন, তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক।

অকাম আত্মকাম আত্মারাম পুরুষে এই প্রথম কামের উদয় হল। তাতে পুরুষ-প্রকৃতি সম্পৃক্ত একীভূত ছিল। এখন তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করে পতি ও পত্নী হলেন।

ঋগবেদের পরমাত্মাসূক্তে বলা হয়েছে–

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ঋক্, ১০.১২৯.৪

সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে,

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতামুচ্যতে॥ তৈত্তিরীয় ২.৭.১

সৃষ্টির পূর্বে নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপেই ছিল। সেই অসৎ শব্দ পদবাচ্য ব্রহ্ম হতে এই নাম রূপে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হল। তিনি নিজেই আপনাকে এরূপ করলেন, এই কারণে তাঁকে স্বকৃত (স্বয়ংকর্তা) বলা হয়।

দুর্লভ সারে বলা হয়েছে–
প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনে।
বিভিন্ন আকার হইল 'রমণ' কারণে॥
বিলাস কারণ আর সৃষ্টির কারণ।
বিলাসে উপজে প্রেম ভাবের লক্ষণ॥

প্রকৃতি-পুরুষ তথা রাধা-কৃষ্ণের মিলনের দুটি কারণ-এটি বিলাস কারণ, অন্যটি সৃষ্টির কারণ। পুরুষ-প্রকৃতি যোগে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা সকল শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। সেখানে প্রকৃতির অন্য নাম সন্ধিনী শক্তি। কিন্তু রস-রূপের আলোচনায় প্রকৃতির নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি, যাকে রাধিকা বলা হয়।

গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ গীতা, ১৪.৩

প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান স্থান। আমি তাতে গর্ভাধান করি, তা হতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমনাৎ অসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ॥ স্কন্দপুরাণ

পরম পুরুষকে আত্মারাম বলা হয়, এ কথার অর্থ তিনি আত্মাতে রমিত হন।আত্মার সঙ্গে রমণ করেন। ভক্তিশাস্ত্র মতে রাধিকাই তার আত্মা, রাধিকার সঙ্গে রমণ করেন বলেই তাঁকে আত্মারাম বলা হয়।

সেই রসস্বরূপ পরম পুরুষের স্বরূপ হলো, তিনি রস স্বরূপ, জীব সেই রস লাভ করেই আনন্দিত হয়। –তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও বলা হয়েছে,

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তীতি। তৈত্তিরীয় ৩.৬.১

সেই ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। আনন্দ হতেই ভূত সকল জন্মে, আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে। আনন্দাভিমুখে তাঁদের যাত্রা এবং আনন্দেই তাঁদের বিলীন বা পরিসমাপ্তি।

ব্রহ্মবৈবর্তে বলা হয়েছে সেই ভক্তানুগ্রাহক সুরসিক রাসেশ্বরই (কৃষ্ণ) ভক্তজনের প্রিয় ও ঈশ্বর। পরম ধ্যেয় রাধা-বক্ষঃস্থল-বিহারী পরমাত্মা ঈশ্বরকে বৈষ্ণবগণ নিরন্তন ধ্যান করেন।রাধা সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে–

পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরামাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥ ব্র. বৈ. ২.১.৪৪-৪৭

যিনি পরম আনন্দ-রূপিণী, ধন্যা, মান্য ও পূজনীয়া যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাসমণ্ডলের জন্য উৎপন্ন এবং রাসমণ্ডল দ্বারা ভূষিতা, যিনি রাসের ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাসবাসে নিয়ত অবস্থান করেন, যিনি গোলোকবাসিনী ও গোপবেশধারিণী, যিনি পরম আহ্লাদরূপিণী, সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী, যিনি নির্গুণা, নিরাকারা-তিনি পঞ্চমী প্রকৃতি রাধিকা।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণ নামের ব্যাপক উল্লেখ আছে। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেই রাধাকৃষ্ণের একত্র উল্লেখ গাথাসপ্তশতীরই একটি শ্লোকে পাওয়া গেছে–

মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অণ্নাণ বি গোরঅং হরসি॥[৬১]

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হলো রাধার নামটুকুই শুধু নয়–অন্যান্য গোপিনীদের তুলনায় কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার উৎকর্ষও এখানে ঘোষিত হয়েছে।

গাথা সপ্তশতীর অন্যান্য কয়েকটি শ্লোকেও গোপীকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ রয়েছে যেমন–

এই শ্লোকে দেখি গোপীপ্রেমের চাতুর্যময় গভীরতার উৎসার–

ণচ্চণ-সলাহণ ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ নিউণ গোবী।
সরিস গোবিআণঁ চুম্বই কবোল পডিমা-গঅং কণ্হ॥[৬২]

কৃষ্ণকে চারপাশে ঘিরে গোপিনীদের এই নৃত্য রাসনৃত্যের অনুরূপ। অপরা গোপীর গণ্ডে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণমুখ চুম্বন করার মধ্যে গোপিনীদের গভীর প্রেমের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

গাথা সপ্তশতীর অপর একটি পদে রাধা এবং কৃষ্ণের নাম না থাকলেও গোপীপ্রেমের উল্লেখ রয়েছে। শালিক নামক এক গাথাকারের গাথায় আছে–

মহু-মাস-মারুআহঅ-মহুঅর-ঝংকার-নিব্ভরে রণ্ন
গাঅই-বিরহক্খরাঁবদ্ধ-পহিঅ-মণ-মোহণং গোবী॥[৬৩]

অর্থাৎ বসন্তকালে মলয়পবনে ভ্রমরঝংকারে অরণ্যভূমি পরিপূর্ণ হয়েছে। গোপীরা বিরহের গানে পথিকদের মন মোহিত করছে। ঠিক এই ভাবেরই একটি শ্লোক জয়দেবের গীতগোবিন্দও আছে।

গাথা সপ্তশতীর মতোই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত ছন্দোগ্রন্থ। প্রাকৃত পৈঙ্গলও বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগীয় কৃষ্ণলীলার কিছু বিশিষ্ট উপাদানের উৎস নির্দেশে সক্ষম।

এখানে এমন অনেক শ্লোক আছে, যার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষা কৌশল প্রায়ই বাংলার অনুরূপ। নৌকালীলার প্রথম প্রসঙ্গ আমরা পেলাম প্রাকৃত পৈঙ্গলেরই নিম্নোদ্ধৃত এই শ্লোকে–

অরে রে বাহহি কাহ্নু ণাব,
ছোড়ি ডগমগ কুগতিণ দেহি।
তইঁ ইথি ণদিহিঁ সঁতার দেই,
জো চাহহি সো লেহি॥[৬৪]

ওরে ও কৃষ্ণ, নৌকা বাও, টলমল করিয়ে দুর্গতি দিও না। আগে তুমি নদীটা পার করে দিয়ে যা চাও তাই নিও। গাথা সপ্তশতীর রাধা আমাদের কাছে তার দৈবী সত্তার পরিচয় নিয়ে আসে নি। কিন্তু প্রাকৃত পৈঙ্গলের একটি শ্লোকে রাধাকে অভিজাত পৌরাণিক দেবীদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী, গৌরী, মহামায়া ইত্যাদি দেবীদের সঙ্গে 'রাই' বা শ্রীমতী রাধার নাম একাধিক পুঁথিতে পাওয়া যায়।

লচ্ছী রিদ্ধী বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা খমা আ দেহীআ।
গৌরী রাঈ চুন্না ছাআ কান্তী মহামাঈ॥[৬৫]

পরবর্তীকালে কৃষ্ণনামে জয়দেব কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রাকৃত পৈঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত পদ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়–

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাস করে গিরি হত্থ ধরে,
জমলজ্জুণ ভংজিঅ পঅভর গংজিঅ
কালিঅ কুল সংহার করে জস ভূঅণ ভরে।
চাণুর বিহংডিঅ পিঅকুল মংডিঅ
রাহামুহমহু পাণ করে জিনি ভমর বরে।
সো তুহ্ম ণরাঅণ বিপ্পপরাঅণ
চিত্তঅ চিংতিঅ দেউ বরা ভব ভীই হর।[৬৬]

যিনি কংস বধ করে কীর্তি প্রকাশ করেছিলেন, মুষ্টিক অরিষ্টকে বিনাশ করেছিলেন, হাতে গিরি ধরেছিলেন, যমলার্জুন ভেঙেছিলেন, পদভরে নির্যাতন করে কালিয়কুল সংহার করেছিলেন, যশে ভুবন ভরে ছিলেন, চাণুরকে দ্বিখণ্ডিত ও আপন কুলকে মণ্ডিত করে ভ্রমরের মতো রাধার মুখ-মধু পান করেছিলেন, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণকে চিত্তে চিন্তা কর। তিনি (তোমাকে) ভবভীতিহর বর দান করুন।

হেমচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণের শেষ অংশে বিবিধ সূত্রের উদাহরণ হিসেবে কিছু অবহট্‌ঠ কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলাঘটিত তেমনি একটি পুরোনো অবহট্‌ঠ কবিতা হলো–

রাহী দোহড়ি পঢ়ণ সুণি
    হসিউ কণ্হ গোআল।
বৃন্দাবন ঘণ কুঞ্জঘর
    চলিউ কমণ রসাল॥[৬৭]

–রাধিকার দোহাটি পড়া শুনে কৃষ্ণ গোপাল হাসলো (আর) বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে কেমন রসাল (গতিতে) চলে গেল।

অতএব সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের নাম বিশেষতঃ রাধা এবং ব্রজকেন্দ্রিক কৃষ্ণনাম গীতগোবিন্দে ও বাংলালোকসমাজে সহজভাবেই বিকাশলাভ করেছিল। এছাড়াও কৃষ্ণ-বলরামের বহু বাল্যলীলার ঘটনা গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু বিষ্ণু মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ত হয়েছে। 'পৌরাণিক কৃষ্ণনামের যেসব বিষয় রয়েছে সেখানে কখনও বাল্যলীলা ও দ্বারকালীলার উল্লেখ কিছু কিছু লোকের মন্তব্য থেকে জানা যায়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ের মধ্যে ৪০টি অধ্যায়ে বৃন্দাবন এবং গোকুল কৃষ্ণের বাল্যজীবনের বর্ণনা রয়েছে। ৩৯৪৬টি শ্লোকের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোকের সংখ্যা হলো ১৬০৪টি।'[৬৮]

গীতগোবিন্দ

দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশের সঙ্কটময় সময়। অনুমান করা হয় একাদশ শতকের শেষ এবং দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে সমাজ ব্যাভিচারে পূর্ণ, রাজশক্তি অবসন্ন, ঠিক সেই সময়টিতেই জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

> 'বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমলপদে।
> করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চনকোকনদে॥'[৬৯]

জয়দেব বাংলারই রবি কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু তিনি যে কান্তকোমল পদে সংস্কৃতের স্বর্ণপদ্মকে সুরভিত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জয়দেব সংস্কৃতের শেষ বড় কবি এবং বাংলা বা অন্যান্য নব্য আর্যভাষায় রচিত কাব্যের গঙ্গোত্র তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্য।জয়দেব তাঁর সময় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বললেও ইঙ্গিত রেখেছেন অন্য কবিদের নামোল্লেখের মধ্যে।

> 'বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
> জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরুহদ্রুতে।
> শৃঙ্গারোওরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্ধন–
> স্পর্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥'[৭০]

উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভার পাঁচটি রত্ন বলে উল্লিখিত :

'গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥'[৭১]

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে ১১৭৯-১২০৫ সাল। তাই জয়দেবও ঐ সময়ের কবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুকুমার সেনের মতে 'জয়দেব দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।'[৭২]

১১২৭ বা ১২০৬ সালে শ্রীধরদাস রচিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলিত হয়।[৭৩] সেই গ্রন্থে গীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক আছে। এ ছাড়া দুটি শ্লোকে যে রাজপ্রশস্তি আছে তা লক্ষ্মণ সেনের প্রশস্তি বলেই মনে হয়। তার মধ্যে একটি শ্লোকে স্পষ্টতঃ বঙ্গপ্রিয় ও গৌড়েন্দ্র কথাটির উল্লেখ আছে–

'লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ! জঙ্গমহরে! সংকল্পকল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃসাধক অঙ্গ! সংগরকলাগাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়!
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজনায়ক! সভালংকার! কর্ণার্পিত–
প্রত্যর্থিক্ষিতি পাল! পালকসতাং! দৃষ্টোহসি, তুষ্টা, বয়ম্॥'[৭৪]

সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত তিনটি শ্লোক এবং গৌড়েন্দ্র প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি দেখে মনে হয় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলনের কিছু আগেই জয়দেবের খ্যাতি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।[৭৫] এই সময়টি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বসীমার মধ্যেই পড়েছে।

সেক শুভোদয়া গ্রন্থেও লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক হিসেবে জয়দেবের উল্লেখ আছে। রূপগোস্বামী সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'তে লক্ষ্মণ সেনের নামে দুটি শ্লোক আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্লোকদুটির একটি যুবরাজ কেশব সেনের নামে চিহ্নিত।[৭৬]

আহুতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধুরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥[৭৭]

অর্থাৎ, যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন, আমি ডেকেছি বলে আজকের উৎসবে রাধা এই রাতে শূন্য ঘর ফেলে চলে এসেছে। ভৃত্যেরা মধুপানে মত্ত। কুলবধূ একাই বা যাবে কি করে? অতএব, বৎস, তুমি একে ঘরে রেখে এসো। যশোদার একথা শুনে রাধামাধবের মধুর অলসদৃষ্টি জয়যুক্ত হোক।

এই শ্লোকটিতে যশোদা কৃষ্ণকে বলেছেন রাধাকে বাড়ি নিয়ে যেতে, আর গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিতে নন্দ শ্রীরাধাকে বলছেন কৃষ্ণকে বাড়ি নিয়ে যেতে। শেষ পঙ্‌ক্তির বাক্‌সাম্যও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। রাজাকে ও যুবরাজকে খুশি করবার জন্যে জয়দেবই তাঁর রচিত শ্লোক অনুকরণে গীতগোবিন্দের শ্লোকটি লিখে থাকুন আর জয়দেবের অনুকরণে লক্ষ্মণ সেন বা যুবরাজই শ্লোকটি লিখে থাকুন, উভয়ে যে সমকালীন ছিলেন তা বোঝা যায়।[৭৮]

জয়দেবকে নিজ নিজ অঞ্চলের বলে দাবি করছে বাংলা, উড়িষ্যা ও মিথিলা। দ্বিজমোহন দাস-রচিত 'ভক্তমাল' এবং বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত্রে' বীরভূমের কেন্দুবিল্বকেই জয়দেবের বাসভূমি বলা হয়েছে। তা ছাড়া রাধার প্রাধান্য বাংলারই বৈশিষ্ট্য।[৭৯]

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী।[৮০]জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' (১.২), 'বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে' (১১.২১), 'জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতী-ভণিতমতিশাতম্‌' (১০.১০) এইসব উদ্ধৃতি এর সাক্ষ্য।[৮১]

'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থেও জয়দেবপত্নীর এ নাম সমর্থিত। টীকাকারেরা কেউ কেউ অবশ্য 'পদ্মাবতী' অর্থে লক্ষ্মী বা 'রাধা' ধরেছেন। প্রাচীন টীকাকার ধুতিদাস বলেছেন 'পদ্মাবতী নাম জয়দেবভার্যা'। রোহিণীরমণ এই বিশেষণটি দেখে কেউ কেউ বলেন রোহিণী তাঁর আর এক স্ত্রীর নাম, কেউ কেউ মনে করেন 'রোহিণী' পদ্মাবতীরই আর এক নাম। সহজিয়ারা বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া।[৮২]

> পদ্মাবতীসহোদরা রোহিণী নামেতে।
> তারে গুরু কৈল রস আস্বাদিতে॥[৮৩]

সুশীলকুমার দে বলেছেন : It should not be forgotten that the Gitagovinda was composed as an epoch when the classical Sanskrit literature was already on the declines, and when it was possible for such irregular types to come into existence, presumably through the influence of musical and melodramatic tendencies of the vernacular literature. Which was by this time emerging into definite existence.[৮৪]

গীতগোবিন্দ মূলত চব্বিশটি গানের পালা। একেকটি শ্লোক হলো একেকটি পদ, আর পদের সমষ্টি হলো পদাবলী। আটটি পদ নিয়ে এক একটি গান বলে একে অষ্টপদীও বলা হয়েছে।[৮৫]

একেকটি সর্গে এক বা একাধিক গান আছে। সেই গানগুলোর আগে এবং পরে বৃত্তছন্দে রচিত শ্লোকে কাহিনীসূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সর্গের একটি বিশেষ নাম আছে, সেই নামটি ঐ

সর্গের বিষয়বস্তুর মূল সুরটিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ভেবে চিন্তে প্রয়োগ করেছেন কবি। সর্গ গুলো নিম্নরূপ–

প্রথমঃ সর্গঃ
সামোদ-দামোদরঃ

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ–
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥

কন্দর্পক্লিষ্টা রাধা কৃষ্ণকে খুঁজছেন বৃন্দাবনের বনে বনে। কিন্তু সখী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন তিনি অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। কৃষ্ণ সোহাগের বহুস্মৃতির তরঙ্গ বয়ে গেল রাধার হৃদয় দিয়ে। কিন্তু সেই দামোদর আজ তাঁকে ছেড়ে অন্য নায়িকাকে নিয়ে আমোদে রত। এই সর্গের বক্তব্যটি তাই 'সামোদ-দামোদর' নামে চিহ্নিত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গ
অক্লেশ-কেশবঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ো হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥১॥

সখীর কথায় ম্রিয়মাণ রাধা অন্য কুঞ্জে গেলেন। অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত কৃষ্ণকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। তবু কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলনস্মৃতি তিনি ভুলতে পারলেন না। কৃষ্ণ গোপীদের বিলাসকলা দেখে নিশ্চয় রাধাকেই বেশি করে স্মরণ করছেন। কবি বলছেন এই নবকেশব সকলের ক্লেশ দূর করুন। শেষে পঙ্‌ক্তিতে ফুটে উঠেছে 'অক্লেশ কেশব' নামের তাৎপর্য।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ
মুগ্ধ-মধুসূদনঃ

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

যাঁর জন্যে সংসার বাসনার শৃঙ্খল আনন্দে পরেছেন কৃষ্ণ, সেই রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে তিনি হঠাৎ ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলছেন। কোথাও তাঁকে না পেয়ে বিষণ্ন মনে ভাবছেন—আমার বিরহে না জানি তিনি কী করছেন। তাঁর অভাবে আমারই বা কী কাজ ধনে জনে গৃহে। মুগ্ধ হয়ে হরি একথা ভাবছেন। তাই সর্গটির নাম 'মুগ্ধ মধুসূদন'।

চতুর্থঃ সর্গঃ
স্নিগ্ধ-মধুসূদনঃ

যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্॥
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

রাধার এক সখীর কাছে কৃষ্ণ শুনলেন, রাধা তাঁর বিরহে সূর্যদগ্ধ কুসুমের মতো শুষ্ক। এ সংবাদ শুনে ভয়ভীত কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হলেন, তার দুশ্চিন্তা দূর হলো। তাই সর্গের নাম হলো 'স্নিগ্ধ মধুসূদন'।

পঞ্চমঃ সর্গঃ
সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১ ॥

অন্যনারীসংসর্গ করেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করলেন কৃষ্ণ। তাই সখীর মুখে রাধা অবস্থার কথা শুনেও রাধার কাছে ছুটে যেতে পারলেন না তিনি। রাধাকেই সখী নিয়ে আসুক তাঁর কাছে—এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কৃষ্ণ। সখী রাধাকে কৃষ্ণ-অভিসারে যেতে আহ্বান জানাল, কারণ তিনি যে 'সাকাঙ্ক্ষ'। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ
ধৃষ্টবৈকুণ্ঠঃ

অত তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥১॥

সখী এসে কৃষ্ণকে বলে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল। তিনি নিজেকেই কৃষ্ণ মনে করে তন্ময় হয়ে আছেন। তাই কৃষ্ণের উচিত লজ্জা ত্যাগ করে নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া। বিপরীত অভিসারে কৃষ্ণ ধৃষ্ট (অর্থাৎ নির্লজ্জ) হোন—সখীর এই আকুতিই এই সর্গে প্রকাশিত, নামের ইঙ্গিতও সেই দিকে।

সপ্তমঃ সর্গঃ
নাগর-নারায়ণঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত–
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ–
র্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥১॥

প্রসরতি শমধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

রাধা অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন। পাতায় সামান্য শব্দ হলেও উন্মুখ হয়ে ওঠেন–বুঝি তিনি এই এলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এলেন না। সখীর কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাধা। তাঁর চোখে ভাসে অন্য নারীর সঙ্গে বিলাসে মত্ত বহুনারীপ্রিয় নারায়ণের ছবি। তাই এ সর্গের এই নাম নাগরনারায়ণ। নাগর অর্থ বহুবল্লভ।

অষ্টমঃ সর্গঃ
বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতিঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনাং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥১॥

কোনমতে দুঃসহ বেদনায় রাত কাটালেন রাধা। ভোর হলে দেখলেন, কৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে, মুখে অনুনয়বাণী। রাধার চোখে পড়ে কৃষ্ণদেহে অন্য নারীসংসর্গের চিহ্ন। রাধা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। বিলক্ষ অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণ। তাই সর্গটির নাম 'বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি'।

নবমঃ সর্গঃ
মুগ্ধ-মুকুন্দঃ

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ মহঃ সখী ॥ ১ ॥

রাধা অভিমানে ফিরিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। কিন্তু যাকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর জন্যেই হলেন আকুল। সখী ভর্ৎসনা করে রাধাকে, মান করে এখন আবার কাঁদছ। সখীরা হাসছে তোমাকে দেখে। সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অনুতাপের কথা বলেন। কৃষ্ণ মুগ্ধ হন রাধাপ্রকৃতি দেখে : এই মান আবার এই অনুতাপ! সর্গটির নাম তাই 'মুগ্ধ মুকুন্দ'।

দশমঃ সর্গঃ
মুগ্ধ-মাধবঃ

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম–
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদগদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥১॥

রাধার মান কমে আসতে থাকে। কুঞ্জবনে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাতাস সুগন্ধ হলো কার স্পর্শে? কৃষ্ণ এলেন। রাধা চাইলেন সখীদের দিকে। সখীরা সরে গেল সেখান থেকে। মুগ্ধ কৃষ্ণ নতজানু হয়ে বললেন–দেহি পদপল্লবমুদারম্। সর্গটি কৃষ্ণের এই বিমুগ্ধ ভাবটিকেই রূপ দিয়েছে। সংগীত গবেষণার দিক থেকে নিচের এই গানটিকে এক পংক্তিতে আটটি তাল ব্যবহৃত হয়েছে যা অন্য কোন গানে দেখা যায় না।

গীতম্ ॥ ১৯ ॥
দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে–

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন–চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন–চকোরম্ ॥ ২ ॥[৮৬]

অর্থাৎ রাধে তুমি যদি কিছু কথা বলো, তোমার দাঁতের ঝিকিমিকি অতি ঘোর অন্ধকারের যে ধারা তাকে হরণ করে নেয় তোমার ঐ দন্ত জ্যোতি। তার অর্থ একবার হেসে কথা বলো রাধে তাহলে আমার মনের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

দন্তরুচি – দাঁতের ঝিকিমিকি
কৌমুদী – চাঁদের আলো
হরতি – হরণ করা
দরতিমিরমতিঘোরম্– ঘোর অন্ধকারের ধারা।

আটটি তাল হলো–
আড়, দোজ, যতি, শশীশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক, সোম। এই আটটি তাল রয়েছে পরিশিষ্ট–৪এ।

এই গীতের আর একটি পংক্তি যা সকলের মুখে মুখে, রাধারানীর মান ভাঙ্গাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম॥
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম ॥ ৫ ॥

তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসারসাগরের রত্ন। তুমি আমার প্রতি সর্বদা অনুকূল হও–এ আমার হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও।)।৪

একাদশঃ সর্গঃ
সানন্দ-গোবিন্দঃ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষাং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

মিনতি জানিয়ে কৃষ্ণ প্রসন্ন করলেন রাধাকে। রাধা ভুলে গেলেন সব বেদনা। সখী মন্ত্রণা দিল–আর দেরি নয়। এবারে তোমার স্বর্ণমেখলায় রতিরণবাদ্য বেজে উঠুক। কটাক্ষ-ইঙ্গিতে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রাধা প্রবেশ করলেন বাসক-গৃহে। কৃষ্ণ হলেন আনন্দিত। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

দ্বাদশঃ সর্গঃ
সুপ্রীত-প্রীতাম্বরঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর
স্মরশরবশাকৃতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব–
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবারে মিলন। কৃষ্ণ রাধার প্রীতিসম্পাদনে সফল তাই তিনি 'সুপ্রীত'।[৮৭]

জয়দেবের বিয়ে এবং গীতগোবিন্দ লিখা সম্পাদন—পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এলেন দক্ষিণদেশবাসী এক ব্রাহ্মণ দম্পতি। নিঃসন্তান তাঁরা। স্বপ্নে পেলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তির আশীর্বাদ। তাঁদের ঘর আলো করে এল এক কন্যা। শৈশবেই সঙ্গীত ও নৃত্যে শিশুর অদ্ভুত দক্ষতা দেখা গেল। যৌবনে পদ্মাবতী যেন হলো 'প্রভাতরলং জ্যোতিঃ'।[৮৮] জগন্নাথের কাছেই সমর্পণ করলেন কন্যাকে। আবার স্বপ্ন দেখলেন, 'ব্রাহ্মণ, তোমার কন্যা সাধারণ নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই তার জন্ম। জয়দেব গোস্বামী নামে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আছে, সেই তোমার কন্যার পতি, কন্যা সমর্পণ করবে তাকে।' ব্রাহ্মণ পেলেন কেন্দুবিল্ব গ্রামের সন্ধান। তাঁর কাছেই কন্যাগ্রহণের আবেদন জানালেন।[৮৯] জয়দেব জানালেন আমি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র নই, আমি দীন ও অনিকেতন, অতএব আমার কাছে এ আবেদন বৃথা।

কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাকে বললেন, 'ইনিই তোমার স্বামী, তোমাকে এঁর কাছেই রেখে গেলাম'। জয়দেব বললেন—

> উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভুবতুঃ।
> নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ কৃষ্ণনামার্চনতৎপরৌ।[৯০]

তিনি গীতগোবিন্দ রচনায় হাত দিলেন। একদিন লিখলেন :

> 'স্মরগরলখন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং'।[৯১]

তার পরের পঙ্‌ক্তিটি তাঁর মনেই রয়ে গেল, লিখতে পারলেন না, কেমন করেই বা পারবেন? 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' কৃষ্ণকণ্ঠে রাধার প্রতি এই ভক্তিযোজনা কি সঙ্গত? কিন্তু আর অন্য কথাও তো কিছু মাথায় আসছে না। থাক তবে, পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে—এই ভেবে জয়দেব নদীতে স্নান করতে গেলেন। পদ্মাবতী দেখলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামী স্নান সেরে ফিরেছেন। আহারের শেষে জয়দেব বললেন—পুঁথিটি আনো পদ্মাবতী, ঐ পদটি শেষ করি। জয়দেব লিখলেন :

> স্মরগরলখন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং
> দেহি পদপল্লবমুদারম্।[৯২]

প্রতিকী চিত্র

লেখা শেষ করে জয়দেব বিশ্রামের জন্য ঘরে গেলেন। পদ্মাবতী স্বামীর পাতে রোজকার মতো খেতে বসলেন। এমন সময়ে স্নান সেরে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে জয়দেব বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পদ্মাবতী অবাক–সে কি, এই তো আহারান্তে বিশ্রাম করতে গেলেন জয়দেব। জয়দেবও স্তম্ভিত–সে কি! আমাকে অভুক্ত রেখেই আজ পদ্মাবতী আহারে বসেছে! পদ্মাবতী বিশ্রামকক্ষে ছুটে গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। বুঝলেন স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছিলেন গৃহে। পুঁথি এনে জয়দেবকে দেখালেন, স্পষ্ট লেখা আছে :

দেহি পদপল্লবমুদারম্।[৯৩]

কৃষ্ণেস্পর্শধন্য গীতগোবিন্দ কাব্যটি শেষ করলেন জয়দেব। রাধানাথের মন্দিরে গাইতে লাগলেন সেই গান। জয়দেবের নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাতেও গিয়ে পৌঁছাল সেই নাম। লক্ষ্মণ সেন সাদরে তাঁর সভায় স্থান দিলেন এই গীতস্রষ্টাকে।

ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকে যে বর্ণনা আছে তাতে আমরা গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকটির শব্দগত ও ভাবগত সাদৃশ্য দেখতে পাই। শ্লোকগুলো নিম্নরূপ–

নারায়ণ উবাচ,
একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।

তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্॥১
সরঃসু স্বাদু তোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি॥২
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে॥৩
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্টা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্॥৪
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ॥৫
কথং যাস্যামি গোবৎ সং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বলকস্য কিম্ ॥৬
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ॥৭
এ তস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম্ কষ্ণসন্নিধিম্।
গমনং কুর্ব্বতী রাজ-হংসখঞ্জনগঞ্জনম্ ॥৮[৯৪]

শ্লোকগুলোর অর্থ হলো–

নারায়ণ বললেন, একদা নন্দ কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে যেয়ে বৃন্দাবনের কাছে ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করতে লাগলেন। তিনি সেই বনমধ্যস্থিত সরোবরের জল গোসমূহকে পান করালেন ও নিজে পান করলেন। তারপর বালক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করে তিনি বটমূলে অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময় বালক কৃষ্ণের মায়ায় নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হল। তখন নন্দরাজ আকাশ মেঘাবৃত ও কাননাভ্যন্তর শ্যামবর্ণ দেখলেন এবং ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের দারুণ শব্দ ও বজ্রের ঘোরতর নিনাদ শুনলেন। তখন অতিস্থূল বৃষ্টিধারা পতিত হতে লাগল, বৃক্ষসমূহ বায়ুর প্রবল বেগে আন্দোলিত হতে লাগল। তা দেখে নন্দরাজ অতি ভীত হয়ে বলতে লাগলেন, এই সব গোবৎস পরিত্যাগ করে কিভাবে গৃহে যাই? যদি গৃহে না যাই তা হলে বালকের অবস্থাই বা কি হবে? গোপরাজ যখন এই কথা বলছেন, এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মায়াকল্পিত ভয়ে রোদন করে উঠলেন। এই সময় রাধা রাজহংস ও খঞ্জনের মৃদুগমনে কৃষ্ণসমীপে এসে উপস্থিত হলেন।[৯৫]

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক–

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ–
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥[৯৬]

কবি জয়দেব এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁর অপার্থিব প্রেম গীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বসন্ত রাস। সরস বসন্তে ব্রজবনভূমি নন্দননিন্দি কান্তসৌন্দর্য্যে মধুময় শ্রীধারণ করেছে। যমুনাস্নাত সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলনে, বিটপিকুঞ্জে ব্রততীবিতানে পুষ্পিত সোহাগের পুলকোল্লাসে, কুসুমে কুসুমে মধুকর নিকরের (সমষ্টি) ঝঙ্কার কোলাহলে, শাখায় শাখায় কোকিল কোকিলার কলকাকলিতে, আকাশে বাতাসে মাধুরীর মেলায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিলনের লীলায়, প্রকৃতির উৎসব সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের অভিসার বিরহ-মান-মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবরঙ্গে অভিনিত হচ্ছে।[৯৭] এই হলো তাঁর কাব্যের প্রধান বর্ণনার বিষয়। কিন্তু প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করেছেন–আকাশ মেঘে মেদুর, বনভূমি তমালে শ্যামল, তার উপর আবার রাত্রিকাল; ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে হে রাধে তুমি গৃহে যাও। এইরূপ নন্দনিদেশে প্রস্থিত যমুনা কূলের পথকুঞ্জতরুতলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজন কেলি জয়যুক্ত হোক।'[৯৮] আটশত বছর আগে জয়দেব এই শ্লোক রচনা করেন। আজও কত বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে এই শ্লোক নিয়ে।[৯৯]

জয়দেব যে অনেকাংশে ব্রহ্মবৈবর্তকেই অনুসরণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত ও গীতগোবিন্দ উভয় গ্রন্থের আরো কয়েকটি স্থান উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে।যেমন, মানের পরে মিলনোৎসুক রাধিকার আগমন কল্পনায় জয়দেবের কৃষ্ণের মোহাবিষ্টের পরিস্থিতিটি তুলে ধরা যেতে পারে–(একাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোক)

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যে ইতি সঞ্চিন্তয়ন্।
সং ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃ পুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ॥
(গীতগোবিন্দ, ১১.১০)[১০০]

এর অনুরূপ দৃশ্য পাওয়া যাবে ব্রহ্মবৈবর্তে কৃ.জ.খ. ২৮ অধ্যায়ে বসন্তকালীন রাসে মিলনের পূর্বে রাধিকার দর্শনে কৃষ্ণের অনুরূপ অবস্থায়। কৃষ্ণ কটাক্ষ-কাম-বাণে পীড়িত হলেন, তাঁর হাত থেকে মুরলী ও ক্রীড়া-কমল খসে পড়ল, শরীর থেকে পীতধড়া ও ময়ূর-পুচ্ছও খসে পড়ল–

কটাক্ষকামবাণৈশ্চ বিদ্ধঃ ক্রীড়ারসোন্মুখঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ্য ন পপাত তস্থৌ স্থানুসমো হরিঃ॥
পপাত মুরলী তস্য ক্রীড়াকমলমুজ্জ্বলম্।
দ্বিতীয়ং পীতবস্ত্রঞ্চ শিখিপুচ্ছং শরীরতঃ ॥ (ব্র. বৈ. ৪.২৮.৫৯-৬০)

মিলনের পর রতিশ্রান্তা নিদ্রিতা রাধিকার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি কৃষ্ণের সে অনুরাগ গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে প্রকাশিত হয়েছে–

কাঞ্চীদামদরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো।
রেভিঃ বামশরৈস্তাদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্॥
ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপালৌ।
স্পষ্টাদষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারষষ্টিঃ॥
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্ গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিত স্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি॥
(গীতগোবিন্দ. ১২.১৪-১৫)

এ যেন ব্রহ্মবৈবর্তের এই দুটি অংশের মিশ্রিত পরিবেশন-

দৃষ্ট্বা তাং মূর্চ্ছিতাং কৃষ্ণো নতশ্রোণিপয়োধরাম্।
বিলুপ্তবেশাং কামার্তাং নগ্নাং বিশ্লথকুন্তলাম্॥ (ব্র. বৈ. ৪.২৯.১৯)
এবং
বিহায় নিদ্রাং নিদ্রেশো দদর্শ নিদ্রিতাং প্রিয়াম্।
শয়ানাং পদতলে চ সুখসম্ভোগমাত্রতঃ॥
দৃষ্টামুখং চ ঘর্মাক্তং শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিতম্।
অতিসংলুপ্ত সিন্দূরং লুপ্তং কজ্জলভূষণম্॥ (ব্র. বৈ. ৪.৫১)

যেমন গীতগোবিন্দে তেমনি ব্রহ্মবৈবর্তে উল্লিখিত পরিস্থিতির একেবারে পরেই কৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার কেশবাস রচনাও পাওয়া যায়–

গীতগোবিন্দে রাধিকার অনুরোধে কৃষ্ণ–
রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুস্ব কপোলয়ো
ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজাকবরীভরম্।
কলয়বলয় শ্রেণীং পাণৌ পদে করুনূপুরা–
বিতি নিগদিতঃ প্রীত পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥ (গীতগোবিন্দ ১২.২৫)

ব্রহ্মবৈবর্তে–

কবরীং রচয়ামাস কিঞ্চিদ্দামেন বঙ্কিমাম্।
মালতীমাল্যসংযুক্তাং কুন্দপুষ্পৈশ্চ বেষ্টিতাম্॥
তস্যাঃ কপালে সিন্দূরং তিলকং সুন্দরং দদৌ
গন্ডয়োঃ স্তনয়োশ্চিত্রাং চকার পত্রিকাং মুদা॥
সালক্তকাংশ্চ নখরান্ বিচিত্রান্ পাদপদ্মযোঃ
নখৈঃ কৃত্রিমপদ্মানি নির্মমে শ্রোণি-বক্ষসোঃ॥ (ব্র. বৈ. ৪.২৯.২১-২৩)

গীতগোবিন্দে কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা রাধিকার শীতল পদ্মদলে শয়ন, চন্দন ও চন্দ্রকিরণেও অঙ্গজ্বালা বৃদ্ধি ও কৃশতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের বিকারাদি সকল যা পাওয়া যায়, তাও ব্রহ্মবৈবর্তের একাধিক স্থলে বর্ণিত দেখা যায়।

গীতগোবিন্দে–

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণেমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব বলয়তি মলয়সমীরম্॥
সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥ (গীত. ৪.২)

ব্রহ্মবৈবর্তে বিরহিণী রাধিকার খেদোক্তি–

যোষিজ্জন্মনি যোষিৎসু সম্প্রাপ্য তাদৃশং পতিম্॥
ভেদো বভূব কস্যা বা মদন্যা কাপি দুঃখিনী॥
কিং দদাসি প্রবোধম্ মে নাস্তি মে বোধনোচিতম্॥
নিষ্কলং দেহিনাং দেহো বিনাত্মানং সদোদ্ধব॥
সম্প্রীত্যাসহ সৌভাগ্যং গৌরবং নিত্যনূতনম্॥
অতীব দুর্লভং প্রেমরহস্যং নবসঙ্গমম্॥ ব্রহ্মবৈবর্ত, কৃষ্ণজন্ম অধ্যায়, শ্লোক-৫-৭

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধিকার তেত্রিশ জন সখীর কথা বলা হয়েছে। এঁরা হলেন-সুশীলা, শশিকলা, চন্দ্রমুখী, মাধবী, কদম্বমালা, কুন্তী, যমুনা, জাহ্নবী, শুভা,পদ্মা, দুর্গা, মঙ্গলা, কালিকা, কমলা, সরস্বতী, ভারতী, অপর্ণা, রতি গঙ্গা, সতী, কৃষ্ণপ্রিয়া, নন্দিনী, সুন্দরী, কৃষ্ণপ্রাণা, গোপিকা, চম্পা, চন্দনা প্রভৃতি। রাধিকার ষোলটি নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ষোলটি নাম যথা–রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণস্বরূপিণী, কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা, পরমানন্দ-রূপিণী, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবন-বিনোদিনী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকান্তা এবং শতচন্দ্রনিভাননী। এই নামগুলো পরবর্তী সময়ে জয়দেবসহ বৈষ্ণব রসবেত্তাগণ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেছেন।

(ব্র. বৈ. কৃ. জ. খ. ১৭শ অধ্যায়, ২২৫-২৭ শ্লোক)

দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘রাধা প্রথমত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও গীতগোবিন্দসহ আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্যাবর্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, চির শ্রদ্ধেয় দেব-দেবীগণ প্রকৃতির আভরণহীনা সৌন্দর্য প্রতিমার আড়ালে পড়িয়া গেলেন, সদ্যঃচ্যুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল। চিরারাধ্যা দূর্গা ও কালীর উদ্দেশ্যে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে

দোলাইয়া দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে ফুল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসীদলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হলেন, প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য তাঁহারই চরণ-কমলের সুরভিমাখা।[১০১]

যদি সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করি তাহলে গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু এরকম যে, গীতগোবিন্দের দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ কবি। তাঁর গীতগোবিন্দ রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলার প্রাণের সুরটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কবি জয়দেব রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গকেই প্রাধান্য দিয়ে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। স্বাভাবিক মননবিন্যাসকে লোকায়িত ধারাবাহিকতায় রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গকে গীতগোবিন্দ হিসাবে নামকরণ করেন।[১০২] কারণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম। 'গীত' অর্থাৎ গান। আর যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই রাধার নাম থাকবেই। অতএব গীতগোবিন্দ নামকরণ যথার্থ হয়েছে।

ছোট বেলা হতেই কবি প্রতিভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তনের পদভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম হতেই জাগতিক প্রেমের বাহ্যিক ধারা কবির মধ্যে সারা জাগায় বলে তিনি রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাপক প্রেমবিন্যাস করে গীতগোবিন্দ রচনায় ব্রতী হন। তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তার সমসাময়িক কবি নারায়ণতীর্থ ও আনন্দতীর্থ।[১০৩] আর তার বাহ্যিক প্রকাশ আজকের গীতগোবিন্দ।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য হলো—

'* গীতগোবিন্দ প্রধানত আখ্যান কেন্দ্রিক;
* গীতগোবিন্দই সম্ভবত প্রথম নাট্যগীত;
* রাধা ও কৃষ্ণ দুটি গীতগোবিন্দের প্রধান বাণীর অংশ;
* বাংলা গানের ধারাবাহিকতায় চর্যাগীতির পর গীতগোবিন্দ সংগীতের প্রধান নিদর্শন;
* রাগ ও তালের নির্দেশিকায় গীতগোবিন্দ রচিত;
* গীতগোবিন্দে ১২টি সর্গ ৮০টি শ্লোক এবং ২৪টি গান আছে;
* গীতগোবিন্দ কাব্য ও সংগীতের সমন্বয়ে রচিত;
* গীতগোবিন্দের গানে রাগের উল্লেখ থাকলেও রাগরূপের বর্ণনা সেখানে পাওয়া যায় না;
* সপ্তদশ হতে তামিলনাড়ুতে গীতগোবিন্দের রূপায়ণ প্রবর্তিত হয়;
* ১৮০৮ সালে গীতগোবিন্দের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়; পরবর্তী সময়ে জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার গীতগোবিন্দের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
* গীতগোবিন্দ প্রবন্ধ শ্রেণির সংগীত।'[১০৪]

গীতগোবিন্দের গানের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে এর ধ্রুপদাংগ ধারা অপরটি হলো এর কীর্তনাংগ ধারা। ধ্রুপদাংগ গায়ন ধারাই গীতগোবিন্দের আদি রীতি।[১০৫] ১৭৮৪ সালে পদকীর্তন গানের

প্রতিষ্ঠা ঘটলে গীতগোবিন্দের অষ্টপদীসমূহ কীর্তনাংগ সুরে গাওয়া হতো।[১০৬] গীতগোবিন্দে প্রধান চরিত্র হলো রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। রাধা ও কৃষ্ণই গীতগোবিন্দের মূল বিষয়। রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে এই গীতগোবিন্দে। রাধা স্বকীয়া নন তিনি পরকীয়া নারী। তাইতো তাঁর প্রেমে জোয়ারে তীব্রতম স্রোত। আকর্ষণ দুর্বার। তাই নিয়ম-নীতি, বাঁধা-বন্ধন, সংসার, সমাজকর্ম, দেহ-মন সবকিছু দূরে ঠেলে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শ্রীমতি রাধা এগিয়ে চলেছেন দিব্য অভিসারে পুরোষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পানে।[১০৭] কবি জয়দেবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ বিষয় নিয়ে কুঞ্জে মিলন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন নিয়ে এমন উচ্চ মধুর জয়ধ্বনি আর কারো কোমল কণ্ঠে শোনা যায়নি। গীতগোবিন্দে কবি জয়দেবে লিখেছেন–

কানু ছাড়া গীত নাই
রাধা ছাড়া সাধা নাই॥[১০৮]

গীতগোবিন্দ যে সময় রচিত হয়েছিল সে সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শেষ অবস্থা বা অবনতির যুগ এবং দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল।[১০৯] নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ বিস্মৃত দেশীয় ভাব ও ভাষার আদর্শকে আত্মসাৎ করে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নতুনরূপে গঠিত করবার প্রয়াস সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। আমার মনে হয় জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নতুন প্রয়োগের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গীতগোবিন্দে যেসব রাগ-রাগিনী ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো মধুমাধবী, গুর্জরী, ললিত, ভৈরব, বসন্ত, রামকিরি, পঞ্চম, ধন্যাসিক, মালবগৌড়, দেশাখ, মালবশ্রী, কেদার, শ্রীরাগ, মল্লার, বরাট, মেঘ, নট, গোন্ডাকিরী (গুণকরী), মালব-ভৈরবী, মালব, স্থানগৌড় এবং বিভাস। গীতগোবিন্দে যেসব তালের উল্লেখ আছে সেগুলো হলো রূপক, নিঃসার যতি, একতাল এবং অষ্টতাল।[১১০] গীতগোবিন্দে জয়দেব যেসব সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে শার্দুল বিক্রিড়িত ছন্দই তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল মনে হয় কারণ ৭৭টি বৃত্তছন্দে লেখা শ্লোকের মধ্যে ৩৭টিই এই ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দকে বিদায় দিয়ে অপভ্রংসের ছন্দকে স্বাগত জানিয়েছে গীতগোবিন্দের গানগুলো।[১১১]

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সাথে সখী নামের সমন্বয়ে গীতগোবিন্দের বাণী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, আত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে পরিচিত। তিনি সগুণ ও নির্গুণ, তিনি সর্বজ্ঞ, অন্ত বিভু। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই গীতগোবিন্দের উপজীব্য বিষয়।[১১২] জয়দেবের গীতগোবিন্দের মূলভাব রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন। হিন্দুসমাজে এর বিরাট অবস্থান অবিস্মরণীয়। অন্য সকল সমাজ হতে এটা অনেক দূরে। যদিও সর্বক্ষেত্রে বাংলার ছন্দ, কাব্যগীতির ধারায় গীতগোবিন্দের অবস্থান ব্যাপক। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের গীতগোবিন্দ প্রভাবিত করেছে।

গীতগোবিন্দে আমরা দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। গীতগোবিন্দের ভাবদর্শনে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলন কাহিনীই প্রদর্শিত হয়েছে। গীতগোবিন্দে অভিমানিনী রাধা অপরাপর গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমান প্রীতি দেখে স্বভাব বশতঃ মান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘মন আমার বশিভূত আমি এখন কি করিব? শ্রীরাধার অভাবে আমার ধনে জনে জীবনে এক বিরাট শূন্যতা।’ অতএব বিরহ এবং মিলনই গীতগোবিন্দের মূলভাব।[১১৩]

১.৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অনুসরণে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। বাংলার কাব্য এবং বাংলা সংগীতের একটি সার্থক ধারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।[১১৪] বড়ু চণ্ডীদাস স্বাভাবিকভাবে তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কাব্যধর্মীতাকে সঠিকভাবে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন।[১১৫] মধ্যযুগীয় সাংগীতিক প্রয়াস এবং কাব্যিক প্রকাশের ধারাবাহিকতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। তিনি সামাজিক ধারা তৎকালীন সংগীত বিবর্তনকে উজ্জ্বলতরের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সৃষ্টি করেন।'[১১৬]

১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁ্যাকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশের দেবন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে এ পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে (১৩২৩ সনে) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।[১১৭] পুঁথিটির প্রথমদিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেও কিছু পাতা নেই। রীতি অনুযায়ী পুঁথির প্রথমদিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লেখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে। প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকালের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে।[১১৮]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কিছু অংশ খণ্ডিত বলে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কবির জন্মকাল ১৪০৩ হতে ১৪১৭ সাল, অথবা ১৩৮৬ থেকে ১৪০০ সালের কোনো এক সময়। অন্য মতে ১৩২৫ সাল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবির জীবনকাল ১৩৭০ থেকে ১৪৩৩ সাল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, ছাতনার রাজা হামির উত্তর ১৩৭৩ থেকে ১৪০৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময়ে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন।[১১৯] বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ায় (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ) উল্লেখ আছে বড়ু চণ্ডীদাস পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে (মতান্তরে ছাতনা বাঁকুড়া) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাদাস বাগচী ছিলেন বরেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ। চণ্ডীদাস ছিলেন বাশুলী (বিশালাক্ষ্মী) দেবীর ভক্ত। (বাংলাপিডিয়া ৪, পৃ. ২৩৩)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বেশ মতবিরোধ আছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। ১৬৮২ সালে পুঁথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল।[১২০] পুঁথিটি অবশ্যই এই চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতর। ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই পুঁথি ১৩৫৮ সালের পূর্বে সম্ভবত চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত। ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা 'পুঁথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে।' যোগেশচন্দ্রের মতে, এ পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ সালের পূর্বে নয়।[১২১] ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয়, ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের মত সমর্থন করেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।[১২২]

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ সালের পূর্বের বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাছাড়া রসবিচারে কাব্যটির ভাষা চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বলেও ধরা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস আদিমযুগ তথা চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি। জনশ্রুতি আছে কবির জন্মকাল ১৩২৫ থেকে ১৪১৭ সালের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ সালের মধ্যে রচিত।[১২৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭। পুঁথির লিপি তিন হাতের লিখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।[১২৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো হলো–

জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বানখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।[১২৫]

জন্মখণ্ড–দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনে নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম নেন।[১২৬]

> 'তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরে বিনাশে।
> হেন বর গাঁথা সব দেব গেলা বাসে।'
>
> –জন্মখণ্ড, পা ৩/১[১২৭]

তাম্বুলখণ্ড–তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবন্যের কথা শুনে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধাকে তাম্বুলাদি প্রেরণ করেন কিন্তু স্বরূপবিস্মৃতা রাধাকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।[১২৮]

'আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরংরাধিকামাহ বৃদ্ধ কপটকোবিদ্যা।'[১২৯]

দানখণ্ডে—দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহায়তায় রাধার দধিদুগ্ধের পসরা নষ্ট করে রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ করে।[১৩০]

'বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগর জলে
লীলাএ আহ্মো মুরারী।
দৈ-ত্য দলিলো 'আসুর' সংহারিলো।
শঙ্খ চক্রগদাধরী। –দানখণ্ড, পা ৫১/২[১৩১]

নৌকাখণ্ড—নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনায় কাণ্ডারী সেজে গোপীগণকে পার করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মগ্ন হয়। এখান থেকেই রাধার মনের প্রতিকূলতা দূর হতে থাকে।[১৩২]

'যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাত্র।
হেহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্নু বাহে নাত্র।
হেহে লহে লহে।[১৩৩]

ভারখণ্ড—ভারখণ্ডে কৃষ্ণ ভারবাহীরূপে রাধার পসরা বহন করে।

'চামর কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্নু
মাঝে রাধিকা জাত্র বিকা॥'[১৩৪]

ছত্রখণ্ড—ছত্রখণ্ডে রাধাকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের ছত্রধারণ এবং রাধাকর্তৃক রতিদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়।[১৩৫]

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল লোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা ণাল দণ্ড।
গন্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥[১৩৬]

বৃন্দাবনখণ্ড—বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বনবিহার এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন।

'তোর রতি আশেআশেঁ গেলা অভিসারে
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেতবেণু বাজাত্র যতনে॥'[১৩৭]

কালিয়দমনখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগের দমন। কংসকে বধ করতে তিনি অবতীর্ণ হলেন—

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।
কংস মারিবারে আহ্মো অবতার কৈল॥[১৩৮]

যমুনাখণ্ড–যমুনাখণ্ডে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[১৩৯]

'যমুনাতীররবানীরনিকুঞ্জেমন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমতরোদ্‌ভ্রান্তংমাধবংরাধিকাসখী'॥[১৪০]

হারখণ্ড–হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ।

'কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ জরতীমেবং রাধিকাধিমতী সতীং॥'[১৪১]

বানখণ্ড–বানখণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদনবান নিক্ষেপ করে, এতে রাধা মূর্ছা যায়। ফলে কৃষ্ণের মনে অনুতাপ জাগে, বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে। পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে বন্ধনমোচন করা হয়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করে এবং উভয়ের মিলন ঘটে।[১৪২]

'খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর।
কেশপাশে নীল বিদ্যমানে। এআ।
সিনের সিন্দুর সূর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসত্র মদনে॥ এআ॥'[১৪৩]

বংশীখণ্ড–বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে, রাধা কৃষ্ণের বাঁশি অপহরণ করে এবং পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তা ফেরৎ দেয়।[১৪৪]

কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥[১৪৫]

রাধাবিরহখণ্ড–রাধাবিরহখণ্ড রাধার বিরহ, উভয়ের মিলন, রাধার নিদ্রা এবং সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংসবধের জন্য মথুরা যাত্রা। এরপর কাব্য খণ্ডিত।[১৪৬]

'আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন॥'[১৪৭]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গীতি আলেখ্য। রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান কীর্তন নামে অভিহিত হয়। দেবতার গুণ মাহাত্ম বর্ণনা করে ভক্তি করে এ গান গাওয়া হয়।[১৪৮] মূলত রাধাকৃষ্ণের লীলাই এর মূল বিষয়। রাধাকৃষ্ণের মিলন, বিরহ, লীলাই মূলত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

মূল উপজীব্য বিষয়।[১৪৯] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা আদি মধ্যযুগের ভাষা (১৩০০-১৫০০ খ্রি.)। লোকভাব ও লোকভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূখ্যভাব ও ভাষা। সংস্কৃতের প্রভাব এসেছে যৎসামান্য। নগর জীবনের চেতনার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের কোনো যোগসূত্র ছিল না। এজন্য তার রচনায় সংস্কৃত ভাষার প্রতিফলন ততটা পড়েনি।[১৫০]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনটি চরিত্রই মূলত মুখ্য—যথাক্রমে রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বিবৃতি ব্যতীত রাধা কৃষ্ণ, রাধা বড়াই ও কৃষ্ণ বড়াই প্রভৃতির মধ্যে উক্তি প্রত্যুক্তি রয়েছে।[১৫১]শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগীয় সংগীত ও কাব্যে মূল নিদর্শন। রাগ ও তালের সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিবেশিত হতো। রাধাকৃষ্ণের লীলাই এর মূল বিষয়।[১৫২] জাগতিক প্রেমের বাহ্যিক প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রাধা ও কৃষ্ণের বিরহ মিলনই এর মূল প্রেক্ষাপট। এর পদগুলো নিরপেক্ষ বিচারের বিষয় নয়, এর পদগুলো সমস্ত কাব্যকাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাধার বিরহ মানবিক এবং দেহমূল হলেও হৃদয়ের আর্তি প্রকাশে তাদের সার্থকতার প্রশ্ন উঠে না। পদগুলোতে দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু সংগীত বিস্তারে তা শিথিল।[১৫৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যধর্মীতার মূল অবলম্বন রাধা ও কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানে স্থানে গীতিকবিতা অনুরণিত হয়েছে। কাব্যের গোড়ার দিকে ঝুমুর শ্রেণির লোকসংগীতের প্রভাব আছে কিন্তু বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ডে সে সুর গীতি কবিতার উচ্চ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।[১৫৪] সংলাপের তীক্ষ্ণতায়, ঘটনার স্থান পরিবর্তনের আখ্যানের গতিময়তায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি গীতিধারা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট বত্রিশটি রাগ-রাগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো যথাক্রমে—আহের, ককু, কহু, কহু গুঞ্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, গুজ্জরী, দেশববাড়ী, দেশাগ, ধানুষী, পটমুঞ্জরী, পাহাড়ী, বঙ্গাল, বঙ্গালবাড়ী, বরাড়ী ভৈরবী, বসন্ত, বিভাস, বিভাসকহু, বেলাবল, ভাটিয়ালী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, মাহারঠা, রামগিরি, ললিত, শৌরী, শ্রী, শ্রীরামগিরি ও সিন্ধোড়া। পদের শীর্ষে যেসব তালের উল্লেখ আছে সেগুলো হলো—যতি, ক্রীড়া, একতালী, রূপক, লঘুশেখর, কুড়ুক, আটতালা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখিত শৌরী রাগ সম্ভবত চর্যায় ব্যবহৃত 'শবরী' রাগের অপভ্রংশ। ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে শবরী থেকে শৌরী আসা বিচিত্র নয়।[১৫৫]

চর্যাগীতির পদকর্তাদের মতো, জয়দেবের মতো বড়ু চণ্ডীদাসও ভণিতা করেছেন। মোট পদের ৪১৮টির মধ্যে ৪০৯টিতেই ভণিতা রীতি প্রবর্তিত। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের মত পদের মধ্যবর্তী স্থানে ভণিতা না দিয়ে তিনি দিয়েছেন পদের শেষে।

যেমন–'না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন,

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।'[১৫৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক খণ্ডেই বিভিন্ন পদের মধ্যে বিবিধ প্রসঙ্গে বহু পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–অর্জুন, অহল্য, কালীয়, কুন্তী, কৃষ্ণ, গোকুল, চক্র, তারা, বৃন্দাবন, শঙ্খ, সীতা, রাধা, রাবন, রাম,লক্ষ্মণ প্রভৃতি। মূল চরিত্র হলো রাধা ও কৃষ্ণ। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-মিলন এর মূলভাব।[১৫৭] জাগতিক প্রেমের বাহ্যিক যে ধারাবাহিকতা তারই বাহ্যিক প্রকাশ এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসরণ করেছেন। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদাবলীতে, বর্ণনায় সর্বত্রই ব্রহ্মবৈবর্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, চণ্ডীদাসের কাব্যে পীরিতির প্রাধান্য ব্রহ্মবৈবর্তের ভাবসমৃদ্ধ বলা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মবৈবর্তের সূত্রটি উপেক্ষা করলে চণ্ডীদাসের কোন কোন পদের প্রকৃত ব্যাখ্যাকেই উপেক্ষা করা হয়। যেমন চণ্ডীদাসের এই পদটি–

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
... ...
আজি ময়লানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভবভরে গদগদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহে চণ্ডীদাস॥[১৫৮]

এই পদটি ব্রহ্মবৈবর্তের রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা যেতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্তে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ও মথুরাগমনের কারণ হিসাবে গোলোকে রাধা-শ্রীদামের কলহ এবং শ্রীদাম কর্তৃক রাধিকাকে এক শতবর্ষ ব্যাপী কৃষ্ণ বিচ্ছেদের অভিশাপকেই দায়ী করা যেতে পারে। উপরে উদ্ধৃত চণ্ডীদাসের পদটিতে দেখা যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাই এখানে 'শতেক বরষ পরে' বলতে কেবল সাধারণভাবে দীর্ঘকালকেই বুঝাচ্ছে না, শতবর্ষই বোঝাচ্ছে।

তিনজন চণ্ডীদাসকে নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে–

১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা সংবলিত হয়ে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৫৯] এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই বঙ্গদেশে বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যরসিক মহলে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত সমস্যাটির উদ্ভব হয়। 'এই সমস্যা আরো প্রবলতর হয়ে উঠে যখন মনীন্দ্রমোহন বসু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হতে দীন চণ্ডীদাসের পদ আবিষ্কার করেন।'[১৬০]

প্রথমেই আমরা দেখি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করেছিলেন কি না? সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণীর টীকায় আছে–'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।'[১৬১] কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে :

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥'[১৬২]

এইসব উক্তি অবলম্বন করে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই দান ও নৌকাখণ্ডের পদের রসাস্বাদন করে 'পরম আনন্দ' উপভোগ করতেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চণ্ডীদাসের পদের বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের লুপ্তপ্রায় গীতিকাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশিত হলে সমস্যা সত্যি সত্যিই জটিল হয়ে পড়ে। ১৩৩৩ সালে দুই হাজার পদপূর্ণ দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের এক বৃহৎ পুঁথির সন্ধান মিলে।[১৬৩]

ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্ররায়ের মতে চণ্ডীদাস তিনজন।[১৬৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও তিনজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি নিবন্ধে লিখেছেন, 'পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া এক গৃহস্তের গোয়লঘর হইতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর এক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়া রসজ্ঞ পাঠকসমাজে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। পুঁথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের লেখায় সম্ভবত পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কিন্তু বসন্তবাবু পুঁথি

সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।'[১৬৫] বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামেই বড়ু চণ্ডীদাসের পদগুলো সবিশেষ পরিচিত এবং বক্ষমান আলোচনাও এই নাম গ্রহণ করেছি যদিও যুক্তিসঙ্গতভাবে সমর্থনযোগ্য 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি।[১৬৬]

ভণিতার ব্যাপারে বড়ু চণ্ডীদাস স্বাতন্ত্র্য রয়েছেন। তিনি কোথাও দ্বিজ বা দীন ভণিতা ব্যবহার করেননি। চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে অন্য একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ভাব ও ভাষা বিচারে দ্বিজ চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র কবি।[১৬৭] ড. সুকুমার সেনের মতে এই চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ সালের দিকে হবে না। দ্বিজ চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁর পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও ভাবসম্মেলনের পদগুলো উৎকর্ষপূর্ণ। এসব পদের ভাব ও আদর্শ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব হয়ত তাঁর পদ আস্বাদন করতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের মতো দ্বিজ চণ্ডীদাস যে বাশুলী (বিশালাক্ষ্মী) দেবীর সেবক ছিলেন তা তাঁর ভণিতা থেকে জানা যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাসের তারা নাম্নী রজকী সাধন-সঙ্গিনী ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি মাত্র আরবি, ফারসি শব্দ আছে। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি শব্দের সংখ্যা অনেক।[১৬৮] এতে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে পরবর্তী কালের তা প্রমাণিত হয়। দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুটি পদে শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে। তাঁর একটি পদের ভণিতার শ্রীরূপের নাম পাওয়া যায় বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, 'মনে হয় যে তিনি চৈতন্য শিষ্য রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।'[১৬৯]

এরপর দীন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন দীন চণ্ডীদসের পদগুলো দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পৃথক কবি।[১৭০] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতায় বাসলী (বাশুলী) দেবী কোনো উল্লেখ নেই, রজকিনী রামী বা নান্নুরেরও উল্লেখ নেই। দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত পদাবলী ভিন্ন কোনো ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনা করেননি। তিনি ব্রজবুলিতেও কিছু পদ রচনা করেছেন।[১৭১] মনীন্দ্রমোহন বসুর মতে ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক মনে করেন।[১৭২] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং খুব সম্ভব সতের শতকের গোড়ার দিকের কবি ছিলেন।[১৭৩]

এসব আলোচনা থেকে বড়ু, দ্বিজ ও দীন এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মধ্যযুগে বিস্তৃত পরিসরে প্রায় চার শ বছর ধরে চণ্ডীদাস নামধারী কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদগুলো সংক্ষেপে এরূপ দাঁড়ায়–

* ড. দীনেশচন্দ্র সেন অভিন্ন চণ্ডীদাস মনে করেন।

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই মতের সমর্থক।

* বসন্তরঞ্জন রায় পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে এক ব্যক্তি ধরেছেন।

* মনীন্দ্রমোহন বসু ও ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় চৈতন্যপূর্ব বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী দীন বা দ্বিজ একজন পদাবলীর চণ্ডীদাস মানেন।

* ড. সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উল্লেখযোগ্য চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান।

* ড. বিমানবিহারী মজুমদার তিনজনের বেশি চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া পদাবলীর দুই চণ্ডীদাস দ্বিজ ও দীন স্বীকার করেন। এ ধরনের আরো মতামত রয়েছে।[১৭৪]

তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুযায়ী চৈতন্যপূর্বযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী পদাবলীর দীন চণ্ডীদাস—এই তিনজনকেই স্বীকার করতে হয়।[১৭৫] তিন চণ্ডীদাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহে জটিলতা বিদ্যমান বলে চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে একটি রহস্যজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বাংলার কবি না হয়েও অথবা বাংলায় কবিতা রচনা না করেও 'বাঙালি বৈষ্ণবের গুরুত্বস্থানীয়, রসিক বাঙালির শ্রদ্ধেয় কবি। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের নবরসিকের অন্যতম। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, বিদ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, ১৩৯০ থেকে ১৪৯০ সালের মধ্যেই বিদ্যাপতির জীবন আবর্তিত হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ বিস্তারিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ধারনা করেছেন যে, বিদ্যাপতি ১৩৬০-৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ সালের মধ্যে পরলোকগমন করেন।[১৭৬]

অনেকের মতে 'বিদ্যাপতি প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি (১৪০০-১৫০৬ সাল) মিথিলা প্রবাসী বাঙালি কবি। মৈথিল বাংলায় পদ রচনা করেছেন। মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন। এজন্য তাঁর পদাবলীর ভণিতায় শিবসিংহ ও তাঁর মহিষী লছমী দেবীর নাম যুক্ত আছে। বিদ্যাপতি নামে একাধিক পদকর্তাও থাকতে পারেন। তাঁর পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মহাপ্রভু তাঁর

পদ আস্বাদন করতেন।'[১৭৭] তাঁর প্রমাণ আমরা পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের ৪২ শ্লোকে–

'বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত।'[১৭৮]

তিনি বিস্ফি (সর্হবিসফি) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর পরিবার বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্যের অধিকারী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি রাজসভায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন এবং একজন সভাসদরূপে পরিগণিত হন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাজপণ্ডিত পদের মর্যাদা লাভ করেন এবং সারাজীবন এই পদেই একটির পর একটি নরপতি ও তদীয় মহীষীর শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।'[১৭৯]

বিদ্যাপতি বাঙালি না হলেও বাংলা কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যাপতির সঙ্গীতাবলীতে নিঃসৃত হয়েছিল জগৎ ও জীবনের তত্ত্ববিষয়ক অনেক নিগূঢ় কথা, সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল বাঙালির জাতীয় ঐক্য ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা। অর্থনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক দিক থেকে সময়টা ছিল দুঃসময়। বাংলাদেশে তখন ধনছিল, টোল-চতুস্পাঠী ও পণ্ডিত ছিলেন অজস্র। তবু সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছিল হাহাকার। এ অবস্থাতেই এক সার্থক চিত্র পাওয়া যায় বিদ্যাপতির এ কয়েকটি ছত্রে :

কত বিদগ্ধ জন, রস অনুমানই
অনুভব কাহুক না পেঁখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুরাইতে
লাখে না মিলয় এক॥[১৮০]

বিদ্যাপতি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকে বলেন তিনি শৈব ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতাই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। 'তাঁর কাব্যে ভক্তিরস অবশ্যই আছে, কিন্তু যেটা মুখ্য সেটা হচ্ছে মানবিক প্রেম, যে প্রেম দেহকে অস্বীকার করে না। অথচ দেহের মিলনেই তার শ্রেষ্ঠতা বা সার্থকতা বলেও সমর্থন করে না। দেহ ও অন্তর এই দুটির অপূর্ব সমন্বয় তিনি করেছিলেন তাঁর গীতিকাব্যে এবং পরবর্তী কবিরা তারই অনুসরণ করতে চেষ্টা করে গেছেন।'[১৮১]

'বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বহুবিচিত্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতাকা, লিখনাবলী, ভাগবত-অনুলিপি, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনী এবং সেই সাথে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ও শৈব পদ।[১৮২] সুতরাং ভূগোল,

ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি, পত্র রচনারীতি এবং সেইসঙ্গে শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসের পদাবলী রচনায় কবির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, অবহট্ঠ এবং মৈথিল তিনেরই নিদর্শন রয়েছে। দেশীয় অবহট্ঠ ভাষায় কীর্তিলতা রচনার কারণ দেখিয়ে কবি লিখেছেন–

সক্কয় বাণী বূহুঅণ ভাবই
পাউত রস কো মন্ম না পাবই।
দেসিল বঅনা সবজন মিট্ঠা
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্ঠা॥[১৮৩]

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি জয়দেবের ভানানুসারী। সেজন্য বিদ্যাপতিকে অনেকে অভিনব জয়দেব আখ্যা দিয়েছেন।[১৮৪] আবার বিদ্যাপতির এক শতাব্দী পর বাংলায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। সেই কারণে গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদন করতেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর-মাহ-বাদর' পদটি নিজে সুরারোপ করেছেন। গোবিন্দদাসের 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' পদটিতে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করেছেন এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৮৫]

বিদ্যাপতি সহস্রাধিক পদাবলী রচনা করেছিলেন। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র লীলা কবির কাছে আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়েছিল বলে তিনি রাধা-কৃষ্ণ লীলার পদই বেশি রচনা করেছিলেন। পদ প্রায় পাঁচ শতাধিক। বিদ্যাপতির পদগুলো স্থানভেদে মর্যাদার তারতম্য ঘটেছে। মিথিলাবাসী ও হিন্দিভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির শৈব ও শাক্ত পদগুলোর উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপরদিকে বাংলাদেশের বিদ্যাপতির সব পদই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক।[১৮৬] বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেণিবিভাগ এ রকম–

ক) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক,

খ) হরগৌরী ও কালী বিষয়ক,

গ) গঙ্গা বিষয়ক,

ঘ) প্রহেলিকা জাতীয়,

ঙ) দেবতা সম্পর্ক বর্জিত বিভিন্ন ধরনের পদ।[১৮৭]

কবিবর বিদ্যাপতি রচিত কাব্য, বর্ণ এবং রাগের অনুবদ্ধ যে গীতগুলো ছিল, সেইগুলো এবং প্রায় সেইগুলোর মতো বা সেগুলোর অনুসরণে রচিত যেসব রাগে নিবদ্ধ গীত খ্যাতি লাভ করেছিল,

কোনো প্রকারে সেগুলো একত্রিত করে ধীমান শ্রীমন নরপতি কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক নিযুক্ত লোচন সেইগুলো লিপিবদ্ধ করলেন।[১৮৮] লোচন মিথিলার দেশী সংগীতকে অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেশীয় গীতাদির মধ্যে সুদেশীয় রচনা হিসাবে মিথিলার অপভ্রংশ ভাষায় শ্রীবিদ্যাপতি কবি কর্তৃক নিবদ্ধ গীতসমূহকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[১৮৯]

মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির উপর ব্রহ্মবৈবর্তের প্রভাব কম নয়। তাঁর বিভিন্ন পদে ব্রহ্মবৈবর্তের মত উজ্জ্বল রসের প্রাধান্য এবং কৃষ্ণের বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ব্রজবুলি

বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায়। ব্রজবুলি নামটি প্রথম কিভাবে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছে বলা কঠিন। ব্রজধাম-বৃন্দাবন অঞ্চলে যে আঞ্চলিক হিন্দিভাষা ব্যবহৃত হয় তার সাথে এই ভাষার একেবারেই মিল নাই। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'এ ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট।'[১৯০] প্রাকৃত-পৈঙ্গলে এ ভাষার প্রাসঙ্গিক নমুনা আছে। তবে বিদ্যাপতির পদ প্রচারে এই ভাষার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী, এই জন্যই বোধ হয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি হয়েছে।[১৯১]

সুকুমার সেনের মতে, 'অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা, মৈথিলি, হিন্দি রাজস্থানি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাগুলো অল্পবিস্তর পূর্ণ পরিণত রূপ ধরবার পরেও অবহট্‌ঠের আদর কমেনি দরবারি সাহিত্যে, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে।[১৯২] এর পরবর্তী অবহট্‌ঠ যার উপর মৈথিলি প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল। সুরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা কবিদের রচনায় যে অল্প স্বল্প অহিন্দি শব্দ ও পদ আছে তা এই পরবর্তী অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন ব্রজবুলি যাই বলি না কেন তার থেকে নেওয়া।[১৯৩] সুতরাং ব্রজবুলি কোনো প্রদেশ বিশেষের সম্পত্তি নয়, তা আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং এক হিসেবে কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধুভাষা।'[১৯৪]

সুনীতিকুমার ব্রজবুলিকে 'A curious jargon, a mixed Maithili and Bengali with a few western Hindi form, entirely different from the western Hindi dialect, called Brai-bhakha, current round about Mathura' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৯৫]

সুকুমার সেন মনে করেন, 'মোরাঙ নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে অবহট্‌ঠের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।'[১৯৬]

পনের শতকেই মিথিলা, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে পদাবলী রচনার রীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আসামে পনের শতকের বিখ্যাত কবি শঙ্করদেব এবং ষোল শতকে তাঁর শিষ্য মাধবদেব ব্রজবুলিপদ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন।[১৯৭] উড়িষ্যার ব্রজবুলি পদ রচনার কৃতিত্ব চৈতন্য সুহৃদ রামানন্দ রায়ের, আর বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন ব্রজবুলি পদের রচয়িতা হলেন যশোরাজ খান। অবশ্য বাংলাদেশেই ব্রজবুলি পদরচনার উর্বর ক্ষেত্র। এত বেশি ব্রজবুলি পদ অন্য কোনো প্রদেশে রচিত হয়নি। ড. সুকুমার সেন বলেন, 'ব্রজবুলি বাংলার একটি উপভাষা, তবে কথ্য নয়, সাহিত্যিক এবং এই উপভাষার রসপুষ্টিও ঘটেছে বাংলা ভাষার আশ্রয়ে এবং বাঙালি কবিদের হাতে। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর লীলাকীর্তনের আসর জমে উঠেছিল ব্রজবুলির পদের কল্যাণে।'[১৯৮] বৈষ্ণব সমাজে ব্রজবুলি কথিত ভাষা হয়ে উঠে নাই। কিন্তু সকলেই বুঝতো, এই ভাষায় পদ রচনার সার্থকতা ছিল—

১. এই ভাষা এতই উদার ও আতিথেয় যে এর মধ্যে যে কোনো প্রাদেশিক ভাষা সহজে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই ভাষাতে ফরাসি শব্দও প্রবেশ করেছে।

২. ব্রজবুলির সাথে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ সুললিত ছন্দ পেয়েছেন। এই ছন্দগুলো দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিন্দোলিত।

৩. শ্রীচৈতন্যের সময় হতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হয়েছিল। আর্যাবর্তের বহু লোকও এই সাহিত্য উপভোগের জন্য পিপাসু হয়েছিল। সে জন্যই কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় নিলেন যাতে সকল লোকেই সহজে বুঝতে পারে। অর্থাৎ অবহট্‌ঠ বা ব্রজবুলিতে রূপান্তর করলেন।

৪. গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা থাকুক কবিগণের সম্ভবত এই অভিপ্রায় ছিল।

৫. অনধিকারী প্রাকৃতজনের দ্বারা পাছে পদাবলীর মর্যাদাহানি না হয়, হয়ত সেই কারণেই বৈষ্ণব কবিগণ প্রাকৃতজনের ভাষা বর্জন করে ব্রজবুলি ব্যবহার করতেন।

৬. প্রেমলীলা বর্ণনার পক্ষে এই ললিতকোমল তরলায়িত ভাষাকে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়েছিল। বিদ্যাপতি বাংলায় রূপান্তরিত পদাবলীতে মধুর রসাত্মক ব্রজলীলা বর্ণনায় ব্রজবুলিকে প্রেমলীলার আদর্শ ভাষা করে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অনেক কবিই বিদ্যাপতি ভাষার বঙ্গীয় রূপ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন—রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার নাম বলা যেতে পারে। ভানুসিংহ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ব্রজবুলির শেষ কবি।

৭. রসিক স্রোতাদের চাহিদাতেই সম্ভবত এই ভাষা কবিদের আদরণীয় হয়েছিল।

৮. দেশগত ও কালগত ব্যবধান যেমন একটা রোমান্সের সৃষ্টি করে তেমনি ভাষাগত ব্যবধানও তেমনি একটা রোমান্সের সৃষ্টি করতো।

৯. কীর্তনসংগীতের রসমূর্ছনা ও সুরের অলঙ্করণের পক্ষে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী বলে মনে করে কবিরা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করতেন।

মোটের উপর এই অপূর্ব ভাষাটির জন্য বঙ্গীয় কবিরা বিদ্যাপতির কাছে প্রধানত ঋণী। বিদ্যাপতির পদাবলীই বাঙালি কবিদের ব্রজবুলিতে পদচারণার প্রেরণা দিয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে।[১৯৯]

ব্রজবুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—

১. তিনটি শ, ষ, স-এর পরিবর্তে একটি মাত্র ‘স’-এর ব্যবহার।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি বর্জন ও স্বরধ্বনির ব্যবহার প্রবণতা।

৩. অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ-এর হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে ও লিখিত বানানে খুবই শৈথিল্য ছিল।

৪. য এবং ব-এর অন্তস্থ্ ‘ইয়’ ‘ওয়া’ উচ্চারণ লোপ পেয়েছে।

৫. ভিন্ন দুই যুক্ত ব্যঞ্জন অনেক সময় এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।

৬. অনেক সময় দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে।

৭. ধ্বনি পরিবর্তনের, বিশেষ করে বিপ্রকর্ষ ও স্বরসংগতির যথেষ্ট উদাহরণ মিলে।

৮. অনুনাসিক উচ্চারণ কম।

৯. সম্পাদনের পৃথক রূপ নাই।

১০. সমাজবদ্ধ বিভক্তিহীন সম্বদ্ধ পদের যথেষ্ট ব্যবহার।

১১. তৎসম ও তদ্ভব শব্দই বেশি ব্যবহৃত।[২০০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মধ্য যুগ
(১২০০ সাল-১৮০০ সাল)

২.১ বৈষ্ণব পদাবলী

পদাবলী কথাটি 'পদ' ও আবলা' এই দুই পৃথক শব্দের সন্ধিযুক্ত সমাহার। আবলা শব্দের অর্থ সমাহার বা সমষ্টি আর পদ শব্দের অর্থ বাক্য এবং সংগীত উভয়ই। প্রাক্ চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী রচনার সুস্পষ্ট ধারার সূচনা সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব থেকেই। পরবর্তীকালের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের পদাবলীর বিষয়বস্তু ও কাব্যকাল কমবেশি অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের রচনা পদাবলীর ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পদাবলী সাহিত্যে এই কবিদের বড় অবদান রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবু বলতে হয় বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ ও রসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় চৈতন্যের প্রভাবে। চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ পদাবলীকে ভক্তি রসাশ্রিত সাহিত্যের নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে।[২০১] (গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ বা বৈষ্ণব দর্শন আলোচনা করেছি তৃতীয় অধ্যায়ে)।

চৈতন্য পূর্বযুগের রাধাকৃষ্ণ লীলার পদকর্তা ছিলেন সংস্কৃতে জয়দেব এবং বাংলায় চণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, হোসেন শাহ'র কর্মচারী (সভাসদ) মালাধর বসু (যশোরাজ খান) এবং ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। চৈতন্যোত্তর যুগে প্রায় দশ হাজারের মতো বাংলা ও ব্রজবুলি পদ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচ ছয়শ' পদই গীতিকবিতা হিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছে।[২০২] মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদও বাঙালির মুখে মুখে পরিবেশিত হয়েছে। ফলে, বিদ্যাপতি এখনও বাংলা ও বাঙালির প্রিয় কবি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বংশীবদন, জয়দানন্দ, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, নরহরিদাস, নরোত্তমদাস প্রমুখ।

পদাবলী সাহিত্যে মধ্য যুগের মুসলমান কবিগণের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমান পদকর্তার সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয়নি। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম কবি ছিলেন সম্ভবত শেখ কবির। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলি রজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস, চাঁদ কাজী প্রমুখ। চাঁদ কাজীর একটি পদ স্বরলিপিসহ পরিশিষ্ট-৫এ রয়েছে।[২০৩]

পদাবলীর বিষয়বস্তু ও উৎস

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা এবং নবদ্বীপ নীলাচলের গৌরাঙ্গলীলা নিয়েই বিপুলায়তন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণলীলার আবার দুটি অংশ–বাল্যলীলা এবং রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুরলীলা। বাল্যলীলার মধ্যে কালীয়দমন, গোষ্ঠলীলা ইত্যাদির কিছু পদ রয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করলেন, চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।[২০৪] তবে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁর বাল্য, কৈশোর, সন্ন্যাস, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি জীবনালেখ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আলোকে রাখতে হয়েছে।

কয়েকটি পদে কৃষ্ণের রাধার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও সুস্পষ্ট নামোল্লেখ নাই। (দ্র. শ্লোক ২/১৪, ২/১৭, ৫/৪৭, ৭/৫৫, ৭/৬৯ গাথা সপ্তশতী) রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-প্রেমলীলার উৎস সন্ধান সহজ করা কাজ নয়। হালের (অন্ধ্র দাসবংশীয় রাজা) 'গাথা সপ্তশতীতে' প্রায় দু'হাজার বছর (খ্রি. ১ম শতক) আগে রাই, কানু এবং গোপীদের উল্লেখ রয়েছে। এটিই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন রাই-কৃষ্ণ যুগল নামের উল্লেখ।[২০৫] 'রাঢ়দেশে 'পটুয়া' নামে একটি সম্প্রদায় আছে। অতি প্রাচীনকালে এরা 'যমপট্টিক' নামে পরিচিত ছিল। প্রায় বারোশত বছর পূর্বে রচিত কবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে', তারও পূর্বে রচিত বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' যমপট্টিকের উল্লেখ আছে। বিশাখ দত্তের মতে এরা চানক্যের গুপ্তচরের কাজ করত। এই যমপট্টিক থেকেই পট্টিকসস্স এসেছে।'[২০৬] পোট্টিকসস্-এ বৃন্দবনলীলার উৎস সম্পর্কে পাওয়া যায়–

> 'মুহমারুত্রণ তং কহ্ণ গোরঅং রাহিআত্র অবণেন্তো।
> এতাণং বলবীণ অন্নাণ বি গোরঅং হরসি॥'
>
> –পোট্টিসস্স।[২০৭]

অর্থাৎ–হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখের) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করে এই বল্লভীদের ও অন্যান্যদের গৌরব হরণ করছ। এছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের উৎপত্তি নিয়ে তত্ত্ব রয়েছে। সেটি আমি রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

চৈতন্য পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী—রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় দার্শনিক রূপ দিলেন। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি এবং জীব গোস্বামীর ষটসন্দর্ভে সেই দর্শনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ রয়েছে।[২০৮] পরবর্তীকালে দেশী ভাষায় এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অমরগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পরিবেশন করেছেন। বাংলাদেশের খেতুরী মহোৎসবের (১৫৮১ সাল) প্রবর্তক নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনগানের একটি বিশিষ্ট ধারা (গড়ানহাটী) মাধ্যমে পালাকীর্তনের (পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, মান, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ, রাস, নিবেদন, মাথুর ইত্যাদি) রূপ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব থেকেই নৃত্য-গীত সহযোগে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করতেন—সেই অভিনয় চৈতন্যদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা কৃষ্ণ, রাধা এবং বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপগোপীদের চরিত্রকে রূপায়িত করতেন।[২০৯] সাধারণ অভিনয় থেকে লীলাভিনয়ে পার্থক্য ছিল এই যে, বৃন্দাবন-মাথুর ধর্মীয় লীলাভিনয়ে ভক্তবৃন্দ সেইভাবে একেবারে তন্ময় হয়ে আত্মলীন হয়ে পড়তেন। মহাপ্রভুর এই লীলাকীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ পালারূপ দিলেন নরোত্তম ঠাকুর।[২১০]

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সমগ্র বাংলা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর ষোল শতকের শেষার্ধে পদাবলী সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বিবেচনা করে তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে এবং ভক্ত কবিগণ তাঁর ভাবাদর্শ কাব্যে রূপায়িত করে পদাবলী সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগের সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলীর যে দুটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কবিগণ মোটামুটি তা-ই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদাস

সম্ভবত ষোল শতকে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনার মাধ্যমে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলায় পদ রচনা করেছিলেন, তবে বাংলা পদেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। জ্ঞানদাস পদাবলীতে সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, আবেগের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মানবজীবনের বাতায়নে বসে ভাব বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীর লীলা প্রত্যক্ষ করে শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তিনি তপস্বিনী রাধার মূর্তিটি নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।[২১১] নায়িকার রূপবর্ণনা, অতৃপ্ত

প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্রজ্বালা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, মিলনের গভীর উল্লাস ও বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।[২১২]

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জ্ঞানদাস ছিলেন শিল্পী, আর চণ্ডীদাস ছিলেন সাধক। জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে পরিস্ফুট করে তুললেও তাকে 'হর্ষোৎফুল্ল মিলন-ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা' হিসেবে রূপ দিয়েছেন।[২১৩] জ্ঞানদাস চৈতন্যপরবর্তী কবি বলে ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞানদাস যে লিরিক প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ফুটে উঠেছে জ্ঞানদাসের পদে :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥[২১৪]

জ্ঞানদাসের ভাষা সহজ, সরল, অলঙ্কারবর্জিত, কিন্তু প্রবল আবেগে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব ও মননশীলতা।

গোবিন্দদাস

সম্ভবত ষোল শতকের তৃতীয় দশকে গোবিন্দদাসের জন্ম এবং সতেরো শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর মৃত্যু হয়।[২১৫] তিনি প্রায় সাত শ পদ রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে কিছু বাংলা পদ থাকলেও অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত।[২১৬] বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও চিত্রকল্প তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। গোবিন্দদাস নিজের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন :

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥[২১৭]

কবির পদ শুধু রসনারোচন ও শ্রবণবিলাস হয়েই থাকে নি, বরং শব্দকল্পনা, অলঙ্করণ, রূপরীতি ও মঞ্জুল ঝঙ্কারের বাহনে কবির সৌন্দর্যকামী ও ভক্তিগত চেতনা যে সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা, চিত্রল প্রতীকতা ও সুরময় ধ্বনিরণন সৃষ্টি করেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে রাধা চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ করা যায়।[২১৮] তিনি ছিলেন ভক্তকবি। অভিসারের পদগুলোতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পদের অপূর্ব

বাণীঝঙ্কার, চিত্ররীতি, অলঙ্কার-নৈপুণ্য ও ছন্দের কারুকার্য তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নীলরতন সেন মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাসও সচেতন শিল্পী ছিলেন, ভাবতন্ময়তার তুলনায় বহিরঙ্গ রূপচিত্রণের প্রতি তাঁরও অনুরাগ কিছুমাত্র কম ছিল না।[২১৯] তবে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির পদে রাধারূপের বর্ণনায় মানবীয় প্রেম বিশ্লেষণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভাবচিত্র লক্ষ করা যায়, চৈতন্য-পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস সে সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে ভক্তিতত্ত্বের প্রভাবে অনেকাংশে সংযত হয়েছেন, রূপদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে সেখানে বৈষ্ণব ভক্তের মিলন ঘটেছে।[২২০] গোবিন্দদাস ছিলেন বিদগ্ধ কবি, রুচির রসিক এবং শান্তভক্ত। গোবিন্দদাস অনবদ্য প্রকাশভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। একজন সার্থক চিত্রকরের মতো তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিরহব্যাকুল রাধার চিত্রটি চমৎকারভাবে তাঁর লেখনীতে রূপ লাভ করেছে।

গোবিন্দদাসের সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত্য ছিল। ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসে তিনি যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা একক ও তুলনারহিত। চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। তাঁর বিরহব্যাকুলা রাধার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর মধ্যে আছে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, মৌলক কল্পনা ও শব্দ চয়নেও ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। এসব দিক থেকে তিনি গুরু বিদ্যাপতির চেয়েও অগ্রণী ছিলেন বলে সমালোচকেরা মনে করেন। গোবিন্দদাসের বর্ণনায় বহিরঙ্গের মাধুর্য প্রাধান্য পেয়েছিল।[২২১]

ছন্দের লালিত্য, ভাষায় মাধুর্য ও অত্যাশ্চর্য প্রকাশভঙ্গির গুণে তাঁর পদাবলী অভিনব বলে বিবেচনার যোগ্য। ব্রজবুলির ছন্দঝংকার ও সংস্কৃত অলঙ্কার সমৃদ্ধ গোবিন্দদাসের পদের নমুনা :

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥[২২২]

বলরামদাস

একাধিক বলরামদাসের কথা পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তাঁর নামে যে সব পদ পাওয়া যায় তাতে সবচেয়ে বেশি কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাৎসল্যরস ও রসোদ্গারের পদে। রাধার আক্ষেপানুরাগের পদগুলোও তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যে সুখদুঃখের চিত্র

উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর পদের মূল সুর হচ্ছে সহজ জীবনরসপ্রীতি। বলরামদাসের একটি পদ কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট রাধার উক্তি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সই কি জানি কদম্ব তলে।
দেখিয়া ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি
যাইতে যমুনা জলে॥[২২৩]

লোচনদাস

লোচনদাস ছিলেন চৈতন্যজীবনীকার। তিনি কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন নরহরি সরকার। লোচনদাস গৌর নাগর ভাবে অনেকগুলো আদিরসাত্মক পদ রচনা করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, লোচনদাস মাত্রা ছাড়িয়ে কটু আদি রসের ভিয়ান চড়িয়ে শৃঙ্গার উদ্বোধক ধামালির চটুল ছন্দে নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করেছেন।[২২৪] তাঁর পদের কয়টি পংক্তি–

আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মনপ্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছটফটানি প্রাণে॥[২২৫]

পদাবলী সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে অগণিত পদকর্তা কবিতা রচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বাসুঘোষ, জগদানন্দ, শশিশেখর, রায় শেখর, রায় বসন্ত, কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি প্রমুখ।

বৈষ্ণব গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমান মধুরতা। যেন একটি পাখির দুইটি পক্ষ। এই দুই পক্ষে ভর দিয়ে সাধনসিদ্ধ গায়কের সঙ্গে ভাবুক ও রসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকেও উধাও করে বৈষ্ণবের গান যে কল্পলোকে নিয়ে যায় তা কোনো কাল্পনিক জগৎ নয়। বৈষ্ণব কবিগণের অনুভূতিতে সেই সচিদানন্দময় ধামও যেমন সত্য, এই নিত্যনতুন লীলাও তেমই সত্য। কবিগণ তার সাক্ষাৎদ্রষ্টা।[২২৬]

বৈষ্ণব পদাবলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য–ভণিতা। এই ভণিতার জন্য কোনো কবির পদ সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে–এক অভাবিতপূর্ব ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে উঠেছে। কবিগণ সেখানে লীলাসঙ্গী। সাহিত্যের রসের সঙ্গে যোগী জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্তপ্রতিপাদ্য রসের মিলনেই বৈষ্ণব পদাবলী চিরন্তন আস্বাদ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক যুগ হতে যুগান্তেরের পথে পদাবলী তাই নিত্যনতুন পথচারীকে আকর্ষণ করছে।[২২৭]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলয়িতা শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস। গোপাল দাস ভণিতার পদগুলো তার রচিত। তাঁর সংকলনগ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী'।[২২৮] আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' এর পরে সংকলিত হয়েছিল। বিশ্বনাথ হরিবল্লভ ভণিতা দিয়ে পদ রচনা করেছিলেন।[২২৯] ক্ষণদার পরে নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' এবং রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্রের' নাম করতে হয়। পরবর্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'।[২৩০]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পার্ষদ

পঞ্চতত্ত্ব

ভক্ত রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্ত স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তবতার শ্রীঅদ্বৈত। ভক্ত শ্রীশ্রীবাস ও ভক্ত শক্তি শ্রীগদাধর।

ছয় গোস্বামী

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস।

ছয় চক্রবর্তী

শ্রীব্যাস, শ্রীদাম, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীগোবিন্দ (ভাবক চক্রবর্তী) ও শ্রীরামচরণ।

অষ্ট কবিরাজ

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীগোপীরমণ ও শ্রীগোকুল।

অষ্ট প্রধান মোহান্ত

শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীসেন শিবানন্দ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ (মতান্তরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত) ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

দ্বাদশ গোপাল

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীকমলাকর পিপলাই, শ্রীকালা কৃষ্ণদাস, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীনাগর পুরুষোত্তম, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, শ্রীশ্রীধর (খোলাবেচা) ও শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর।

দ্বাদশ উপগোপাল

শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর (রামচন্দ্রপুর), শ্রীরুদ্র পণ্ডিত (বল্লভপুর), শ্রীমুকুন্দানন্দ (নবদ্বীপ), শ্রীকাশীশ্বর (বল্লভপুর), শ্রীওঝা বনমালী (কুল্যাপাড়া), শ্রীমন্ত ঠাকুর (রুকুনপুর), শ্রীমুরারি মাইতি (বংশীটোটা), শ্রীগঙ্গাদাস (নৈহাটী), শ্রীগোপাল ঠাকুর (গৌরাঙ্গপুর), শ্রীশিবাই (বেলুন), শ্রীনন্দাই (শালিগ্রাম), শ্রীবিষ্ণাই (ঝামটপুর)।

চৌষট্টি মোহান্ত

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রধান

রত্নগর্ভ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, ভূগর্ভ ঠাকুর, রাঘব গোস্বামী, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

শ্রীরায় রামানন্দ প্রধান

মাধব সঞ্জয়, নীলাম্বর ঠাকুর, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নন্দ আচার্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধি মিশ্র।

শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর প্রধান

শ্রীমান্ পণ্ডিত, ঠাকুর জগন্নাথ দাস, জগদীশ ঠাকুর, সদাশিব ঠাকুর, রায় মুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দর আচার্য ও নারায়ণ বাচস্পতি।

শ্রীবসু রামানন্দ প্রধান

পরমানন্দ ঠাকুর, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর, বনমালী দাস, শ্রীকর পণ্ডিত, শ্রীনিধি পণ্ডিত, লক্ষ্মণ আচার্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

শ্রীসেন শিবানন্দ প্রধান

মকরধ্বজ দত্ত, রঘুনাথ দত্ত, মধু পণ্ডিত, বিষ্ণুদাস আচার্য, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দ ঠাকুর, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরাম দাস।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ প্রধান

কাশী মিশ্র, শিখি মাহিতি, শ্রীরাম পণ্ডিত, বড় হরিদাস, কবিচন্দ্র, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর।

শ্রীমাধব ঘোষ প্রধান

মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর, মহেশ ঠাকুর, শ্রীকান্ত, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র ভট্টাচার্য।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রধান

রাঘব পণ্ডিত, মুরারি চৈতন্য দাস, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, শ্রীজীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র গুপ্ত।[২৩১]

চৈতন্যদেবের সময়ে ও চৈতনোত্তর সময়ের কীর্তনীয়াগণের তালিকা–

শ্রীধাম নবদ্বীপের কীর্তনীয়া–

শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত ও ব্রহ্ম হরিদাস।

শ্রীপুরীধামে কীর্তনীয়াগণ–

প্রথম সম্প্রদায়

স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়

গঙ্গাদাস পণ্ডিত, ছোট হরিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুভানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত।

তৃতীয় সম্প্রদায়

মুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসুদেব দত্ত, গোপীনাথ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন।

চতুর্থ সম্প্রদায়

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, হরিদাস, বিষ্ণুদাস, শ্রীরাঘব, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

পঞ্চম সম্প্রদায়

নর্তক সত্যরাজ খান

ষষ্ঠ সম্প্রদায়

নর্তক অচ্যুতানন্দ

সপ্তম সম্প্রদায়

নর্তক শ্রীরঘুন্দন

বাঙ্গালার কীর্তনীয়া

ময়নাডাল, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ, কৃষ্ণদয়াল চন্দ, মনোহর চক্রবর্তী, অদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী), রসিক দাস, অখিল দাস, শচীনন্দন দাস. গণেশ দাশ, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী, যদুনন্দন দাস, রাধারমণ দাস, অবধৌত দাস, চোঙ্গাধারী বাবাজী ও ত্রিভঙ্গদাস, নন্দকিশোর দাস, শ্রীরথীন ঘোষ।[২৩২]

২.২ মঙ্গলগান

চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলায় প্রধানত শাক্তদেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক একপ্রকার আখ্যানগীতি রচিত হয়। এগুলো মঙ্গলগান মঙ্গলকাব্য নামে খ্যাত।[২৩৩] খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হতেই মঙ্গলগানগুলো যে সুসংবদ্ধ

কাহিনীর আকারে রচিত হয়ে সমাজে প্রচার লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ব্যাপক প্রচারের ফলে এদের ভাষার প্রাচীনত্ব অনেক ক্ষেত্রেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কোনো রচনার মধ্যেই এখন আর চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় না।[২৩৪]

মূলত মিলন অথবা বিয়ে অর্থে মঙ্গল শব্দটি দ্রাবিড় ভাষায় আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিয়ে এবং তখন হতেই বিয়ে উপলক্ষে প্রচলিত লোকসংগীতের রাগকেই প্রাচীন বাংলায় মঙ্গলরাগ বলা হতো—পরে এর অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে দেবদেবীর বিয়ে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই শব্দটি হিন্দী ভাষায় প্রচলিত আছে। অতঃপর বাংলায় দেবদেবীর মাহাত্মসূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হতে থাকে।[২৩৫]

সংগীত শাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে মঙ্গলাচার ও মঙ্গল প্রবন্ধগীতির বর্ণনা দিয়েছেন—

> 'যস্তু গদ্যেন পদ্যেন গদ্যপদ্যেন বা কৃতঃ।
> কৈশিক্যা মঙ্গলাচারঃ সনিঃসারু স্বরান্বিতঃ।'[২৩৬]

সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুবাদ করেছেন, 'যাহা গদ্যে পদ্যে বা গদ্যপদ্যের মিশ্রণে নিবদ্ধ, কৈশিকী নামক রাগে ও নিঃসারু তালে গেয়, যাহার পাদান্তে বা অর্ধান্তে স্বর প্রযোজ্য তাহার নাম মঙ্গলাচার।'

মঙ্গল প্রবন্ধগীতি সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

> 'কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ র্পদৈঃ।
> বিলম্বিত লয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দমথবা॥'[২৩৭]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ : 'মঙ্গল প্রবন্ধ কৈশিকী বা বোট্টরাগে গেয়, মাঙ্গলিক পদে নিবন্ধ ও বিলম্বিত লয়ে গেয়; অথবা ইহা মঙ্গলছন্দে নিবন্ধ।'[২৩৮] ক্রমশ এই মঙ্গল গান দেশী সঙ্গীত ধারার মধ্যে আশ্রয় লাভ করতে থাকে।

বৈদিক সাহিত্যে মঙ্গল গান ও গীতির উল্লেখ আছে :

> 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবা
> ভদ্রং পশ্যেমাক্ষ ভির্যজত্রাঃ
> স্থিরৈ রঙ্গৈস্তষ্টুবাং সস্তনুভির্ব্যশেমহি
> দেবহিতং যদায়ূঃ
> ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।'[২৩৯]

মধ্যযুগের বাংলাদেশে যে সমস্ত গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে মঙ্গলগানের ধারাই ছিল প্রধান। এই গানের সুরছন্দে কাব্যিক ধারার প্রভাব পরবর্তী যুগের বহু গানেই পড়েছে। জন্মসূত্র বিচার করলে দেখা যায় মঙ্গলগান হলো বাংলার অভিজাত সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের একটি সমন্বিত স্বরূপ। কারণ উভয় গীতধারার সংমিশ্রণেই মঙ্গলগানের সুর ছন্দ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগ থেকেই বাংলাদেশে বহু ধরনের মঙ্গলগানের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ সব গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় কীর্তন গানের ভাবভঙ্গি, সুর, স্বর বিস্তার, গায়ন পদ্ধতি, দল সংগঠন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়কেই যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে।[২৪০] মঙ্গলগানের পদ্ধতিগত বিন্যাস ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

ক) এই গান দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। দলের মধ্যে একজন থাকেন প্রধান গায়ক তাকে বলে মঙ্গলের অধিকারী, তার সহায়ক থাকে আরো কতিপয় গায়ক যাদের বলা হয় দোঁহার। মঙ্গলগানের প্রধান সহযোগী বাদ্য হলো খোল। ঠাকুর দেবতার পট বসিয়ে সংকল্প করে অনেকটা পাঁচালী ঢঙে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় দল সংগঠনের নিয়ম বা পদ্ধতিটি কীর্তনের দল সংগঠনের পদ্ধতির অনুকরণেই সৃষ্টি হয়েছে। গানের সুর চিতান পর্যায়ে গেলে খোল করতালে চৌচুনী বা বাজনার বোল বাজিয়ে গানকে জমিয়ে তোলা হয়।

খ) মঙ্গলগানের মূল পদগুলো সাধারণত কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি বা রচয়িতার দ্বারা লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু যে গানগুলোতে আবার আখর সংযোজিত হয়ে থাকে, সেগুলো ভাবপ্রধান গান হিসেবে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশিত হয়। এই আখর সংযোজন পদ্ধতি এবং সেই সুরের মাধ্যমে কথা বলা ও সুরের বিস্তারের নিয়ম সবই কীর্তনের অনুরূপ। এমনকি সব মঙ্গলগানেই প্রথমে আসর বন্দনা এবং সবশেষে আরতির রীতি বা বিধি প্রচলিত।

গ) মঙ্গলগানের বিষয়বস্তুগুলো সবই ঠাকুর দেবতার প্রসঙ্গ। এই দেবতাদের নামানুসারে তাদের লীলাপ্রসঙ্গের ধারানুসারে মঙ্গলগানের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন চৈতন্যমঙ্গল, রামমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। এই নামকরণও কীর্তনের পালা-প্রকরণের সাধারণ নিয়মানুযায়ীই তৈরি হয়েছে।

ঘ) মঙ্গল গানের মধ্যে বিভিন্ন রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ বিরহাত্মক ও মিলনাত্মক এই উভয় প্রকার রসই নায়ক-নায়িকার আশ্রয়ে নাটকীয়ভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে এবং শ্রোতারাও ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকে।

ঙ) মঙ্গলগানে সাধারণত প্রধান গায়কের হাতে থাকে চামর। এই চামর নেওয়ার রীতি লৌকিক। অনেক সময় কুলোতে নানাবিধ দ্রব্য সাজিয়ে নতুন গামছা চাপা দিয়ে সামনে রেখে মঙ্গলগান করা হয়। অর্থাৎ গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোকাচার মানা হয়ে থাকে।

চ) গানের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ লোকসঙ্গীতের সুরকেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লোকসঙ্গীতের ন্যায় জমাট বা লগ্নি ব্যবহারের চলনও মঙ্গলগানে রয়েছে।

ছ) মঙ্গলগানের মূল গায়কদের অনেকেই বাউলভাবাপন্ন বা বাউল ধারার গায়ক। তাই বাউর গানের প্রভাব মঙ্গলগানে দেখা যায়।

জ) মঙ্গলকাব্যগুলোতে গীতিরূপের চেয়ে বাদ্যযন্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। যেমন–সানাই, বাঁশী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা, রবার, দোতারা, সেতার, ডম্ফ, খমক প্রভৃতি। ডম্ফ বা ডফ্ (ডুবকী) বাংলার বিশেষ প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। তাছাড়া বাঁশি, সেতার, দোতারা, মন্দিরা প্রভৃতির ব্যবহার বাংলা সঙ্গীতে এখনো সঙ্গত হয়ে থাকে, আর দোতারা যন্ত্রটি আমাদের লোকায়ত সঙ্গীতে সমাধিক প্রচলিত।

ঝ) মঙ্গলকাব্যে দেব দেবীর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে ভণিতা ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো সময় এরমধ্যে কবির আত্মনিবেদনের ভাবটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমন–

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।

শ্রীকবিকঙ্কন গায় মধুর সংগীত।

মুকুন্দরাম।[২৪১]

মঙ্গলগানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বঙ্গদেশে মৌলিক পর্যায়ের বহু ধরনের মঙ্গলগান সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো হলো চৈতন্যমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল– পরবর্তীকালে শীতলামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ইত্যাদি। এদের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গলের গানের রূপটি প্রাচীনতম। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সঙ্গীত সাহিত্য হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এগুলোকে লোচনের ধামালী পদ বলাই বিধেয়। লোচনের ধামালী পদের উদাহরণ :

'বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা বিনোদ গলে দোলে।

কোন বিনোদিনী গাঁথিলে মালা বিনোদ বিনোদ ফুলে॥

–চৈতন্যমঙ্গল[২৪২]

কৃষ্ণমঙ্গলের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার অংশ অবলম্বনে কতকগুলো সাঙ্গীতিক প্রকরণ আছে। এই প্রকরণগুলো গাইবার ক্ষেত্রে চৈতন্যমঙ্গলের সুর ও পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্ট পর্যায়ে দানখণ্ড, মানখণ্ড ইত্যাদি যে কয়েকটি লীলাপ্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো কৃষ্ণমঙ্গলেরই একধরনের গান ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যেগুলো কেবল সাঙ্গীতিক প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরবর্তী যুগে মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণই সাঙ্গীতিক রূপ লাভ করে।[২৪৩] মঙ্গলগানের এই সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যুগে কীর্তন ও লোকনাট্যের মধ্যে অনেকটা সেতু বন্ধনের কাজ করেছে। কারণ পরবর্তী যুগে লোকনাট্যের মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান কীর্তনাঙ্গীয় ধারায় পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। যেমন–

আমি তোমায় নিতে আসি নাই

দেখা দাও জীবন কানাই।
একদিন অক্রুরের রথে
দেখা হয়েছিল যে পথে,
সেই অবধি দেখা নাই ভাই
তোমারি সাথে।
একবার দেখা দাও হে জীবন কানাই,
জন্মের মত দেখে যাই
দেখা দাও হে জীবন কানাই।[২৪৪]

উপরোক্ত গানটি লোকসঙ্গীত পর্যায়ের গান হলেও অনেকটা কৃষ্ণমঙ্গল ধাঁচেরই গান।

চৈতন্য ভাগবতের পদগুলো মঙ্গলগান রূপে গীত হয়েছে। যেমন :

প্রভুকন গাও কিছু, কৃষ্ণের মঙ্গল
মুকুন্দ গাহেন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল।

(চৈতন্য ভাগবত ২/২৫)[২৪৫]

আবার বিয়ে অনুষ্ঠানের গানকেও মঙ্গলগান বলে উল্লেখ করা হতো। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে শিবদুর্গার বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলগানের উল্লেখ আছে :

নানা রূপ মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥[২৪৬]

বিভিন্ন জায়গার রাধামাধব মন্দির বিশেষভাবে পুরীর মন্দিরে কবি জয়দেবের পদ মঙ্গল বন্দনা গীতি হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন—

'শ্রিতকমলা কুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল কলিত কলিত বনমালহে
জয় জয় দেব হরে। ধ্রুঃ
দিনমণি মঙ্গল মণ্ডণ ভবখণ্ডন, মুনিজন মানস হংস
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রুঃ'[২৪৭]

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী, উড়িষ্যা, ভারত
চিত্র : ২০১৭ সাল

কীর্তন শেষে মঙ্গল আরতির রীতিও আছে–

‘মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোর হি জোর॥
মঙ্গল অদ্বৈত ভকতহিসঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে॥’[২৪৮]

পাঁচালী : পাঁচজন (একাধিক অর্থে) গায়েন, বায়েন ও দোঁহার মিলে গীত নৃত্য (উক্তি-প্রত্যুক্তি ও অভিনয় সহযোগে) পরিবেশিত কাহিনী।[২৪৯] কেউ কেউ বলেছেন পা-চালী, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী ও দাঁড়া কবি–এই পাঁচ ধরনের পরিবেশনের একত্র সন্নিবেশের ফলে ‘পাঁচালী’ নামকরণ। মধ্যযুগে ‘পাঞ্চালী’ পাঁচালী অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়, পাঁচালী কোনো কোনো ক্ষেত্রে পয়ার ছন্দেরও (মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গলে’)। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ‘পাঞ্চালিকা’ বা পুতুলবাজি থেকে পাঁচালীর উদ্ভব বলে মনে করেন কিন্তু অনেকেই তা স্বীকার করেন না।[২৫০]

পাঁচালী প্রধানত দু’ধরনের– ১. কৃত্য পাঁচালী বা কৃত্যমূলক পাঁচালী, ২. প্রণয় পাঁচালী বা প্রণয়মূলক পাঁচালী।[২৫১]

কৃত্য পাঁচালীর প্রধান উদাহরণ মঙ্গলকাব্যসমূহ। প্রণয় পাঁচালী রীতিতে পরিবেশিত হয় প্রণয়কথা। অষ্টাদশ শতকে বাঙলার নতুন ধরনের পাঁচালীর উদ্ভব ঘটে। এ সকল পাঁচালী বিশেষ খণ্ড পালাকাহিনী অবলম্বনে রচিত। একে 'অষ্টাংগ পাঁচালী' বলে। মধ্যযুগের পাঁচালীতে মোট তিন কি চারটি পরিবেশনমূলক শব্দ প্রায় সর্বত্র লভ্য। সেগুলো হলো–ধুয়া, পয়ার, ত্রিপদী বা নাচাড়ি, এর সঙ্গে থাকত শিকলি।[২৫২] পাঁচালী মধ্যযুগের গীতনৃত্য-নাট্যের এক দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরীতি রূপে বিবেচ্য।[২৫৩]

মধ্যযুগে প্রায় সর্বত্র পাঁচালীকার এবং গায়েন অভিন্ন ব্যক্তি। মুকুন্দরাম, আলাউল, ঘনরাম পর্যন্ত এই ধারাটা বজায় ছিল। ভারতচন্দ্রে এসে দেখা যায়, পাঁচালীর রচয়িতা ও গায়েন ভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য 'পদ্মাবতী' বা 'সিকান্দারনামা' নিছক মৌখিক রীতিতে রচিত হয়নি, কবি স্বয়ং পূর্বাহ্নে কাব্যটি লেখ্যরূপ দিয়েছেন, অতঃপর তা পরিবেশিত হয়েছে। পাঁচালীকার সচরাচর মৌখিকরীতিতে আসরে উপস্থাপনযোগ্য করে পালা রচনা করেন। এর ফলে পাঁচালীর প্রধান গুণ এর পরিবেশন যোগ্যতা, এ ধারা সর্বযুগে বিদ্যমান ছিল।[২৫৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, নতুনকালের পাঁচালীকার ও পরিবেশনকারী (যেমন, দাশরথি রায়) অভিন্ন ব্যক্তি। কাজেই ঐ সব কাহিনীর রচয়িতা যথার্থ অর্থে পালাকার। তবে শিথিল অর্থে বাংলায় কাহিনী অর্থে পালা এবং রচয়িতা পালাকার রূপে অভিহিত হয়ে থাকে।

কৃষরামদাসের 'রায়মঙ্গলের' সূচনায় আছে–

> পাঁচালী প্রবন্ধ কর মঙ্গল আমার।
> আঠার ভাটির মাঝে হইব প্রধার৷৷

এখানে 'পাঁচালী প্রবন্ধের' যৌক্তিক অর্থ পাঁচালী রীতিতে।[২৫৫]

পাঁচালী বর্ণনার দুটি পদ্ধতি :

(১) পাঁচালী পাঠ অর্থাৎ যাকে বলে কথকতা (২) পাঁচালী গান, যেখানে গানের সুরে কোথাও যন্ত্র ব্যবহার করে, কোথাও বা বিনা যন্ত্রে গাওয়া হয়ে থাকে। এই পাঁচালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মনসার পাঁচালী, ধর্মঠাকুরের পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী, রামায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি। এছাড়া বহু রচয়িতা নিজের নিজের লেখনী তথা কল্পনার ভিত্তিতে যেসব গান রচনা

করেছেন তাকেও পাঁচালী বলা হয়, যেমন—দাশরথি রায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ ওঝার পাঁচালী, নীলকণ্ঠের পাঁচালী ইত্যাদি।[২৫৬]

মূখ্য ভাষার দিক থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচীন গ্রাম্য বাংলাভাষা ব্যবহার করা হয়। পাঁচালীতে মূলত দুটি কাব্যিক ছন্দের ব্যবহার হয়। একটি হল পয়ার ছন্দ, অপরটি ত্রিপদী ছন্দ। পয়ার ছন্দ ৪/৪ বিভাজনে গাওয়া হয়। আর ত্রিপদী ৩/৩ অর্থাৎ দাদরা ছন্দে গাওয়া হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তেওড়া অর্থাৎ ৩/২/২ ছন্দেও গাওয়া হয়ে থাকে।[২৫৭]

বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন কবি বিজয় গুপ্ত। তিনি মনসা দেবী সম্পর্কে অপূর্ব ধারণা প্রচার করেন মনসামঙ্গলের সূত্রে। বেহুলা লক্ষিণন্দরের প্রণয়ঘটিত ঘটনা, মনসা দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করে মনসামঙ্গল রচিত হয়। এই পাঁচালীকে বাংলাদেশে বলা হয় রয়ানী গান। এই গান সম্প্রদায় নিয়ে গাওয়া হয়। গায়ক বা গায়িকার হাতে থাকে চামর। শ্রাবণ মাসে কোন কোন বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়ে সুরে সুর মিলিয়ে পাঁচালী পাঠ করে থাকেন। মনসা পাঁচালীতে দাসপ্যারী, কার্ফা, ঠুংরী, দাদরা, একতাল, তেওড়া, পূর্ববঙ্গীয় লোফা প্রভৃতি তালের ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলার কোনস্থানে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে। মহাদেবের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে ধর্মঠাকুরকে কল্পনা করা হয়। মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারণা আজো আছে যে এই ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে বাঘের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।[২৫৮]

পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বিষহরির পূজার প্রচলন রয়েছে। বিষহরি মনসারই আর এক নাম। বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন নামে পূজিতা যেমন—নদীয়া অঞ্চলে মনসা নামে, বাংলাদেশে রয়ানী, পুরুলিয়ায় ঝাঁপান, বর্ধমান ২৪ পরগণা অঞ্চলে বিষহরা ইত্যাদি। ঝাঁপান গানের দুটি বৈশিষ্ট অর্থাৎ একটি গানের দুটি ভাগ। একটা তেওড়া ও অপরটি দাদরা ছন্দে গীত হয়। ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতেও মনসার গানকে পাঁচালীরূপে পাঠ করার বিধি লক্ষ্য করা যায়।[২৫৯]

প্রসিদ্ধ রায়মঙ্গল কাব্য ১৩৮৬ সালে কবি কৃষ্ণরাম রচনা করেন। বাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের নির্দেশে এই কাব্য রচিত হয়। এটি দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী গানের নমুনা নিচে দেওয়া হল—

> রজনী শেষে এই দেখিলাম স্বপন/বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন
> করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।/পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণেশ্বর রায়॥[২৬০]

মালদহের আইহো গ্রামে 'সানঝা' নামে একপ্রকার গানের প্রচলন আছে। একে সানঝার পাঁচালী বলা হয়। সানঝা কথার অর্থ হল সন্ধ্যা বেলা। অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলাকেই দেবীরূপে কল্পনা করে তাঁর পূজা করা হয়। পুরো বৈশাখ মাস ধরে সানঝার পূজা ও পাঁচালী পাঠ করা হয়। সানঝা গানের উদাহরণ :

সুন্দরী সানঝায় কোন বরেক দিবেরে
তুলসী হইল আমার কালোরে
না জানে সানঝা আমার
ঝাঁট ছড়া দিতেরে
না জানে সানঝা আমার
বিছিনা পাড়িতে রে
কেমনে রইবে শ্বশুর বাড়িরে
সানঝার কমরেতে চান শোভে চরণে নুপূর
সানঝায় সাজিল রে
সানঝায় সাজিল
গোয়াল পাড়া লইয়ে
যত যে গোয়ালার মেয়ে দই জোগায়
সানঝায় সাজিল রে॥[২৬১]

উত্তরবাংলায় সোনা রায়ের গান নামে একপ্রকার গানের প্রচলন দেখা যায়। এসকল গানে মঙ্গলকাব্যের আকারে সোনা রায় ঠাকুরের জন্ম, পূজা, প্রচার এবং ঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা সোনা রায়ের পাঁচালী নামে প্রসিদ্ধ। এই পাঁচালীর দুটি ভাগ—প্রথমাংশে সোনা রায়ের জন্ম ও বাল্যলীলা এবং পরবর্তী অংশে সোনা রায়ের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার।

সোনা রায়ের পাঁচালী গানের নমুনা :

যদিয়ে গোয়ালের নারী মুই এনাম পাকিরাও
ধর্মক সহয়করি পুত্রবর নেঞে।
মুঞি যদি গোয়ালের নারী এনাম পাবাঞো
ধর্ম আরতিয়া মুঞি পুত্র বর নেঞে।[২৬২]

শুভচুনী পাঁচালীতে দেখা যায় পীরের মতো চেহারা ও পোশাক গায়ে দিয়ে কোন কোন ব্যক্তি কাঁধে বাঁশের ঝোলায় ভাত নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। বাঁশের ঝোলার সামনের দিকে ঝোলানো থাকে তেলের টিনের বাক্স, তার মধ্যে বসানো থাকে শুভচুনী দেবীমূর্তি, এই দেবীমূর্তিকে অনেকে চণ্ডী

মূর্তিও বলে থাকেন। এই মূর্তি নিয়ে পাঁচালী গান করতে করতে বাড়ি বাড়ি ভক্তরা ভিক্ষা করে বেড়ায়।

ভাদু গানকেও অনেকে পাঁচালীর অংশবিশেষ বলে মনে করেন। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে পরিবারের প্রধানত কুমারী কন্যারা একত্রিত হয়ে ভাদুপূজা বা মাহাত্ম্য বন্দনা করে। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ভাদুপূজার প্রচলন রয়েছে। ভাদুগানের উদাহরণ :

> 'আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে/খিদে লাগলে খাবে কি
> আনো ভাদু গায়ের গামছা/মিঠাই সন্দেশ বেঁধে দি॥
> মিঠাই সন্দেশ খেয়ে ভাদু/গরম জল আর খেয়ো না
> সোজা রাস্তায় চলে যাবে/কারো পানে চেয়ো না॥'[২৬৩]

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল কাব্যই পাঁচালী ঢঙে গীত হত। অর্থাৎ এই গান মন্দিরা বাজিয়ে চামর সহযোগে আসরে পরিবেশিত হত। আর গায়কের পায়ে থাকত ঘুঙ্গুর।[২৬৪] কবি কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালী ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালির কাছে আদরণীয় হয়ে আছে। দাশরথি রায় (১৮০২-১৮৫৭ মতান্তরে ১৮০৬-১৮৫৫) পাঁচালীকে এক নতুন রূপ দান করেন। তাঁর গানের বিষয়বস্তু যদিও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক তবুও পরিবেশনের মধ্যে ছিল অভিনবত্ব। কারণ তাঁর রচিত পাঁচালী রাগভিত্তিক গানের আওতায় পড়ে। গানের স্টাইলও স্বতন্ত্র শ্রেণির। তিনি প্রায় ৬০টির মত পাঁচালী পালা রচনা করেন।[২৬৫]

দাশরথী রায়ের পাঁচালী গানের নমুনা–

> গিরি গণেশ আমার শুভকারী
> আমি পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
> যাও হে গিরিরাজ আনিতে গৌরী॥[২৬৬]

২.৩ শাক্তপদাবলী

শক্তিদেবী শ্যামা ও উমাকে নিয়ে রচিত পদ বা গান শাক্তগীতি বা শাক্তপদাবলী রূপে অভিহিত হয়। সতের (১৭০০ সালে) শতাব্দীতে বাঙালি মানস চেতনায় বৈষ্ণব-ভাবপ্লাবন অনেকটা মন্দীভূত হয়ে এলো এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রভাব ছেড়ে মাতৃশক্তি উপাসনা প্রাধান্য লাভ করলো।

রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে দেশে যখন দুর্দিন ঘনিয়ে এলো তখন প্রেম সাধনার আদর্শ ছেড়ে জনচিত্ত মাতৃশক্তি আরাধনায় শক্তির সন্ধান করলেন। বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায় সংসার বিমুখ ছিলেন কিন্তু শক্তি সাধকেরা বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মঙ্গল কাব্যে এই শক্তি পূজার প্রবণতা পূর্ব থেকেই ছিল।[২৬৭]

মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে আখ্যায়িকা কাব্যরচনার ধারাটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পরিণামে তা খণ্ড গীতিকাব্যরচনার মধ্যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যের সব বিভাগেই বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাব অব্যাহত হয়ে ওঠে। সেই যুগেই শাক্ত আখ্যানমূলক কাব্যগুলো এই খণ্ডগীতির প্রভাবের বশবর্তী হয়। যার ফলে সেই যুগে এর বিষয়বস্তুর কোন কোন অংশ নিয়ে যুগোচিৎ কতগুলো খণ্ডগীতিকবিতা রচিত হয় তাই শাক্তপদাবলী নামে পরিচিত।[২৬৮]

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, ঢাকা, বাংলাদেশ–এখানে নিয়মিত শাক্তপদাবলীর চর্চা হয়
চিত্রটি ধারণ করেছি ২২.৭.২০২০ তারিখে

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহালয়া উপলক্ষে আগমনী গান পরিবেশন করছেন পণ্ডিত শ্রী অনিল কুমার সাহা
চিত্র : ১৭.০৯.২০২০ ইং

শাক্তপদাবলী চর্চার অন্যতম স্থান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ
চিত্রটি ধারণ করেছি ১৭.১০.২০২০ তারিখে

শাক্তপদাবলীর দুইটি ধারা–

একটিতে চণ্ডী কন্যারূপিনী উমাতে, অপরটিতে মাতৃরূপণী কালিকাতে পরিণতি লাভ করেছে।[২৬৯] These songs are the cravings of the child for the love of his mother, in whom he has total faith as the 'Saviour' the approach to the Goddess is direct like a child to his mother.

These devotional songs are based on :

(a) Stories of daily chores where the simple relationship between the mother and son is depicted most affectionately, and

(b) Deep philosophical and spiritual aspects to achieve 'moksa' through the various paths of sadhana. These songs are composed in simple, informal language and are precise in nature and direct in appeal.[২৭০]

শাক্ত কাব্যের রস হল–বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত। শান্ত সাধকের কাছে তার পরমারাধ্য কোথাও মাতা কোথাও কন্যা। শাক্ত কবিতার মধ্যে ছন্দ বৈচিত্র্য নেই। অলংকার প্রাবল্য নেই এবং বাণীর পারিপাট্য নেই। এখানে আছে ভক্ত হৃদয়ের সহজ সরল আবেদন। এ যেন মুখোমুখি (সংলাপ)–দাঁড়িয়ে মায়ে-পুত্রে কথা বলা। এ জন্যে ভক্তিযুক্ত পাঠক মাত্রেই রস আস্বাদন করতে সক্ষম হন।[২৭১]

বাংলায় তন্ত্রসাধনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসাধক কবির মনে কালীমূর্তি প্রাধান্য লাভ করে। শাক্তপদাবলী নামের মধ্যেই শক্তিভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। The sakta padavalis may be divided into three broad categories, viz.

a. Agamani–Bijaya
b. Sayam sangita,
c. Kali Kirtana[২৭২]

a. Agamani-Biyaya : In Agamani-Bijaya songs, awesome Goddess Chandi is perceived as Uma, the daughter of Giriraja and menaka. A Bengali household is tied down by affectionate relationship not any among the close members of the family but relations far and near. The Agamani-Bijaya sons were set by him

in developed type of raga based music with touch of folk. These Songs were sung extensively by the kaviwalas and Bhats during the 18th and 19th century A.D. throughout Bengal starting their sessions every autumn during Durga Puja. These songs were followed by syama sangita.[২৭৩]

b. Syama Sangita : Sadhaka Ramprasad Sen is the innovator and the greatest composer of syama sangita. The beautiful concept of `Sakti' as the 'Mother' and the devotee as the child demanding and urging her to shower love and affection, is the essential thought of Sayama Sangita.[২৭৪]

c. Kali kirtana–It is part of sakta padavali and is a simple form of devotional music. It has no artificiality and is a spontaneous outburst of devotional feeling. Kali-kirtanas are sung in chorus by bhakta-mandalis (groups of devotees) led by the mul-gayen, Normally these songs are rendered after kirtana pattern.[২৭৫]

Ramprasad Sen and kamalakanta have composed many songs which bear their bhanita. Later composers however have used no special bhanitas of their own but composed under a general term– 'premik' which stood for every padakarta.[২৭৬]

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই শতাব্দী পরে বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কতকটা হ্রাস হয়েছিল। সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ও ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারীবর্গ বৈষ্ণবধর্মের নিরীহ শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন না বলেই শাক্ত আরাধনার দিকে ঝুকেছিলেন।[২৭৭]

শাক্তপদাবলী, সর্বত্রঙ্গম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন। আনুমানিক ১৭২০-১৭৮১ সালে বা ১৮০০ সালের প্রথম দিকে বা ১৭১৮ থেকে ১৭২৩ এর কোন এক সময় নৈহাটির কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৭৮] রামপ্রসাদের পাশাপাশি ভারতচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) শ্যামাসংগীত রচয়িতারূপে খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র (?-১৭৮৮), শম্ভুচন্দ্র ও নরচন্দ্র শ্যামাসংগীত রচনা করেন। রাজা নন্দকুমার রায় (১৭০৫-১৭৭৫), রাজা রামকৃষ্ণ (? ১৭৯৫), রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (? ১৮৩৯), ইংরেজ সরকার কর্তৃক মহারাজা খেতাবে ভূষিত নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৫৮), বর্ধমানের রাজা মহাতাব চাঁদ (১৮২০-১৮৭৯), কোলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮), দেওয়ান রামদুলাল

(১৭৮৫-১৮৫১) প্রমুখ রাজা ও দেওয়ান শাক্তপদ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।[২৭৯] এছাড়াও শাক্তপদাবলীতে যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে–

কবিয়াল রাম বসু (১৭৮৫-১৮২৮)

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)

রসিক রায় (১৮২০-১৮৯৩)

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মীর্জা) (১৭৫০-১৮২০)

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩)

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪)[২৮০]

রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো ১৮২৮ সালে। তারই দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মসংগীত রচিত ও গীত হবার ধারা প্রবর্তিত হলে শাক্তপদ রচনার প্রবাহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই সংগীতধারা উৎকর্ষের এক মহান স্তরে উন্নীত হয়। ফলে পৌত্তলিকতাশ্রয়ী শাক্তপদের গৌরব অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। তবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬ সাল–১৮৮৬ সাল) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ সাল–১৯০২ সাল) এর প্রভাবে শ্যামাসাধনায় উৎসাহের পুনরুজ্জীবন ঘটলে তা শ্যামাসংগীতের প্রবাহেও নতুন বেগ সঞ্চার করে। শাক্তপদে এই নবসৃষ্ট প্রেরণার বিশিষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৯-১৯১২) গানে। বাংলা ভক্তিসংগীতে ব্রাহ্ম প্রভাবকে খর্ব করার ব্যাপারে সবচেয়ে কষ্টকর ভূমিকা পালন করে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এ ধারায় রচিত তাঁর শত শত গানের মধ্যে শ্যামাসংগীতই বিশেষ ভূমিকা রাখে। একালের রচিত শ্যামাসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপটি নজরুলের রচনায়ই পাওয়া যায়।[২৮১]

রামপ্রসাদ সেন নীচের এই আগমনী গানটিতে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন উমা জননী মেনকার চরিত্র চিত্রণে–

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না
বলে বলুক লোকে মন্দ
কারো কথা শুনবো না॥

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।[২৮২]

সহজ ও ব্যঞ্জনাময় প্রসাদী সুর এবং মাতৃভাববিগলিত পদ, এ দুয়ের সর্বগ্রাহী সম্মিলন সাধনের ভেতর দিয়ে রামপ্রসাদ বাংলা গানের ইতিহাসে নিজের জন্য এক উজ্জ্বল আসন রচনা করতে সমর্থ হন।

কিছু গানের ভেতর দিয়ে রামপ্রসাদ আজো পর্যন্ত বিপুলভাবে জনপ্রিয়। এমন কিছু গান আছে যেগুলো রামপ্রসাদের নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্রই স্মৃতিতে চলে আসে। তেমন গীতিমালা থেকে একটি গান উদ্ধৃত করা হল–

প্রসাদী সুর। একতাল (ঈষৎ দ্রুতলয়)
মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা॥[২৮৩]

রামপ্রসাদ সেনের অধিক প্রচলিত কিছু গান–

আমায় দাও মা তহবিলদারী/আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী, ডুব দেরে মন কালী বলে/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে, মা আমায় ঘুরাবি কত/কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত, বল মা আমি দাঁড়াই কোথা/আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা, মন কর না সুখের আশা/যদি আভয়পদে লবে বাসা, মাগো তারা ও শঙ্করী/কোন অবিচারে আমার পরে/করলে দুঃখের ডিক্রি জারি, আমি কি দুঃখেরে ডরাই/ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই, মন ভুলনা কথার ছলে/লোকে বলে বলুক মাতাল বলে, ওরে সুরাপান করিনে আমি/সুধা খাই জয় কালী বলে, এই সংসার ধোঁকার টাটী/ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি, মা হওয়া কি মুখের কথা/যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা, বসন পর বসন পর মাগো বসন পর তুমি/চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি, কাজ কি সামান্য ধনে/ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে, মায়ের এমনি বিচার বটে/যেজন দিবা নিশি দুর্গা বলে/তার কপালে বিপদ ঘটে, জগতজননী আমায় তরাও গো মা তারা/জগতকে তরালে আমাকে ডুবালে/আমি কি জগত ছাড়া গো তারা, প্রভৃতি গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[২৮৪]

২.৪ কবিগান–

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে এক ধরনের ছড়া-গীত ঢোল ও কাঁসি সহযোগে গাওয়া হতো। এই ছড়া-গীতির প্রাচীন নাম 'আর্যাতর্যা'। সাধারণ শিব বা ধর্মঠাকুরের গাজন উপলক্ষে এগুলো গাওয়া হতো। আসলে ছড়াকাটাকাটির এই সাহিত্যযুদ্ধকে বলা হতো 'দাঁড়াকবি'। পরে এইগুলোই পল্লবিত হয়ে কবিগানে পরিণত হলো। দু-দলের উতোর-চাপান বিশিষ্ট তাৎক্ষণিক আসরকেন্দ্রিক গানকে বলা হয় কবিগান। পক্ষ-প্রতিপক্ষ কবিগানের নাটকীয়তর উৎস।[২৮৫] মৌখিক রীতিতে পরিবেশিত কবির লড়াই লীলা, যাত্রাপালার পৌরাণিক ও লোকপুরাণ কেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে স্ব স্ব দোঁহার দল কর্তৃক দু'জন গায়েনের তর্কযুদ্ধ। আঠার শতকের আগে থেকে কবি গানের উৎপত্তি, কারো কারো মতে মুর্শিদকুলি খানের আমলেও কবি গানের অস্তিত্ব ছিল। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে পাঁচালী গানের মধ্যেই তর্জা, আর্যা প্রভৃতি সংযোজিত হতো। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে তর্জা আছে।[২৮৬]

কবিগানের বিকাশ কাল ১৭৬০ সাল-১৮৩০ সালের মধ্যে। কোলকাতা শহরের পত্তন এবং এই শহরকে কেন্দ্র করেই কবিগানের বিকাশ ঘটে। রাজসভার অবসানে কবিগান-সর্বসাধারণের জনসভায় আনন্দবর্ধনের দায়িত্ব নিয়েছিল। প্রাচীন কবিগান চতুরঙ্গ পর্যায়ে বিভক্ত : ক) বন্দনা খ) সখী সংবাদ গ) বিরহ ঘ) খেউড়। কবিগানের প্রধান উপজীব্য হলো : রাধাকৃষ্ণ প্রেম, উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত। গোঁজলা গুই, কেষ্টামুচি, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি রচনার বাগ্‌বৈভবে ও বিষয়বস্তু গৌরবে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। যেমন :

'সাহেব তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
তোর পাদ্রী সাহেব শুনতে পেলে,
গালে দেবে চুনকালি॥[২৮৭]

এন্টনির এই গানটি সেকালে সকলের মুখে মুখে শোনা যেত :

'কৃষ্টে আর খৃষ্টে কিছু তফাৎ নাইরে ভাই,
শুধু নামের ফেরে জগৎ ফেরে এমনকথা শুনি নাই'।[২৮৮]

কবিগান সন্ধিযুগের গান। বাংলা কাব্য-মুক্তির প্রথম কাকলি এই গানে শ্রুত হয়েছিল।[২৮৯] ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় কবিগানের কালবিভাগ করেছেন এভাবে–

প্রথম পর্ব–আঠার শতকের পূর্ব যুগ।

দ্বিতীয় পর্ব–আঠার শতকের গোড়ার থেকে ভারতচন্দ্র বা তাঁর কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব–আঠার শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত।

চতুর্থ পর্ব–উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ।

উপসংহার পর্ব–বিশ শতকের গোড়ার দিক।[২৯০]

বাংলাদেশের কবিগানে নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয়–

ঢোল, হারমনিয়াম, কাঁসা, বেহালা, বাঁশের বাঁশি, দোতারা, জুড়ি, মন্দিরা, করতাল, সারিন্দা ইত্যাদি। কবিগানের পরিবেশক সচরাচর চারজন দোঁহার, একজন সদর দোঁহার (প্রধান দোঁহার) ও কবিয়াল।[২৯১]

সত্যপীর-মাহাত্মকথা ষোলশতক থেকেই রচিত ও গীত হতে থাকে। শেখ ফয়জুল্লার 'সত্যপীর বিজয়' কঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' এবং কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। সত্যপীরের হিন্দুভক্ত রাজা দক্ষিণ রায় এবং মুসলিম ভক্ত বড় খাঁ গাজী সত্যপীরের তত্ত্বপ্রভাবে অনেক লৌকিক দেবতা বা কাল্পনিক পীর কাহিনীও রচিত হয়েছে। যেমন–বনবিবি, বনদেবী, শীতলা, ওলা, দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, ষষ্ঠী দেবী, কালু গাজী, কানু রায় প্রভৃতি পীরনারায়ণ সত্যকে কেন্দ্র করে সাধারণ ও দুঃস্থ হিন্দু মুসলমানদের এক মিলন-ময়দান তৈরি হচ্ছিল–

> 'হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর।
> দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির॥[২৯২]

২.৫ বাউল

বাউল সাধকদের ধর্মই হচ্ছে তাঁর গান। যা কিছু জ্ঞাতব্য, গুঢ়তত্ত্ব তা গানের মাধ্যমেই প্রকাশিত। গানের মাধ্যমেই এরা 'মনের মানুষ' বা 'আলেক সাঁই' (অলক্ষ্য স্বামী) কে খুঁজে বেড়ান নক্ষত্র খচিত আকাশে, পুষ্পশোভিত বনভূমিতে, আপন বাহির, মিলন-বিরহের মাঝে। মানব অন্তরে যে পরম সুন্দর অবস্থান করেছেন তিনি অধরা- (অধরচাঁদ) ধরা দিয়েও ধরা দেন না- সেই অধরাকে ধরার সন্ধানে রত বাউলকবি। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর মনের মানুষকে অন্বেষণ করেছেন গানে–'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে।'[২৯৩]

বাংলায় বাউল শব্দটি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কারো মতে, বায়ু শব্দের সাথে আছে এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করে বাউল শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ইস্টের জন্যে 'ব্যাকুল' এই অর্থে

ব্যাকুল থেকে বাউল শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কারো মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে বাউল শব্দটি বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। বস্তুতঃ বাউলরা ভাবের পাগল, রসের সাধক।[২৯৪] এই অর্থে 'বাউরা' (অর্থ পাগল) কথাটির সঙ্গে ধ্বনি ও ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। এই 'বাউরা' শব্দটিও বাউল বা বাতুলের অপভ্রংশ। বাউল শব্দের সমার্থবোধক অপর একটি শব্দ 'আউল'। বর্তমানে বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত এক শ্রেণির মুসলমান সাধকদের (সুফীধর্ম প্রভাবিত) 'আউল' বা আউলিয়া বলে অভিহিত করা হয়। 'আউল' শব্দটিও সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'আকুল' থেকে এসেছে। 'আকুল' শব্দটি আবেদ–চঞ্চল, আলু থালু, বেসামাল, অস্বাভাবিক মনোভাব সম্পন্ন প্রভৃতি ভাবের দ্যোতনা করে এবং এক রকম 'বাতুল (বাউল) এরই সমার্থবোধক।[২৯৫]

The Baul faith took definite shape around 1625 A.D. and the compositions of Baul songs started from around 1650 reaching its zenith and culmination during the early 20th century A.D. around 1925.[২৯৬]

'The Baul Faith was the outcome of a mixed faith having its source from tantrism of the ancient vartyas and borrowing ideas from the saiva, Bauddha, Jaina Sahaja, Vaisnava and Sufi faiths through the ages, to emerge as an independent maulika-loka–dharma, i.e. fundamental/ radical popular–religion, follwing its very own principles.'[২৯৭]

সতের শতকের দ্বিতীয় পাদ (১৬৫০ সালে) থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মাধব বিবি ও আউল চাঁদই এই মতের প্রবর্তক বলে সুধীজনের ধারণা। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ। লালন পরবর্তী গগন, দুদ্দুশা, পাগলা কানাই, রাধা রমন, মদন শা'নূর, সাহাবুদ্দীন, হাসনরাজা প্রভৃতি অসংখ্য মরমিয়া সাধকদের মধ্যদিয়ে বাংলার লোকায়ত এই অকৃত্রিম মানস সম্পদ নানা তরঙ্গ ভঙ্গে বয়ে চলেছে।[২৯৮]

বাংলার প্রাত্যহিক জীবনধারা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত-বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রাচীন চর্যাগীতিতে যেমন এর নিদর্শন লক্ষ্য করেছি, তেমনি ব্রতোৎসব ছড়ার আকারে সহজ সরল গান ও ছন্দায়িত নৃত্য, ঝুমুর গান, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, জারি, সারি, বাউল গানে বাংলার স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে।[২৯৯]

বৌদ্ধ সহজিয়া নাথগীতিকা, মধ্যযুগীয়, সুফী ধর্মীয় প্রভাব, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্ম এবং লোকায়ত সংস্কৃতির সম্মিলনে পরবর্তীকালে বাউল ধর্ম তথা বাউল গান এক সার্বজনীন দর্শন রূপে বিশ্বমানবতার প্রতিকী হয়ে উঠেছে। এই গানেই শুনা গেছে মানবতার চরম বাণী–

> ‘নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
> জগত ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত’।[৩০০]

বাউলে-দর্শন-ধর্ম সাধনার বাণী আছে। বাউল সাধনার আশ্রয় সংগীত। বাউলদের সাধনা সহজ পথের সন্ধান। সংগীতের মাধ্যমেই তারা সেই পথের সন্ধানে লিপ্ত। তান্ত্রিক বাউলদের কর্মকাণ্ড দেহকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।[৩০১]

বাউলকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন–তান্ত্রিক বাউল, সাধক বাউল, কবি বাউল, কর্তাভজা বাউল, বৈষ্ণব বাউল, গৌর বাউল ইত্যাদি। বাউল দর্শন প্রতিষ্ঠা মূলতঃ গুরুবাদ, সহজিয়াবাদ ও শূন্যবাদের উপর। অঞ্চলভেদে বাউল গানের সুর ও গায়কীর পার্থক্য দেখা যায়। বাউলগানের আবেদন অর্ন্তভেদী। সাধনার তৃপ্তি যেন বাউল সুরে প্রকাশিত। লালন শাহ্‌ ও হাসনরাজার বাউলগান সর্বযুগের আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠগান। বাউল গানের মধ্য দিয়েই তাঁরা চির অমর হয়ে থাকবেন। সর্ব ধর্মের সম্মেলনে মানব ধর্ম পর্যবসিত হয়েছে।[৩০২]

২.৬ যাত্রাগান

সাধারণ অর্থে গমন, কোথাও যাওয়া, দূর অতীতে তিথি বা নক্ষত্রযোগে গমন অর্থে শোভযাত্রা। নাট্য অর্থে অষ্টাদশ শতকে যাত্রা কথাটি যুক্ত হতে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যাত্রা বাঙলা নাট্য ধারায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙলায় নাট্য অর্থে কোথাও যাত্রা প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। আসামে শঙ্করদেব রচিত নাটকগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ‘কালিয়দমন’ নাটকে যাত্রা কথাটির উল্লেখ দেখা যায় (কৃষ্ণস্য কালিয়দমনযাত্রা), কিন্তু তা কালিয় সর্প দমনের নিমিত্ত কৃষ্ণের একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন অর্থে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙলায় চরিত্রভিত্তিক লীলানাট্যের অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কাজেই লীলানাট্য থেকেই যাত্রার উদ্ভব (সূত্র : মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য)। আচার্য শশীভূষণ দাশের মতে যাত্রা কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পরীতি নয়। জনরুচির স্বাভাবিক নাট্যবোধ থেকেই এর উদ্ভব এবং তা নাটকের সকল রীতির ক্ষেত্রে শিথিলভাবে ব্যবহৃত

হয়। অষ্টাদশ শতকের অন্তে এসে যাত্রা কথাটি শুধুমাত্র ‘কালিয়দমন’ পালার ক্ষেত্রেই যুক্ত হতে দেখা যায়। সেইকালে ক্রমে ক্রমে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, প্রভৃতি নাট্যযাত্রা রূপে অভিহিত হতে থাকে।[৩০৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে যাত্রা বিশিষ্ট শিল্পরীতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এদেশে প্রধানত মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও যশোর অঞ্চলে যাত্রার দলগুলো এখনও সক্রিয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চারণ কবি মুকুন্দদাস গীতি প্রধান যাত্রার প্রচলন করেন। দেশাত্মবোধক যাত্রা নাটকের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় জনগণকে বিপুলভাবে উদ্দীপ্ত করেন।[৩০৪]

‘কৃষ্ণপ্রসঙ্গ’ অভিনয়কে কেউ লীলানাট্য মনে করেন, কেউ যাত্রা মনে করেন। একাদশ শতাব্দী থেকে রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব হয়। এই রাধা-কৃষ্ণলীলাই জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দে’ রূপায়িত হয়ে কাব্য সংগীত অভিনয়গুণ ধারণ করে। ‘The well known sanskrit Idyll called Gitagobinda, by Jayadeva Goswami, Which, as has been well observed, is nothing but a yatra in Sanskrit is based on a part of the story, in as much as it depicts only the amours of krishna with Radha in their various phases without referring to the other two periods of his life.’[৩০৫]

অনেক বাঙালি পণ্ডিত মনে করেন, অপভ্রংশ ভাষার খোলস ছেড়ে যখন নতুন বাংলার সৃষ্টি হয়েছিল, তখনই যাত্রাগানের উদ্ভব হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়–

> The break up of the old orthodox drama was almost synchronous with the rise of Apabhramasa and modern Indian Literature; and along with it came popular entertainments of the type of semi-religious Jatra.[৩০৬]

জয়দেবের গীতগোবিন্দকে ডক্টর আহমদ শরীফ ‘একটি নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্য’ আখ্যা দিয়েছেন। সুকুমার সেন গীতগোবিন্দকে ‘পালাগান’ বলেছেন এবং একে যাত্রাগানের আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী এতে নাচতেন বলে জানিয়েছেন।[৩০৭] সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা এবি কিথ গীতগোবিন্দের মধ্যে যাত্রার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। প্রবোধবন্ধু অধিকারী লিখেছেন, ‘জয়দেব ছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি। তাঁর অভিনয়-পদ্ধতিকে ‘নাটগীতি’ ও ‘যাত্রা-নাট’ এই আখ্যাতেই ভূষিত করা হয়েছে। এসকল বিবেচনায় প্রবোধবন্ধু যাত্রাকে আটশো বছর আগের অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। ফোকলোরবিদ আশরাফ সিদ্দিকীও যাত্রার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন দ্বাদশ শতাব্দীতে। তিনি বলেছেন, ‘কবি জয়দেবের

গীতগোবিন্দ এবং পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যাত্রার নিদর্শনটি পাওয়া যায়।'[৩০৮] কবি চণ্ডীদাস নিজে যাত্রা করতেন। কথিত আছে যে যাত্রা করার সময় মণ্ডপ ভেঙে তার তলায় চাপা পড়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনও শাখারই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। 'গীতগোবিন্দ'র অনুকরণে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অনেক অভিনয়যোগ্য উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সন্ধানী গবেষক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাত্রার উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাই। তিনি একে লোকনাট্যের আদি-অবস্থা বলতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়–

> বেশধারী যাত্রাচরিত্রের ঈষৎ পূর্বাভাস শ্রীকৃষ্ণলকীর্তনে মিলবে; এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নৃত্য গীতাত্মক লোকনাট্যের পূর্বরূপ ফুটে উঠেছিল এরকম অনুমান নিতান্ত অসম্ভব নয়। পরে যে সমস্ত কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হত, তাতে এ-ধরনের লোকনাট্য পালাই অনুসৃত হয়েছে।[৩০৯] (কৃষ্ণযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে)।

মধ্য-পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) ব্যাপক অবদান রয়েছে।[৩১০] তিনি নিজে যাত্রাভিনয় করেছেন বলে তাঁর জীবনীপাঠে জানা যায়। কেউ কেউ একে যাত্রা না বলে নাটগীত বা লীলানাট্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের গীত, অভিনয়, আর নৃত্যের সমন্বিত পরিবেশনা 'গীতাভিনয়' কিংবা প্রকৃত অর্থে 'যাত্রা'রই নামান্তর। নবদ্বীপে চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের ' চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নাটকে। এই কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের সময়কে ১৫০৯ সাল অথবা ১৫৩৯ সাল অনুমান করা হয়।[৩১১] এই অভিনয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে পরিশিষ্ট-১-এ। ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রথম অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল আসামের শঙ্করদেবের 'অঙ্কীয়া নাটে'। নাট্যগবেষক মনীন্দ্রলাল কুণ্ড জানিয়েছেন–

> ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দের পর চিত্রপট অঙ্কন করে শঙ্করদেব নাচগান সহযোগে যে 'ভাওনা' করেছিলেন তার নাম ছিল 'চিহ্নযাত্রা'। এ থেকে মনে হয়, 'যাত্রা' শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই পূর্বাঞ্চলে নাটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩১২] শঙ্করদেব অবশ্য নাট, নাটক ও যাত্রার মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেননি। তবু যাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁর পালাগুলো বঞ্চিত ছিল না।

ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির অন্যতম বাহন 'যাত্রাগান'-এর উন্মেষ। দেব-বন্দনার অংশ হিসেবে গীতবাদ্য-অভিনয়ের উপস্থাপনা যাত্রাগান নামে পরিচিত হলেও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেছেন যে, পাঁচালীগানের ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি হয়েছে।[৩১৩] ডক্টর সুকুমার সেন যাত্রার উদ্ভবের কোনও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেননি তবে এর পূর্বরূপ হিসেবে পাঁচালীকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

> পাঁচালী হতেই যাত্রার উদ্ভব। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়েন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রায় একাধিক, সাধারণত তিনটি।[৩১৪]

যাত্রার এখন আর তিনিটি চরিত্র নেই, বিশ-বাইশটি চরিত্রও অভিনয় করে। অর্থাৎ তিনি যে যাত্রার কথা বলেছেন তা মূলত নৃত্যগীতাভিনয়। রামলীলা কিংবা কৃষ্ণলীলা পরিবেশনের জন্যে এই ধরনের নৃত্যগীতাভিনয় আঙ্গিক ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে যা রামযাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা হিসেবে পরিগণিত হয়।

নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-১৯৯৯) যথার্থই বলেছেন, 'বঙ্গসংস্কৃতির ঊষালগ্নে এ-যাত্রা শুরু হলেও আজো পর্যন্ত এর সঠিক তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে এ-অধ্যায় দুঃখজনকভাবে উপেক্ষিত'।[৩১৫] এরকম ধারণা নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখেরও (জ ১৯২৫)। তিনি বলেছেন–

> যাত্রাগান পরিবর্তনশীল লোকনাট্যের নানারূপেরই একটি রূপ। কিন্তু এ সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই। কারো কারো মতে খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকেই ভারতে নাকি কৃষ্ণ-বিষয় নিয়ে যাত্রা রচিত হত। তারই ধারা জয়দেবের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলায় এসে পড়ে। বাংলাদেশের পাঁচালীগান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি, একথাও কেউ কেউ বলেন। তাঁদের মতে এর আগে যাত্রার অস্তিত্ব ছিল না। দুটি মত যে খুবই ভিন্ন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইসব বিভিন্নতার কারণ, বিচার-বিশ্লেষণোপযোগী প্রচুর তথ্যের অভাব। অপ্রচুর তথ্যভিত্তিক আলোচনার ফাঁক অগত্যা ধারণা দিয়েই ভরে নিতে হয়।[৩১৬]

যাত্রা গানের মধ্যেও সুসাহিত্যের উপাদান ও অভিজাত সংগীতের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণযাত্রা থেকে আরম্ভ করে সবরকম যাত্রা গানই একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছিল এবং জনচিত্তেও তা সমাদৃত হয়েছিল। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা পালার প্রচলন রয়েছে। সবই এখন গদ্য সংলাপময় যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে, লোকায়ত রচনায় পালারীতির প্রচলন সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায়'।[৩১৭]

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'ময়মনসিংহ গীতিকা' লোকসাহিত্য তথা–বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্টসম্পদ। বাস্তবতায়, মানসিকতায় ও জীবন চেতনায় এগুলো অসাধারণ। এতে ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ মেলে গাথাগুলোতে। এই গীতিকাগুলোর রচনাকালের পরিধি ষোল থেকে আঠারো শতক অবধি বিস্তৃত।[৩১৮]

২.৭ নিধুবাবুর টপ্পা

কবিগানের সমসাময়িককালে কোলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ-রাগিনীসংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল। হিন্দি টপ্পাগান এর আদর্শ। বাংলা টপ্পাগানের জনক ছিলেন নিধু বাবু বা রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)।[৩১৯]Tappa came in to Bengal around the end of 18th century A.D. The pioneer from Bengal in this style was Kali Airza/Kalidas Chattopadhyay (1750-1826), although the credit for popularising Tappa in Bengal is attributed to Nidhubabu or Ramnidhi Gupta (1741-1839).[৩২০]

The other fact is that when Nidhubabu went to chapra, he received his talim in Hindusthani Sastriya–Sangita from 'one ustad'. This ustad perhaps could not have been a tappa maestro from shori Miya's khandan, because Nidhubabu was in chapra from 1776-1794 A.D. and shori Miya flourished in the court of Nawab Suja-ud-Daula of Lucknow, who ruled between 1753-1775.'[৩২১]

নিধুবাবুর নাম এক সময় বাঙালি সঙ্গীত-রসিক-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা।[৩২২]'Nidhubabu's songs famous as 'Nidhubabur tappa' were most suitable for expressing pathos of love songs and his style brought in a real change in Bengal's music style, which lasted for a whole century.'[৩২৩]

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) হুগলি জেলার চাঁপতা গ্রামে মামা রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত।[৩২৪] এঁদের বাসস্থান ছিল কোলকাতা শহরের কুমারটুলি অঞ্চলে। বর্গীর আক্রমণের আশঙ্কায় হরিনারায়ণ কোলকাতা ছেড়ে চাঁপতায় আশ্রয় নিলে সেখানে নিধুবাবুর জন্ম হয়। নিধুবাবু বাংলা, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এক মিশনারী সাহেবের

অধীনে তার ইংরেজি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রামনিধি গুপ্ত ছিলেন প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অন্যতম।[৩২৫] তাঁর বয়স যখন ১৫ বছর তখন পলাশীর যুদ্ধ হয়। তারও দেড় যুগ পরে ১৭৭৫ সালে ইংরেজদের নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তার বছর খানেক পরেই ১৭৭৬ সালে কালেক্টরেটে কেরানির চাকরি নিয়ে নিধুবাবু কোলকাতা থেকে বিহারের ছাপরা চলে যান। সেই *চাকরী সূত্রেই* তিনি ১৮ বছর ছাপারায় বসবাস করেন।[৩২৬]

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় রাগ সংগীত চর্চার ব্যাপক প্রসারের সূচনা লগ্নে টপ্পারও প্রচলন শুরু হয়। বাংলায় সেই টপ্পারীতির প্রধান প্রচলন কর্তা রামনিধি গুপ্ত যিনি নিধুবাবু নামে সমাধিক পরিচিত। বিরহ-মিলনকে কেন্দ্র করে নিধুবাবু যে গান রচনা করতেন তাকে সব সময় টপ্পা বলা হতো না, প্রনয় গীতিও বলা হতো। মানবীয় প্রেমের বিরহ মিলন কথা নিধুবাবুর গানে ফুটে উঠেছে।[৩২৭]

ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার মধ্যে বাংলা ভাষায় করা গানগুলো বিশেষভাবে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে সেই সময়ে। বাংলা ভাষার প্রতি নিধুবাবুর সুগভীর শ্রদ্ধাও ছিল, তাঁর গানে এর পরিচয় পাওয়া যায়–

তিলক কামোদ/তেতালা
নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাকতীর ধারাজল
বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?[৩২৮]

১৭৭৬ সালে চাকুরী সূত্রে বিহারে ছাপরা শহরে বসবাসকালে নিধুবাবু রাগ সংগীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমা টপ্পা আয়ত্ব করেন। তার মধ্যে গোলাম নবী বা শোরি মিঞার টপ্পা প্রধান।[৩২৯]

অনেকের ধারণা যে, টপ্পা ছিল পাঞ্জাবের লোকসংগীত। আঠারো শতকের প্রথম দিকে পাঞ্জাবের 'ঝাঙ্গা' জেলার গায়ক গোলাম নবী (মতান্তরে শোরি মিঞা)। সে অঞ্চলের উট চালকদের গানের মধ্যে কারুকাজ দিয়ে উত্তর ভারতীয় রাগগুলোর কাঠামো নিয়ে 'টপ্পা' গীত পদ্ধতির সৃষ্টি করেন।[৩৩০]

শোরির টপ্পা রাগ, তাল ও ছক বা সাঙ্গীতিক আদর্শ ও আঙ্গিক অনুসরণে নিধুবাবু বাংলা টপ্পা রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গানের সাথে তুলনা করা যায়–

শোরির টপ্পা (সিন্ধু খাম্বাজ)

পশ্চিমী টপ্পা (হিন্দুস্থানী)

ও মিঞা বে জানে ওয়ালে (তানু)

আল্লা কি কসম কিরিয়া নয়নুওয়ালে।[৩৩১]

নিধুবাবুর টপ্পা–

কি যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে,

পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।[৩৩২]

পশ্চিমী টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পার তুলনা :

শোরি মিঞার টপ্পা–
দেখোরি এক বালা যোগী, মেরে
দুয়ার মে খাড়া হায়।
নিধুবাবুর টপ্পা–
তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ
এই মহী মণ্ডলে।[৩৩৩]

নিধুবাবু তাঁর প্রায় ছয়শত টপ্পা গানে ১০৬টি রাগ ব্যবহার করেছিলেন। এ থেকে রাগ সংগীতে তাঁর প্রগাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৩৪] নিধুবাবুর টপ্পায় দ্রুত তালের আধিক্য নেই, পশ্চিমী টপ্পায় তালের কাজটা খুব দ্রুত। কিন্তু নিধুবাবু এই তালে একেকটি সুরের উপর একটা আন্দোলনের ভাব সংযোজন করলেন। যাতে করে টপ্পার করুণ রসটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নিধুবাবুর পরে টপ্পা রচনায় যাঁরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে শ্রীধর কথক, কালীদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জা, রঘুনাথ রায় ও বিষ্ণুপুরের রাম শংকর ভট্টাচার্য্য অন্যতম।[৩৩৫]

বাংলা সংগীতের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের মিলন অর্থাৎ কাব্যধর্মিতা বাংলা টপ্পায় সে আস্বাদ পাওয়া যায়। টপ্পার মধ্যে প্রাচীন রীতির সঙ্গে নবীন রীতির একটা সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। টপ্পার এই বিরাট প্রভাব (নবীন গীতিরীতি ধারা) পরবর্তী যুগেও চলে এসেছে এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, অতুল প্রসাদের রচনায় টপ্পার স্পর্শ বিজড়িত হয়ে আছে। নজরুলের দু-একটি গানেও টপ্পার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন– 'যাহা কিছু মম'–যৎতালে গানটি জ্ঞান গোস্বামীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত আছে।[৩৩৬] রবীন্দ্রনাথের গীত রচনায় একটি পর্যায়ে নিধুবাবুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিধুবাবুর রচনা–

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল

ফুকারি কাঁদিতে নারী বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।[৩৩৭]

রবীন্দ্রনাথের রচনায়—

ক্ষমা করো মোরে সখি, শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।[৩৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক গীত কবিদের রচিত গানের পর 'টপ্পারীতির' বাংলা গানের প্রবাহ বিলম্বিত এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তা ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছে। আগামীতে বাংলা গানে টপ্পার প্রচলন বা প্রতিফলন কেমন হবে কে জানে। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের গানেই বাংলা টপ্পার রসাস্বাদন করবে বাঙালি চিত্ত। টপ্পা গানে ভাবের মাধুর্য, ভাষার শুদ্ধতা, গীতরীতির গাম্ভীর্য ও ছন্দের বৈচিত্র প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। মানবীয় প্রেম, বিরহ, মিলন, উপস্থিত হয়েছে। এই গানগুলোর কথাsimple, সুর simple কিন্তু এর সহজ স্বাভাবিক সুরের ধারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মনকে গভীরভবে স্পর্শ করে। এর সুরের pathos-আকুল করে তোলে মন।[৩৩৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আধুনিক যুগ
(১৮৬০ সাল থেকে বর্তমান সাল পর্যন্ত)

আঠার শ' সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের পরিধি, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র গৌরব নিয়ে এই আধুনিক যুগের শুরু।[৩৪০] রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল এই পাঁচজন হচ্ছেন বাংলা গানের আধুনিক যুগের প্রধান পাঁচ নির্মাতা। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও রাগসংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা সংগীতেও নব নব সুর সমাবেশ লক্ষ্য করা গেল। সুরবৈচিত্র্য ও কাব্য মাধুর্যে বাংলা গান বিশিষ্টতা লাভ করলো রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯৩১), রজনীকান্ত (১৮৬৪-১৯১০) অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪), নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) মতো সংগীতকারদের সৃষ্টিশৈলীতে। এই পঞ্চগীতি কবিদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলা গানের আধুনিক ধারার সূত্রপাত।[৩৪১] এদের মধ্যে রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের রচনা অপর্যাপ্ত। তৎসত্ত্বেও সংগীতগৌরবে এঁদের অবস্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল। আর মরমী অভিধায় যদি কেউ এঁদের মধ্যে ভূষিত হন তা হলে রজনীকান্ত সেনই সর্বাগ্রে স্মরণীয় হবেন। তাঁর সরল মধুর অনুভব গভীর সুরকলার মধ্যে এমন এক গুণ আছে যাকে মরমী ছাড়া আর অন্য কোনো অভিধায় ভূষিত করলে যথার্থ হয় না।[৩৪২]

৩.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক গীতিকবিতার ধারাটির প্রবর্তন বিহারীলাল চক্রবর্তী করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হতে এই ধারাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং একমাত্র তাঁরই বিস্ময়কর প্রতিভর অনুপম স্পর্শে বাংলা গীতকবিতার একটি পূর্ণ পরিণতি ঘটে।[৩৪৩]

Rabindranath was born on 25th Baisakh, 1268 B.S. (7th May 1861) at Jorasanko. He was the fourteenth child of Maharsi Debendranath and Saradadevi. His own autobiography and biographies written by various authors give an insight into the poet's highly sensitive and creative genius. His own deep knowledge in philosophy and humanity was proverbial. To sum up the

contribution of this great personality in the sphere of music, that is as a musician and music composer, out of his manifold talents and creative faculties, needs a short biographical sketch with the main events of his life.[৩৪৪]

কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে।[৩৪৫] তাঁর গীতধর্মী প্রতিভা নাট্যমাধুর্যকে অবলম্বন করেও বহু বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে।[৩৪৬] নীহাররঞ্জন রায় গীতধর্ম ও সুরধর্মকেই রবীন্দ্রনাট্যকলার প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই মূলত গীতিধর্মী গানের প্রতিভা, কবিতার প্রতিভা, সুরের প্রতিভা। তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছেড়ে দিয়ে ছোটগল্প ও রূপক নাট্যগুলোর দিকে তাকালে একথা স্বীকার করতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়। নাটক তিনি অনেক রচনা করেছেন, কিন্তু এ কথা বলতেই হয় তাঁর প্রতিভা ঐতিহ্যগত নাটকের প্রতিভা নয়; নাটকের মধ্যে নাটকীয় ধর্ম ততটা নাই যত আছে গীতধর্ম ও সুরধর্ম।[৩৪৭]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে জগৎ ও জীবনের কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৩৪৮] কবি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক ক্লেষ যেমন অত্যধিক ছিল, জাগতিক দুঃখ ও পাপের মাত্রাও তেমনি দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে।[৩৪৯] তখন যদিও তাঁর মন বহু নিরুত্তর প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত ছিল তবু তিনি তাঁর সহজাত মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারান নি।[৩৫০] নটরাজের ধ্যান তাঁকে একপ্রকার বৈরাগ্যমাখা স্থিত প্রজ্ঞ প্রশান্তি দিয়েছিল।[৩৫১] অন্যদিকে মানুষের অপরাজেয় শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস তাঁকে তিক্ত নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করেছিল মৃত্যুদিন অবধি।[৩৫২] তাঁর সৃষ্টিসম্ভার ছিল বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। নানা রূপে, নানা রসে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।[৩৫৩]

কি কাব্যে, কি সংগীতে রবীন্দ্রনাথ অজেয়। রবীন্দ্রনাথের গান যে কেবল অপূর্ব সুরলহরী তা নয়, এক অপরূপ বাণীর ব্যঞ্জনাও বটে। রবীন্দ্র সংগীতের সুরের আকর্ষণে স্তব্ধ হতে হয়, ভাব-ভাষার ব্যঞ্জনায় আর কথার কারুকার্যে হতে হয় অভিভূত। সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাবে তাঁর আশ্চর্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষায়, নিপুন ছন্দে, চিত্রকল্পে এবং অনুভবের গভীরতায়।[৩৫৪]

'তোমার আর্শীবাদের মালা নেব আমার মাথে, আমার ললাট ঘেরি' বিষয়বস্তুতে এমন সরল অথচ গভীর সংবেদনের শিল্পরূপ, চিত্রকল্পে এমন অনায়াসস্বরূপ, এমন ভাব প্রবল ও রঙ্গের বর্ণিল সমাবেশ

বাকপ্রতিমায় এমন অনুপম লাবণ্য, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যত্র বিরল।[৩৫৫] এ ভাষা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যকারো কাব্যগীতিতে দেখা যায় কি? বিষয়বস্তুতে কোথাও ব্যক্তি সত্তার আকুলতা নেই। বৈদান্তিক অনুভূতি বেগময় হয়ে উঠেছে কবির অনুভবে। পূজার আরতিতে সর্বকালের সর্বমানবের হৃদয়াকুতি উচ্ছ্বসিত–"আমার দেহ ধুলার পরশ, তোমার সুধায় হল হরষ–হারের মাঝে আছে তোমার জয়' কত অনায়াস বাকধারায়, সহজ সুরে কবি নিত্যকালের মানবচিত্তের চিরসত্য বাণীটি প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে তার ভাববাদী দর্শনের রূপটি।[৩৫৬]

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, রবীন্দ্রনাথ মানব হৃদয়ের কবি। বিশ্বপ্রকৃতিতে দিবা-রাত্রি এবং বিচিত্র ঋতুর আবর্তন, কালের নিরন্তর নৃত্যছন্দ রবীন্দ্রনাথের গানে, কথায় ও সুরে আভাসিত হয়ে উঠেছে। মানব হৃদয়ের চির বিচিত্র পরিবর্তনমান ভাবগুলো, পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ বেদনা মিশ্রিত অপূর্ব আকুলতা এক আশ্চর্য রূপ নিয়ে তাঁর গানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে–

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী'।[৩৫৭]

বিশ্ব প্রকৃতি আর মানব প্রকৃতির এক আনন্দময় পরিপূর্ণ মহামিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সুরে ও গানে। প্রতিনিয়ত তিনি গানের ভিতর দিয়েই বিশ্বভুবন হৃদয়ে ধরে দেখেছিলেন, অন্তকর্ণে শুনেছিলেন অনাহত অশ্রুত সুর। সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিহ্বল-আত্মহারা। প্রভাতে, সন্ধ্যায়, সজনে, নির্জনে, চিত্তের সকল সৌন্দর্যপ্রীতি কবিতায় রূপ লাভ করে সুরে বেজে উঠেছে, গান হয়ে উঠেছে। সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–'প্রথম বয়সে হৃদয় ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য'। রবীন্দ্রনাথের এই ভাব আর রূপ তার গানের প্রাণ।[৩১৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :

ক. পূজা, খ. স্বদেশ, গ. প্রেম, ঘ. প্রকৃতি, ঙ. বিচিত্র, চ. আনুষ্ঠানিক।[৩৫৯]

পূজা পর্যায়ের গান–

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি॥

সংসার সুখ করেছি বরণ
তবু তুমি মম জীবনস্বামী॥
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে॥
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তবু শুভ আশিস আসিছে নামি॥[৩৬০]

তাঁর নিজের সত্তার মধ্যে উপলব্দি করছেন ঈশ্বরকে। সুর ঈশ্বরের মধ্যে, কিন্তু বাইরে তাকে সুরের মাধ্যমে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। সংসারে সবকাজের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন।[৩৬১]

স্বদেশ পর্যায়ের গান–

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও-অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়–
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥[৩৬২]

নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত করার কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। সত্য পথে একাকী হলেও কবির কাছে সেই পদটিই প্রিয়। সেখানে কেউ সাথী না হলেও কবির কোন আপত্তি নেই। আপন বুকের মাঝে সত্যের স্পন্দন জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেম পর্যায়ের গান–

কবি তাঁর প্রেম পর্যায়ের গানে মানবীয় প্রেমকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন–

ফিরবে না তা জানি, তা জানি–
আহা, তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি॥

গাঁথবে না মালা জানি মনে,
আহা, তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে
প্রাণে ঐ পরশের পিয়াস আনি॥[৩৬৩]

তাঁর প্রেমের গানে যেমন মিলনের সুর বেজেছে তেমনি বিরহ দমনে প্রেমের প্রবল আকুতি ফুটে উঠেছে। যে প্রিয়ার জন্য কবি আকুল, সে প্রিয়া ফিরবে না জেনেও তারই জন্য মন প্রাণ নিবেদন করেছেন কবি।

প্রকৃতি পর্যায়ের গান–

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে॥
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে॥[৩৬৪]

প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ঝড়েছে প্রকৃতি পর্যায়ের গানে। গ্রীষ্মে প্রকৃতি যেন মৌনি তাপস হয়ে দেখা দেয় আমাদের মাঝে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, গানের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক এমন আর কিছুতেই নেই। প্রেমে, প্রাণে এবং গানের ভিতর দিয়ে যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রসকে অনুভব করেছেন কবি, তেমনি প্রকৃতির রূপ লাবণ্য রুদ্র-রুক্ষ-শান্ত-সৌম্য, শুভ্র-সুন্দরের বিচিত্র লীলা কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। অধীর করে তুলেছে, আকুলিত ও আপ্লুত করেছে বাংলার ঋতু প্রকৃতির যে ছয়টি রূপ রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর চিত্রকর্ম এঁকেছেন। মনে হয় যেন প্রেমের তরে প্রকৃতির সঙ্গে সুরের গাঁথায় আয়োজন।

বিচিত্র পর্যায়ের গান–

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়–
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥[৩৬৫]

সুদূরকাল থেকে মানুষের আসা-যাওয়ার মাঝেও মানুষকে আন্দোলিত করে প্রেমের ক্ষণিক চাওয়া পাওয়ার আনন্দে। এই গানটিতে মানব জীবনের স্বল্প সময়ের মাঝেও প্রেমের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র পর্যায়ে। প্রতিটি গানের মধ্যেই রয়েছে একটি আলাদা আবেদন।

আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গান–

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে।
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।

আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানটি মূলতঃ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত। কবি আহ্বান জানিয়েছেন গানটিতে মানুষকে মাটির কাছে ফিরে যেতে, মাটিকে ভালবাসতে, উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হতে।[৩৬৬]

রবীন্দ্রনাথ একজন ভাববাদী ও আনন্দবাদী দার্শনিক। বিশুদ্ধ আনন্দরূপে মানুষ ব্যক্ত করে আপন ভাবকে। তাই ভাবের বস্তুই তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী।[৩৬৭] ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ এই প্রসন্ন কবিদৃষ্টিকেই বলেছেন প্রজ্ঞা, প্রতিভা–'প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ'। বস্তুরহস্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সুষমা-প্রকাশে নিয়ত এই প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে মনীষী কার্লাইলও প্রতিভার দৃষ্টি বলেছেন–'The Seeing eye. It is this that discloses the inner harmony of things.[৩৬৮] বহুবিচিত্রের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সুষমা সন্ধানকে এদেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে বলে 'সাধারণীকরণ'। ঈষৎ ভিন্নভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এই সাধারণীকৃতির ভাবটিই এখানে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিক এবং ভাব গভীরভাবে তুলনাহীন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অহমের গণ্ডি থেকে শুদ্ধতার অভিমুখী আনন্দ চেতনায় তাঁর গীতিকাব্য এনেছিল মুক্তি। রোমাঞ্চিত বেদনায় মিতবাক কবি আধুনিক যুগযন্ত্রণায় শিল্পরূপ দিলেন গানের ভাষায়।[৩৬৯]

রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী এবং কীর্তন–প্রকৃতির গানে ভাব, ভাষা ইত্যাদির দিক থেকে পদাবলীর প্রভাব বেশি দেখা যায়। তবে পরবর্তীকালে কীর্তন-প্রকৃতির গানে সুর-সংযোজন এবং তাল প্রয়োগের দিক থেকে ঢপ কীর্তনের প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে।[৩৭০] রবীন্দ্রনাথের কীর্তন-প্রকৃতির গানের রূপ আরো একধাপ অগ্রসর হয় বাংলার বৈচিত্র্যময় পল্লী-সংগীতের সান্নিধ্যে আসার ফলে। শিলাইদহ অঞ্চলে আসার পর থেকে, এখানকার বিস্তৃত জন-জীবনের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতিতে যেমন একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তাঁর সংগীতমনেও ক্রমে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে–এখানকার বাউল, সারি, ঢপকীর্তন বা ভাঙ্গাকীর্তন ইত্যাদি লৌকিক সুরের স্পর্শ পেয়ে। এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া তাঁর কীর্তন-প্রকৃতির গানেও প্রতিফলিত হয়। এই সময়ে তিনি তাঁর কীর্তন-প্রকৃতির গানে বাউল সুরেরও মিশ্রণ করেছেন। 'আমার কি বেদনা সে কী জানে?' 'আজি লহ লহ তুলে লহ' ইত্যাদি অনেকগুলো গানে কীর্তন এবং বাউল সুরের মিলন-মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।[৩৭১]

বৈষ্ণব পদাবলী তাঁকে যে সারাজীবনই টানত সে প্রমাণ আমরা পাই পদাবলী রচনার ১০ বছর পর (১৮৯৪) শিলাইদহ অঞ্চল থেকে লেখা 'ছিন্নপত্র' অংশে।[৩৭২] তিনি বলেছেন, 'বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষকালের যমুনার বর্ণনায়মনে পড়ে প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দ ঝঙ্কার এনে দেয়–তার প্রধান কারণ সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য্য নয়, এর মধ্যে মানব ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলন গাঁথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরতন্তন হৃদয়ে লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন

রয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।'[৩৭৩]

পরমাত্মা যে মধুর মুরলী তানে জীবাত্মকে কাছে টানে—শ্রীমদ্ভাগবতের এই নব সংবাদই যেন গীতাঞ্জলীর প্রথম অঞ্জলীর মূল সুর—

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষি।
গোবিন্দবেণুমনু-মত্তময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০/২১/১০[৩৭৪]

শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি জাদুঘর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
চিত্রটি ধারণ করেছি ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে সংগীত বিষয়ক আলাপ আলোচনায় আখরের মহিমা রবীন্দ্র সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে তুলে ধরেন কবিগুরু।[৩৭৫] দিলীপ কুমার রায়ের সাথে কবিগুরুর আলোচনায় কবিগুরু বলেন—কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকে নানা আখরের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর, অর্থাৎ

বাক্যের তান, অগ্নি চক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে।[৩৭৬]

দিলীপ রায়ের সঙ্গে আলোচনার পাঁচ বছর পর এই আঁখরের মহিমা রবীন্দ্র সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছেও তুলে ধরেন কবিগুরু। আইনস্টাইন প্রশ্ন করলেন রবীন্দ্রনাথকে, æAre the words of a song also free? I mean to say is the singer at liberty to add his own words to the song which he is singing?” সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন æYes. In Bengal we have a kind of song–Kirtan we call it-which gives freedom to the singer to introduce parenthetical comments, phrases not in the original song. This occasions great en-thusiasm, since the audience is constantly thrilled by some beautiful, spontaneous sentiment added by the singer.” (August 1930)[৩৭৭]অর্থাৎ গায়কের স্বকীয় ভাবের আখরের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন রাখে সে কথাটিই বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে বুঝালেন তিনি। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের জ্ঞানভূমিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম কীর্তনের মহিমা প্রতিষ্ঠা করলেন তাও তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কাছে। আখর যুক্ত একাধিক কীর্তনাঙ্গ গানও লিখলেন তার মধ্যে একটি যেমন “ওহে জীবন বল্লভ/ওহে সাধন দুর্লভ/আমি মরনের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই ানহি কব।/শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।/আখর যোজনা করলেন-দিনু চরণ তলে/কথা যা ছিল, দিনু চরণ তলে/প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরল তলে/। দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনাকালে শান্তিনিকেতন ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের বিশেষ কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেন–বাংলা রাধাকৃষ্ণের লীলা গান দিল হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে।[৩৭৮] এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান। স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই।উপমা যদি দেওয়া চলে তা হলে বলতে হবে ঐ সংগীতে আছে এক একটি রত্নের কৌটা।ওস্তাদ জহুরী ঘটা করে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকনা খোলে। আলোর ছটায় তাক লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমাঝদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দাম যাচাই করে বলে দিতে পারে এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না।[৩৭৯]

কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যেমন রসিক, সে প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে দেখতে পায় না রত্নগুলোকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানা ভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়। এই বক্তব্যে যে চিত্রকল্প গ্রহণ করলেন কবিগুরু তাতে বুঝি যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইবার বা শোনাবার সময় গায়কও শ্রোতা উভয়ের রাগের রূপ ও মার্গসঙ্গীতের বিকাশের জটিলতার দিকেই

বিশেষভাবে মনোযোগী থাকেন কিন্তু কীর্তন গাইবার বা শোনবার সময় গায়ক বা শ্রোতা উভয়ে খেয়াল করেন যে সুরে তালে পদে আখরে মূল ভাবটি প্রতিষ্ঠিত হল কিনা।[৩৮০]

১৮৮৪ সালের মাঘোৎসবের আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সর্ব–ব্রাহ্মসমাজের এক সম্মেলন হয়।[৩৮১] ওহে জীবনবল্লভ, আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি ইত্যাদি গান দিয়ে যখন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হচ্ছে তখন তৎকালীন সংবাদপত্রে সমালোচনার ঝড় ওঠে যে ব্রাহ্মসমাজ উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ পাখোয়াজ ছেড়ে এখন কীর্তন আর খোল করতাল নিয়ে মেতেছে–তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের পক্ষ অবলম্বন করে ঘোষণা করেছিলেন যে ধর্মপ্রচারের এই প্রাচীন পন্থাকে সুরুচি সম্পন্নভাবে ব্যবহার করাই আমাদের কর্তব্য।[৩৮২]

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, কোলকাতা
চিত্র : ৩০.১২.২০১৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিসম্ভার ছিল বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। নানা রূপে নানা রসে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির নিরন্তর প্রবহমান গতিবেগে কবি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। জীবন ও জগতের বিচিত্র রূপ তাঁর কাব্য ও গানের উপজীব্য হয়েছে। তাঁর প্রতিভার বিকাশ ছিল বহুমুখী এবং সৃষ্টিতে ছিল বৈচিত্র্য।

কীর্তনাঙ্গ ১৫১টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সূচি ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত; রাগসুর নির্দেশিকা’ (সুধীরচন্দ) গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য তাঁর ‘কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে’ বইয়ে উপস্থাপন

করেছেন—অসুন্দরের পরম বেদনায়/আজ যেমন করে গাইছে আকাশ/আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে/আজি এ নিরালা কুঞ্জে/আজি দখিন দুয়ার খোলা (বাহার)/আজি যে রজনী রায় (ভৈরবী)/আজ্ সখি মুহুমুহু (বেহাগ)। আনমনা, আনমনা/আবার মোরে পাগল করে/আমার এই রিক্ত ডালি (খাম্বাজ)। আমার কি বেদনা সেকি (পঞ্চম বা সোহিনী)/আমার না বলা বাণীর/আমার প্রাণের পরে চলে গেল (পিলু-কালংড়া-পরজ) আমার প্রাণের মাঝে সুধা/আমার মন মানেনা (পিলু ভীমপলশ্রী)/আমার মল্লিকা বনে। আমার হৃদয় সমুদ্রতীরে/আমি চিনি গো চিনি (খাম্বাজ) আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি/আমি তখন ছিলেম মগন/আমি তো বুঝেছি সব (খাম্বাজ)/আমি মিছে ঘুরি। আমি যখন ছিলেম অন্ধ/আমি বলিতে (খাম্বাজ)/আর নাই রে বেলা (ইমন)/উতল হাওয়া লাগল আমার/এ নতুন জন্ম/এই পেটিকা আমার/একবার তোমা মা বলিয়া/একলা বসে একে একে/এত দিন বুঝি নাই (গৌড়সারং)/এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম (বিভাস)/এসো এসো ওগো-শ্যাম ছায়া ঘন/এসো এসো পুরুষোত্তম/এসো এসো ফিরে এসো (ভৈরবী)/ও জান না কি (বিভাস)/ঐ সাগরের ঢেউয়ে/ঐ ঝঙ্কার (ইমন) ওকে বল/ওকে বল সাথী (বেহাগ)/ওকে বোঝা গেল না/ওগো এত প্রেম আশা (ঝিঁঝিই)/ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে (পিলু)/ওগো শোন কে বাজায় (বেহাগ)/ওরা অকারণে চঞ্চল/ওরে বকুল, পারুল (বাহার)/ওলো সই, ওলো সই (বিভাস)/ওহে জীবন বল্লভ/কবে তুমি আসবে বলে/কাঁটাবন বিহারিনী/কিসের ডাক তোর/কী অসীম সাহস তোর/কী কথা বলিস তুই/কী দোষে বাঁধিলে/কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে (ইমন)/কৃষ্ণ কলি (মিশ্র)/কে জানিত তুমি (দেশ)/কে বলেছে তোমায় বঁধু/কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার/কোন সে ঝড়ের ভুল/ক্লান্ত যখন আম্র কলির কাল/খাঁচার পাখি ছিল/গগনে গগনে ধায় হাঁকি/গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে/চলো নিয়ম মতে/চাহিনা সুখে থাকিতে হে (মিশ্র ঝিঁঝিট)/জয়যাত্রার যাও গো/ জানি গো, দিন যাবে (রামকেলী)/জীবনে কিছু হল না হায় (মিশ্র হাম্বীর)/তব সিংহাসনের আসন (পিলু বারোয়াঁ-ভীমপলশ্রী)/তবু মনে রেখো/তাই হোক তবে তাই হোক/তুমি আমাদের পিতা/তুমি ইন্দ্রমণির হার/তুমি কাছে নাই বলে/তুমি কোন পথে যে এলে/তুমি যত ভার দিয়েছ/তোমরা যা বলো তাই বলো (বেহাগ)/তোমরা হাসিয়া বহিয়া (কানাড়া-মিশ্রণ)/ তোমায় আমায় মিলন হবে/তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা/তোমার কাছে শান্তি চাব না/তোমর গোপন কথাটি/তোমার বাস কোথা যে, পথিক (খাম্বাজ) তোমার বাণীর গান ছিল/তোমার বৈশাখে ছিল/থাম্ রে তোরা (বেহাগ)/থামো থামো কোথায় চলেছ (বিভাস) দই চাই গো (ইমন)/দিয়ে গেনু বসন্তের এই (বেহাগ) দুই হাতে কালের মন্দিরা (ইমন)/ দে পড়ে দে আমায় তোরা/নমো, নমো, নমো নমো। নির্দয় অতি/নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে/না চাহিলে যারে পাওয়া যায়/না না না, ডাকবোনা

(বিভাস)/না না না সখী ভয় নেই/না রে, না রে ভয় করব না/পুরানো জানিয়া চেয়ো না/প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত/প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ (কাফি)/ফিরবে না জানি (ভৈরবী)/ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে/বাজাও রে মোহন বাঁশি (পিলু), বনে যদি ফুটল কুসুম/বাকি আমি রাখা না (খাম্বাজ)/বাংলার মাটি বাংলার জল/বিজয় মালা এনে আমার লাগি (কেদার)/বিনা সাজে সাজি/ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হতাশন/ভালো ভালো, তুমি দেখবো পালাও কোথা/ভালোবেসে দুখ সেও সুখ (পিলু-ভীমপলশ্রী)/ভালো বেসে, সখি নিভৃতে যতনে/ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে/মনে রয়ে গেল মনের কথা (বেহাগ), মরণরে, তুঁতু মম (ভৈরবী)/মরণ সাগর পারে তোমার অমর (বিভাস)মরি লো মরি (ইমন)/মাগো, এত দিনে মনে হচ্ছে/মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (আঁখর সমৃদ্ধ) সুরান্তরঃ (কাফি) মালা হতে খসে পড়া/যতক্ষণ তুমি আমায় বসিয়ে রাখ/যদি ঝড়ের মেঘের মতো/যা হারিয়ে যায় (খাম্বাজ)/যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে/যে ছিল আমার স্বপনচারিণী (ভৈরবী)/যেতে যেতে চায় না যেতে/রোদন ভরা এ বসন্ত (মিশ্র বেহাগ)/লহো লহো, তুলে লহো/লুকালে বলেই খুঁজে বাহির/শুধু একটি গন্ডুষ জল/শুনলো শুনলো বালিকা (ভৈরবী) শোন তোরা তবে শোন্ (ঝিঁঝিট)/সকল জনম ভরে (টপ্পা) সখী বহে গেল বেলা (গৌড় সারং) সজনি সজনি রাধিকা লো (বেহাগ)/সতিমির রজনী (দেশ)/সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো/সুখে আছি, সুখে আছি/সুখে থেকো আর সুখি করো/সে আমার গোপন কথা/সে আসি কহিল/সেই ভালো মা, সেই ভালো (ইমন-ভূপালী) স্বপন পারের ডাক শুনেছি/হতাশ হয়োনা/হরি, তোমায় ডাকি/হল না লো, হলো না (মিশ্র হাম্বীর)/হায় রে, হায় রে নূপুর/হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে (ভৈরবী)/হৃদয়ের এ কুল ও কুল (বিভাস) হে আকাশ বিহারী।[৩৮৩]

৩.২ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে এম.এ. পাশ করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাত থেকে ফিরে প্রথমে সেটেলমেন্ট অফিসার এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন।[৩৮৪] নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা অধিক হলেও কবিতা ও গানে তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। স্বদেশি ও কীর্তনাঙ্গ গানের রচয়িতা হিসেবে তার বিশেষ পরিচয় উল্লেখযোগ্য।[৩৮৫] দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত ও সাহিত্যজীবন গড়ে উঠেছিল প্রধানত তাঁর পিতা এবং অগ্রজ ও অনুজদের সান্নিধ্যে। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজ্যের দেওয়ান। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যগ্রন্থে, রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

চক্রবর্তী গোপাল দেওয়ান সহবতি
রায় বকসি মদন গোপাল মহামতি।[৩৮৬]

মদন গোপাল রায় ছিলেন কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ। অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা, বংশগৌরব, আভিজাত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল পুরুষানুক্রমিক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি।[৩৮৭]

দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, চলতি ভাষা, ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বর্ণনা সমৃদ্ধ চিত্ররূপ—কোন কোন গানে দেখা যায়।

যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট ও ধ্বনিব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ ভাষারীতি, চলতি শব্দের এবং ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বাংলাকাব্যগীতিতে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই দেখা যায়। ভক্তিগীতির পর্যায়ে দ্বিজেন্দ্রলালের গান কম সংখ্যক গৃহীত হয়েছে। ভক্তির তীর্থে দ্বিজেন্দ্রলালের বাস্তবনিষ্ঠ অন্তরের যাতায়াত ছিল বিরল।[৩৮৮]

দ্বিজেন্দ্রগীতি খেয়ালভঙ্গিম প্রধানতঃ তিন সপ্তকে সুরের ব্যপ্তি, মিশ্রণরীতি, টপ্পার দানা আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সুর বলতে ইমন-ভূপালী মিশ্রিত একটি পরিচিত কাঠামো গড়ে উঠেছে। তার বাইরে সুরের কোন স্বতন্ত্র রূপ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সব গানের মধ্যেই একটি আবেদন আছে। একটি স্বকীয়তা আছে। যেখানে একটি ভাব দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, এই গানটিতে–

আজি নূতন রতনে ভুষণে যতনে, প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও।
আজি সাগরে ভুবনে-আকাশে-পবনে, নতুন কিরণ ছড়িয়ে দাও।
আজি পুরানো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে, মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে।
শ্যামলে-কোমলে-কণকে-হীরকে, ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও।[৩৮৯]

এই গানটিতে তিনি প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর গানে অলংকার, বৈচিত্র্য, শব্দচাতুর্য, দীর্ঘ পঙ্ক্তিবিন্যাস, ধ্বনিব্যঞ্জনা বর্তমান। তাঁর গানগুলোতেই প্রকাশ পায় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধায় উত্তীর্ণ বাস্তবনিষ্ঠ কবি। শিল্পের শুদ্ধ প্রকাশ কাব্যগীতিতে বা গানে কোথাও কোথাও ধরা পড়লেও প্রধানত দুঃখ–সুখ, ব্যথা-বেদনা মণ্ডিত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানবজীবনের ইহমুখীনতাই, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগীতি বা গানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৩৯০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' ১৩০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের গান নিয়ে আলোচনায় লিখেছেন, বঙ্গদেশের কীর্তনে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে কাব্য পরিপূর্ণ এবং সংগীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোনার কবিতা ভরা সুরের সংগীত নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সংগীত কেবল যে কবিতাটিকে বহন

করিতেছে তাহা নহে, তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য এবং ঔদার্য এবং মর্যাদা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।[৩৯১]

আর্যগাথাকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন–আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উভয় শ্রেণির গানই দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলো গান আছে তা সুখপাঠ্য নয়, যার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলো সাহিত্য সমালোচকের অধিকার বহির্ভুত। আর কতকগুলো গান আছে যা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ–যা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হতেই তুলনা করে দেখাতে পারি।[৩৯২]

(কীর্তন)
সে কে? এ জগতে কেহ আছে
অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ;
সে কে? অধীন হইয়ে তবু
রহে যে আমায় প্রভু
প্রভু হয়ে আমি যার দাস।[৩৯৩]

রথীন্দ্রনাথ রায় আর্যগাথায় অন্তর্ভুক্ত প্রণয় সংগীত ও কীর্তনাঙ্গ সংগীত সম্পর্কে জানিয়েছেন– এই কাব্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাদের দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমগীতিকা বলা যায়। উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ, চিরন্তন প্রেমরহস্যের গভীর উপলব্ধি এই প্রণয় সংগীতগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৩৯৪] প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটি বিখ্যাত পদে–

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে,
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।[৩৯৫]

রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অনুসরণ করে তিনি লিখেছেন–

তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে।
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।[৩৯৬]

প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি এই প্রেমগীতিতে ঝংকৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে রঙ্গরসের প্রভাব বেশি থাকলেও উৎকৃষ্ট পদাবলীর আলোচনায় রঙ্গরসের স্থান নেই। নিকৃষ্ট শ্রেণির পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবজ্ঞবেশ, বৈদ্যবেশ, নাপিতাবেশ ইত্যাদি ছদ্মরূপের কল্পনা করে একটু আধটু হাসাবার চেষ্টা করেছেন।[৩৯৭]

৩.৩ রজনীকান্ত সেন : রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ সাল–১৯১০ সাল) স্বদেশপ্রেম ও ভগবতভক্তিমূলক কাব্যরচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে তাঁর গান ছিল প্রেরণার উৎস। রজনীকান্ত সেনের কন্যা শান্তিলতা দেবী তাঁর পিতা সম্পর্কে বলেছেন–'রজনীকান্ত ভগবত বিশ্বাসী ছিলেন, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি অকপটে। ভক্তির লক্ষ্মণই এই আত্মসমর্পণ।[৩৯৮] সরল আত্মসমর্পিত, পাপ, মোহ, বিবেক, পাতকী, বিপন্ন ইত্যাদি শব্দ সমাহার দেখা যায় রজনীকান্তের কাব্যগীতি বা গানে। যন্ত্রণা জর্জর, বিবেক, লাঞ্ছিত এক পীড়িত কবিসত্তা ঈশ্বরের কাছে মুক্তি ভিক্ষু। গানগুলোর বিষয়বস্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই রজনীকান্তের গানগুলো যে ভাবদর্শন ভিত্তিক এটা বোঝা যায়। যেমন–

পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোনে রাখি।
অমনি চমকে উঠে দেখি, পাশে জ্বলছে তোমার আঁখি।[৩৯৯]

আর একটি গান,

তব অমৃত পানে, এই বিকৃত প্রাণে মম
স্থান ভেদে হয় কালকুট সম
হৃদয়ে বহ্নি জ্বালা, নয়নে অন্ধ তমঃ
কোথায় শান্তি নিদান, কর শান্তিবিধান।[৪০০]

রজনীকান্তের গানের সুরের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রচলিত রাগ-রাগিনীর সহজ চলাফেরার সরল সুরের প্রকাশ, মিশ্রণ রীতি নেই। রজনীকান্ত শুদ্ধ ভক্তিরসের অমলিন প্রকাশ। তীব্র পাপবোধ অনুশোচনা এবং নিষ্কণ্ঠ আত্মসমর্পণের সহজ সরল রূপ। বৈচিত্র বৈভব রোমান্টিকতা বিরল।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশি আর সাধ্য নাই।"[৪০১]

রজনীকান্তের এই গানটিতে ভাববোধ এবং দর্শনতত্ত্ব নিয়ে এটি একটি বিখ্যাত গান হিসেবে পরিচিত।

এ ধরনের ভাষা রীতি এবং চিত্রকল্প একান্তই রজনীকান্তের, সেগুলো অন্যান্যের গানের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা কম। উদাহরণস্বরূপ যে গানগুলো বিশেষভাবে প্রচারিত সেগুলো ধরা যাক :

১. পাতকী বলিয়ে কিগো;
২. তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে;
৩. তোমারি দেওয়া প্রাণে;
৪. আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ;
৫. কবে তৃষিত এ মরু।[৪০২]

এ গানগুলোর সহজ সরল আবেদন প্রচলিত ভাবের অনুষঙ্গী বলেই এদের কথার সহজ বিষয়বস্তুতেই আকর্ষণ বেশি হয়, কিন্তু সুরের বৈচিত্র্যের দিক থেকে এগুলো সরল পরিচিতি অর্থাৎ সুরের অতি সাধারণ সংবেদন মাত্র। রজনীকান্ত বিশেষভাবেই স্বভাব কবি, ভাববাদী দার্শনিক, সুরসম্পদ তাঁর জীবদ্দশার কান্তি ও ঐশ্বর্য। কীর্তনের সুরে রজনীকান্ত সেন অনেক গান রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : নাথ ধর হাত, যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে ক্ষুদ্র হৃদয় পল্লব জল প্রভৃতি গান।[৪০৩]

৩.৪ অতুলপ্রসাদ : (১৮৭১-১৯৩৪) অতুলপ্রসাদের সংবৃত আত্মবেদনার তাপ বাংলা গানের নতুন ভাবলাবণ্য সংযোজন করে। অতুলপ্রসাদ এই ভবার্নবে দিশেহারা, জীবন তরণী ভাসাতে চান ঈশ্বর তীর্থে। নিশ্চিত বিশ্বাস, বিফল জীবন, ছিন্ন কুসুম ঈশ্বর গ্রহণ করবেন। অতুলপ্রসাদের গানে নিরবিচ্ছিন্ন বেদনার সুর অনুরনিত। বিষয়বস্তুর বিচারে অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্ত ঈশ্বর আরাধনায় অনেকাংশেই সহধর্মী। অতুলপ্রসাদ কান্ত কবি মতো নির্ভাবনায় আপন অন্তরের দৈন্য, ব্যথা, বিড়ম্বনা অনায়াসে আরাধ্য দেবতার পায়ে সমর্পণ করেছেন। অতুলপ্রসাদের গানে যে পাপ-পুণ্যের, ব্যথা-বেদনার প্রকাশ তা সর্বকালের ভক্তচিত্তের স্নিগ্ধ আকৃতির ব্যঞ্জনায় রসসিক্ত। অতুলপ্রসাদের গান ভাবদর্শনে পরিপূর্ণ।

'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা।'[৪০৪]

এই গানে তাঁর ভাষার প্রতি দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দার্শনিকতার আলোকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, গানটি একটি ভাষার গান, এটি একটি দেশাত্ববোধক গান। সুতরাং গানটির বাণী ধর্মীতাই একটি জাতীয় মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অতুলপ্রসাদের গানে ও সুরে ঠুংরীর সূক্ষকাজ আছে, যা বিশিষ্ট গায়কীর উপর নির্ভরশীল। এর বাইরে সাধারণ ভক্তিগীতি বা প্রেমসংগীতে সুরের বিশিষ্ট গঠন ভঙ্গি নেই যা কথাবিহীন অতুলপ্রসাদের গানকে চিনতে সাহায্য করে।

"বধুঁয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে।

আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে।"[৪০৫]

অতুলপ্রসাদের এ গানটিও ভাবদর্শন ভিত্তিক। এটি একটি বিখ্যাত গান। যার ভাব ও দর্শনতত্ত্ব দিয়ে সবার সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। অতুলপ্রসাদের অপূর্ব গুণগীতি রচনার দিক লক্ষ্য করা যায়। ২০৪টি গীতি রচনার মধ্যে অতুলপ্রসাদ যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যে ভাববাদের প্রকাশ পেয়েছে সেটি হলো–গানের প্রথম কলির আবেদনটিই গানের কেন্দ্রস্থল। অতুলপ্রসাদ কতকগুলো সহজ ও সার্থক প্রথম কলি বাংলাগানে উপহার দিয়েছেন। এরূপ সামান্য সংখ্যক গীতি রচনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, এমন ভাবদর্শনের প্রভাব এবং সংগীত সত্তার পরিপূর্ণ স্ফুতি আর কোথাও হয়নি। অতুলপ্রসাদ কীর্তনাঙ্গেরও বেশকিছু গান রচনা করেছেন। যেমন–

'যদি তোর হৃদ্ যমুনা
হ'ল রে উছল রে ভোলা।'

'কে আবার বাজায় বাঁশী
এ ভাঙা কুঞ্জবনে?'[৪০৬]

৩.৫ কাজী নজরুল ইসলাম :

রবীন্দ্রযুগে যে কয়েকজন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে, গানে বিদ্রোহী কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের মধ্যবর্তী সময়টুকু কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার বিকাশকাল।[৪০৭]

বাংল গানে কাজী নজরুল ইসলাম যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ আছে, অসত্যের প্রতি তিনিও ঘৃণায় প্রকাশ

করেছেন, কিন্তু নজরুল ইসলাম যত বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন তা অন্য কারও মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। ১৯২২ সালে 'অগ্নিবীণা' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার ব্যাপক বিকাশ ঘটে এবং বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার মধ্যে এক ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়।[৪০৮] কাজী নজরুল ইসলাম সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সংগীত রচনা করেন নি। সকল সম্প্রদায়–তথা সকল মানুষের জন্য তাঁর উদার অন্তরের অপরিসীম সহানুভূতি উৎসারিত হয়ে উঠেছিল। সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।[৪০৯] কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ঐতিহ্য-সচেতন কবি। একদিকে ইসলামি ঐতিহ্যে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্যদিকে হিন্দু ঐতিহ্যের পরিবেশের মধ্যে তাঁর জীবন বিকশিত হয়েছিল। তাই মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্য যথাযথ স্থানে যথাপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।[৪১০]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

কাজী নজরুল ইসলাম মানব প্রেমের কবি, ঈশ্বর আরাধনায় তাঁর কবিসত্তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল নয়। কৃষ্ণ, কালী, উমা, আল্লাহ সকলকেই কবি আরাধনা করেছেন। কাব্যের কায়াগঠনের শৈথিল্য নজরুলকে চিনতে সাহায্য করে বললে বোধ হয় অন্যায় বলা হবে না। 'ভগবান পূজা করতে যদি তুমি ভাব অপমান'। 'পাখী যেমন সন্ধ্যাকালে বন্ধুস্বজন পালে, উড়ে এসে বসে ছিল ডালে হে', 'নদী

হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃথাই'—এই ভাষারীতি এবং চিত্রকল্প অতুলপ্রসাদের বা দ্বিজেন্দ্রলালের, রজনীকান্তের নয়। এই ভাষারীতি ও চিত্রকল্প একমাত্র নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। গজলগানের সুর প্রণয়নেই নজরুলের সুরধর্মিতার পরিচয়। নানান রাগ-রাগিনী, তাল-ছন্দের বৈচিত্র আছে, কিন্তু সাধারণ প্রেমগীতি বা ভক্তিগীতিতে সুর কোনো স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেনি। বিরহের, ব্যথার ভাব সুরে প্রধানত উচ্ছ্বসিত।[৪১১]

নজরুলের কাব্যগীতি অলংকৃত, ধ্বনি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ, শব্দ ও চিত্রকল্পমণ্ডিত। মূলতঃ মানবীয় দেহভাবনার আধারে কবি ভাবনা আবর্তিত। ভাঙার গান, উদ্দীপনমূলক গান, মার্চের সুরের গান, দেশত্ববোধক প্রভৃতি গান নজরুলের সংগীত প্রতিভার একটি ব্যাপক অধ্যায়।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার
পাষাণ বেদী॥[৪১২]

নজরুলের গানটি অর্থবোধক, ভাববোধক এবং দর্শনতাত্ত্বিক সব কিছু মিলে এটি এপার-ওপার বাংলার একটি বিখ্যাত গান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে, যার ভাব এবং দর্শনতত্ত্ব নিয়ে এটিকে একটি বিখ্যাত গান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৪১৩]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্রিকার জন্য নজরুলের কাছে একটি অনুরোধ আসে, তখন ১৯২১ সালে নজরুল এই বিখ্যাত গানটি রচনা করেন। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। বন্দিশালাগুলো তখন পরিপূর্ণ। এই পরিবেশে গানটি রচিত এবং গানটি ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারি বাংলা কথায় মুদ্রিত হয়েছিল। গানটি রেকর্ড করেছিলেন সীরিন চক্রবর্তী। রেকর্ড নং-৭৫০৬।[৪১৪]

নজরুল ছিলেন স্বভাব বিদ্রোহী কবি। তিনি অসুন্দরকে পরিহার করে সুন্দর এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশবাসীর হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।[৪১৫]

হিন্দু ধর্মসংগীত পর্যায়ে নজরুল রচনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক কীর্তন বা কীর্তনাঙ্গের গান। কৃষ্ণ বা শ্যাম বিষয়ক সংগীত এই অর্থে কেউ কেউ শ্যাম সংগীত কথাটি ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণ কাহিনীর নানা পর্যায় অবলম্বনে নজরুল বহু সংখ্যক গান রচনা করেন। রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গানই সবচেয়ে বেশি রচনা করেছেন।[৪১৬] শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অসুরারি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী কৃষ্ণ-নারায়ণের মহিমা যেসব গানে বর্ণিত হয়েছে সেইসব গানকে একটি ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায়

এবং অপর ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেইসব গান যেখানে কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন ব্রজবিহারী, রাধাবল্লভরূপে। পদাবলী কীর্তনে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর বিভিন্ন পর্যায় এসব গানের উপজীব্য।[৪১৭] পদাবলী কীর্তনের ঐতিহ্যানুসারে নজরুল যথেষ্ট কীর্তন বা কীর্তনাঙ্গের গান রচনা করেন। আমি কলহের তরে কলহ করেছি, আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম, একি অপরূপ রূপের কুমার, ওগো প্রিয় তুমি চলে গেছ আজ, ওলো বিশাখা–ওলো ললিতে এই পথের ধুলি দে, কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়, তোরা যা লো সখি মথুরাতে, নওল শ্যামতনু গোরীর পরশে, না মিটিতে মনোসাধ, নাটুয়া ঠমকে যায়, ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই, ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে, ফুটিল মানস মাধবী কুঞ্জে, ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা, মণিমঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে, মুরলী শিখব বলে, মোর মাধবশূন্য মাধবী কুঞ্জে, মোরে সেই রূপে দেখা দাও, যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে, শ্যাম মুখ আর না হেরব, সখি আমিই না হয় মান করেছিনু, সখি সাজায়ে রাখলো পুষ্পবাসর প্রভৃতি নজরুলের উল্লেখযোগ্য কীর্তনাঙ্গ সংগীত রচনা।[৪১৮]

কৃষ্ণের ব্রজলীলানুষঙ্গে রচিত নজরুলের গানও সংখ্যায় অনেক। প্রকৃতপক্ষে এ ধারায়ই তাঁর কৃষ্ণবিষয়ক সর্বাধিক সংখ্যক গান রচিত হয়েছে। আমার নয়নে কৃষ্ণ, আমার হৃদয় মন্দিরে ঘুমায়, আমি কেমন করে কোথায় পাব কৃষ্ণ চাঁদের দেখা, আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাই, আমি রবনা ঘরে, আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম, এল নন্দের নন্দন নবঘনশ্যাম, এস আনন্দে সুন্দর ঘনশ্যাম, এস নওল কিশোর, এস নূপুর বাজাইয়া, এস প্রাণে গিরিধারী, এস মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী, এস হৃদি রাসমন্দিরে ও তুই যাসনে রাই কিশোরী, ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের, ওরে নীল যমুনার জল, ওরে মথুরাবাসিনী মোরে বল, কিশোর গোপবেশ, কিশোর সুকুমার শ্যামলতনু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা কেন বাজাও বাঁশী, কোন রস যমুনার কূলে, গিরিধারীলাল কৃষ্ণ গোপাল, ঘনশ্যাম কিশোর, চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার, চম্পা বনে বেণু বাজে, চির কিশোর মুরলীধর, তরুণ তমাল বরণ, তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম, তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম, তোমার কালো রূপে যাকনা ডুবে, তোমার লীলারসে হে কৃষ্ণ, দিও বর হে মোর স্বামী, দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ, নন্দ দুলাল পিয়াল তমাল, নব কিশলয় শ্যামল তনু, নবঘন শ্যাম মুরতি মনোহর, নবনীত সুকোমল লাবণী তব শ্যাম, বনে বনে খুঁজি, বনের ময়ূর কোথায় পেলি এমন চিত্র পাখা, বাজিয়ে বাঁশী মনের বনে, বাহির দুয়ার মোর বন্ধ হে প্রিয়, বাঁশরী বাজে দূরে বনমাঝে, বিজন মাঠে কে রাখাল বাজায় বেণু, বৃন্দাবনী কুমকুম ফাগে, ব্রজদুলাল ঘনশ্যাম মোর, ব্রজপুর চন্দ্র পরম সুন্দর, ব্রজে আবার আসবে ফিরে, ব্রজেয় দুলাল ব্রজে আবার, মাধব বংশীধারী বনওয়ারী, মুরালী ধ্বনি শুনি ব্রজনারী, মোর শ্যাম সুন্দর এস, রাখ রাখ রাঙা পায়, রাধাকৃষ্ণ নামের মালা, রাধাতুলসী প্রেম পিয়াসী, রাধা শ্যামকিশোর, রাসমঞ্চে দোল দোল লাগে রে,

রাসমঞ্চোপরি দোলে মুরলীধারী, শুকসারীসম তনু মন মম, শুধু নামে যাহার এত মধু, শ্যাম মনে কি পড়ে গো যমুনায়, শ্যামসুন্দর গিরিধারী, শ্যামল তুমি শ্যাম, শ্যামল সুন্দর প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম, শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা, শ্রীকৃষ্ণ নামের তরীতে, শ্রীকৃষ্ণ রূপের কর ধ্যান অনুক্ষণ, সখি আমি যেন রূপমঞ্জরী, সখি সে হরি কেমন বল, সজলকাজল শ্যামল এস প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর বিভিন্ন অনুষঙ্গ অবলম্বনে রচিত কীর্তনের সংগীত। কৃষ্ণের শৈশব লীলা অবলম্বনে কয়েকটি গান আছে। যেমন : আয় ঘুম আয় ঘুম, জগো গোপাল জাগো গোপাল, নন্দদুলাল নাচে রে, নাচে ঐ আনন্দে নন্দদুলাল ব্রজের গোপাল নাচে, মদনমোহন শিশু নটবর প্রভৃতি। কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন সম্পর্কে নজরুল গান রচনা করেন। যেমন : গোঠের রাখাল বলে দেরে, মন মোর ছুটে যায় দ্বাপর যুগে। কৃষ্ণলীলার একটি বিশেষ অঙ্গ ঝুলন উৎসব নিয়ে নজরুল বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। এর মধ্যে এল কৃষ্ণ কানাইয়া, ঝুলন দোলায় দোলে, ঝুলনে ঝুলিছে শ্যাম রায়, ঝুলনের হিন্দোলা দোলে, দোলে বনতমালের ঝুলনাতে, মম বনভবনে ঝুলন দোলনা, সোনার হিন্দোলে কিশোর কিশোরী দোলে প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।[৪১৯]

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পর্কে নজরুলের রচনা—একি অপরূপ যুগল মিলন, এই যুগল মিলন দেখব বলে, কাঁদিব না আর শচী দুলাল তোমায় ডেকে ডেকে, তাঁর কে গড়িল গৌর অঙ্গ, দেখে যা তোরা নদীয়ায়, নিঠুর কপট সন্ন্যাসী, বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়, সিনান করিতে গিয়েছিনু প্রভৃতি গান।[৪২০]

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম এই পাঁচজন হচ্ছেন বাংলা গানের আধুনিক যুগের প্রধান পাঁচ নির্মাতা। এঁদের মধ্যে রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের রচনা অপর্যাপ্ত। তৎসত্ত্বেও সংগীত গৌরবে এঁদের অবস্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল। আর মরমী অভিধায় যদি কেউ এঁদের মধ্যে ভূষিত হন তা হলে রজনীকান্ত সেনই সর্বাগ্রে স্মরণীয় হবেন। তাঁর সরল মধুর অনুভবগভীর সুরকলার মধ্যে এমন এক গুণ আছে যাকে মরমী ছাড়া আর অন্য কোন অভিধায় ভূষিত করলে যথার্থ হয় না।[৪২১]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে আধুনিক ধারার সূত্রপাত হলো পঞ্চগীতি কবির বৈচিত্র্যময় প্রকাশে ও নব নব সৃষ্টির বিকাশে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল এই পঞ্চকবির গীতরসে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও লোকসংগীতের বৈচিত্র্যময় সম্ভারে ঋদ্ধ হলো বাংলা গান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলা গানেরই অনুবর্তন অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে। পাশাপাশি, লোকায়ত রচনার অন্যতম বাউলকবি লালন (১৭৭৪-১৮৯০), রাধারমন (১৮৩৪-১৯১৫), হাছনরাজা (১৮৫৪-১৯২২) ও তাঁর পরবর্তী অসংখ্য মরমিয়া বাউল ফকিরদের রচিত গানের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ধরাশ্রয়ী অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশশৈলী সমান্তরালভাবে বাংলা সঙ্গীতে এখনো প্রবাহমান।[৪২২]

তথ্যসূত্র

১. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩১

২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ১২

৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪৪

৪. Bimal Kumar Ray, *Prācīnayuga,* Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996. p. 32

৫. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৪৪

৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৩

৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪

৯. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১২

১০. তাপসী ঘোষ, এম.ফিল গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত) (দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক), পৃ. ৮৬

১১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৮৭

১২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪৪

১৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৫

১৪. তাপসী ঘোষ, এম.ফিল গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত) (দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক), পৃ. ১৬

১৫. Bimal Kumar Ray, Prācīnayuga, Sharada publishing House, Delhi-110035, 1196. p. 32

১৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *চর্যাগীতিকা*, প্রকাশন : ইভেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪০২ সাল, পৃ. ৯

১৭. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ৩২

১৮. তাপসী ঘোষ, এম.ফিল. গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত) দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক পৃ. ১৮

১৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *চর্যাগীতিকা*, প্রকাশন : ইভেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪০২ সাল, পৃ. ১০

২০. তাপসী ঘোষ, এম.ফিল. গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত) দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক পৃ. ১৮

২১. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫২

২২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *চর্যাগীতিকা*, প্রকাশন : ইভেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪০২ সাল, পৃ. ৪০

২৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ১০

২৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *চর্যাগীতিকা*, প্রকাশন : ইভেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪০২ সাল, পৃ. ৩৯

২৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬

২৬. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৯, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ৩৫

২৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৭-৩৮

২৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৯-৪০

২৯. ঋগ্বেদ, ১/১৫৪/৬ ও বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৯-২১, সারাংশ।

৩০. ড. সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৯

৩১. শতপথ ব্রাহ্মণ; ১৪শ কাণ্ড।

৩২. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ১/১।

৩৩. ঋগ্বেদ; ১০/৯০/১॥

৩৪. ঐ–ঐ।

৩৫. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩/৬/১।

৩৬. ঋগ্বেদ, ৮/৯৬।

৩৭. ছান্দোগ্য উপনিষদ; ৩/১৭/৬।

৩৮. তৈত্তিরীয় আরণ্যক; ১০ম অধ্যায়।

৩৯. মহাভারত; বন। ১৫৯ ও ১৬০ সংখ্যক অধ্যায়

৪০. অষ্টাধ্যায়ী ৪/৩/৯৮

৪১. ঐ, *'হেতুমতি চ'*, ৩.১.২৬।

৪২. ঐ, 'অব্যয়াত্তপ্', ৪.২.১০৪।

৪৩. Krsna in History and Legend, *Biman Bihari Majumdar, p. 16*

৪৪. পঞ্চোপাসনা, *জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৬০), পৃ. ৫৫

৪৫. সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৫০।

৪৬. E.1. Vol. XX1. p. 83

৪৭. E.1. Vol. XX1. p. 133

৪৮. সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৫০।

৪৯. হরিবংশ; ২/১৯/৪৫
৫০. সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৫০
৫১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, পৃ. ৬০০।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০।
৫৩. K.N. Dikshit; Excavations at Paharpur, Bengal, p. 44
৫৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, গৌড়লেখমালা, পৃ. ৯
৫৫. Inscriptions of Bengal, Vol. III, pa. 25
৫৬. গাথাসপ্তশতী; পাবর্তীচরণ ভট্টাচার্য ২/৫১।
৫৭. পৃথ্বিরাজ সেন, অষ্টাদশ পুরাণ কাহিনী সমগ্র, কোলকাতা বই মেলা, ২০১৬, পৃ. ৮
৫৮. ভাগবত, ১০.৩০.২৪
৫৯. শ্রীরূপ গোস্বামী, উজ্জ্বলনীলমণি, রাধা পুস্তকালয় পুনর্মুদ্রণ, বইমেলা ২০১৩, পৃ. ২৪২
৬০. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, পৃ. ১৫৯
৬১. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ২/৫১
৬২. তদেব, ২/১৪
৬৩. তদেব, ২/২৮
৬৪. PRAKRITA-PAINGALAM (Part 1) Edited by Dr. Bhola Sankar Vyas; p. II
৬৫. PRAKRITA-PAINGALAM (Part 1); p. 56
৬৬. তদেব, পৃ. ১৭৬-৭৭
৬৭. ড. সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ৩৯৮ হতে পুনরুদ্ধৃত।
৬৮. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশমস্কন্ধঃ), পৃ. সূচনা
৬৯. প্রতীক বসু, নির্বাহী সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল : ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ১৪৭
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৭৩. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৮
৭৪. প্রতীক বসু, নির্বাহী সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল : ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ১৪৭
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৭৭. জ্যোতিভূষণ চাকী, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (শ্রী গীতগোবিন্দম্), নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ১৪৮
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৮০. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃ. ২০৩

৮১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪৫

৮২. জ্যোতিভূষণ চাকী, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (শ্রী গীতগোবিন্দম্), নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ১৪৯

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৮৪. (সুশীলকুমার দে) Sushil Kumar Dey, History of Sanskrit literature existence, p. 394-395

৮৫. তাপসী ঘোষ, এম.ফিল. গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত) দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক পৃ. ৪০

৮৬. জ্যোতিভূষণ চাকী, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (শ্রী গীতগোবিন্দম্), নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ২২৪

৮৭. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ বইয়ের সূচিপত্র থেকে সংগৃহীত, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃ. ১৭৮-২৫৬ সারাংশ

৮৮. প্রাগুক্ত, সূচীপত্র

৮৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৯

৯০. সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, পৃ. ১৫৪

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৯২. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃ. ২৪৩ (দশমঃসর্গঃ গীতম্-১৯)

৯৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪৫, দশম সর্গ, গীতম-১৯ ॥৯॥

৯৪. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস প্রণীতম, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত) পৃ. ৩৩৪

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৯৬. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃ. ১১০

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

১০০. গীতগোবিন্দ, *একাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোক।*

১০১. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭

১০২. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃ. ১৯০

১০৩. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক* (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ১৯

১০৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৯

১০৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২০

১০৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১

১০৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১

১০৮. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা* (হাজার বছরের বাংলা গান), প্রকাশন প্যাপিরাস, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ১৫

১০৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৬
১১০. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৯
১১১. প্রতীক বসু, নির্বাহী সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, নবপত্র প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৫ই জুন, ২০১১, পৃ. ১৫৩
১১২. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক* (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ১০৪
১১৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১০৪
১১৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, পৃ. ২৯
১১৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৯
১১৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৯
১১৭. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯
১১৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৩
১১৯. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩৪
১২০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬
১২১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬
১২২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬
১২৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৬
১২৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৭
১২৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৮৬
১২৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৮৭
১২৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ১৯
১২৮. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৮৬
১২৯. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ২৩
১৩০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৩
১৩১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ২০
১৩২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১
১৩৩. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রকাশন সহিত্য সংসদ, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩০
১৩৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১

১৩৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৮৯

১৩৬. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রকাশন সহিত্য সংসদ, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩১

১৩৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪

১৩৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৮

১৩৯. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৮৬

১৪০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ২২

১৪১. নীলরতন সেনের সম্পাদনায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০২, পৃ. ৩২১

১৪২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৯১

১৪৩. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, প্রকাশন সহিত্য সংসদ, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৭

১৪৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৯১

১৪৫. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশনা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রকাশকাল : ১৯৯৩, পৃ. ২৫

১৪৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৯৬, পৃ. ৯৩

১৪৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৯৩

১৪৮. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক* (এমফিল, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২১

১৪৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৯

১৫০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৯

১৫১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২০

১৫২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১

১৫৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১

১৫৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২২

১৫৫. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্রকাশন প্যাপিরাস, প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৫, পৃ. ২৭

১৫৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৮

১৫৭. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক* (এমফিল, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২২

১৫৮. প্রাগুক্ত, ঐ, ২২

১৫৯. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬, পৃ. ৬১

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১৬১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, কোলকাতা দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬, পৃ. ৬১

১৬২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬১

১৬৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬৩

১৬৪. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১২৮

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

১৬৬. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ২৯

১৬৭. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*, প্রকাশন দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৮

১৬৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৮

১৬৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৯

১৭০. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক* (এমফিল, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২১

১৭১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২২

১৭২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৩

১৭৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪

১৭৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪

১৭৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৫

১৭৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৮

১৭৭. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, পৃ. ১৯৬

১৭৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৯৭

১৭৯. লোচন শর্মা বিরচিত, *রাগ তরঙ্গিনী*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ সম্পাদনা ও ভাষান্তর রাজ্যেশ্বর মিত্র ভূমিকা ১৩৯১, পৃ. ১

১৮০. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য*, প্রকাশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৯

১৮১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩২

১৮২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩২

১৮৩. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী* পরিচয়(নব পর্যায়), প্রকাশন : সাহিত্য লোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৪

১৮৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫

১৮৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫

১৮৬. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩৩

১৮৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

১৮৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

১৮৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

১৯০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

১৯১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়* (নব পর্যায়), প্রকাশন : সাহিত্য লোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩

১৯২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫

১৯৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩৫

১৯৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩৫

১৯৫. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় :* (নবপর্যায়), প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩

১৯৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪

১৯৭. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫

১৯৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩৫

১৯৯. কালিদাস রায়, *পদাবলী সাহিত্য*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কোলকাতা ১৩৮৩, পৃ. ১৪-১৬

২০০. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫

২০১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৭

২০২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩৯

২০৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৯

২০৪. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় :* (নবপর্যায়), প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৬

২০৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৭

২০৬. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৫

২০৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৫

২০৮. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় :* (নবপর্যায়),প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ১১

২০৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১

২১০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১

২১১. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৪৫

২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২২০. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৪৬

২২১. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৪৮

২২২. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৪৮

২২৩. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৪৮

২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২২৬. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রকাশন : সাহিত্য সংসদ, প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০১৫, পৃ. ১৮

২২৭. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৯

২২৮. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৯

২২৯. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ২০

২৩০. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ২০

২৩১. সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, প্রকাশন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল : জুন ২০১১, পৃ. ২০৭-২০৮

২৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. সূচিপত্র

২৩৩. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৭৯

২৩৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কোলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ৪৪

২৩৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৮৩-৮৬

২৩৬. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বাংলার সংগীত (মধ্যযুগ)*, কোলকাতা ১৯৫৫, পৃ. ২৭

২৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২৩৯. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১২৬

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

২৪১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৪৫

২৪২. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১২৮

২৪৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২৯

২৪৪. প্রাগুক্ত, ঐ, ১২৯

২৪৫. *চৈতন্য ভাগবৎ*, ২/২৫

২৪৬. প্রাগুক্ত, ঐ

২৪৭. প্রাগুক্ত, ঐ

২৪৮. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১৩০

২৪৯. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিশু ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২১৪

২৫০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১৫

২৫১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১৫

২৫২. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৪, পৃ. ১৬২

২৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২৫৪. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিশু ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২১৪

২৫৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১৫

২৫৬. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৮৭

২৫৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৮৮

২৫৮. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৪৮

২৫৯. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৮৮

২৬০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৮৯

২৬১. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৪, পৃ. ১৬৩

২৬২. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৮৯

২৬৩. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৪, পৃ. ১৭৪

২৬৪. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৯০

২৬৫. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ এবং মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, পৃ. ৯১

২৬৬. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৯১

২৬৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫১

২৬৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৯৪

২৬৯. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ৯৪

২৭০. Bimal Kumar Ray, *Sakta Padavali,* Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996. p. 160

২৭১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫১

২৭২. Bimal Kumar Ray, *Sakta Padavali,* Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996. p. 160

২৭৩. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬১

২৭৪. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬২

২৭৫. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬২

২৭৬. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬২

২৭৭. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কোলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ২০

২৭৮. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫১

২৭৯. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১০৯

২৮০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১০৯

১৮১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১১

২৮২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫৩

২৮৩. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১০১

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২৮৫. ড. দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, প্রকাশনা : আকাদেমি অব ফোকলোর, প্রকাশকাল : ২০০৪, পৃ. ১৪৫

২৮৬. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিশু ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫৮

২৮৭. ড. দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলার লোকসংংফস্কৃতির বিশ্বকোষ, প্রকাশনা : আকাদেমি অব ফোকলোর, প্রকাশকাল : ২০০৪, পৃ. ১৪৫

২৮৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৬

২৮৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৬

২৯০. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬০

১৯১. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, প্রকাশন : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫৮

২৯২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫৫

২৯৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোকসংগীত*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ৩২

২৯৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৯৬. Bimal Kumar Ray, *Sakta Padavali,* Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996. p. 179

২৯৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৮০

২৯৮. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক, এম.ফিল. (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২৭
২৯৯. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ২৭
৩০০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫৯
৩০১. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক এম.ফিল. (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২৮
৩০২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৮
৩০৩. সেলিম আল দীন, *বাংলা নাট্যকোষ*, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল ১৯৯৮, পৃ. ২৮০
৩০৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৮০
৩০৫. Nishikanta Cattopadhyay, p. 63-64
৩০৬. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*,প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল, জুন ২০০৭. পৃ. ১১
৩০৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১
৩০৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২
৩০৯. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৩ [উদ্ধৃতি : মনীন্দ্রলাল কুণ্ডু প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯]
৩১০. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*,প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল, জুন ২০০৭. পৃ. ১১
৩১১. প্রবোধবন্ধু অধিকারী, আটশো বছর যাত্রারথে–
৩১২. মনীন্দ্রলাল কুণ্ডু প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৩১৩. মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, দ্বি-সং, ১৯৫৯, পৃ. ৪৮
৩১৪. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৮৯ (১৯৮২) কোলকাতা, পৃ. ৫১১
৩১৫. নরেন বিশ্বাস, *প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৫১
৩১৬. আসকার ইবনে শাইখ, বাংলা মঞ্চ নাট্যে পশ্চাৎভূমি, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ১২৬
৩১৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫৭
৩১৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৮
৩১৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬৬
৩২০. Chhaya Chatterjee, Tappa, Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996, p. 316
৩২১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১৭
৩২২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬৬
৩২৩. Chhaya Chatterjee, Tappa, Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996, p. 317
৩২৪. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১১৭
৩২৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৮

৩২৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৮
৩২৭. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক, এম.ফিল. (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২৭
৩২৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১১৮
৩২৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৭
৩৩০. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক এম.ফিল. (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ২৮
৩৩১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৬২
৩৩২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬২
৩৩৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬২
৩৩৪. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১১৮
৩৩৫. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দকি সম্পর্ক* (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, এম.ফিল) পৃ. ২৯
৩৩৬. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৬২
৩৩৭. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ৬২
৩৩৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬২
৩৩৯. মৈত্রেয়ী দেবী, প্রকাশন : প্রাইম পাবলিকেশন, ১৯৮৯, পৃ. ৫২
৩৪০. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৭৯
৩৪১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৬৬
৩৪২. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩৩৪
৩০৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫৯৬
৩৪৪. Chhaya Chatterjee, Santraya Sangita and Music Culturee of Bengal through the ages, Vol. II, Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996, p. 398
৩৪৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫৯৬
৩৪৬. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩০
৩৪৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৩১
৩৪৮. সুকুমার রায়, *বাংলা সংগীতের রূপ*, ফার্মা কেত্রলএম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ১৯৯১, পৃ. ৩৩
৩৪৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩
৩৫০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩
৩৫১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩
৩৫২. আবু সৈয়দ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৬০২
৩৫৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬০২

৩৫৪. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৪৮

৩৫৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৮

৩৫৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৯

৩৫৭. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ৬৫

৩৫৮. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৪৮

৩৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কোলকাতা, সূচিপত্র, পৃ. ৮

৩৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ব্রহ্মসংগীত*, স্বরবিতান ২৫, পৃ. ১০৮

৩৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ৪৬*, গীতিচর্চা-১, পৃ. ২৪৪

৩৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা-২*, পৃ. ৩৭৫

৩৬৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৩৪

৩৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্ববিতান-১০*, পৃ. ৫৭৩

৩৬৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৭৩

৩৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা-২*, আনুষ্ঠানিক-১, পৃ. ৬১২

৩৬৭. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৫২

৩৬৮. Carlyle, *The Hero as a poet,* p. ৩৩০

৩৬৯. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৫৪

৩৬০. রবীন্দ্র সংগীত, পৃ. ১৬৭

৩৭১. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬৭

৩৭২. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৬৭

৩৭৩. অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য, *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*, প্রকাশন : সাহিত্য রংবেরং পাবলিকেশন, প্রকাশকাল : ১৪২৩, দোল পূর্ণিমা, পৃ. ১৩

৩৭৪. প্রাগুক্ত, ঐ. পৃ. ১৩

৩৭৫. শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০/২১/১০

৩৭৬. অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য, *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*, প্রকাশন : সাহিত্য রংবেরং পাবলিকেশন, প্রকাশকাল : ১৪২৩-দোল পূর্ণিমা, পৃ. ১৪

৩৭৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫

৩৭৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫

৩৭৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫

৩৮০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫

৩৮১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫

৩৮২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৩

৩৮৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৩

৩৮৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৫

৩৮৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬০২
৩৮৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬০৩
৩৮৭. ভরতচন্দ্র রায়, অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৬
২৮৮. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৩৫
৩৮৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬
৩৯০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *পঞ্চ-গীতিকবির গান* অবসর প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২০০০, পৃ. ৭১
৩৯১. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩১০
৩৯২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১৩
৩৯৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১৩
৩৯৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১৪
৩৯৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩১৫
৩৯৬. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, সাহিত্য সংসদ ১৯৬৬, ভূমিকা পৃ. ৪৭
৩৯৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৭
৩৯৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩২১
৩৯৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩০
৪০০. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৩৬
৪০১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৮
৪০২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৮
৪০৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *পঞ্চ-গীতিকবির গান* অবসর প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২০০০, সূচিপত্র
৪০৪. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩৩৪
৪০৫. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত, *পঞ্চ-গীতিকবির গান* অবসর প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২০০০, পৃ. ২৩৯
৪০৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪০
৪০৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪০
৪০৮. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬১১
৪০৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬১২
৪১০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬১৩
৪১১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬১৪
৪১২. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ১২৬
৪১৩. নজরুল সংগীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন
৪১৪. তাপসী ঘোষ, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (এম.ফিল. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ১১৮
৪১৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৮

৪১৬. করুণময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৩৭০

৪১৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৭০

৪১৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৭১

৪১৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৭২

৪২০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৬৮

৪২১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬৮

৪২২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
কীর্তন

কীর্তন বাংলার মাটিতে কখন জন্মেছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে কীর্তন বিষয়ক গবেষকগণ সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে দ্বাদশ শতকে অর্থাৎ জয়দেবের সময়ে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় কীর্তনের ধারা প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। কীর্তন হলো স্তুতিবাচক গান। কৃৎ ধাতুর অনঢ় প্রত্যয় যোগ করে কীর্তন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপে প্রধানত শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য ভক্তরূপ, নামরূপ, গুণ লীলা ইত্যাদি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গটি হলো কীর্তন। তাছাড়া গুরুদেব বা বৈষ্ণব ভক্তদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা তাদের মহিমার কথা বর্ণনার নামই কীর্তন। সুতরাং কীর্তন হলো স্মরণাত্মক এবং বর্ণনাত্মক। ভক্তি সাধনার যে নয়টি অঙ্গ প্রকরণ করা হয়েছে তার প্রধান দুটি প্রকরণ হলো কীর্তন এবং শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ উক্ত নববিধা ভক্তির নয়টি স্তর হলো—১. শ্রবণ, ২. কীর্তন, ৩. স্মরণ, ৪. পদসেবা, ৫. অর্চন, ৬. বন্দন, ৭. দাস্য, ৮. সখ্য, ৯. আত্মনিবেদন।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥[১]

কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা। তবে কীর্তন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে এই অর্থের ইঙ্গিত আছে—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ো কণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রন্ বেণোরধরসুধয়া পুরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০/২১/৫)[২]

৪.১ কীর্তনের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

'কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। কীর্তি ও কীর্তন এই দুইটি শব্দই কৃৎ ধাতু হতে এসেছে। রূপে শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁর নাম স্মরণ, গুণ বর্ণন, গুণ যশোসূচক গানের নাম কীর্তন।'[৩] ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম গুণান্বিত। তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সকলের আশ্রয়। তাঁর মহিমা অনুত্তর। তাই ঈশ্বরের নাম, গুণ ও যশোকথা আবৃত্তি ও গান কীর্তনের বিশিষ্ট অর্থ। ভক্ত ও সাধকজন বরাবরই কীর্তন শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেন। এটাই এখন কীর্তনের প্রচলিত অর্থ।

কীর্তন সৃষ্টি রহস্য বিচার না করেও সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যা ছিল উত্তম এবং মধ্যম বৃন্দগান, তারই অপভ্রংশ অধম বৃন্দরূপে ছিল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এবং পরবর্তী সংস্করণই রূপ নিল গৌড়েলা প্রবন্ধের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত, এ ছিল পূর্বভারতের প্রধান সঙ্গীত। রাধাতত্ত্ব বিধৃত হলো কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞ কাব্যশ্রষ্ঠার হাতে। 'প্রাক চৈতন্যযুগের কেন্দুবিল্বের গায়ক জয়দেব, মিথিলার গায়ক বিদ্যাপতি এবং নান্নুরের গায়ক চণ্ডীদাস মুখরিত হয়ে উঠলেন শ্রীমতি রাধার উৎকর্ষ ব্যাখ্যায় আর রাধামুখে কৃষ্ণ কথা বর্ণনাকে কীর্তন নামে অভিহিত করলেন। সমগ্র ব্রজ বর্ণনাই কৃষ্ণের যশোগাথা, তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন শুভলগ্নেই এ সঙ্গীত পদ্ধতিকে কীর্তন নামে অভিহিত করা হলো।'[৪]

'নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্'–শ্রীহরি নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। নবধা ভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ কীর্তন। এই কীর্তন 'জপ' নামেও পরিচিত। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি'। জপ ত্রিবিধ–মনে মনে জপ, উপাংশু জপ, বাচিক জপ। উপাংশু জপ হচ্ছে অপরে শুনতে পাবে না, অথচ আমার ওষ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র আমি শুনতে পাব। আর বাচিক জপ হচ্ছে উচ্চকণ্ঠে হরি কীর্তন।'[৫]

নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন ভেদে দুই প্রকার। নামকীর্তনে শ্রীহরির নাম ও করুণার কথাই প্রধান, আর লীলাকীর্তনে তাঁর রূপ, গুণ ও বিভিন্ন মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। নামকীর্তনই হোক, আর লীলাকীর্তনই হোক সঠিক তাল প্রয়োগে বিশুদ্ধ সুরে ও বিভিদ রাগ রাগিণী যোগে গাইতে হয়।

'The Dictionary meaning of the word kirtan 'the act of praising', but the music it is the act of singing the glories of the Load in concert. Kirtan is an ancient term and is derived from the word 'kirti' which means fame, reputation

achievements. Both kirti and kirtan are derived from krt dhatu. Kirta + ktin is kirti and when the kirtis of the Lord are sung aloud in chorus in rag, tal, lay, ras and bhav, it is kirtan'[৬]

শ্রবণ ও কীর্তন ভক্তি অঙ্গের দুটি উপকরণ এবং কীর্তন হলো স্তুতিবাচক। কীর্তন যেহেতু স্তুতিবাচক অর্থাৎ বাচ্যের মাধ্যমে ভগবৎ স্তুতি প্রকাশ করে সেহেতু আভিধানিক অর্থ বিচারে কীর্তনকে এক কথায় গান না বললেও চলে কারণ ভগবৎ বিষয় নিয়ে যে কথকতা তা কীর্তন বলে অভিহিত। এই কথকতা কীর্তনকে বলে শুক কীর্তন। 'নৈমিষারণে (লক্ষ্ণৌ-এর কাছে) প্রথম কথাকতা কীর্তনের আসরে ৬০ হাজার শ্রুতিধর ঋষি উপস্থিত ছিলেন। এরা পূর্বজন্মে সকলেই ব্রহ্মার সন্তান ছিলেন। এই ঋষিদের সূত্র ধরেই কথকতা কীর্তনের ধারা বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়।'[৭]কীর্তনের দ্বিতীয় প্রকরণটির মূল প্রচারক হিসাবে নারদ মুনিকেই গণ্য করা হয় এবং সেই ধারাটিকে বলা হয় নারদীয় কীর্তন। 'বহুগণর্ভি মিলিত্বা তদ্গান সুখম্।'[৮]

কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ :

বন্দনা কীর্তন
প্রার্থনা কীর্তন
আরতি কীর্তন
অধিবাস কীর্তন
পরবগান
সূচক কীর্তন
নামকীর্তন
পদাবলী কীর্তন
লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন।

এগুলো সবই যে সমসাময়িক সৃষ্টি, তা কিন্তু নয়। পরবগান ও পদাবলী কীর্তনের যে ধারা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে, তাই পরে লীলাকীর্তনের রূপ পরিগ্রহণ করেছে, পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সূত্রে নামকীর্তনের রূপায়ন এবং বৈষ্ণবীয় ভজনপ্রণালী সূত্রে বন্দনা, প্রার্থনা, আরতি ও অধিবাসের সূচনা হয়। সূচক গানও প্রাচীনকালের সৃষ্টি, তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দের সূচক ষোড়শ শতকেরই প্রকরণ।'[৯]

বন্দনা কীর্তন : বৈষ্ণবীয় নববিধা ভক্তির বিশেষ অঙ্গ হলো বন্দনা। প্রাচীনকালের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো গ্রন্থকার গ্রন্থসৃষ্টির প্রারম্ভেই যে যার উপাস্য দেবতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ভাষায় একটি করে বন্দনা লিখতেন। কীর্তনের বন্দনা গাওয়ার সময় সহজ তালে এবং পরিচিত সুরে গাওয়া হয়, যাতে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। গায়ক বন্দনা গাওয়ার সময় ভক্তদের ভাবের উপযুক্ত আখর সংযোজন করেন। এতে বন্দনা একটি বিশেষ শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। প্রধানত যে বন্দনাগুলো বিশেষভাবে গাওয়া হয়ে থাকে সেগুলো হলো গুরুবন্দনা, গৌরবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, রাধাকৃষ্ণ বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা।[১০]

গুরুবন্দনা : বেশ কয়েকটি গুরুবন্দনার গান পাওয়া যায়, তার মধ্যে যে গানটি সবচয়ে বেশি প্রচলিত সেটি হলো বৈষ্ণব দাস রচিত একটি প্রসিদ্ধ পদ। আগে বড় গায়কগণ একতালি তালে গাইতেন। কিন্তু পরবর্তী যে সুরটির প্রচলন তা সাধারণ দাসপ্যারী তালের প্রচলিত সুর। নানাবিধ আখর সংযুক্ত করে নানাভাবে বৈষ্ণব মহলে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। গানটি হলো :

মূলপদ : জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকল্পতরু
আখর– ১. বদনভরে জয় গাও ভাই
২. পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের
৩. যাহার কৃপায় নাম পেলাম ইত্যাদি
মূলপদ – অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ হে।
আখর– ১. কি অদ্ভুত প্রকাশরে ভাই
২. জীবের নিস্তার লাগি
৩. আপনি শ্রীনন্দসুত, ইত্যাদি।

এভাবে পুরোপদটিতেই আখর সংযোজিত হয়েছে। এরকম আরো অনেক গুরুবন্দনার গান আছে। কিন্তু এ গানটিই বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।[১১]

বৈষ্ণবের কাছে 'মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান', গুরু সমস্ত মঙ্গলাধার সর্বানন্দময় বিভু সত্তা। 'শুদ্ধস্বর্ণরুচি বিভুম, শুদ্ধ ভাবভূষা কলেবরং, সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গং, করুণামৃতবর্ষিণং' প্রভৃতি। যেহেতু আত্মাকে তথা পরমাত্মাকে প্রিয়তম রুপে পাবার সুযোগ তিনি করে দেন, তাই তিনি বিদ্বান এবং তিনিই হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।[১২]

গুরুকে কৃষ্ণরূপে, আবার গুরুকে সখারূপে ভজন করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিধি। তিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, চরাচরপরিব্যাপ্ত, জ্ঞানাঞ্জনশলাকাধারী। দক্ষ, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে কোনো দেবজ্ঞানে তিনি পূজ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আছে :

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহি'চিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধা সূয়েৎ সর্বদেবময়ো গুরুঃ।"[১৩]

গৌরবন্দনা : গৌরবন্দনা অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করা হয় কীর্তনের প্রাক্কালে। লীলাকীর্তনে গৌরিচন্দ্রিকা প্রচলিত হওয়ার দরুন পৃথকভাবে কোন গৌরবন্দনার পদ গাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রাচীন গায়কগণ 'আপত্তনের' সূত্রে গৌরবন্দনা বা আবাহন করে থাকেন। 'আপাত্তনের' দুটি অংশ–'পূর্বরূপ' এবং 'উত্তররূপ', যাকে সুরের আলাপও বলা যেতে পারে। এই আলাপ পর্যায়ে–'এস হে, গৌর হে' এই কথাটি নানাভাবে উচ্চারণ করে গৌরবন্দনা করা হয়। এর পরেই শুরু হয় গৌরচন্দ্রিকা, যা মূলত গৌরবন্দনাই। অবশ্য কীর্তনের প্রারম্ভে গৌর ও নিতাইকে আহ্বান করা দীর্ঘকালের প্রচলিত ধারা চলে এসেছে। নিচের পদগুলোই গৌরবন্দনায় বেশি গাওয়া হয়ে থাকে :

"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"
বা
"এস গৌরাঙ্গ এস নিতাই।
এস দুটি ভাই গৌর নিতাই।
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে।
পুজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে হে।"[১৪]

আখরযুক্ত হয়ে এইসব পদগুলো বেশ আকুতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সাধারণত এসব আখর শ্রোতাদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়।

দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।
[চৈতন্যচরিতামৃত][১৫]

পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা : পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা হলো শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আদ্যন্ত বা আঙ্গিক কীর্তন। 'পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা' গানে গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর এই পঞ্চতত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য গৌরপরিকগণের জয়সূচক গান থাকে। এই পাঁচজনকে পঞ্চতত্ত্ব বলার কারণ নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব

আন্দোলন হয়েছিল এই পাঁচজনই ছিলেন প্রধান।শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের শ্লোক ৬-এ আছে–

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ–স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

অর্থাৎ–শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি–এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। এই শ্লোকটির তাৎপর্য হচ্ছে–শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতারূপে তাঁর স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর দেহ অপ্রাকৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে পরমানন্দময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাই বলা হয় ভক্তরূপ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় ভক্তস্বরূপ। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছেন। শ্রীগদাধর তাঁর শক্তি। এর দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের বাক্য, 'পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে'–এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর।

পঞ্চতত্ত্ব বন্দনায় ভক্তদের মনের মতো আখর সংযোজন করে কোনো কোনো স্থানে গানটিকে ভরে তোলা হয়। এটি হলো নিয়ম এবং উপস্থিত সকলেই সববেতভাবে এ গানটি গেয়ে থাকেন।'[১৬] এই গানটি রামদাসবাবাজী মহারাজ খুব রসসিক্ত ও ভাবসমৃদ্ধ করে তুলতেন।

'জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ।'[১৭]

এই অংশটুকু সাধারণ দাসপ্যারী, আর নিচের অংশ চঞ্চুপুট তালে–

'জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত্যেচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥'[১৮]

(এবার আমায় দাও গৌর চরণ) সবকয়টি চরণ একই সুরে, সেই জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় চরণ একটু চড়িয়ে গাওয়া হয়।

রাধাকৃষ্ণ ও পাঠের আঙ্গিক কীর্তন : এই গানগুলো সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও পদ সবক্ষেত্রে একরকম নয়। সুর, তাল ও পরিবেশনের দিক থেকে পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণ বন্দনা একই রকম। শুধু গানের কথা ভিন্ন। এখানেও প্রথম অংশটুকু দাসপ্যারী ও পরের অংশ চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়।

প্রথম অংশ :

"জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।

রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ॥"

দ্বিতীয় অংশ :

"জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥"

শেষে (এবার আমায় দাও যুগল চরণ)[১৯]

বৈষ্ণব বন্দনা : বৈষ্ণব বন্দনার পদে মহাজন পদাবলী অনেক থাকলেও একটি গান সর্বক্ষেত্রেই আবশ্যকীয় অর্থাৎ লীলাকীর্তনই হোক, নামকীর্তনই হোক আর প্রার্থনাদি অন্য কীর্তনই হোক সর্বক্ষেত্রেই কীর্তনের শেষে সবাই মিলে একটি গানই করে থাকেন। গানটির প্রথম চরণ 'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায়নম' (চৈতন্য ভাগবত ২/১) 'চৈতন্য ভাগবতে এই গানটি নামকীর্তন হিসাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু পদটি সামগ্রিকভাবে বন্দনা, প্রধানতঃ বৈষ্ণব বন্দনা বলে প্রতিক্ষেত্রেই সবশেষে গাওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আখর সংযোজনার রীতিও বিশেষ নাই। বৈষ্ণব ভক্তগণ প্রায় সকলেই এ গানটি জানেন এবং সমভাবে গেয়ে থাকেন।'[২০]

প্রার্থনা কীর্তন: গৌর নিত্যানন্দের চরণে শরণাগতি, বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও অভিলাষ জ্ঞাপন ইত্যাদি অভিপ্রায়ে গানের উপযুক্ত করে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেসব পদ রচনা করেছেন, সেগুলোই হলো প্রার্থনার পদ এবং সেগুলোই হলো প্রার্থনা কীর্তন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ, রাধামোহন, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাসসহ অনেকেরই পদ রয়েছে।[২১] সবচেয়ে নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত পদ হৃদয়গ্রাহী ও স্বকীয় সত্তা নিয়ে আজও অব্যাহতরূপে সকলকে আনন্দিত করে। এই প্রার্থনাগুলোর মধ্যে অনেক গানই গড়ানহাটী গান হিসাবে প্রসিদ্ধ। আত্মনিবেদনের আকুতিই বৈষ্ণবের প্রধান বিষয়। নরোত্তমদাস ঠাকুর বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেও তাঁর আশা মিটে নাই। তিনি শ্রীগোবিন্দের চরণে আত্মনিবেদন করে লিখলেন,

"যুগল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধ্যেবা,
যুগলেই মনের পিরিতি,
যুগলকিশোর রূপ, কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি॥"[২২]

ব্রজে বাসের মধুরিমা কীর্তন করা হয়েছে নিচের পদটিতে–

"হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো॥

যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপীকার নূপুর,

তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো ॥"[২৩]

পদমাধুর্য বিচারে বা নিবেদনাত্মক অভিব্যক্তি হিসাবে এমন পদ দুর্লভ। এই গানগুলো সাধারণত ঠাকুর বাড়িতে, অল্প লোকসমাগমে ছোট আসরে বা ঘরে অল্প সময়ের জন্য গাওয়া হয়। কিন্তু গানগুলোতে আকর্ষণ থাকে বেশি।

৩. আরতী কীর্তন : খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিয়ে ত্রিসন্ধ্যা আরতি হয়। আর বিশেষ সময়ে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই কীর্তন বেশির ভাগ ঠাকুরবাড়িতেই নিত্যকৃত্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিত্যতা হলেও, কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তদের সমাগম হলে আরতির সময় কীর্তন হয়। আরতি তিন প্রকার :

ক) মঙ্গল আরতি,
খ) মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি,
গ) সন্ধ্যা আরতি।

ক) প্রত্যুষে দেবতার শ্রীবিগ্রহের নিদ্রাভঙ্গ হলে তাঁকে জাগানো হয় এবং মঙ্গল আরতি শুরু হয়। খোল করতাল বাজিয়ে মঙ্গল আরতির নির্দিষ্ট পদগুলো সমবেতভাবে গাইতে হয়। মঙ্গল আরতির দুটি পর্যায়—শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গলারতি এবং যুগলকিশোর মঙ্গল আরতি।

শ্রীগৌরাঙ্গের আরতিকালে গেয় পদটি :

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।

মঙ্গল শ্রীনিত্যানন্দ জোরহি জোর।

এর পরে গাওয়া হয় যুগল কিশোরের মঙ্গল আরতি। পদটির প্রথম চরণ :

"মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।

মঙ্গল সখীগণ প্রেম রসে ভোর।"

উভয় মঙ্গল আরতিরই একই প্রভাতী সুর। তাল চঞ্চুপুট।

খ) মধ্যাহ্নকালীন আরতি বলতে ভোগ-আরতি। ভোগের নানাবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন করে মন্দিরে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার প্রতিটির উপর তুলসীমঞ্জরী দিয়ে পূজক ভোগ নিবেদন করেন, আর বাইরে নাটমন্দিরে ভক্তগণ খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন গাইতে থাকেন। এ কীর্তনের দুটি প্রকরণ—মহাপ্রভুর ভোগ-আরতি ও রাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতি। মহাপ্রভুর ভোগ-আরতিরও প্রকারভেদ আছে।

যেমন—শান্তিপুরের ভোগ এবং নবদ্বীপের ভোগ। শান্তিপুরের ভোগ আরতির পদে অদ্বৈতের পত্রপ্রেরণ নিমন্ত্রণাদি থেকে শুরু করে সমস্ত বর্ণনা থাকে। বিভিন্ন মন্দিরে এসব বিভিন্ন প্রকরণগুলো গাওয়া হয়। মহাপ্রভুর ভোগের শুরুর পদটির প্রথম চরণ হলো :

'ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী
দীন দয়াময় হিতকারী ॥'

রাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতির পদে শুরু করা হয়—

'ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
ও গিরিধারী গোবর্ধন বিহারী
কেলি কলারস গোপীমন চারী।'

গ) আরতির তৃতীয় পর্যায়টি হলো 'সন্ধ্যা আরতি'। এটি বৈষ্ণবীয় দেব-দেউলের কৃত্য। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে ঘণ্টা, কাঁসর, বেল, করতাল ও খোল। সমভাবে সবকটি একসাথে বাজানো হয়, সেই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গাওয়া হয় সন্ধ্যারতির গান। সন্ধ্যারতিরও বিভিন্ন রকম পদ হয়ে থাকে। যেমন—মহাপ্রভুর আরতি, মদনগোপালের আরতি, তুলসীর আরতি ইত্যাদি। এসব পদগুলো অতি সহজ সুরে চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়। এখানে কোনো আখরের প্রয়োগ নাই।

'ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্তনের সুমধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥'[২৪]

অধিবাস কীর্তন : অধিবাস কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। অধিবাস কীর্তন হলো আনুষ্ঠানিক কীর্তন। পরের দিন প্রাতঃকাল থেকে কীর্তন মহোৎসবের শুরু হবে এমন সংকল্প করার জন্যই অধিবাস কীর্তন করা হয়। সংকল্পিত কীর্তন বলতে প্রহরব্যাপী সংকল্প। আট, ষোল, চব্বিশ ইত্যাদি বহুপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন হতে পারে। আবার অষ্টকালীন লীলাকীর্তনও হতে পারে অথবা নানাপ্রকার কৃষ্ণ লীলাগানও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অধিবাস গান করতে হয় আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। সে সময়ে বিগ্রহের পূজা অভিষেক হয়, নাটমন্দিরকে আমের পল্লব দিয়ে সাজাতে হয়। আসনে শ্রীচৈতন্যের প্রতিকৃতি বা মৃন্ময় বিগ্রহ বসানো হয়। পূর্বঘট স্থাপন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে

হয়। সন্ধ্যাবেলায় আসরে মালা, চন্দন, তিলক দিয়ে গান শুরু হয়। গান শেষ হলে খোল করতাল হারমনিয়াম ইত্যাদি যন্ত্রগুলো আসরে রেখে যেতে হয়। পরের দিন সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে গান শরু করতে হয়–

'জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥'
–ঠাকুর নয়নানন্দ[২৫]

৫. পরবগান : রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বৈষ্ণবদের কতোগুলো বিশেষ পর্ব আছে। এইসব পর্বের জন্য নির্দিষ্ট দিনে এ গানগুলো গাওয়া হয় বলেই এগুলোকে 'পরবগান' বলা হয়। পর্ব বা পরবগুলো হলো–হোলি, ঝুলুন, রাস, বাসন্তী রাস ইত্যাদি। এ ছাড়া কোনো কোনো ঠাকুরবাড়িতে এখনো নিয়মিত পর্ব উপলক্ষে গানগুলো গাওয়া হয়। প্রতিটি পর্যায়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বিশেষ লীলা হিসাবে পরিচিত, তাই গানগুলোর পর্যায়কে লীলা বলে চিহ্নিত করা হয়; যেমন–হোরিলীলা, ঝুলনলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি।[২৬] হোরিলীলা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির লীলা এবং বসন্তের বিশেষ লীলা। হোরিলীলার একটি পদ–

'এস বঁধু, আরবার খেলি হে ফাগুয়া
এবার হারিবে যদি ফাগুহারা নিরবধি
জগভরি গাব এই ধুয়া।'[২৭]

ঝুলনলীলা : ঝুলনলীলা হলো বর্ষাকালোচিত লীলা। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এ লীলা স্মরণ করা হয়ে থাকে। এ সময়ে প্রতিটি ঠাকুরবাড়িতে অতি সুন্দর করে সাজিয়ে একটি দোলা বানানো হয়, যাকে বলা হয় হিন্দোলা, তার উপরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে বসিয়ে ঝুলানো হয়। এটিই হলো ঝুলনলীলা বা হিন্দোললীলা। এই পালাটি সবসময় রাধারানীর অভিসার দিয়ে শুরু হয়।অভিসার পর্যায়ের তেওট তালের সুন্দর পদটি রচনা করেছেন 'জগমোহর দাস', শ্রীমতি রাধারানী মুরলী ডম্ফ ইত্যাদি শব্দ শুনতে পেরেছেন–

"ঘন মুরলী ধ্বনি জম্ফ শব্দ শুনি
উমরই নাগরী চিত।

সখিগণ সঙ্গে নামি ধনি নিকসল
গায়ত সুমধুর গীত।"[২৮]

অনুরাগ ভরে হেলে দুলে, নেচে নেচে, ব্রজের পথ আলো করে চলেছেন সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী রাধা বিনোদিনী।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ও কৃষ্ণের গোকুলে আগমন বৃত্তান্ত নিয়ে তেমন কোনো গান নাই। তবে পরের দিনের প্রাতঃকালীন উৎসবকে বলা হয় নন্দোৎসব। এ উপলক্ষে বিশেষ ধরনের গান আছে, যেটিকে বলা হয় 'নন্দোৎসব লীলা'। নন্দোৎসব লীলায় গৌরচন্দ্রিকাটি অভিনব, কারণ সমস্ত গৌরচন্দ্রিকাতেই শ্রীচৈতন্যদেবের হয় রাধাভাব, নয় শ্রীকৃষ্ণের ভাব; কিন্তু এই গৌরচন্দ্রিকাটিতে শ্রীচৈতন্যদের স্বয়ং পিতা নন্দের ভাবে বিভাবিত।[২৯]

"স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
স্বর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং
তমসা জনাত্যয়ে।" –শ্রীমদ্ভাগবতম্[৩০]

অর্থাৎ স্বীয় মায়াশক্তি অবলম্বনে সেই আপনিই জগৎ সৃষ্টির জন্য রক্তগুণান্বিত ব্রহ্মা, পালনের জন্য শুক্লবর্ণ সত্ত্বগুণান্বিত বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য কৃষ্ণবর্ণ তমগুণান্বিত রুদ্ররূপ ধারণ করে থাকেন।"[৩১]

পরবগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হলো 'রাসলীলা'। রাসলীলা দুই ধরনের। একটি হলো 'নিত্যরাস' বা 'মহারাস', অন্যটি হলো 'শারদীয় রাস' বা 'নর্তক রাস'। 'নিত্যরাস' যে কোনো সময়ই গাওয়া যায়, কিন্তু 'শারদীয় রাস' গাইবার সময় হলো বৃন্দাবনের পুরশ্চরণ কাল অর্থাৎ দেবী ভগবতীর শুভ বিজয়ার পরদিন যে একাদশী সেদিন থেকে শুরু করে শারদীয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এ লীলাটি গাওয়া হয়। রাসলীলা প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে সেই আদর্শকে আশ্রয় করে।

পদরচয়িতা মহাজনগণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর সাংগীতিক বিন্যাস অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে।

"পূর্ণরাস হেরিবারে যায় হর্ষভরে।
অতএব মহারাজ শুন তদন্তরে॥
অনন্তর রাসেশ্বর ব্রজগোপী সঙ্গে।
রাসক্রীড়া করিবারে মাতিলেন রঙ্গে॥"–শ্রীমদ্ভাগবত[৩২]

সূচক কীর্তন :

সূচক কীর্তন পরিবেশন করছেন শ্রী জীবশরণ দাস (শরণ) ও ভক্তবৃন্দ।
স্থান : শ্রীপাট, শ্রীখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত—২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট

গুরুবর্গের বা বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের তিরোধান তিথিকে উপলক্ষ করে বিরহ উৎসব সম্পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট চরিতগীত নির্দিষ্ট তালে ও সুরে গেয়ে গুরুকে বা আচার্যকে স্মরণ করা হয়। এই গানকেই বলে 'সূচক কীর্তন'। অনেকের জন্যই নির্দিষ্ট সূচকগান আছে। শ্রীগুরুপূর্ণিমা অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর সূচক গাওয়া হয়। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা করে তার পর নির্ধারিত সূচক কীর্তন শুরু করতে হয়। সনাতন গোস্বামীর সূচক, নরোত্তমদাসের সূচক, শ্রীনিবাস আচার্যের সূচক ইত্যাদি নানাবিধ সূচক গান আছে। নরোত্তমদাস ঠাকুরের একটি সূচক কীর্তনের প্রথম চরণ—

'পতিত পাবন প্রভু মদনগোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
কৃপা কর মো অধমেরে।
সংসার সাগর ঘোরে, পরিয়াছি কারাগারে,
কৃপা ডোরে বাঁধি লহ মোরে।'[৩৩]

'অনিত্য এ দেহকে আপন ভেবে ভুল করেছি। কখন মৃত্যু হয় তা জানি না।' তাই শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রাণ রাত্রি দিনে কাঁদছে ব্রজে যাওয়ার জন্য—

'হে শ্রীগুরুদেব! করি এই নিবেদন।
ব্রজে বাস দিও মোরে হে গুরুধন।'[৩৪]

নামসংকীর্তন : অনেকে মিলে ভাগবৎ-সুখ-নিমিত্ত ভগবৎ সম্পর্কিত যে গান গেয়ে থাকেন তাই হলো নামসংকীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেক মিলে গাওয়া

নামসংকীর্তনের উপর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদরের ও রাম রায়ের সঙ্গে রজনীতে কৃষ্ণকথা আলাপনরত মহাপ্রভু বলে উঠলেন–

'হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥'[৩৫]

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥'[৩৬]

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।

–চৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রী বাসস্থলী আশ্রম, রানীর বাজার, কুমিল্লা শহর। ১২ নভেম্বর ২০১৯-এ
নামসংকীর্তন পরিবেশন করছেন শ্রী সুমন চক্রবর্তী

হরিনামসংকীর্তন কলিতে সর্বাভীষ্ট লাভের শ্রেষ্ট উপায়। যোগী, জ্ঞানী ভক্ত সকলেই হরিনামকীর্তনে আপন আপন অভীষ্ট লাভ করতে পারবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের চারটি নাম। এগুলো হলো–

সত্যযুগের নাম–

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরা গতিঃ।

ত্রেতা যুগের নাম–

রাম নারায়ণাতন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।

দ্বাপর যুগের নাম–

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

কলি যুগের নাম–

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

চার যুগের এই চারটি নামেরই ত্রাণক্ষমতা আছে। তাই এদের তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়।[৩৭]

পদাবলী কীর্তন : পদাবলী কীর্তন পালাকীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগুলো পদকে সংকলিত করে ঘটনার নাটকীয় বর্ণনার উপস্থাপনকল্পে করা হয় পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন। পদকীর্তন হলো ইদানীং প্রচলিত কীর্তনের অর্থাৎ কবি জয়দেবোত্তর যুগে প্রচলিত কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ। যেমন–

'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম।
মধুর কোমলকান্তপদাবলীং শৃনু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥'

–শ্রীগীতগোবিন্দ[৩৮]

আর সংস্কারপ্রাপ্ত রূপটি হলো গড়ানহাটী গানের ধারা। ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পালা কীর্তন পর্যায় প্রকরণের সময় গানগুলো যখন সংযোজন করা হয়, তখন প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট্যের যথার্থরক্ষা করা হয়। তাই পদাবলী কীর্তনই হলো কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। কবি জয়দেব স্বরচিত মধুর কোমলকান্ত সঙ্গীতের নাম দিয়েছেন পদাবলী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পদাবলী শব্দটি গ্রহণ করেছেন। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচিত সঙ্গীতসমুহকে পদাবলী নামে অভিহিত করা হয়েছে। পণ্ডিগণের মতে পদাবলী শব্দটি দেশীয় ভাষা হতে গৃহীত। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পদ রচয়িতাগণের মধ্যে কবিরঞ্জন, রায়শেখর এবং গোবিন্দ আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিরঞ্জন এবং রায়শেখর পদকর্তাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবি রঞ্জনের নাম ছিল রঞ্জন,

উপাধি ছিল ছোট বিদ্যাপতি। গড়ানহাটী ধারাটি যেমন পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য তেমনি আবার হাল্কা সুরের গানগুলোকে শ্রুতিরোচক করে পরিবেশনের প্রচেষ্টাও শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়। এই ধারার শিল্পীরা ছিলেন–কৃষ্ণচন্দ্র দে, অর্পণা দেবী, কমলা ঝরিয়া, আঙ্গুরবালা, ললিতা বৈষ্ণবী, হরিদাস কর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, ব্রজেন সেন প্রমুখ।[৩৯]

পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন : বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলোকে লীলা বলে বর্ণিত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে লীলা হলো ভগবৎরূপের খেলা। লীলার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি নিত্যধারা। ভগবৎস্বরূপের প্রকৃত অবস্থার সমস্ত কর্মই লীলা। লীলাকীর্তনে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ আছে, সেগুলোর সংখ্যা অল্প। শ্রীরাধাকৃষ্ণের, শ্রীগৌরাঙ্গ–নিত্যানন্দের জন্ম লীলাদির পদ আছে, তার সংখ্যা বেশি নয়। বাৎসল্য রসের পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। নন্দোৎসব. ফলক্রয় লীলা, নবনীহরণ, শ্রীকৃষ্ণ বলরামের গোষ্ঠাষ্টমীলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বৎসচাণাদি লীলা, শ্রীরাধার জন্মলীলা উল্লেখযোগ্য। সখ্যরসের পদের মধ্যে গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ, যজ্ঞপত্নীগণের অন্নভোজন, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সঙ্গে বনবিহারের পদ পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার মধ্যেও মধুর রসের পদ আছে। কারণ গোষ্ঠেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। দানের যেমন দুইটি পালা–একটি শ্রীরাধা ও গোপীগণের মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয়, অপরটি–মনির যজ্ঞে ঘৃত দান। নৌকা বিলাসেরও তেমনি দুইটি পালা–একটি মধুরা যাত্রা পথে যমুনায় নৌকা বিহার, অপরটি শ্রীবৃন্দাবনেই মানসগঙ্গায় নৌকাবিহার। ঝুলন ও দোল মধুরসের পর্যায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধিক্ষণের পদ নাই। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদে সুপরিচিত।[৪০]

২০১৭ সালের ১৪ আগস্ট ঢাকা ইসকন মন্দিরে পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করছেন অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য। পাশে শিল্পীর বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন কীর্তনীয়া কৃষ্ণকীর্তন দাস ব্রহ্মচারী।

এই লীলাসূত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায়। পৃথকভাবে এ গানগুলো হলো লীলাকীর্তনের আঙ্গিকে লীলা প্রকরণটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য। বিভিন্ন পদকর্তার ওই লীলা সংক্রান্ত পদ সংগ্রহ করে গায়ক তাঁর আত্বিক ও শৈল্পিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা একটি আস্বাদনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী লীলাকীর্তনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো মেনে চললে লীলাকীর্তনের পূর্ণাঙ্গতা পায়–

(১) রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাইতে হয়।

(২) পদ-সংকলনে শাস্ত্রীয় ক্রম রক্ষা করতেই হয়।

(৩) ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজনপদাবলীর অভাব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুক গান বা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু উল্লেখ করতে হয়।

(৪) আখর সংযোজনের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং রসের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হয়।

(৫) শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে গান করতে হয়। প্রতিটি গানের ভনিতা গাইবার সময় পদকর্তার প্রতি সম্মান দেখাতে হয়।

(৬) সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্ব মানতে হয়, অর্থাৎ যে গান যে তালে এবং যে সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই যেন গাওয়া হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান সংযোজন করা হয়।

(৭) লীলাকীর্তন-বিশ্লেষণে কেবল নায়ক-নায়িকা, সখা-সখী ইত্যাদির প্রতি সমগ্র গুরুত্ব দিলে হয় না, পরিবেশ-বিশ্লেষণ অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয়।

(৮) অনুষ্ঠানের সার্বিকতা রক্ষাকল্পে ভক্তিভাব দেখাতে হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের মনমতো দেববিগ্রহের ফটো, মালা, তিলক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

(৯) তিলক, মালা ইত্যাদি পরাবার সাধারণ নিয়ম : প্রথমে একটি ফুল দিয়ে বাটিতে তিলক নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, পরে শ্রীখোল-করতালে মালা দিতে হয় তারপর মূলগায়েন, দোঁহার ও বাদকদের তিলক এবং মালা পরিয়ে প্রণাম করতে হয়।

(১০) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আবশ্যকীয় হলো মিলন। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পর্কিত গান, শেষ পর্যায়ে করতে হয় এবং এই মিলন শুনলেই বোঝা যায় গান শেষ।

(১১) লীলাকীর্তনের যে কোন সময়ে যে কোন লীলা গাওয়া চলে না। দিনের যে অংশে কীর্তন হবে, সে অংশের নির্দিষ্ট লীলাপ্রসঙ্গ গাওয়াই বিধেয়। যেমন : নিশান্তে–কুঞ্জভঙ্গ; প্রাতে–বাল্যলীলা, দেবগোষ্ঠ, গমনগোষ্ঠ, খণ্ডিতা; পূর্বাহ্নে–খেলাগোষ্ঠ, কলহান্তরিতা, শ্রীকুণ্ডমিলন, মধ্যাহ্নে–নবোঢ়া, রসোদ্গার, সূর্যপূজা, গোপীগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস; অপরাহ্নে–উত্তরগোষ্ঠ, পূর্বরাগ, রসোদ্গার, ভাবোল্লাস, সায়াহ্নে–রুপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ; প্রদোষে–রূপাভিসার, মিলন, নক্তলীলায়–রাসলীলা, সাক্ষাৎ আক্ষেপ, রসালস, তা ছাড়া মাথুর বিরহে ভবন এবং ভাবী পর্যায়ই প্রাতকালীন পর্যায়।

(১২) ঋতুভেদে উৎসবানুযায়ী কতগুলো লীলাপ্রকরণ আছে, সেগুলো গাইতে হয়। যেমন দোলে– হোরীলীলা; ঝুলনে–ঝুলন লীলা; জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব; বসন্তে–বাসন্তীরাস; শরৎকালের পূর্ণিমায় শারদীয়া রাস।

(১৩) লীলাকীর্তনে শ্রীখোল-সঙ্গতে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বাজাতে হয়। লীলার প্রসঙ্গ, ভাব ও রস অনুযায়ী ঠেকা, লহর, কাটান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। বাদককে দাঁড়াতে হয় এবং নৃত্যভঙ্গী দেখাতে হয়।

(১৪) অষ্টকালীন লীলাকীর্তন হয়, সময়োচিত নির্দিষ্ট আটটি প্রসঙ্গ নিয়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গায়ক ধরাবাহিকতা রক্ষা করে গান করে থাকেন।

(১৫) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা, ব্রজবুলি এবং সংস্কৃত এই তিনপ্রকার ভাষা এবং আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়।[৪১]

এই লীলাকীর্তনেরই অপর নাম 'পালাকীর্তন' এবং এই 'পালাকীর্তন' শব্দটি মনে হয় বাংলাদেশের সূত্রে এসে লীলাকীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'পালা' বলতে যাত্রা, নাটক ইত্যাদির পালা। লীলাকীর্তনে যেহেতু নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়, সেহেতুই মনে হয়, পালা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিবাসীগণ লীলাকীর্তনের পরিবর্তে পালাকীর্তনই বলে থাকেন। লীলাকীর্তনই হোক আর পালাকীর্তনই হোক, কীর্তনের এ ধারাটির সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে পরবর্তীকালে। গানগুলো যখন প্রথম রচিত হয় তখন সেগুলো পৃথক গান হিসাবেই গাওয়া হতো। তাই প্রত্যেকটি গানের পৃথক অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বের সূত্রেই গানের গড়ানহাটী রূপটি পাওয়া যায়। পরে লীলাপ্রসঙ্গের পূর্ণায়ত রূপ দিতে গানগুলো খুঁজে গায়কগণ একটি ঘটনার রূপ দিয়েছেন। স্বভাবতই এর সৃষ্টি কিছু পরে এবং এর সৃষ্টি ক্ষেত্রে বা পালা প্রকরণ ক্ষেত্রে কিছুটা মঙ্গলগানের প্রভাব আছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়া লোচনদাস ছিলেন মঙ্গলগায়ক। তাছাড়া 'নাটগানের' প্রভাবও যথেষ্টই আছে। এর থেকে বোঝা যায়, লীলাকীর্তনের পূর্ণাঙ্গ রূপসৃষ্টির প্রয়োজনেই মনোহরশাহী গানের ধারা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।[৪২] গানকে আখর দিয়ে পল্লবিত করা, সুরবিস্তার দিয়ে অলঙ্করণ করা, হাল্কাভাবে গানকে পরিবেশন করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদাবৃত্তি করে দেওয়া–ইত্যাদি মানা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কেবলমাত্র লীলাপ্রসঙ্গ সংকলন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া যেসব গান লীলাপ্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় এবং সেগুলো মনোহরশাহী বলেই পরিচিত, সে গানগুলোরও প্রথম অংশ অর্থাৎ গানের মুখ অনেকটা গড়ানহাটী পদ্ধতিতে বিলম্বিতে গাওয়া হয়। কীর্তনের মধ্যে পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন প্রকরণটি বোদ্ধা শ্রোতাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।[৪৩]

৪.২ কীর্তনের গান সম্পর্কিত আলোচনা

দাগী গান : দাগী গান বলতেই বড় গান অর্থাৎ বিলম্বিত তালের গান এবং আকর্ষণীয় গান। দাগী গানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় মূল গানের মুখের অংশটির পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধের সুরের সূত্রে। মুখের অংশটি বড় তালে গাওয়া হয়। কীর্তনের গান শেখা বলতে ওই বড় গানের অংশটি শেখাকেই বোঝায়। যেসব গানের মূল সুরটি অতুলীয় বা একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেগুলোকেই বলা হয় দাগী গান।[৪৪]

জাত গান : কীর্তনের দাগী গানগুলো যেমন বনেদি গান, তেমনি 'জাত গান' গুলোও অভিজাত গান। এর মধ্যে সুর ও তালের আভিজাত্য থাকে। জাত গানের গাইয়ে, জাত গানের দোঁহার কিংবা জাত

গানের বাজিয়ে পাওয়া কঠিন। প্রকৃত পক্ষে রাঢ় দেশের কীর্তন এই জাতের আভিজাত্যেই সমৃদ্ধ। জাত গান বলে যে গানটিকে চিহ্নিত করা হয় ঠিক সে গানটির সুরে ও তালে আরও বেশ কিছু গান থাকে। অর্থাৎ গানটির সুর ও তাল অভিজাত পদ্ধতির এবং একই সুর ও তালে আরও কয়টি গান গাওয়া হয় এই সবগুলোই জাত গান। সুতরাং জাত গান একটি শ্রেণিকে বোঝায় এবং সুর ও তালে তারতম্যানুসারে জাত গানের সংখ্যাও কম নয়।[৪৫]

তুক গান : অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময়, মিলাত্মক গাথা তুক গান নামে পরিচিত। কোনো কোনো তুক গানে কয়েকটি কলি থাকে। তুক গান বা তুক কীর্তন গায়কগণের গুরুপরম্পরাক্রমে সৃষ্ট। অনেক অজ্ঞাত পদকর্তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ বা পদাংশ তুক গান হিসাবে চালিয়ে দেয়। 'তুক অর্থে সঙ্গীতের অংশ বোঝায়। কোনো একটি দীর্ঘ পদের অংশবিশেষ গায়ক কর্তৃক গীত হয় বলে এটিকে তুক গান বলা হয়। এরূপ তুক গানের সংখ্যা অনেক। এইসব গানগুলো যে কাব্যিক ছন্দে নিবদ্ধ থাকে, ঠিক তা নয়, অনেক গান আবার গদ্যছন্দেই লেখা। এর মধ্যে অনেক দাগী গানও আছে। অনেক লীলা প্রসঙ্গেই এ গান গাওয়া হয়।'[৪৬]

বটুক গান : বৈঠকে বসে গাওয়া হয়ে থাকে বলে সেগুলোকে 'বটুক গান' বলে। গ্রামদেশে প্রচলিত অন্য নামগুলো হলো 'বৈঠকিয়া গান', 'বৈঠকী' বা 'বৈঠকিরী' গান। গায়কগণ যখন গাইতে বসেন তখন এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেন যাতে মূল গানটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেই চড়া পর্দায় আখর জুড়ে দেন। আখরের পদ সাধারণতঃ 'আহারে, আহা মরি রে, মরি মরিরে' ইত্যাদি হয়ে থাকে। করতাল বাজাবারও বিশেষ পদ্ধতি আছে। উপস্থিত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের আস্বাদনের বস্তু হিসাবে এ গানগুলো গাওয়া হয়।[৪৭]

গৌরচন্দ্রিকা : রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা প্রসঙ্গ গানের পূর্বে ঠিক সেই লীলার অনুরূপ শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রসঙ্গ গানকে গৌরচন্দ্রিকা গান বলে। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ জীবনীকারেরা সেইভাবে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবনচরিত রচনা করলেন। মহাজনদের পদাবলী গৌরাঙ্গ লীলার অসংখ্যপদে পূর্ণ হয়ে উঠল। রাধাকৃষ্ণের লীলা আলেখ্যেই গৌরাঙ্গের জীবনচিত্র পদাবলীর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। *রাধাকৃষ্ণ লীলার সকল প্রকার ভাবই শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভক্ত কবিরা প্রতিবিম্বিত করে দেখতে চাইলেন*। সুতরাং তখন থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পালাকীর্তনের সূচনায় চৈতন্যদেবের জীবনলীলার অনুরূপ ঘটনাবিবৃত একটি পদ সর্বপ্রথম গাইবার রীতি প্রবর্তিত

হলো। ভক্তেরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক প্রথম গান শুনেই বুঝতে পারেন সভায় কোন পালা সেদিন গাওয়া হবে। এই হলো গৌরচন্দ্রিকা।[৪৮]

ঝুমুর গান : লীলাকীর্তনের শেষ পর্যায়ে ঝুমুর গান গাওয়া হয়। পালার শেষ হয় রাধাকৃষ্ণের মিলনে। এই মিলনের পর মিলনভক্তির কতকগুলো গান যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে সেসব গানের দু-একটি পদ সাধারণতঃ প্রত্যেক মূল গায়কই গেয়ে থাকেন। ঝুমুর গান মূলত লোকসঙ্গীত, প্রধানত আদিবাসীদের উৎসবের গান। সে হিসাবে সাঁওতালী ঝুমুর, পুরুলিয়া ঝুমুর, বাংলাদেশে সাঁওতাল ঝুমুর, চাকমা ঝুমুর ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক ঝুমুরের ছড়াছড়ি দেখা যায় লোকসংগীতে। কোনো কোনো ঝুমুরের সঙ্গে কীর্তনের কোনো কোনো সাধারণ শ্রেণির গানের বেশ মিলও আছে। এ দেখে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুলিয়ায় ঝুমুরের প্রভাব কীর্তন গানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় কীর্তনে যে ঝুমুর গান আছে তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ঝুমুরের কিছু কিছু মিল আছে।তবে অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, 'কীর্তনের ঝুমর আর ঝুমুর সংগীত কোনো মতেই এক নয়। কীর্তনের কিছু কিছু লীলা আছে (পূর্বরাগ, রূপানুরাগ প্রভৃতি) যা কখনো কখনো একাধিক গায়ক মিলে একটি পর একটি পালা করেন (পরপর কয়েকটি দল আলাদা আলাদা পালা করেন)। সে ক্ষেত্রে রাধা কৃষ্ণের মিলন ছাড়াই যখন কীর্তন গানে কোনো গায়ককে বিশ্রাম দিতে হয় তখন কিছু বিধিবদ্ধ গান আছে যা গাইলে বোঝা যায় যে গায়ক এবার গানে বিশ্রাম দিচ্ছেন। সেই গানই হলো ঝুমর গান। যেমন পূর্বরাগের একটি ঝুমর হলো–

> 'নব রে নব রে নব দোহাকার প্রেমরে।
> দারিদ্র পায়ল যেন ঘট ভরা হেম রে॥'[৪৯]

লুট গান : গ্রাম অঞ্চলে অনেক বাড়িতে একটি তুলসীতলা থাকে। শনি, মঙ্গলবার বা বিশেষ কোনো তিথি বা শুভ উৎসবাদি উপলক্ষে তুলসীতলায় হরির লুট দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির এবং পাড়ার সকলে তুলসীতলায় সমবেত হয়, সেই সময় বাতাসা, খই, নাড়ু, পেড়া, সন্দেশ ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। সাধারণত কীর্তনের শেষে ঝুমুর গান হয় এবং ঝুমুরের শেষ জমাটের পর লুট গান হয়। এই লুট গানের পরে বাতাসা চরদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে বা কোনো বিপদে পড়লে মুক্তি কামনায় ওজনের হরিলুট মানত করা হয়। এক্ষেত্রে যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরিলুট মানত করা হয় তার দেহের যে ওজন সে পরিমাণ নানাবিধ ফল মিষ্টি, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে লুটের ব্যবস্থা করা হয়। এসময় সারা রাত লুটের কীর্তন হয়। গানগুলো সহজ,

কোন বাদ্যযন্ত্র লাগে না, কেবল হাততালি দিয়ে গাওয়া হয়। সকলেই এই গানে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন–

"আয়রে তোরা লুটবি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়রে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধারে
নিতাই চাঁদ তাঁর অঙ্গ *আধারে*।"[৫০]

গড়ানহাটী গান : আগেই বলে নেওয়া ভাল কীর্তনের যে ঘর বা ঘারানা রয়েছে তার একটি হলো গড়ানহাটী। এই ধারাটি আদি ও অকৃত্রিম। রাজশাহীর গড়ের হাট পরগণাতেই মূলতঃ এই ধারার উৎপত্তি। আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথমে এই ধারার প্রবর্তন ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় শতাধিক বছর পর রাজশাহীর খেতুরী অঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্ত মহাশয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। ইনি জমিদারির কার্যভার থেকে মুক্তি নিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হন। তখন তার নাম হয় নরোত্তমদাস ঠাকুর। এই নরোত্তমদাস ঠাকুরের সমসাময়িক পদরচয়িতা ছিলেন গোবিন্দদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, গায়েন ও বাদক দেবীদাস, গৌরীদাস প্রমুখ। শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যাজী গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য এবং নিত্যনন্দ ঘরণী শ্রীমতি জাহ্নবা দেবীকে সাক্ষী রেখে এক উৎসব করেছিলেন। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের ছয় ধরনের বিগ্রহকে ছয়টি ভিন্ন নামে সংস্কার করা এবং ছয়টি মন্দিরে এই বিগ্রহগুলো স্থাপন করা। সেই উৎসবে অভূতপূর্ব কীর্তনের ধ্বনিতে ত্রিলোক কম্পিত হলো। এই ঐতিহাসিক মহোৎসবেই কীর্তনের নবরূপায়ন হয়েছিল। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। আর সেখান থেকেই বিলম্বিত লয় দীর্ঘ ছন্দ, মাত্রার সারল্য অভিনব কথা ও তালের সুমিত সংকলনই গড়ানহাটী গান হিসাবে পরিচিত।'[৫১]

মনোহরশাহী : মনোহরশাহী গান কীর্তনের অতি প্রচলিত জনপ্রিয় গান। এটি রাঢ়ভূমির গান। এর জন্মস্থান বর্ধমান, বীরভূম এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সংগমস্থল। অর্থাৎ কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল ও তার চারপাশে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে। এই কীর্তনধারা প্রাচীন এবং চৈতন্য সমসাময়িক বলে মনে করাই বিধেয়। মনোহরশাহী গান সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। প্রথমত ধরা হয় এ গান সৃষ্টি হয়েছে কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে–শ্রীপাট শ্রীখণ্ড কান্দরা, জাজীগ্রাম সহ একই অঞ্চলে

কতিপয় গ্রামকে কেন্দ্র করে। এ অঞ্চলটি মনোহরশাহী নামক পরগণার অন্তর্গত সেজন্যই এ কীর্তনের ধারাকে মনোহরশাহী বলে অভিহিত করা হয়। এর মূল স্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানদাস, রঘুনাথ আচার্য, নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখ গুণীজন। এটি খুবই গ্রহণযোগ্য মত কারণ এর ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। দ্বিতীয় মতটিতে বলা হয়েছে *মনোহরদাস* নামক একজন বিখ্যাত পদরচয়িতা এবং গায়ক যে সংগীতধারা প্রবর্তন করেছেন তারই নামে মনোহরশাহী গান। কিন্তু মনোহরদাসের পদের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া মনোহরদাসের গায়কী কৃতিত্বের তেমন উল্লেখ নাই।[৫২] সুতরাং এই মতটির তেমন গ্রহণযোগ্যতা নাই। মনোহরশাহী গানের ধরন হচ্ছে লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, সুরের কারিগরি ও মাত্রার জটিলতা সমৃদ্ধ। মার্গসঙ্গীতে খেয়ালের সমতুল্য। চুয়ান্ন তালের গান।[৫৩]

৪.৩ লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনের ধারা/ঘরানা

খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে (১৫৮৩ সাল বা ৮৪ সাল) নরোত্তম ঠাকুর পদাবলী কীর্তনের যে রূপটির অনুমোদন পেলেন তা কীর্তনের সাংগীতিক রীতি হিসেবে পরিগণিত হলো। ক্রমে ক্রমে নরোত্তম প্রতিষ্ঠিত কীর্তন রীতির দৃষ্টান্তে আরো কয়েকটি কীর্তনরীতি গড়ে ওঠে। উদ্ভবস্থলের নাম অনুসারেই কীর্তন রীতির বা ধারার নাম প্রচলিত হতে দেখা যায়।[৫৪] লীলাকীর্তনের ধারা বা ঘরানা পাঁচটি।

- ক) গড়েরহাটী/গড়ানহাটী
- খ) মনোহরশাহী
- গ) রাণীহাটী বা রেণেটী
- ঘ) মন্দারিণী
- ঙ) ঝাড়খণ্ডী।

ক) গড়ানহাটী : নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন থেকে জন্মভূমি বাংলাদেশের শ্রীহট্ট দর্শন করতে এসে পিতৃব্যপুত্র সন্তোষের অনুরোধে খেতুরীতে কুটীর বেঁধে বাস করেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি খেতুরীতে একটি বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলেন। 'শ্রীসন্তোষ এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এই উৎসবে তৎসাময়িক সমস্ত খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত, সাধক, গায়ক ও বাদক উপস্থিত হয়েছিলেন। এই উৎসবের অধিনেত্রী ছিলেন

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীমতি জাহ্নবী দেবী। এই সম্মেলনে কীর্তন গানের–'রস কীর্তনে'র যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ছিল। এই সম্মেলনে প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। সম্মেলনে নিজে কীর্তন গাইবার জন্য নরোত্তম বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং সুশিক্ষিত সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন।'[৫৫] উৎসবে নরোত্তম যে ধারায় গান করেছিলেন, সেই ধারার নাম গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী ধারা। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা করে পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা গানের পদ্ধতি খেতুরীর মহোৎসবেই প্রবর্তিত হয়। গড়ানহাটী ধারার গায়ন পদ্ধতি এত কঠিন ছিল যে সাধারণের মধ্যে এই গানের প্রচার বা প্রসার বিশেষ ঘটতে পারে নাই।

'গড়ানহাটীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো হলো :

ক) নানাবিধ অভিজাত তাল প্রয়োগে গানগুলো গাওয়া হয়।

খ) গানগুলোর বেশির ভাগই বিলম্বিত লয়ে।

গ) গানের সুরে অনেকটা রাগের আভাস পাওয়া যায়।

ঘ) গানের আখরের সংখ্যা কম।

ঙ) কোনো ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত কথার প্রয়োগ নাই।

চ) প্রতিটি গানেরই পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ছ) গানগুলোর চলনের মধ্যে প্রাচীন রাগরীতির লক্ষণ পাওয়া যায়।

জ) ধ্রুপদের চলনের সঙ্গে গড়ানহাটী গানের মিল পাওয়া যায়।

ঝ) কীর্তনের অভিজাত গানগুলোই হলো গড়ানহাটী ধারার গান অর্থাৎ উন্নতমানের রূপটি গড়ানহাটী ধারার মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে।

ঞ) পদকীর্তনের মধ্যে গড়ানহাটী ধারাটি হলো আদি ও অকৃত্রিম।'[৫৬]

Sastriya Sangit and Music Culture of Bengal বইয়ে গড়ানহাটী ধারাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–'Thākur Narottamdāsa who was a trained musician, a *dhrupada* singer, a *padakartā,* a Vaisnava philosopher and a savant at Brindāvaba, had studied all aspects of *Līlā/Rasa kīrtana* and organised the great congregation of Vaisnavas at Kheturi under the patronage of his nephew Rājā Santos Datta. With the help of Śrīdāsa, Ballabhadāsa, Gokulānandadāsa (singer, *dohār*),

Devīdāsa (*kholplayer*) and Gaurāngadāsa (*karat*āla player) who were related to Narotama and were trained under Svarūpa Dāmodara at Puri, Narottamdāsa introduced his style. *Kīrtana* took a definite shape under his able guidance at Kheturī, where :

1. modes of *kirtana were systematised,*
2. definite methods were devised, which conformed with the modes of *prabandhagāna,*
3. anibaddha sangita with ālāpacārī, followed by nibaddha sangita based on sastriya rāgas were used, and
4. Gauracandrikā was introduced to *Kīrtana*.'[৫৭]

নরোত্তম ঠাকুর যে পদাবলী রচনা করেছেন সেগুলো হলো সর্বসাধারণের আস্বাদনের যোগ্য গান। গোবিন্দদাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক পদকর্তা হয়েও ভাষার পাণ্ডিত্যের দিকে নজর না দিয়ে ভক্তির গভীরতার দিকেই তিনি নজর দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বৈষ্ণবতত্ত্বের বাংলা প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণবের দৈন্যবোধ, বৃন্দাবন লালসা, গুরু বন্দনা, গৌরবন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকা, বৈষ্ণব বন্দনা ইত্যাদি হলো নরোত্তম পদাবলীয় বিশেষত্ব। নরোত্তম পদাবলীর আসল বিষয় হলো বৈষ্ণব সাধনার গোড়ার কথাগুলোকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

'বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।'[৫৮]

সমগ্র বৈষ্ণব সাধনার সারতত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন এই গানটিতে। এর মধ্যে কাব্যিক অলংকরণ তেমন না থাকলেও পরিচিত ভাব প্রকাশের আধিক্য থাকায় তার পদগুলো মধুময় হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি সাঙ্গীতিক দিক থেকে নরোত্তমের পদগুলো সুগেয় এবং সুশ্রাব্য। "Narottama made considerable changes to enhance *Kirtana's* musicalquality and uplifted it to the rank of *marga-sangīta*, by blending musical classicism with spiritualism. His style is famous as Garerhāti/Garānhāti."[৫৯]

মনোহরশাহী : গড়ানহাটীর তুলনায় মনোহরশাহী একটু হালকা গান। মনোহরশাহী গান কীর্তনের অতি প্রচলিত জনপ্রিয় গান। এটি রাঢ়ভূমির গান। এর জন্মস্থান বর্ধমান, বীরভূম এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সংগমস্থল। 'খেতুরীর উৎসব হতে ফিরে জ্ঞানদাস বন্ধু মনোহর, কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের

পৌত্র বদন, শ্রীখণ্ডের রঘনন্দন ও ময়নাডালের মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরকে নিয়ে রাঢ়ের প্রাচীন সঙ্গীতধারার সংস্কার সাধন করেন। কান্দরা মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত বলে এই ধারার নাম হয় মনোহরশাহী। কান্দরা (কাটোয়া), ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড মনোহরশাহী কীর্তনের তিন প্রধান কেন্দ্র। ময়নাডালের চতুস্পাঠী সংগীত ও বাদ্য শিক্ষা এবং শ্রীখণ্ডের চতুস্পাঠী ব্যাকরণ অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন, সংগীত ও বাদ্য শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিল।'[৬০] এই কীর্তনধারা প্রাচীন এবং চৈতন্য সমসাময়িক বলে মনে করাই বিধেয়।[৬১] শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার চৈতন্যদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন অধুনা। তাঁর গান রচনার ক্ষমতা যেমন ছিল, তেমন ছিল গাইবার ক্ষমতা। তিনি বাস করতেন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড অঞ্চলে। ওই গ্রামেই ছিলেন রঘুনন্দন আচার্য, নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিলেন প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা গায়ক ও কবি লোচনদাস। এই গ্রামের অদূরেই বর্ধমান জেলার কান্দরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জ্ঞানদাস। অদূরে নিকটবর্তী দাইহাটির সংলগ্ন অগ্রদ্বীপে ছিলেন বসুদেব ঘোষ। এরা সকলেই ছিলেন তখনকার দিনের দিকপাল গায়ক। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় ওই অঞ্চলে পদাবলী কীর্তনের লীলা প্রকরণের উপযোগী একটি ধারাপ্রবর্তিত হয়। এটিকে মনোহরশাহী ধারা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৬২]

এই ধারার নামকরণের সূত্র সম্পর্কে মতের পার্থক্য আছে। দেবীপদ ভট্টাচার্যের মৌলিক উক্তি মনোহরদাস নামক প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার নামানুসারে এই ধারার নাম হয়েছে মনোহরশাহী। কিন্তু এ মতের যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে মনোহর দাস যদি একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াই হতেন তাহলে তাঁর রচিত বহু কীর্তনের পদ পাওয়া যেত। কিন্তু সেরকম নজির নেই। অপর মত হলো শ্রীখণ্ড বা সন্নিহিত অঞ্চলটিকে প্রাচীনকালে মনোহরশাহী পরগণা বলে ধরা হতো এবং সেই সূত্রেই ওই অঞ্চলের গানের যে ধারা নতুন করে তৈরি হলো তাকে মনোহরশাহী ধারা বলে চিহ্নিত করা হয়। ওই ধারা প্রবর্তনের সময়ে নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, মঙ্গলঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক সব ছিলেন। 'এই গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন পদকে সংকলন করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা এবং মূলপদকে অক্ষুণ্ন রেখে আঞ্চলিক কথা সহযোগে সুর, তাল ছন্দ যুক্ত করে একটি আকর্ষণীয় রূপ সৃষ্টি করা।'[৬৩] অর্থাৎ মনোহরশাহী গানে গায়কের সংযোজনের সুযোগ অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরস্পর গানগুলোকে অন্যসুরের আশ্রয় নিয়ে কিছু কিছু সংযোজন ঘটানো হয়, যে গুলোকে বলে ঘটকালি। এই গানের প্রতিটি স্তরে স্তরে মূর্চ্ছনা ও নৃত্যভঙ্গিতে ভরা থাকে।

কীর্তনের মূল স্বরূপকে মনোহরশাহী গানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা মূল পদগুলো গড়ানহাটী ধারার থেকেই গৃহীত। ফলে গানগুলোর প্রথম স্তবকের প্রথম চরণ গড়ানহাটীর মতোই

বিলম্বিত লয়ে নানাবিধ বড় তালে গাওয়া হয়ে থাকে। 'মনোহরশাহী ঢঙে লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সুরের কারুকার্য খুব আছে। যাত্রার জটিলতাও লক্ষ্যণীয়। মনোহরশাহী ঢঙের তাল চুয়ান্নটি। মার্গ সংগীতের সঙ্গে তুলনা করলে মনোহরশাহী খেয়ালের সমতুল্য।'[৬৪]

শ্রীখণ্ডের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য হতে মনোহরশাহী গানের উদ্ভব। কিন্তু মহোহরশাহীর প্রভাবে শ্রীখণ্ডের স্বতন্ত্র গায়নপদ্ধতি লোপ পায় নাই। 'শ্রীখণ্ডের সংস্কৃতিবান ঠাকুরবংশের নিজস্ব ঘরানার গান মনোহরশাহীর তুলনায় সংযত ও গম্ভীর। ঠাকুরবংশের লীলাকীর্তন একেবারে ঠাসবুনেট। তুক ও ছুট নাই, কথা খুব কম। প্রচলিত উপায়ে আখর দেওয়া হয় না। শ্রীখণ্ড ঘরানার গৌরব শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন গৌরগুণানন্দ ঠাকুর।'[৬৫] 'Srikhanda, the famous centre of vaisnavisa and music, however, maintained its own style although practising Manoharsahi style. Srikhanda gharana of the Thakur Family practised kirtana of a very special nature having no tuk or chut or akhar. The well knit and well selected padaswere capeble of expressing the rasa and behave of the lilas amply. Gauragunanda of this gharana kept up this tradition. He was also a great kirtaniya who could sing all the different styles with authority, Authenticity and ease."[৬৬]

এই ধারার গান–

'বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
যখন আমি বৈসা থাকি, গুরুজনের মাঝে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশি আমি মইরি লাজে।'

'বংশী॥' চাঁদ কাজী[৬৭]

গানটির স্বরলিপি রয়েছে পরিশিষ্ট-৫এ। শুনলেই বোঝায় যায় এটি মনোহরশাহী ঢঙের গান।

শ্রীচৈতন্যদেবের পর কীর্তনের বিবর্তিত রূপধারা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা না গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে মার্গসঙ্গীতের আদলে উচ্চাঙ্গ পদ্ধতিতে নবরূপদান করলেন নরোত্তম ঠাকুর। মনোহরশাহী ধারা গড়ানহাটীর সরলীকৃত রূপান্তর। মনোহরশাহী ধারা কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল–*শ্রীপাট শ্রীখণ্ড জ্ঞানদাস কান্দরা*, জাজীগ্রাম থেকে শুরু হলেও আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পরে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম অঞ্চলেও প্রসার লাভ করেছে।

নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর ছিলেন মনোহরশাহী গানের একজন প্রবর্তক। তিনি পরবর্তীকালে বীরভূমের সিউড়ির নিকটবর্তী 'ময়নাডাল' গ্রামে বসবাস করেন। সেখানে শ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ স্থাপন ও সেবা প্রকট করেন। সেইসময় থেকেই 'ময়নাডাল' গ্রামের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। ময়নাডালের

ধারাতে গায়ক ও বাদক সমভাবে জন্মলাভ করেছে। পুরনো দিনের বেশির ভাগ প্রসিদ্ধ বাদকই ছিলেন ময়নাডালের এবং সেজন্য বলা হতো–উত্তরখণ্ডের বায়ান আর দক্ষিণখণ্ডের গায়ান'–এরাই প্রসিদ্ধ। উত্তর খণ্ডের বাদকদের ক্ষেত্রে আদিগুরু বা মূল ওস্তাদ ছিলেন নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুর। গানের দিক থেকেও 'ময়নাডাল' হলো কীর্তনগানের একটি পীঠস্থান। কারণ এখানে অনেক গায়ক বাদক জন্মগ্রহণ করেছেন। অনেক গান এখানে প্রকৃত রূপ পেয়েছে।[৬৮] নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখের সময় থেকেই ময়নাডালে গান সৃষ্টি, গান নিয়ে গবেষণা শুরু। 'আখর সংযোজনা তালের বিন্যাস এবং গড়ানহাটি ধারার আশ্রয়ে কলেবর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হয়েছিল।'[৬৯] সর্বশেষ পর্যায়ে ময়নাডালের যেসব গায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন–প্রয়াত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর, প্রয়াত নবগোপাল মিত্র ঠাকুর, গোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর, নদীয়ানন্দন মিত্র ঠাকুর। বর্তমানে যিনি আছেন যিনি হলেন নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর, যার সাক্ষাৎকার ৫ম অধ্যায়ে সংযোজন করেছি। মনোহরশাহী গান সমগ্র অঞ্চলকে আশ্রয় করেই বিকাশলাভ করলেও ময়নাডালের অবদান এক্ষেত্রে অনেক বেশি।

বৈশিষ্ট্য

মনোহরশাহী গানের কতগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ভিত্তিতে এ গানকে গড়ানহাটি গান থেকে সহজেই পৃথক করা যায়–

ক. শ্রোতাসাধারণের মনোহরা বৃত্তি অর্থাৎ মনোরঞ্জন করবার চূড়ান্ত প্রয়াস এ গানের শৈল্পিক কুশলতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শিল্পীর অপার স্বাধীনতা থাকে এ গানের ক্ষেত্রে। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আখর, ঘটকালি, পর্যায় প্রকরণ তৈরি হয়েছে।

খ. দলবদ্ধ হয়ে না গাইলে মনোহরশাহী গানের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে না। দোঁহার, কান দোঁহার, শির বায়ান, বাঁয়াটি, কোল বায়ান ইত্যাদি পরিভাষাগুলো মনোহরশাহী গানের সূত্র থেকে জন্মেছে।

গ. মনোহরশাহী গানের সূত্র ধরেই পালাগান বা লীলাকীর্তনের সূচনা হয়। মনোহরশাহী পদ্ধতি গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু করে মিলন পর্যন্ত সমগ্র লীলাপ্রসঙ্গটি মহাজন বিরচিত বিভিন্ন পদাবলী সংযোজন করে পর্যায় করে নাটকীয়ভাবে গাওয়ার নিয়ম।

ঘ. কীর্তনের প্রচলিত সঙ্গীতধারাকে বিশ্লেষণ করলে গানগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের প্রভাব এবং কোথাও কোথাও লোকসংঙ্গীতের প্রভাব দেখা যায়।

ঙ. রাঢ়ী কীর্তন ভাষাটি প্রচলিত আছে কিন্তু বরেন্দ্র কীর্তন ভাষাটি অপ্রচলিত। রাঢ়-রাঢ়েরই পরগণা আর গড়ানহাটী হলো রাজশাহী অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমির পরগণা।

চ. মনোহরশাহী ধারায় গানপ্রসঙ্গ অপেক্ষা লীলাপ্রসঙ্গের উপর বেশি থাকায় লীলাবিন্যাসের সূত্রে রসের নানাবিধ প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

ছ. মনোহরশাহী গানের ভাঁতিতে সুস্পষ্ট একটি লৌকিক প্রভাব পাওয়া পাওয়া যায়। মীরের কাজ এবং সুরের কোনাকুনি যেন শ্রুতিগুলোর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে।

জ. মনোহরশাহী গানে কতগুলো নির্দিষ্ট তালের আশ্রয়ে ঘটকালি, কথা বা সুরের বিস্তার করা হয়। বিশেষ করে একতালি, যতি, দুঠুকী (দোঠুকী), দাসপ্যারী, লোফা, চঞ্চুপুট, ছোট দশকোশী, বিরাম দশকোশী, তেত্তটের কাটান উল্লেখযোগ্য।

ঝ. মনোহরশাহী গানের আখর সংযোজন এবং তার পর্যায়ভেদ একটি অভিনব সংযোজন। আখরের ভাষায় লৌকিক ভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক উচ্চারণবিধি এবং সেই সাথে তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্যের ধারার প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

ঞ. মনোহরশাহী গানের পরিবেশনক্ষেত্রে গায়েন এবং বায়েন উভয়েই প্রায় সমগুরুত্বসম্পন্ন। গায়ক-বাদকের সাথে সঙ্গতই মনোহরশাহী গানের মূল স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।[৭০]

রাণীহাটী বা রেণেটী

বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া থানার রেনেটী এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এটি পরগণা রাণীহাটীর অন্তর্গত। রেণেটীর নিকটবর্তী দেবীপুর নিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস রেণেটি পরগণার নামে একটি সুরের নামকরণ করেন 'রেণেটী'। এটি কীর্তন গানের একটি প্রসিদ্ধ ধারা। "This style was lighter in raga, tata, laya and chanda than the other two styles. It adopted faster talas which were twenty six in number. This style was compared with thumri and used less akhar."[৭১]

'যাঁহারা বন্দীপুরনিবাসী আখরিয়া গোপালের ভাগিনে (হুগলী) বাসুদেবপুরের বেণী দাস কীর্তনীয়ার রেনেটী সুরের কীর্তন শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বহুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত গণেশ দাসের মুখে শুনিয়াছি যে রেনেটীর মাধুর্য মনোহরশাহী অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহে।'[৭২]

বর্ধমান জেলার দেবীপুর রাণীহাটি পরগণার বিপ্রদাস ঘোষ নামক কোনো এক প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার সূত্রে এই গীতধারার সৃষ্টি হয়েছে। বহু খোঁজ করেও এই গানের বৈশিষ্ট্য বিশেষ পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, গানগুলো হালকা ধরনের। কেবল তেয়ট তালের গানই এই ঘরানার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রাধামোহন কর্মকার কীর্তনীয়া মহাশয়ের মতে 'সুন্দরী ঝটকার নটিনী সুবেশ'–এই গানটি রেণেটি তেওট। এছাড়াও আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেণেটি তেওট গান হলো 'মাধব মা কুরু মানিনী রাই', অবশ্য তুলনামূলক বিচারে মনোহরশাহী ঘরানার গানের সঙ্গে এই গানের খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। রেণেটি ঢঙ সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে গঠিত। এর সুর সরল, ছয় ছয় ছন্দ, গতি সংক্ষিপ্ত। রাজ্যেশ্বরবাবু রেণেটি ঢঙের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের খুব প্রশংসা করেছেন। টেঞা উদ্ধবদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ কর্তৃক এই ধারার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। এই ধারার গানের সঙ্গে ঠুংরীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৭৩]

মন্দারিণী : মন্দারিণী ধারা রেণেটি ধারার থেকেও সহজ সরল সুরের প্রাধান্যযুক্ত গান। শোনা যায় বংশীবদন নামক কীর্তনীয়া এই ধারার প্রবর্তক। পাঁচালী বা মঙ্গল গানের অনুকরণে এই গান তৈরি হয়। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই ঘরে তালের সংখ্যা মাত্র নয়টি। মন্দারিণী গানের উৎসস্থল উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর সংলগ্ন গড় অঞ্চল। অনুমান করা হয় গড় মান্দারণ বলে যে স্থানের বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে অর্থাৎ যার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে সেই সূত্রেই মন্দারিণী ঘরের উৎপত্তি। মন্দারিণী গানেরও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। লোকমুখে প্রচলিত গানগুলোই হালকা সুরে ও তালে গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে মেদিনীপুর অঞ্চলে যে ডাক নামক কীর্তনের সুর পাওয়া যায় সেগুলো মন্দারিণী ঘরের সুর বলে অনুমিত হয়। শুধু তাই নয় মন্দারিণী গানে কীর্তন প্রকরণের মৌলিক বিষয়গুলো যে ওই সব অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সাথে মিশে গিয়ে হালকা রূপ গ্রহণ করেছে এরূপ ভাবটাও বোধ হয় অসংগত হবে না। কারণ উড়িষ্যা মেদিনীপুর অঞ্চলের সারিগানের মধ্যে মন্দারিণী ধারার অস্পষ্ট আদল খানিকটা যেন পাওয়া যায়। 'কীর্তনের অন্য একটি সুর মন্দারিণী, সরকার মন্দারণের নামে এর নামকরণ হয়। এটি রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের সুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল এই সুরেই গাওয়া হতো, এখনো হয়। মন্দারিণীতে নয়টি তাল ব্যবহৃত হয়।[৭৪] মন্দারিণী সম্পর্কে বলা যায় :

"Gadhmandaran is a place in Midnapore district, from where this style acquires its name. Mandarini was simple in form and was based more on pacali or mangala gana

type of music. It is believed that one Bamsivadana evolved this style in which nine different kinds of talas were used, but it did not survive too long as an independent style and got merged with Manoharsahi.”[৭৫]

অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর সাক্ষাৎকারে মন্দারিণী সম্পর্কে বলেন, ‘বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত গড়মান্দরণ এলাকায় এক ধরনের কীর্তন পরিবেশিত হয়। তাই হলো গড়মান্দরণ বা মন্দারিণী কীর্তন। মনোহরশাহী এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, মন্দারিণী ধারায় কীর্তন মানুষের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। আমি বহুবার গিয়েছি। ওই এলাকার প্রচলিত কীর্তনের কীর্তনীয়া জগন্নাথ দাস, গ্রাম : রামজীবপুর নিয়মিত এই ধারার কীর্তন চর্চা করেন।’ উদাহরণস্বরূপ তিনি এই গানটির উল্লেখ করেছেন–

কাঞ্চন মনিগণ
জনুনির মাওল
রমণী মন্ডল
সাজরে... ।

পা – র্সা	ণা না র্সা	ধা – ণা	ধা পা না
কা – ন্	চ ০ ন	মা – নি	গ ণ ০
-া া পা	পা পা ধা	মা – া ণা	ধা পা – া
০ ০ জ	নু নি র	মা ০ ০	ও ন ০
বু- া - া মা	মা মা মা	গা মা গা	রা গা সা
০ ০ রা	ম নী ০	ম ০ ণ্	ড ০ ল
য়া- া - া	প- া- া	ণা ধা পা	মা গ রা
সা ০ ০	০ ০ জ	রে ০ ০	০ ০ ০

ঝাড়খণ্ডী : লীলাকীর্তনের পঞ্চম রীতির নাম ঝাড়খণ্ডী। ঝাড়খণ্ড পরগণায় উদ্ভাবিত কীর্তনরীতি হিসেবে এর নাম হয় ঝাড়খণ্ডী। লোকসঙ্গীতের সুরের ভিত্তিতে ঝাড়খণ্ডী গায়নকলা রচিত।

'মঙ্গলগানের সুরেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে। কবীন্দ্রগোকুল ঝাড়খণ্ডী কীর্তনরীতির ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন।'[৭৬]

ঝাড়খণ্ড স্থানটি হলো বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলার প্রান্ত অঞ্চল। মানভুম হয়ে উড়িষ্যা যাবার পথে। চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবতে এই ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়িখণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। জনবসতি ছিল কম। পশুপাখির বাস ছিল বেশি। পথটি যদিও দুর্গম ছিল তবুও এই পথ দিয়েই ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে পায়ে হেঁটে উড়িষ্যা যাওয়া হতো। স্বয়ং মহাপ্রভুও পায়ে হেঁটে ওই পথেই ঝাড়িখণ্ডী অর্থাৎ মানভূম ছোটনাগপুর হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। (এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৩৫৩০/৭১ বি ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি। ৩৩ পত্রের পরপৃষ্ঠায়ও (২য় পৃ.) ত্রিপদী কবিতার সুর লেখা আছে ঝাড়িখণ্ডি)।

"পঞ্চকোট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ববাস কড়ই কবীন্দ্র ভক্তাতুল" (ভক্তি-রত্নাকর)

'কড়ই নিবাসী কবীন্দ্র গোকুল সেরগড় পরগণায় এসে বাস করেন। সেরগড় ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। পূর্বে বীরভূমের বক্রেশ্বর পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। কবীন্দ্র গোকুল এই সুরের কিছু সংস্কার সাধন করেন। এই সুর এখন লুপ্ত হয়েছে।'[৭৭]

মহাপ্রভুর সেই পদযাত্রা ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ মহাপ্রভুর এই পরিক্রমা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের সামন্ত রাজা, জমিদার তথা আদিবাসীদের উপর এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ফলে রাজা, জমিদার, প্রজা বা সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী হয়ে পড়েন, এমনকি দীক্ষা পর্যন্ত গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রচণ্ডভাবে পড়ে। আঞ্চলিক সঙ্গীতধারা কীর্তনধারায় প্রভাবিত হয়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এইভাবেই প্রথম কীর্তনের সূত্রপাত। এই সূত্র থেকেই পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলের লোকদের প্রচেষ্টায় রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক উচ্চাঙ্গ পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে মানভূমের আঞ্চলিক সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ঝাড়খণ্ডী কীর্তন গানের প্রবর্তন হয়। মানভূমের আঞ্চলিক সুর বলতে এখানে ঝুমুরকেই বোঝানো হচ্ছে। 'শোনা যায় শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোকুলানন্দ সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে এই নতুন কীর্তনধারার জন্মদান করেন। গোকুলানন্দ ছাড়া অন্য কোনো প্রবর্তকের নাম ঝাড়খণ্ডী কীর্তন ধারায় ক্ষেত্রে তেমন সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।'[৭৮] তবে চৈতন্য-

উত্তর যুগে ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণবীয় আচরণের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির একটা আদান-প্রদান বা লেনদেন ঘটে। এর ফলে আঞ্চলিক বা আদিবাসী ঝুমুর গানের সঙ্গে ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের মিলিত ফলস্বরূপ ঝাড়খণ্ডী ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকা যেমন গোপীবল্লভপুর, রোহিণী, ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল এই নতুন ধারার কীর্তনগানের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এই গানকে পদাবলী বা বৈঠকী ঝুমুর বা দরবারী ঝুমুরও বলা হয়ে থাকে। এই গান পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিকে এমনভাবে তৈরি যে একে আলগাভাবে শুনলে মনে হয় যেন কীর্তন গানই শুনছি। কারণ গানের ভাষা ও সুরের মধ্যে উচ্চ আদর্শ ও রাগসঙ্গীতের প্রভাব পুরো মাত্রায় আছে। আর আছে পদাবলী কীর্তনের পদকর্তাদের অনুকরণে ভণিতা। এই অঞ্চলের শিল্পীদের গান শুনলে ঝাড়খণ্ডী ধারার কীর্তনগান সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মে। একথা বলার কারণ এই ধারার মধ্যে কীর্তনের প্রভাব পুরো মাত্রাতে থাকলেও লৌকিক রসবোধের উপরে ভিত্তি করেই তা রচিত। তাই একে পদাবলী প্রভাবিত আঞ্চলিক বা লৌকিক পদাবলী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আঞ্চলিক বলার কারণ বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোন জায়গায় এই গানের বিশেষ কোন প্রচার ও প্রসার ঘটেনি।[৭৯]

তবে কীর্তনের সঙ্গে কিছুটা তফাত অবশ্য লক্ষণীয়। কীর্তনে গায়কের সঙ্গে প্রধান সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে খোল, হারমোনিয়াম, করতাল ইত্যাদি। আর ঝাড়খণ্ডী কীর্তন গায়কের সঙ্গে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে হারমোনিয়াম, আড়বাঁশী এবং মাদল যার আকার অনেকটা ছোট ঢোলের মতো। বোঝার সুবিধার জন্য একটি ঝাড়খণ্ডী কীর্তন ও একটি পদাবলী কীর্তনের কিছু অংশ স্বরলিপির সাহায্যে দেখালাম। প্রথমে দুটি গান উদ্ধৃত হলো–

ঝাড়খণ্ডী কীর্তন–

বৃন্দাবন বিনোদিনী রাজনাগরী
শ্যামের বিরহানল জলে,
ঘেঁটিতেছে নীলমণি জলরাধা কমলিনী
শ্যামেরে দেখিয়া বারি তোলে।
নীলপীত তনু শিরে পুচ্ছ পাখা
ভুরু দুটি তার কাম ধেনু আঁকা,
মনোহরণ বাঁকা নয়নেতে,

ওগো অবলারি মন করে আক্রমণ
মন প্রাণ সদা হরে নিতে।
[নীল জল নীল কমলেতে
দেখি নাপারি চরণে চলে যেতে।]৷৷ রঙ বা ধুয়া
উজান বহিছে নীল যুবনে
ময়ূবা ময়ূবী নাচিছে দুজনে,
বাঁশি বাজায় রাধা নামেতে

ওগো গুরুর গঞ্জনা
আমি যে ভয় করি না,
আমার যা লিখেছে বিধি কপালেতে।
[নীল জল নীল কমলেতে
দেখি নাপারি চরণে চলে যেতে]। রঙ বা ধুয়া
দেখিয়া যবুকে মহা তরঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গ করি মিলাইব অঙ্গ,
দাঁড়াইব শ্যামের বামেতে।
[ওগো দ্বিজটিমা বলে পাবে অন্তিমকালে
সদা ওরূপ খেলে ভিতরেতে]৷৷ রঙ বা ধুয়া

পদাবলী কীর্তন–

একবার যাও সহচরী মথুরা নগরী
হামারী বচন শুন
আমার বঁধূয়া এই দেশে
আসে কি, আসেনা
বারেক বারতা জান৷৷

[গিয়ে জেনে আয়গো, একবার যা যা গিয়ে জেনে আয়গো। বলি বঁধূয়া এ দেশে আসে কিনা আসে যা যা গিয়ে জেনে আয়গো]৷৷ আখর৷৷

বারেক বারতা জান
অনেক প্রকারে বুঝাইবি তারে
যদি নাহি আসে তা
বুঝিয়ে নিশ্চিত করব বিহিত
মনেতে আছয়ে যে৷৷

[বুঝে করব বিহিত, মন জেনে বুঝে করব বিহিত। আমার যা মনে আছে মন জেনে বুঝে করব বিহিত]৷৷ আখর৷৷

মনেতে আছয়ে যে

আর মিছে আশে আশ   করিয়া প্রয়াশ
সহিব কতেক দিন
যা আছে কপালে   করি এই কালে
মিটাব আখর তিন
[আমি মিটায়ে দিব আমার তিনটি নামের আখর এবার আমি মিটায়ে দিব]॥ আখর॥
মিটাব আখর তিন
তখন রাইয়ের বচনে   চলে সহচরী
নিঠুর কালিয়া পাশ
আর সহচরী সাথে   ভর্ৎসনা করিতে
চলে ধনঞ্জয় দাস॥

[রাইয়ের দুঃখ দেখে চলে ধনঞ্জয় দাস, রাই বুঝি আর বাঁচে নাগো, নিঠুর শ্যামের লাগি কেঁদে কেঁদে রাই বুঝি আর বাঁচে নাগো, দুঃখ দেখে চলে ধনঞ্জয় দাস]॥ আখর॥

উপরোক্ত গান দুটিকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে দুটি গান প্রায় সমগোত্রীয়। পাঁচালী ঢঙে কিছুটা অনিবন্ধ রীতিতে গীত হয়, এবং রঙ ও আখর উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঝুমুরের রঙ বা ধুয়াই কীর্তনের আখরের সমতুল্য। দুটি গান পাশাপাশি রেখে গাইলে তবে সমগ্র বিষয়টির সদৃশ্য বৈসাদৃশ্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। নিচে দুটি গানের স্বরলিপি পাশাপাশি দেখানো হল :

ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের রঙ বা ধুয়া অংশ–

সা	সা	সা	সা	সা	সা	রে	গ	ম	ম	প	প
দ্বি	জ	টি।	মা	ব	লে।	পা	রে	অ	স্তিম্	কা	লে।
প	ধ	প	ম	গ	ম	রে	গ	রে	ম	প	প
সা	দা	ও।	রূপ	খে	লে।	ভি	ত	রে।	তে	ও	গো।
প	ধ	প	ম	গ	ম	র	গ	রে	সা	সা	সা
সা	দা	ও।	রূপ	খে	লে।	ভি	ত	রে।	তে	S	S।
রে	গ	রে	সা	ধ	নি	সা	সা	সা	সা	প	প
নী	ল	জ।	ন	নী	ল।	ক	ম	লে।	তে	যে	ন।
প	ধ	প	ম	গ	ম	রে	গ	রে	সা	সা	সা

না	পা	রি।	চ	র	নে।	চ	লে	যে।	তে	S	S।

পদাবলী কীর্তনের আখর অংশ : ছন্দ ৩। ৩

ম	প	প	প	ধ	ধ।	প	ধ	র্সা	নি	ধন্	ধপ
দুঃ	খ	দে।	খে	চ	লে।	ধ	ন	ঞ্জ	য়	দাS	সS
ধ	র্সা	র্সা।	র্সা	র্সা	র্সা	নি	র্রে	র্সা	নি	ধন্	ধপ
রা	ই	বু	ঝি	আ	র।	বাঁ	S	চে।	না	গোS	নিঠুর।
র্সা	র্রে	র্রে	র্সা	র্রের্গ	র্মর্গর্রে	র্সা	র্রে	র্সা	নি	ধন্	ধপ
শ্যা	মে	রে।	লা	SS	গিSS।	কেঁ	S	দে।	কেঁ	দেS	SS
ম	প	প	প	ধ	ধ	ধ	র্রে	র্সা	নি	ধন্	ধপ
রা	ই	বু।	ঝি	আ	র	বাঁ	S	চে।	না	গোS	SS
ম	প	প	প	ধ	ধ	পধ	ধর্র	র্সন	ধন্	ধপ	মপ
দু	খ	দে।	খে	চ	লে।	ধS	নS	ঞ্জS।	য়S	দাS	সS
র্সা	র্রে	র্ম	র্রে	র্রে	র্গ	র্সা	র্রে	র্রে	র্রে	র্গ	র্রে
স	হ	চা।	রী	সা	থে।	ভS	স	ন।	ক	রি	তে
র্সা	র্রে	র্সা	নি	ধ	নি্	ধ	ধ	প	—	—	সা
চ	লে	ধ।	ন	ঞ্জ	য়।	দা	S	S।	S	S	স।

সুতরাং এই অঞ্চলের শিল্পীরা পদাবলী কীর্তন থেকে ঝাড়খণ্ডী ধারায় কীর্তনে কত সহজে যাতায়াত করেন তা একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ কীর্তন ও ঝুমুর এই অঞ্চলে একাকার হয়ে গেছে। ভবপ্রীতানন্দ, জগৎ কবিরাজ, দীনা তাঁতী প্রভৃতি ঝুমুর পদকর্তাদের এমন কিছু পদ আছে যা শুনলে মনে হয় যেন কীর্তনই শুনছি।

৪.৪ কীর্তন গানের বিভিন্ন পরিভাষা

মুখ : প্রতিটি কীর্তন গানেরই মূল পরিচয় হলো প্রথম স্তবকের দুটি চরণ। গানের মুখ হলো প্রথমাংশের চরণ দুটি। যার প্রথম চরণটিকে বলা হয় পূর্বার্ধ এবং দ্বিতীয় চরণটিকে বলা হয় উত্তরার্ধ।

যে কোনো কীর্তন গানেরই মুখ অংশটি বিলম্বিত করে গাইবার নিয়ম। বিশেষ করে মনোহরশাহী গানে। গড়ানহাটী সম্পূর্ণ গানটি একই তালে এবং লয়ে গাইবার নিয়ম বা নির্ধারিত রীতি। 'বড় দশকোশী তালের গৌরচন্দ্রিকাগুলোরও পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ–একই তালে গাওয়ার রীতি। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ বিচার না করে গানের দ্বিরাবৃত্তি দেখা যায়। অর্থাৎ গানের একই পদকে দুইবার দুইরকম তালে ও দুইরকম সুরে গাওয়া হয়।'[৮০]

আখর : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, কীর্তনের আখর কথার তান। মহাকবির যোগ্য ব্যাখ্যা–'আখর' কীর্তনের আসরে শুনিয়া বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্তন গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। কীর্তনের মাধুর্য আস্বাদনে আখর প্রধান সহায়। ইহা রসের ভান্ডার অনর্গল করিবার মন্ত্র, উন্মোচনের কুঞ্চিকা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্তিক।'[৮১] লীলাকীর্তনে কোনো গীত বা পদের উর্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যার নিমিত্ত গায়ক বাড়তি কথার মাধ্যমে যে গীত বা গীতাংশ প্রয়োগ করেন তাকে আখর বলে। 'কীর্তনের গড়নে আদিতে ছিল কথা, তুক, ছুট ও ঝুমুর। পরে হিন্দুস্থানী ভজন ও ঠুমরির ধারা এতে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে প্রায় সব অঞ্চলের পদাবলী কীর্তনেই আখর প্রয়োগের প্রথা গৃহীত হতে দেখা যায়। এমনকি গড়ানহাটী কীর্তনেও আখরের ব্যবহার আছে। তবে শ্রীখণ্ডের আদি রীতিতে আখরের প্রথা দেখা যায় না।'[৮২] পদ বা পদের দুরূহ অংশে ভাব ও রস যখন আবেগদীপ্ত প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে ঠিক সে সময় গায়ক বা পরিবেশনকারী আখরের প্রয়োগ করে থাকেন।

ঘটকালি : ঘটকালি তালের বন্দিশে রেখে গাওয়া হয় না, হয়ত তালটি যথারীতি চলছে, ঠেকাও চলছে, সেই সঙ্গে কিছু সময় গানটির সুরে সুরে যে একটি সার্বিক মূর্চ্ছনা তৈরি হয়েছে সে মূর্চ্ছনার সুরটিকে অবলম্বন করে ভেঙে ভেঙে কথাগুলোকে সাজানো হয়। এগুলো সাধারণত মূলগায়েনই গেয়ে থাকেন। দোঁহারগণ শুধু সুর মিলিয়ে যান। 'এ ঘটকালি দিয়েই অনেক সময় বিভিন্ন গায়কের পালাপর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়। একই পালা ভিন্ন ভিন্ন গায়কের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফুটে ওঠে এই ঘটকালি আর আখরের পার্থক্যের জন্যই।'[৮৩] ঘটকালি সাধারণত ব্যবহার হয় গানটি শুরু করার মুখে পূর্ববর্তী গানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য।

পর্যায় : পর্যায় তৈরীর ক্ষেত্রে সকলেরই কমবেশী বৈশিষ্ট্য থাকে। পর্যায়ভেদেই লীলার আকর্ষণ বেশি হয়। বিশেষভাবে বলা হয়–যামিনী মুখুর্জ্যের পর্যায়, বাড়ুর্জ্যে মশাইয়ের পর্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন গাইয়েদের বিভিন্ন ধরনের পর্যায় থাকে। এক মাথুর পালার কম্পক্ষে ভাবী, ভবন নিয়ে মোট চারটি পর্যায় আছে। দানের তিনটি, মানেই সবচেয়ে বেশি। ব্যতিক্রম আনার জন্য কলহান্তরিতা লীলার

একটি পর্যায়ে এক অন্ধমুনির উপাখ্যান সংযোজন করা হয়। কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের সূত্রে পর্যায়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে যেমন :

'কুন্ড পূর্বদিকে এক অন্ধমুনি বৈসে।
রাধা রাধা নাম জপে মনের হরিষে॥
রাধা নাম শুনি শ্যাম বাহির হইল।
মুনির অগ্রেতে হরি আসি দাঁড়াইল।'[৮৪]

কাটান : কাটান কীর্তনের খুবই একটি আকর্ষণীয় অংশ। গায়ক পদকর্তা বিরচিত মুল পদ থেকে সরে গিয়ে যথাবিহিত আখর সংযোজন করেন স্তরে স্তরে। আর সেইসঙ্গে বাদক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট হাতের লহর নামক সংস্করণগুলো প্রয়োগ করতে থাকেন। 'লহরের সূত্রে আসে দ্রুততা আর আখরের সূত্রে আসে বিষয়ের সুবোধ্যতা। তাই কাটানের পরিবেশনটি শ্রোতাদের কাছে খুবই কাম্য পরিবেশ। এ সময় বাদকের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।'[৮৫] তাই বাদক সুবিধামত আনন্দদায়ক বাদ্য প্রয়োগ করে, পরিবেশকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তোলে। মূল গানের চেয়ে শ্রোতারা কাটানেই বেশি আনন্দ পায়, তাই কাটান হলো কীর্তন গানের একটি আকর্ষণীয় অংশ।

আপত্তন : কীর্তন গান শুরু হবার আগে কীর্তন দলের সবাই মিলে, কখনো মূল গায়ক একা স্বরবর্ণের সাহায্যে নিম্নতর পর্যায় থেকে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায় নানাবিধ গমকের সাহায্যে স্বর আলাপ করে একটি সুরকে মূর্তিমান করে থাকেন।

আলাপের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিকেই বলা হয় আপত্তন। আপত্তনের মূলত তিনটি ভাগ—১. পূর্বরূপ ২. আলাপচারী ৩. জমাট। আলাপের প্রথম অংশটি সাধারণত শুরু হয়—মধ্যসপ্তকের সা থেকে। ক্রমশ এই আলাপ রে গা পর্যন্ত গিয়ে আবার নিচের দিকে নি ধা পর্যন্ত আসে আবার উপরে মা পর্যন্ত গিয়ে নেমে আসে উদারার পা পর্যন্ত আবার ক্রমশ স্তরে স্তরে উপরে মধ্যসপ্তকের পা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে সা-এ এসে বিশ্রাম চায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে খোলে একটি মূর্চ্ছনা বাজিয়ে এই অংশটির সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এটি হলো পূর্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ করতালের তিনটি করে আঘাত দেখিয়ে 'আ' 'আ' এমন তিনটি করে বর্ণ উচ্চারণ করে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নানারকম গমকের আশ্রয়ে ক্রমশ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে আলাপ এগিয়ে যায় চড়ার দিকে। এর গতি কমপক্ষে তারার পঞ্চম পর্যন্ত। করতালের তিনটি আঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে খোলবাদক দাঁড়িয়ে ডাইনায় তিনটি করে আঘাত করে থাকেন—'তা 'তা' 'তা'। কখনো সুরের গতি বুঝে বাঁয়া সংযুক্ত জোরালো শব্দও করে থাকেন। ঘুরে এসে সুর যখন মধ্যসপ্তকের পঞ্চমকে আশ্রয় করে বিশ্রাম চায় তখন একটি মূর্চ্ছনা দিতে হয়। মধ্যসপ্তকের পা-কে সুর করে আবাহন জমাট শুরু হয়। বোল থাকে—ও এস হে, ও গৌর হে, গৌর হে, ও, গৌর হে এ এ এ এ এ এ এ এ ও গৌর হে—এই শেষ জমাটে মাতনের তিন আঘাতে

করতাল বাজাতে হয় আর কতকগুলো নির্দিষ্ট খোলের বোল পর পর বাজিয়ে বিলম্বিত ঘরকে একেবারে দ্রুত লয়ে পর্যবসিত করতে হয়। এটিই হলো আপত্তনের জমাট। ওই জমাটটির বাজনা–

জাঝিনাঝি, নাগ জাজা ঝেইয়া জাঝেই তা জাঝি নাঝি নাগ জাজা

ঝেইয়া জাঝেই তা জাঝি নাঝি নাগুরর জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইতা

তাখেটা থেইতা তা জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইয়া, জাঝেই তা তাখি নেতা খেটাতিনি খেটা তাখি তা–এইভাবে মাত্রা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ছন্দে বাজানো হয়। যেমন–

১. ধেই তাতা খেটা তাতা খেটা তাখি তা

২. দাগুরর ধেই ইন্দা দাধেই য়া

৩. দাঘিনাগ দাঘিনাগ দাঘিনাগ দাঘিনাগ

ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যস্তর মাতন দিয়ে মূর্ছন দিয়ে আপত্তন শেষ। আপত্তনের পরেই শুরু হয় গৌরিচন্দ্রিকা।[৮৬]

সুরমিল : গৌরচন্দ্রিকা শেষ হলে সুরমিলে প্রবেশ করতে হয়। আপত্তের আলাপটি যেমন রাগালপ্তির অপভ্রংস স্বরূপ তেমনি সুরমিল হলো প্রাচীন রূপকালন্তির অপভ্রংস স্বরূপ।[৮৭] সুরমিল হয় নির্দিষ্ট সাত মাত্রার একটি তালের দু আবর্তে–প্রথমে বন্দিশ, এর পরে এক আবর্তে বাট করে সুরমিল জমাট করতে হয়। 'রেথে তা না রেথে রিনা' এই ধরনের বর্ণ ব্যবহার করা হয় সুরমিলে। তালটি ছোট দশকোশীর মত জোড়াতেই গান ধরতে হয়। সুরটিকে ক্রমশ টেনে নিচের দিকে নিয়ে আসা হয়, তখন বাজিয়েকে নির্দিষ্ট বাজনা বাজাতে হয় এবং শেষ পর্যায়ে মূর্চ্ছনা ব্যবহার করে সুরমিল সমাপ্ত হয়। এই সুরমিলের প্রচলন এখনো আছে।

ভাঁতি : বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কীর্তনগানে রাগ-রাগিনীর সুস্পষ্ট কোনো পরিচয় না পাওয়া গেলেও পূর্ণাঙ্গ একটি সুরের মূর্চ্ছনা গানের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে। এই মূর্চ্ছনাটি শ্রোতাদের মনে সুরের প্রভাব সৃষ্টি করে। তাকেই বলা হয় ভাঁতি। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে 'রাঢ় দেশের ভাঁতি আর কথায় সুর আপনি ফোঁটে।'[৮৮]

ভণিতা : 'অধিকাংশ গীতে প্রথম দুই শ্লোক ধৃত একটি অনুচ্ছেদ গাওয়ার পর ধ্রুবপদ গাওয়া হতো। পদের শেষের দুই পংক্তিতে সাধারণত কবিদের নামোল্লেখ থাকে–তাকেই ভণিতা বলে।'[৮৯] জয়দেব পদশেষে ভণতি, ভণিতম্ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আপন নামের উল্লেখ করেছেন। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরাও ভণয়ে, ভণই, ভণে ইত্যাদি শব্দসহযোগে আপন নাম বসিয়েছেন–ভণিতা কথাটি এর থেকেই

এসেছে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন যুগে অবশ্য প্রায় সমস্ত কাব্যেই ভণিতার প্রয়োজন হতো। তার কারণ তখন কাব্যগুলো পাঁচালীগানের মতো সুর-সহযোগে গাওয়া হতো। গানের শেষে শ্লোকে রচয়িতার নাম নির্দেশে শ্রোতারা কবিদের পরিচয় পেতেন। আবার অনেক পদ আছে যার ভণিতা অংশে দুইজন রচয়িতার নাম থাকে। যেমন–

'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দ দাস রসপুর।'[৯০]

এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা নির্ণয় করা চিন্তার বিষয়। কোনো কোনো পদকর্তা আবার দুই নামে পরিচিত। যেমন–নরহরি চক্রবর্তী, অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। বিদ্যাপতির একাধিক ভণিতায় তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহ এবং তাঁর পত্নী লছমী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ভণিতায় পদকর্তার নামটি উচ্চারণকালে প্রথা অনুযায়ী হাতজোড় বা মাথা নিচু করে প্রণাম করে পদরচয়িতাকে সম্মান জানাবার বিধি প্রচলিত আছে। ইতিহাস এবং ধর্মাবেগ উভয় দিক থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর বিনয় নম্র ভণিতাংশের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

ভিয়ান

ভিয়ান হলো প্রস্তুতিপর্ব। পূর্ববর্তী গানের সর্বশেষ বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী গানের প্রথম বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্তবর্তী কোনো অতিরিক্ত কথা সংযোজন হয়। প্রতিটি গান পালা প্রকরণে সংযুক্ত করে গাইবার আগে ঠিক তদরূপ পরিবেশের বর্ণনা করে নিতে হয়। তাহলে পরবর্তী উপস্থাপিত গানটির উপলব্দি সহজ হয়। কথাটি হলো রসের ভিয়ান কিন্তু এর সাথে সুরের ভিয়ান এবং কথার ভিয়ান আপনা থেকে যুক্ত হয়ে থাকে। সুরের ভিয়ান বলা হয় সুরের আলাপ ও বিস্তারের মাধ্যমে পরবর্তী গানের সুরের পরিবেশটি তৈরি করা–সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী সুরের ছায়াকে কাটিয়ে দেওয়া।[৯১] সুরের ভিয়ান এবং পদের ভিয়ান উভয় মিলে হয় রসের ভিয়ান। পরিবেশ প্রস্তুতিকল্পে অন্তর্বর্তী সংযোজনকেই ভিয়ান বলা হয়।

কোনাকুনি : নিতান্তই শ্রুতির আরোপে এবং তিন বা চার স্বর পরিব্যাপ্তির ত্বরিদ্গতিসম্পন্ন সূক্ষ্মতম মীড়ের রূপকে কোনাকুনি বলে। কীর্তনের অনেক পদেই কোনাকুনি সুরের প্রয়োগ আছে। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের পরিভাষায় পরিচয় দিতে গেলে মীড় বলা কিছুটা সঙ্গত হবে।[৯২]

গমক : গমক বলতে স্বরের কম্পন যার দ্বারা গায়কের মনের বিশেষ একটি অনুভূতি আকস্মিক প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে শ্রোতারা আনন্দ পেয়ে থাকেন। এই গমকগুলো চার মাত্রা এমনকি আট মাত্রা ধরে চলে বিশেষ করে ধরা, বড়দশকোশী, কাঁটা ধরা এবং দাসপ্যারী তালে প্রকৃত গুণী ব্যক্তিরা এই গমকগুলোকে খাঁটি ক্লাসিক্যাল গমকের প্রকৃত রূপ বলে স্বীকার করেছেন। 'কীর্তনের স্বর প্রয়োগের আকর্ষণীয় এইসব বিধিগুলো বাংলাদেশের সব রাগসঙ্গীতের বড় বড় ওস্তাদগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।'[৯৩]

চিতান : চিতান অর্থ চড়ার তান। নিচু পিচে গান করলে শ্রোতাদের মধ্যে নির্জীবতা চলে আসে। এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সুরের দাপটে উজ্জ্বলতা স্থাপন করার জন্য গানের আশ্রয়ে বা বিস্তারে গানকে চড়ার দিকে তান দেওয়ার নাম চিতান। চিতান প্রধানত সুরের বিস্তারকে উপলক্ষ করেই হয়, তবে এর সঙ্গে দোঁহারগণ কথা সংযোজন করে আকর্ষণীয় করেন।[৯৪] যখন কোনো পদকে আশ্রয় করে একজন দোঁহার বেশ বিস্তার করেন, তাঁর বিস্তার শেষ হতে না হতেই মধ্য সপ্তকের পা-কে সুর করে আর একজন দোঁহার আরোহণ করে সা-তে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ক্রমশ চড়ার চিতান দিয়ে তারার পঞ্চমে এমনকি ধৈবত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে বিস্তার করেন এবং নামতে নামতে এসে আবার সপ্তকের পঞ্চমে দাঁড়ান।

শ্রীখোলের হাত : (শ্রীখোলের প্রকরণজনিত পরিভাষা) শ্রীখোলের ডাইনার হাত তিন রকম :

ক) তিন আঙ্গুলের চাপড়,

খ) দু' আঙ্গুলের টুকি,

গ) পাঁচ আঙ্গুলের বাজ।

তাছাড়া বাঁয়ার ক্ষেত্রে খোলা চাপড়, গুপো, গাদা, থাবা। তবে এখানে হাত বলতে বোঝানো হয় এক ধরনের বোলকে যে বোল শুধু ডান হাতে পাঁচ আঙ্গুলের চেটোর সাহায্যে তুলতে হয়, সেই সঙ্গে বাঁয়া থাকে খোলা। হাতের বাজনাগুলো খুব বড় বা বেশি মাত্রার হয় না। হাত খেলানোর (কৌশল) বাজনা বলেই এগুলোকে হাত বলা হয়।[৯৫]

ঘাত : ঘাত হলো শ্রীখোলের খুব জোরালো বাদ্য। গৌরচন্দ্রিকার শেষ অংশে জমাট বাজাবার সময় দীর্ঘ সময় ধরে বাদক নানা ধরনের ঘাত বাজিয়ে আসরকে মাতিয়ে তোলেন।[৯৬]

মাতন : মাতন হলো কীর্তন সঙ্গাতের আবশ্যকী অঙ্গ। কীর্তনের আসরে দলবদ্ধ গানে মাতন বাজাতেই হয়। এ সময় খোল, করতাল এবং উচ্চকণ্ঠের গান সমভাবে জেগে উঠে বলে ওই সময়ের কীর্তনের ধ্বনি সৃষ্টি হয়। মূল গানের সাথে প্রথমে ঠেকা বাজাতে হয়, গায়কের আখর সংযুক্তি শুরু

হলে বাদকের ‘লহর’ সংযুক্তি শুরু হয় এবং মূল ধারা থেকে উভয়েই ক্রমশ সরে আসতে থাকেন বলে এই পর্যায়কে বলা হয় কাটান। কাটানের পরিণত রূপ দিতে হাতে, ঘাত ইত্যাদি বাজানো হয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে বাঁয়াপ্রধান এক ধরনের তালভেদে নির্ধারিত জোরালো বাজনা বাজিয়ে আসরকে মাতিয়ে তোলা হয়—এই শেষ ধরনের মাতানো বাজনাকে বলা হয় মাতন।[৯৭]

শ্রীখোল

মূর্চ্ছন

শ্রীখোল বাদ্যের প্রাচীন পদ্ধতিতে সঙ্গতের শেষে তবলার মতো তেহাই দেবার নিয়ম নেই। তেহাইয়ের পরিবর্তে বিশেষ এক ধরনের সমাপ্তিসূচক বাজনা প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলে মূর্চ্ছন। বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ধরনের মূর্চ্ছন আছে, সেটি না বাজালে গায়ক থামবে না।[৯৮]

দোঁহার

কীর্তন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দোঁহারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবেশনের সাফল্য বহুল পরিমাণে দোঁহারের উপর নির্ভরশীল। মূল গায়েনের অবিচ্ছিন্ন সাহায্যকারী গায়ককে দোঁহার বলে। দোঁহারের কয়েকটি শ্রেণি আছে–

ক) শির দোঁহার,
খ) বায় দোঁহার,
গ) কান দোঁহার,
ঘ) সুর দোঁহার।

মূল গায়েনের পিছনের দিকে থাকে তাদেরও দুটি ভাগ থাকে–কয়েকজন ডানের দিকে থাকে তাঁদের বলা হয় ডান দোঁহার আর বামদিকে যারা থাকে তাদের বলা হয় বায় দোঁহার। 'দু'জন দোঁহার মূল গায়েনের ঠিক পিছনে বসেন, শির দোঁহার সুর সংযোজনে সহায়তা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গলা সংযোগ করেন। তাঁদের একজনকে বলে 'সুর দোঁহার' আর একজন কানের কাছে প্রস্তুত থাকে মূল গায়েন গানের কথা ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে তিনি হারমনিয়ামেই থাকেন। এই দোঁহারকে বলা হয় 'কান দোঁহার'।[৯৯] এ দোঁহারদের সাথে মূল গায়েনের বা দলপতির একটি নির্দিষ্ট ভাগের ব্যবস্থা থাকে যাকে বলে বকরা। তাছাড়া দু'একজন মূল গায়েন আবার বেতন ধার্য করে দোঁহার ও অন্যান্যদের দলে রাখেন।

হাতুটি : আসরে কীর্তনের দল বসার পরে শ্রীখোল এবং করতাল বাজনা শুরু হয়–এ বাদ্যধ্বনির ইঙ্গিতে সবরকমের শ্রোতা আকৃষ্ট হন এবং আসরে যোগদান করেন। হাতুটি শব্দটির মূল ব্যবহার হলো কীর্তনের প্রারম্ভে। প্রাচীনতম ধারা অনুসারে মাঙ্গলিক নির্ঘণ্ট হিসাবে আহ্বানসূচক শ্রীখোল বাদ্যের প্রণালীবদ্ধ বোল বাদনের রীতি স্বরূপ। খেতুরী মহোৎসবে দেবদাস প্রথমে এই খোল বাদনের মাধ্যমে উৎসবে কীর্তনের সূচনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত শান্তিপুরের অধিবাস কীর্তনে গোবিন্দ প্রথম এই মৃদঙ্গ বাদ্য শুরু করেন। তাই এই হাতুটি বাজনার মাঙ্গলিক রীতিটি প্রাচীনতম।[১০০]

মূল গায়েন

যিনি প্রধান গায়ক তিনিই মূখ্য গায়ন বা মূল গায়েন। বৃন্দাগানে ব্যবহৃত মূখ্যগায়ন শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে মূল গায়েন শব্দটি কীর্তন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বৃন্দাগান বলতে দল বেঁধে গান করা। কীর্তনের ক্ষেত্রে গানের দল আবশ্যকীয় ব্যাপার। 'যদি বৃন্দাগানের মূখ্য

গায়ন থেকে মূল গায়েন শব্দটি এসে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে কীর্তন গান প্রাচীন বৃন্দাগানেরই একটি ধারা। যাঁরা প্রধান গায়ককে কণ্ঠ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন *সমগায়ন* বা দোঁহার, দোঁহারের সঙ্গে যাঁরা বাদক থাকেন তাঁরা মার্দঙ্গিক, বাঁশি যারা বাজান তাঁরা বাংশীক।'[১০১]

শির বায়েন

কীর্তনের আসরে দোঁহার যেমন দুই ভাগে বিভক্ত থাকে তেমনি শ্রীখোল বাজিয়েরাও দুই দিকে থাকেন। প্রধান শ্রীখোল বাদক যিনি তিনি থাকেন ডান দিকে। তাকে বলা হয় 'শির বায়েন'। বাঁ দিকে থাকেন একজন বা দু'জন। বাঁয়ের বাদকগণ শির বায়েনকে মূলত সহায়তা করেন তাই তাঁদের বলা হয় বাঁয়াটি বায়েন, বাঁ দিকের দ্বিতীয় বাদক থাকেন তিনি হলেন প্রথম বায়াটির অনুগত। তাঁকে বলা হয় কোল বায়েন।[১০২]

কীর্তন গানের তাল–অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয় খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কীর্তন' বই-এর নতুন সংস্করণের সুচনায় সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকায় ষষ্ঠ বর্ষের (১৩৩৬) শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী কীর্তন গানে ব্যবহৃত যে ১০৮টি তালের সূচি প্রকাশ করেন, তিনি সেটি তুলে ধরেছেন। তালগুলোর তালিকা দেওয়া হলো–

১.	বড় দশকোশী	২.	বিষম দশকোশী
৩.	মধ্যম দশকোশী	৪.	ছোট দশকোশী
৫.	কাটা দশকোশী	৬.	বিরাম আড়া দশকোশী
৭.	বড় সমতাল	৮.	মধ্যম সমতাল
৯.	জোত সমতাল	১০.	কাটা সমতাল
১১.	ছোট সমতাল	১২.	সমতালের মূর্চ্ছন
১৩.	পাক ছটা	১৪.	শ্রুতি তাল
১৫.	পোট তাল	১৬.	ধরণ তাল
১৭.	কর্ণাট তাল	১৮.	কাটা পোট তাল
১৯.	আড়া ধরণ তাল	২০.	মাতলি তাল

২১.	বড় রূপক	২২.	মধ্যম রূপক
২৩.	ছোট রূপক	২৪.	বিষমপঞ্চম তাল
২৫.	পঞ্চতাল মধ্যম	২৬.	পঞ্চ শোয়ারী
২৭.	বড় ছুটা তাল	২৮.	বিষম ছুটা
২৯.	আড়া ছুটা	৩০.	ছোট ছুটা তাল
৩১.	বড় তেয়ট	৩২.	মধ্যম তেয়ট
৩২.	তেওড়া	৩৪.	তেয়টি
৩৫.	বড় ধড়া তাল	৩৬.	মধ্যম ধড়া তাল
৩৭.	কাটা ধড়া তাল	৩৮.	বড় একতাল
৩৯.	মধ্যম একতাল	৪০.	ছোট একতাল
৪১.	বড় শশিশেখর	৪২.	মধ্যম শশিশেখর
৪৩.	ছোট শশিশেখর	৪৪.	বড় ডাঁশপেড়িয়া
৪৫.	মধ্যম ডাঁশপেড়িয়া	৪৬.	ছোট ডাঁশপেড়িয়া
৪৭.	আড়া ডাঁশপেড়িয়া	৪৮.	বড় জপতাল
৪৯.	মধ্যম জপতাল	৫০.	ছোট জপতাল
৫১.	আড়া জড়তাল	৫২.	গঞ্জন তাল
৫৩.	পরিমাণ তাল	৫৪.	যোতি তাল
৫৫.	বড় ঝাঁপতাল	৫৬.	ছোট ঝাঁপতাল
৫৭.	বড় দুই ঠুকা	৫৮.	মধ্যম দুই ঠুকা
৫৯.	ছোট দুই ঠুকা	৬০.	আড়া দুই ঠুকা
৬১.	বড় বীর বিক্রম	৬২.	ছোট বীর বিক্রম

৬৩.	বড় আড় তাল	৬৪.	ছোট আড় তাল
৬৫.	বড় কাওয়ালী	৬৬.	ছোট কাওয়ালী
৬৭.	বৃহৎ একতাল তালৌ	৬৮.	ধ্রুব তালৌ
৬৯.	নটশেখর তালৌ	৭০.	নন্দন তালৌ
৭১.	চঞ্চুপুট তাল	৭২.	মণ্টক তাল
৭৩.	বড় ধামালি তাল	৭৪.	মধ্যম ধামালি তাল
৭৫.	ছোট ধামালি তাল	৭৬.	নিস্কারক তালৌ তালভ্যাং
৭৭.	চন্দ্রশেখর তাল	৭৮.	কন্দর্প তাল
৭৯.	বৃহদ্ ক্ষুদ্রক তালী তালৈশ্চ	৮০.	চম্পক তাল
৮১.	বদসি অষ্টতাল ৩২ চাপড়	৮২.	বদসি সপ্ততাল ২৪ চাপড়
৮৩.	ব্রহ্মতাল	৮৪.	রুদ্র তাল
৮৫.	নটনারায়ণ তাল	৮৬.	বিজয়ানন্দ তাল
৮৭.	নিঃসারক	৮৮.	প্রতিচঞ্চলুট তালৌ
৮৯.	গমক তালৌ	৯০.	সর্গদ তালভ্যাং
৯১.	দশমাক্ষর তালৌ	৯২.	রাসে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগোপাল তাল
৯৩.	শ্রীরাধারাণীর নৃত্য বিষম সঙ্কট তাল	৯৪.	শ্রী ললিতায়াঃ নৃত্য তাল বিক্রম
৯৫.	শ্রী বিশালায়াঃ নৃত্য তাল	৯৬.	চম্পকলতায়াঃ নৃত্য তাল
৯৭.	শ্রী তুঙ্গ-বিদ্যায়াঃ বান্ধব তালৌ	৯৮.	ইন্দুরেখায়াঃ নৃত্য ঝম্পক তালৌ
৯৯.	সুচিত্রিয়া নৃত্য মন্দস্মিত তালঃ	১০০.	রঙ্গদেবীর নৃত্য বান্দি বোলং
১০১.	সুদেবীর বাঁদি বোল ছক্কা নৃত্য তাল	১০২.	শ্রীরাধাকৃষ্ণের একসঙ্গে নৃত্য তাল
১০৩.	শ্রী রাসমণ্ডলে সমস্ত গোপীদের নৃত্যতাল	১০৪.	শ্রীমহাদেব নৃত্যতাল

১০৫.	শ্রী পার্ব্বতীর নৃত্য তাল	১০৬.	ঝুমুর তালভ্যাং
১০৭.	খেমটা তাল বা কেহেরবা	১০৮.	ঝুরঝুটি তালি তালভ্যাং

৪.৫ কীর্তনের অঙ্গ

কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ : (ক) কথা, (খ) দোঁহা, (গ) আখর, (ঘ) তুক এবং (ঙ) ছুট।

ক) কথা : সঙ্গীতশাস্ত্রে লক্ষ্য–লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য অর্থে গান (কথা), লক্ষণ তাঁর শাস্ত্র (রাগ ও নিয়মাদি)। কথার অন্য অর্থ আছে। কথা অর্থে গানের ভাষাকে বোঝায়। কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই ও সখিগণের উক্তি প্রত্যুক্তিকে বলা হয় কথা। একটি পদ গেয়ে অন্যপদ গাওয়ার সময় কীর্তনীয়া যে কথার সাহায্যে উভয়কে গ্রথিত করেন তাকেও বলা হয় কথা। গানের কোনো পংক্তির অর্থ কথার সাহায্যে কীর্তনীয়া বিশ্লেষণ করলে তাকেও কথা বলা হয়।"[১০৩]"Katha is used in a number of senses in kirtana :

a. The wordings of the lyric,
b. Statements and counter statements between characters; or the dialogue between chracters,
c. The linking words that connect one song with the other, and
d. Enumeration of a certain line or portion in words."[১০৪]

খ) দোঁহা : দোঁহা বলতে বোঝায় শ্লোক ভঙ্গিম রচনা যেগুলো কীর্তনীয়াগণ আবৃত্তি করে থাকেন। চর্যাগীতির সমকালীন বৌদ্ধ রচনা দোঁহা। সে থেকেই কীর্তনে সূত্রাকারে শ্লোকভঙ্গিম রচনার ব্যবহার হয়ে থাকবে বলে কীর্তনবিদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন। কীর্তন গায়নের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে দোঁহার। দোঁহার বলতে সাহায্যকারী গায়ক বোঝায়। মূল কীর্তনীয়াকে যারা গান গেয়ে সাহায্য করে থাকেন তাঁরা দোঁহার। কীর্তনীয়া পদের একটি অংশ গাইলে দোঁহারগণ তার আংশিক বা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করেন। অনেকের ধারণা যে মূল গায়ক গানের অংশবিশেষ গাইবার পর যারা সে অংশটি দুই হার বা দুইবার গান তাঁরাই দোঁহার। দোঁহা শব্দে উভয়ই বোঝায়। কীর্তনীয়ার উভয় পার্শ্বে বসে গান করেন এই অর্থেও দোঁহার কথাটি প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে।[১০৫] হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধদের রচিত দোঁহা-কোষ পাওয়া গিয়েছে। দোঁহা হতেও 'দোঁহার' কথার উৎপত্তি কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে। 'মূল গায়কের গাইবার পর গান দুই হার (দুইবার) গায় বলে এদের নাম দোঁহার। গানের সূত্র ধরিয়ে দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের

রেশ জমিয়ে রাখা দোঁহারের কাজ। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থের শ্লোকাংশে কীর্তনে দোঁহা নাম পরিচিত।’[১০৬]

Doha means couplets but it is used in two different ways in kirtana :

a) Certain enumerations are done thought couplets which are composed to maintain a link between songs.

b) Doha also means dohar, the accompanying vocalists to the main singer of kirtana. They sit on either side of the mul-gayen and help in keeping the refrain. They follow the main singer and keep musical atmosphere tuneful and alive.”[১০৭]

আখর : আখর পদাবলী কীর্তনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। আখর বলতে গিয়ে মূল পদের বা পদের অংশ বিশেষের ভাবানুসরণে কীর্তনীয়া কর্তৃক প্রদত্ত আপন অভিব্যক্তির সঙ্গীতানুগ বর্ণনা। মূল পদ বা পদস্তবক গেয়ে কীর্তনীয়ার সাধ মিটছেনা, সে সম্পর্কে তিনি নিজেরও কিছু কথা গানের সঙ্গে যোগ করে গাইতে চান। এই যোজিত অংশটিই হয়ে ওঠে আখর।[১০৮] রবীন্দ্রনাথ আখরকে বলেছেন কথার তান। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাথে দ্বিতীয়বার যখন সাক্ষাৎ হয় (১৯৩০ সাল, ১৪ই জুলাই) তখন তাঁদের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে কীর্তনের কথা। আইনস্টাইন প্রশ্ন করলেন রবীন্দ্রনাথকে ‘Are the words of a song also free? I mean to say is the singer at liberty to add his own words to the song which he is singing?’সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন ‘yes, In Bengal we have a kind of song–kirtan we call it which gives freedom to the singer to introduce parenthetical comments, phrases not in the original song. This occasions great enthusiasm, since the audience is constantly thrilled by some beautiful, spontaneous sentiment added by the singer.’[১০৯] (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Asia নামক সাময়িকীর মার্চ ১৯৩১ সংখ্যায় এই কথোপকথন প্রকাশ পায়।) কীর্তনের মাধুর্য আস্বাদনে আখর প্রধান সহায়ক। পদকর্তাগণের বিনা সূতায় গাঁথা মালার রহস্যগ্রন্থি উন্মোচনে আখর একমাত্র উপায়। আখর রসের ভাণ্ডার, অনর্গল করার মন্ত্র উন্মোচনের কুঞ্জিকা। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্তিক। আখরের তাৎপর্য সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–‘আখর পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসভাণ্ডারের কুলুপ খুলিবার কুঞ্চিকা। আখরকে

পদের ব্যাখ্যা বলিলে আসল কথাটাই যেন বলা হয় না। পদে যাহা বলা হয় নাই অনেক সময় আখরে তাহা প্রকাশ পায়। সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলিতে পারি। আখর কোন পদ বা পদাংশ নয়। গড়ন অন্যরকম। আখরের দুই পংক্তির মধ্যে অন্তিম মিল থাকিতে পারে, তবে না থাকিলেও ক্ষতি নাই।'[১১০] গৌর নিতাইকে আবাহন করে কীর্তনীয়া গাইলেন–

'এস দুটি ভাই গৌর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে
আমি পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে।'[১১১]

গানের পরপরই আখর শুরু হল 'আসতে হবে হে, একা যদি আসতে নার, ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর, আমার হৃদয় নদীয়া কর'। এভাবেই বিভিন্ন গুণী কীর্তনীয়া সুন্দর সুন্দর আখর করেন।

কীর্তনে কিছু বাঁধা আখর প্রচলিত আছে। যেমন–'কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধা বা রাধার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের' উক্তির পর এইরূপ আখর দেওয়া হয়–

'রূপ বর্ণনা হয় না।
বর্ণনাতীত রূপ বর্ণনা হয় না।
যে দেখেছে তার বাক্ নাই।
যে বলবে তার নয়ন নাই।
নয়ন দেখেছে সে বলতে নারে।
বদন বলবে দেখে নাই তারে।'[১১২]

এই আখরের উদ্দেশ্য মূল পদ হতে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরে বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা। বড় বড় কীর্তনীয়াগণ আখর তৈরি করে নেন। আখর তৈরি করতে হলে বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভাল দখল থাকতে হয় আর আসরভরা শ্রোতাদের মন বুঝতে হয়।[১১৩] কীর্তনীয়া আখর তৈরি করে দোঁহার ও বাদকের সাথে আলোচনা করে সুর বসিয়ে নেন। গুরুর তৈরি আখর শিষ্য গেয়ে থাকেন। আখর শিষ্য পরম্পরা চলতে থাকে। ধ্বনিসাদৃশ্য ধরে আখর অনেক ক্ষেত্রেই তরল ও চটুল হয়ে উঠতে দেখা যায়।

তুক : তুক কীর্তনের একটি অঙ্গ। অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময়, মিলনাত্মক গাথা তুক নামে অভিহিত। কীর্তন গায়করা মূল পদের বা পদস্তবকের অনুসরণে তুক রচনা করে গানের সঙ্গে যুক্ত করেন। সাধারণত তুক আখরের চেয়ে দীর্ঘ। কোন তুকে কয়েকটি স্তবক থাকে এবং তা একটি মূল পদের

ভাবানুসারী পদ হয়ে দাঁড়ায়। বড় ধরনের তুক রচনা তুক গান রূপে খ্যাত হয়। অনেক অজ্ঞাত পদকর্তার ভণিতাহীন রচনা তুক রূপে প্রচলিত আছে।[১১৪]

যেমন–

'কলহান্তরিতার তুক–

তোমায় নিতে আসিনি।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠছো কি হে

তোমায় নিতে আসিনি।

আমি ফুল নিতে এসেছি। কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি,

বাসি ফুল হবে না, ঝরা ফুল হবে না।

মান রাজার পূজা হবে, করবে পূজা কমলিনী।'[১১৫]

ময়নাডালের কীর্তনীয়া নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুরের সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া নৌকা বিলাসের তুক–

(ওহে নাবিক) বিষম তরঙ্গে তরণী ডুবাইওনা,

আমরা যদি ডুবে মরি!

এ ঘাটে রাই মরেছে বলে!

তোমার এ ঘাটে কেউ আসবেনা,

কেউ আসবেনা, কেউ আসবেনা॥

ছুট : ছুট একটু হালকা ধরনের গান। ভারী গান গাইতে গাইতে কীর্তনীয়ারা অনেক সময় একটু সহজভাবে গাইতে থাকেন। হয়ত তরল তালে একটা পদের কিছুটা গেয়ে দিলেন। এটাকেই ছুট বলে। বড় তালের গানের মধ্যে তাল ফেরতার ছোট তালের গানকেও ছুট বলে। আবার তালেরই একটি নাম ছুট। 'It is a kind of light song or part of a pada renderered in between heavy padas, in simple tala. Chut is also meant to create veriety in padas set in heavey talas, by singing in lighter talas, as tala–ferta.'[১১৬]

ঝুমুর : কীর্তনের আর একটি অঙ্গ ঝুমুর। ঝুমুর বা ঝুমরী একটি সুর। পদাবলীতে পাই 'ঝুমরী গাইছে শ্যাম বাঁশি বাজাইয়া।' ভক্তিরত্নাকরেও ঝুমরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ঝুমুর অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'কীর্তনের পালা গান গেয়ে মিলন গাইতে হয়। কিন্তু দুই তিনজন কীর্তনীয়া একই আসরে পরপর যেখানে একই রসের পালাগান গেয়ে থাকেন, সেখানে মিলন গাওয়া চলে না। সেখানে দুই ছত্র 'ঝুমুর' গেয়ে কীর্তনীয়াকে আসর রাখতে হয়। শেষের গায়ক মিলন গেয়ে কীর্তন সমাপ্ত করেন।'[১১৭]

রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতীত নানা পৌরাণিক বিষয় নিয়েও ঝুমুর গান রচিত হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী এদের নামকরণ হয়। কাহিনী প্রধান ঝুমুর গান পাঁচালীর সুরে এবং ভাব প্রধান রচনা প্রচলিত লৌকিক সুরে গীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কীর্তনাঙ্গের সুর। আধুনিক ঝুমুর গানে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ ভণিতা বা কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন ভবপ্রীতা ওঝা, বিনোদ সিংহ, নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণদাস, পাগলা, ননীবালা প্রমুখ। অধিকাংশ ঝুমুর গানের সঙ্গে নৃত্যও যুক্ত আছে। যেমন–

'আইসো কানু বইসো কড়চিরো পাত
কানু কোদম তলে
গাইনি মাগে দিব ধনি কানু কোমত তলে।'[১১৮]

কীর্তনের বা লোকনাট্যের বিপুল বিচিত্র অঙ্গনে 'ঝুমুর' একটি অনবদ্য সম্ভার। কীর্তন গানের ঝুমর এবং লোকগানের ঝুমুরের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

৪. ৬ কীর্তনে নৃত্য

পাঁচালী গানের নাচের উপাদানটি লীলাকীর্তনে এসেছে। সংকীর্তনেও নাচ আছে সে কথা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। চৈতন্যদেবের কীর্তনে নাচ হতো। চৈতন্যদেব ও তার পরিকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, বিশেষত অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, নরহরি সরকার ও জগদীশ পণ্ডিত নাচে পারদর্শী ছিলেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে চৈতন্যমণ্ডলীতে তাণ্ডব এবং মধুর উভয় প্রকার নাচই হতো। তাণ্ডব পুরুষের নাচ, বলবীর্যব্যঞ্জক। নামকীর্তনে তাণ্ডব নাচের সুযোগ হয়। মধুর বা লাস্যনৃত্য রমণীর বা নারী পুরুষের যুগলনৃত্য। গীতগোবিন্দ পদগানের সঙ্গে লাস্য নৃত্য চলে।[১১৯] নবদ্বীপ ও পুরীধামে কীর্তন সম্প্রদায়ের যাঁরা নৃত্য করতেন, তাদের মধ্যে–

'বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে॥
দা সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥'[১২০]

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নৃত্যে আনন্দিত হয়ে মহাপ্রভু বলেছিলেন–

প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা॥[১২১]

মহাপ্রভুর আর একজন অন্তরঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত আছে–

'যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন প্রচার।
যার দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার।'[১২২]

অদ্বৈত আচার্য, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত সকলেই কীর্তনে ও নৃত্যে সমান নিপুন ছিলেন। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র, অদ্বৈতপুত্র অচ্যুত, গোপাল ও কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর এবং খেতুরীর ঠাকুর নরোত্তম, যাত্রী গ্রামের আচার্য শ্রীনিবাস কীর্তনে ও নৃত্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ নাটগীতে নিপুন ছিলেন। নিত্যানন্দ সম্পর্কে কথাই আছে, 'নাটের গুরু নিত্যানন্দ।'[১২৩]

চৈতন্যচরিতামৃতে ১/১১ তে উল্লেখ আছে মহেশ পণ্ডিত ঢাকের বাজনার সঙ্গে খুব ভালো নাচ করতেন। অর্থাৎ সংকীর্তনে ঢাকির নাচও কিছুটা এসেছিল।লীলাকীর্তনে শাস্ত্র মেনে নাচ করা হতো। শাস্ত্রীয় নাচের উত্তরাধিকার কীর্তনীয়ারা উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা কেরলে মন্দিরে মন্দিরে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রানুযায়ী লীলাকীর্তনের সাথে নাচ করতেন। নাট্য শাস্ত্রচর্চার সাথে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা ছিল। 'সপ্তদশ শতকে নদীয়ার জমিদার রাজা রাঘব রায়ের (জমিদারী প্রাপ্তি ১৬৩২) মতো বড় বড় জমিদারের দরবারে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা হতো। কীর্তনীয়ারা এই সূত্র থেকে নৃত্য বিদ্যা আহরণ করে থাকতে পারেন।'[১২৪] আর একটি সম্ভাব্য সূত্র নীলাচলে মাহারি বা দেবদাসীদের শাস্ত্রীয় গীত ও নৃত্যের ঐতিহ্য সুবিদিত। বাংলা ও নীলাচল হতে কীর্তনীয়ারা শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিখেছে বলে ধারণা করা হয়। কীর্তন রসের সৌন্দর্য ও গভীরতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কীর্তনীয়রা গানের সাথে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা করতেন। 'সঙ্গীতসারসংগ্রহের' নৃত্যনাট্যপ্রকরণ ও আঙ্গিকাভিনয়প্রকরণ অংশে নরহরি চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় নাচ সম্পর্কে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা কীর্তনীয়াদের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় পারদর্শী করে তোলার জন্য লেখা বলে মনে করা হয়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫ তরঙ্গ) শাস্ত্রীয় নাচের বিবরণ আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়ের' গীত বিবরণ অংশেও নরহরি নৃত্য বিষয়ে আলোচনা ও নর্তকের লক্ষণ নির্দেশ আছে। 'আগের দিনে বেশিরভাগ কীর্তনীয়াই কুশলী নর্তক ছিলেন। তাঁদের জন্য মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা লীলাকীর্তনের প্রকাশ্য আসরে সর্বজনভোগ্য হয়ে উঠেছিল।'[১২৫]

৪.৭ কীর্তন গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

শ্রীখোল : শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এই যন্ত্রের রূপকার বলে ধরে নেওয়া হয়। বৈষ্ণবীয় সংস্কার অনুযায়ী শ্রী শব্দটি যুক্ত করে খোলকে শ্রীখোল বলা হয়। কীর্তনে ব্যবহৃত প্রধান যন্ত্রই হলো 'খোল'। যন্ত্রটিকে বিশেষ মাঙ্গলিক যন্ত্র হিসাবে স্বীকার করা হয়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে :

'মর্দল আনন্ধশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার।
কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্মিত এ দ্বয় প্রকার॥
সর্ব বাদ্যোত্তম এ মর্দল সংযোগেতেঃ
সর্ববাদ্য শোভা পায় বিদিত শাস্ত্রেতে॥
মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি-দেব স্থিতি নিরন্তর।
পরম মঙ্গল ধ্বনি সর্বমনোহর।'[১২৬]

খোল নামটি কিভাবে এসেছে তার সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে যখন শ্রীচৈতন্যদেব সাতটি সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন তখন সেই 'সাত সম্প্রদায়ের বাজে চৌদ্দ মাদল'—এমন উল্লেখ আছে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। পণ্ডিতবর্গ এ যন্ত্রটিকেই 'মৃদঙ্গ' বলে আখ্যা দিতেন। গোবিন্দ যে যন্ত্রটি বাজাতে পারদর্শী ছিলেন তার নাম ছিল 'মৃদঙ্গ'। নরোত্তমদাসের খেতুরী মহোৎসবে দেবীদাস যে যন্ত্রটি বাজিয়ে ছিলেন—সেটির নাম ছিল 'মাদল'। বংশীদাসের পদে পাওয়া যায় 'খেলিবার প্রবন্ধে কৈলেন খোল করতাল'। সমসাময়িক অনেক গ্রন্থেই 'খোল' শব্দটির ব্যবহার আছে।[১২৭] সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় একই যন্ত্র বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে।

'আনন্ধে মার্দল শ্রেয়ান ইত্যুক্তং ভরতাদিভিঃ
মৃত্তিকা নির্ম্মিতশ্চের মৃদঙ্গ পরিকীর্ত্তিত।'[১২৮]

মৃদঙ্গের এই প্রাচীন বৈশিষ্টটি আজ পর্যন্ত খোলের ক্ষেত্রেই বর্তমান। তাই এখনও শ্রীখোলকে মৃদঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়।

করতাল ও কাংস্যতাল

কীর্তনে যেসব বাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল করতাল ও কাংস্যতাল।

করতাল—

'কাংস্যজে ঘনবাদ্যে স্যাৎকাংস্যমগ্নৌ সুশোধিতম্।
কাংস্যজো বর্তুলস্তালঃ সপাদদ্বয়ঙ্গুলাননঃ॥
মধ্যোহ্নু স্যাঙ্গুল বিস্তারো নিম্নো রন্ধ্রং চ মধ্যগম্।
পাদোনগুঞ্জামাত্রং স্যাৎপিণ্ডস্তু যবমাত্রকঃ॥
সার্ধাঙ্গুলঃ স্যাদুৎসেধঃ সমাশ্নক্ষ্ণ শুভাকৃতিঃ।
কার্যা তথা যথা নাদো ভবেচ্ছ, তিমনোহরঃ॥
নেত্র বস্ত্রাঞ্চলাগ্রাণি রজ্জু কৃত্য নিবেশয়েৎ।
রন্ধ্রেহগ্রাণামনির্গ স্যৈ গ্রন্থিং চ রচয়েদ্ দৃঢ়ম্॥'

সঃ রঃ–৬ঃ১১৭০-৭৩[১২৯]

করতাল বাদ্যের বর্ণনা ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এর থেকে পাওয়া যায় যে করতাল বর্তুলাকার, মুখটি হবে বার আঙ্গুল ব্যাসার্ধ যুক্ত, মধ্যভাগ সূক্ষ্ম এবং এক আঙ্গুল ব্যাসযুক্ত যার নিম্নাংশে থাকবে ছোট একটি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি পাটের দড়ি বাঁধা থাকবে। ওই দড়িটি আঙ্গুলে বেঁধে করতাল ধারণ করে বাজাতে হয়। অনুরূপ করতাল অদ্যাবধি প্রচলিত, বিশেষত আঞ্চলিক গানে—যেমন ভারতের পূর্বাঞ্চলের কীর্তন গানে, মধ্যাঞ্চলের অর্থাৎ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোকগীতিতে।

কাংস্যতাল : করতাল থেকে সামান্য বড়, পদ্মপাতার মতো দুটি খণ্ডই যদি সমান হয়, যদি মধ্যভাগ সরু হয়ে এক আঙ্গুলের মতো হয়, যার তলদেশে ছোট ছিদ্র থাকবে এবং করতালের মতো পাটের দড়ি বাঁধা থাকবে, তবে তাকে বলা হয় কাংস্যতাল।

'নলিনীদল সংকাশৌ কাংস্যতালৌ সমাকৃতী।
ত্রয়োদশাঙ্গুলৌবক্তে কাংস্যজে দ্ব্যঙ্গুলৌ তলে॥
মধ্যেছঙ্গুলমিতৌ নিম্নৌ তয়োরন্যত্তু তালবৎ।
পাটা ঝনকটা মুখ্যাঃ সন্তি পাটান্তরান্যপি॥' সাঃ রঃ ৬/১১-১-৮২[১৩০]

এর থেকে বুঝা যায় যে, করতালও নির্দিষ্ট পাটে বাজান হতো। যেমন কাংস্যতাল ক্ষেত্রে ঝ, ন, ক, ট ইত্যাদি। গঠন প্রায় করতালের মতো কিন্তু কেবল আকার প্রভেদের জন্য নামান্তর হয় কাংস্যতা।

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা : এই যন্ত্রটি নাচের জন্য ব্যবহার করা হয়। কীর্তনীয়াদের পায়ে বালার মতো লাগাতে হয়। ভিতরে ফাঁপা, যার মধ্যে থাকে সূক্ষ্ম বদরী বীজের মতো কতগুলো গোলক। দড়ি লাগানো থাকে

এবং তার সাহায্যে পায়ে বাঁধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ নাচের সময় ক্ষুদ্র ঘন্টিকা ব্যবহার করতেন। এটির অন্য নামও আছে। যেমন– ঘর্ঘরা, মর্মরা ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যরত রূপের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

'কটিমাঝহি ঘাঘর, ঘুঙ্গুর অতি সুমধুর বাজে'। এ যন্ত্রটি কোমরের বিছার মতো করেও ব্যবহার করা যায়। মাঝে মাঝে কতগুলো ছোটো ঘুঙ্গুর ঝুলানো থাকে।'[১৩১]

মঞ্জীর : এটি অভিজাত ঘুঙ্গুর। বিভিন্ন ধাতুর হতে পারে। যেমন–স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পিতল, কাঁসা ইদ্যাদি। এটি নাচের সময় ব্যবহার হয় এবং পায়ে লাগানো থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়–'অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর'[১৩২]–অন্তস্থল ফাঁপা এবং সেখানে থাকে দাড়িম্ব বীজের মতো শক্ত ধাতব বীজ। নৃত্যের সময় পায়ের আন্দোলনে ঘর্ষণজনিত শব্দোৎপন্ন হয়।

৪.৮ ঢপ কীর্তন

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এক ধরনের কীর্তনাঙ্গের গান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গান হলো ঢপ গান বা ঢপ কীর্তন। কীর্তন গান লৌকিক স্তরে নেমে এসে যে রূপলাভ করে ঢপ কীর্তন তাদেরই অন্যতম। ঢপ নামকরণের কারণ হলো প্রথাগত কীর্তনের সঙ্গে কিছু সহজ সরল এবং চটুল সুরের সংযোজন করে নতুন হালকা ধরনের গান পরিবেশন করা শুরু হয়। ঢপ কীর্তনের শিক্ষাগুরু ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। তবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী গানের সুর সৃষ্টির ব্যাপারে মধুকানের নাম সর্বাগ্রে করা উচিত। তবে এই সিদ্ধান্তের কোনো গবেষণামূলক বিচার হয়নি। ‘বিশেষ ধরন বা ঢঙের কীর্তন সূত্রে উদ্ভুত এই সঙ্গীত প্রসিদ্ধ পালাকার ও গায়ক রূপচাঁদ চাটুজ্যে (১৭২২-১৭৯২) মনোহরশাহী কীর্তনাঙ্গের গান থেকে যে বিশেষ ধরনের চটুল গানের প্রচলন করেন, তা ‘ঢপ’ কীর্তন নামে পরিচিত।’[১৩৩] তবে ঢপের উদ্ভাবনে মধুসূদন কানের অবদানই বহুল স্বীকৃত। ‘মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান যশোর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে বাংলা ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন (১৮-১৮ খ্রিঃ)। ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে মৃত্যুবরণ করেন।’[১৩৪] তার বাবার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিলকের চার পুত্রের মধ্যে মুধুই জেষ্ঠ। পিতার দারিদ্রতার কারণে মধু লেখাপড়া শিখতে পারেন নাই। শৈশবকাল হতেই গীত রচনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ গায়ক ছোট খাঁ, বড় খাঁর শিষ্য হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপরে ঢাকা হতে যশোহর জেলার রাঢ়খাদিয়া নিবাসী রাধামহোন বাউলের নিকটে এসে তিনি ঢপ-কীর্তন শিক্ষা নেন। এই ঢপ কীর্তনেই আজ তাঁর নাম অমরত্ব লাভ করেছে। ‘কীর্তন থেকে সরে এসে ‘নবীন পদ্ধতি’ (সাজ পোষাক ছাড়া) নারী কণ্ঠ রূপান্তরে ‘ঢপ কীর্তন নামে খ্যাত (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সুকুমার সেন)। ঢপগান নতুন আঙ্গীকের হলেও এ আদ্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর পালা।’[১৩৫]

তবে মধুকান বা রূপচাঁদ যিনিই ঢপ সুরের প্রবর্তক হিসাবে দাবি করুন না কেন তাদের বহু পূর্বেই ঢপের অস্তিত্ব ছিল। কারণ কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে সমস্ত প্রাচীন সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করেন তার মধ্যে ঢপ কীর্তনের নামও পাওয়া যায়। তবে কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। তাই ঢপ কীর্তনের প্রাচীনতা নিয়ে কোনো সন্দেহেরও অবকাশ থাকা উচিত নয়। কারণ স্বয়ং লালন ফকিরের ঢপ সুরের দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন।[১৩৬] লালনের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে। তাঁর জীবিতকালে অর্থাৎ সাধক জীবনের পরিপূর্ণতার চরম সময়ে ঢপের সুর দ্বারা যদি তাঁর গান প্রভাবিত হয়েও থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ বাংলাদেশের ওই সময়ে ‘ঢপ ছাড়া গীত নাই।[১৩৭] অষ্টাদশ শতকে এ ধারার

গানে মহিলা কীর্তনীয়ার আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে পান্নাবাই, পটলবাই, ছাপান্ন ছুরী, কমলা ঝরিয়া, ললিতা বৈষ্ণবী যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। পুরুষ গায়কদের মধ্যে লোচনদাস, দ্বারিকদাস, অঘোরদাস, শ্যাম বাউল, শ্রীদামদাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথী রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখের নাম প্রসিদ্ধ। অনেকে রূপচাঁদ পক্ষীকে ঢপ গানের প্রণেতা বলে স্বীকার করেন। ইনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। প্রথম জীবনে কথকতার আসরে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে ঢপকীর্তনের দল গঠন করে সমগ্র রাঢ় বাংলাকে মাতিয়ে তোলেন। ইনি ডুবকী নিয়ে গান করতেন। গানের চলন ছিল হালকা।[১৩৮] রূপচাঁদ ডুবকী রচিত ঢপ কীর্তনের একটি পদ–

‘পাড়ার লোকে গোল করে যা
বলে গৌর কলঙ্কিনী।
যেদিন হয় মা কাজীর দলন
গৌর করে নগর কীর্তন,
আচন্ডাল ব্রাহ্মণ যবন গৌর সঙ্গেতে৷’[১৩৯]

অন্যদিকে মধুকানের ঢপ কীর্তন পাঁচালী, কথকতা, বাউল প্রভৃতি গানের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ এনে দেয়। এই ঢপ গানকে মধুকান জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান। সমগ্র বাংলার বুকে তিনি এই গানকে ছড়িয়ে দেন। তিনি নিজে ঢপ কীর্তনের সুরে বহু পালা রচনা করেন। তার মধ্যে কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর, অক্রুর সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢপ গানকে তিনি নবরূপে রূপায়িত করেন। ‘ঢপ কীর্তন’ নামটি মধুকানেরই দেওয়া।[১৪০]

মধুকানের ঢপ গানের উদাহরণ

“কৃষ্ণ বিরহে রাধা যমুনাতীরে মূর্ছাগত। মর্মসখীরূপ মঞ্জরী তাকে কোলে করে বসে আছে। অপর সখীরা বলাবলি করছে :

রাজ নন্দিনী পড়লো ধরায়,
ওমা তোরা ধর, আয় ধর আয়,
কমলিনী আয় গো তোরা
এরাই যায় যে যমুনায়।[১৪১]

ঢপ কীর্তন গাওয়ার বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি–

এই গানে মূল গায়েন একজন এবং বাকি যাঁরা তাঁরা ছিলেন ধুয়াধারী বা দোঁহার। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই এই গান করতেন। দলের অধিকারীরা নিজেরাই গান বাঁধতেন। বিভিন্ন

রাগরাগিণীর প্রভাবে এবং ভাঙ্গা কীর্তনের সুরে ঢপের গানগুলি তৈরি হলেও কীর্তনের মূল নীতিকে এই গানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হতো না। কারণ পাঁচালী গানের সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের মিশ্রণ ঘটিয়ে এই গান খানিকটা নাটগীতের আঙ্গিকে তৈরী করা হয়েছিল। এই গানের তৎকালীন গায়ক-গায়িকা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশেষ কুশলী শিল্পী। তাই হালকা ধরনের গান হলেও এ গান ছিল আসর জমানোরই গান।[১৪২] তালের মধ্যে কীর্তনের লোফা তাল, ঝাঁপতাল, চঞ্চুপুট, আদ্ধা প্রভৃতি তালের ব্যবহার দেখা যায়। গানের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো সখীরে বলে চড়া সুরের বিস্তার, আর আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো ওই সময়ে মিউজিক Concert-এর মতো হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্লারিওনেট, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলো একসঙ্গে বেজে ওঠা। সময়ে সময়ে আবার আসর জমানোর জন্য গানের সঙ্গে নৃত্যও সংযোজিত হতো। পূজা-পার্বণ যে কোনো অনুষ্ঠানে ঝুলন, দোল, যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবে আখড়ায় বা নাটমন্দিরে ঢপ গানের আসর বসানো হতো। মূলত পালাভিত্তিক সঙ্গীত পরিবেশনায় ঢপ-কীর্তন একটি কাহিনীগত ইঙ্গিত সব সময়ই নেপথ্যে থাকত। সেখান থেকে ক্রমে ঢপগান নাট্যনুবর্তী হয়ে ওঠে।[১৪৩]

কীর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরিশেষে বাংলার কীর্তনগান নিয়ে বলা যায়—

পদাবলী কীর্তনের ভেতর দিয়েই বাঙালির প্রথম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে। চর্যাগীতি বা গীতগোবিন্দ পদাবলী তৎকালীন প্রবন্ধগীতির অন্তর্গত ছিল। তাতে বাংলা নিজস্ব সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা নয়। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিছু কিছু একান্ত আঞ্চলিক প্রবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেসবের গায়নরূপ রক্ষা পায়নি, যার ফলে এর কোন ধারাবাহিকতা নেই। পদাবলী কীর্তনেই প্রথম একটি সংগীতরূপ প্রতিষ্ঠা পেল যা ঋদ্ধ ও একান্তই বঙ্গীয়। হিন্দুস্তানী সংগীতকলার ভিত্তিতেই বাঙালি কীর্তনসংগীত রচয়িতাগণ একটি বঙ্গীয় সংগীতধারা সৃষ্টি করলেন। হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর রচনার রীতি হচ্ছে রাগের সাধারণ রূপপ্রকাশমূলক। হিন্দুস্তানী সংগীতের গোটা বিকাশই হয়েছে বিশুদ্ধ সংগীতের আদর্শে।[১৪৪] কিন্তু বাঙলার কীর্তনে রাগসুরও রূপায়িত হয়েছে হৃদয়াবেগ প্রকাশের পটভূমিতে, রাগসমূহের সাধারণ রূপ প্রকাশ সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সুরকলা কীর্তনে এসে কাব্যভাবমুখী হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে গড়ে উঠেছে কীর্তনসংগীতের নিজস্ব তালমালা। হিন্দুস্তানী তালপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এই জটিল বিপুল তাল জগৎ। ফলে সুরে আর তালে মিলে এমন এক ধরনের সাংগীতিকতা রচনা করে কীর্তনসংগীতকারগণ-যা অভিনব, একান্তই বঙ্গীয় এবং কাব্যভাবমুখী। কাব্যসংগীতকলারূপে বাংলা গানের যথার্থ সূত্রপাত পদাবলীকীর্তনেই।

বাংলার কীর্তনগান এক নজিরবিহীন সেরা সম্পদ যাতে এসে মিলেছে পদাবলী সাহিত্য, ভাব ও রসের শাস্ত্রীয় বিচার এবং লোকগান ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অমৃতরসের ত্রিধারা। আর সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দেওয়া শ্রোতা ও গায়কবৃন্দের ঘটেছে ত্রিতাপদাহ থেকে মুক্তি।[১৪৫] শিক্ষাষ্টকের **১ম** শ্লোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাই আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য :

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥[১৪৬]

তাৎপর্য–কীর্তনগান গাইলে বা শুনলে প্রথমত মানুষের মনরূপী আয়নার দাগ পরিষ্কার ও মন নির্মল হলেই হয় শান্তিলাভ, কীর্তনের দ্বিতীয় উপকার মহাপ্রভুর মতে–ভবদাবানলের নির্বাপন। গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে যেমন দাবানল হয় এখন তেমন মানুষে মানুষে সংঘর্ষের ফলে ভবদাবানল জ্বলছে এবং তা নির্বাপিত হতে পারে বিশ্বব্যাপী সংকীর্তনের মহামেঘ বর্ষণের মাধ্যমে। যেমন চাঁদের আলোতে শালুক আপনি ফোঁটে, তেমনি কীর্তনচন্দ্রের আলোকে জনগণের কল্যাণকুমুদ হবে স্বয়ং প্রস্ফুটিত। কীর্তনগান মানুষের বিদ্যালাভের সহায়ক। কীর্তগানে যেমন বাংলা সাহিত্যের পদাবলী প্রধান উপজীব্য তেমনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা হয়। ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া লোকেরও সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ ঘটে এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যাও লাভ হয়। কীর্তনগান আনন্দসাগরের বিবর্ধন করতে সহায়তা করে। কীর্তনের পদে অমৃতের স্বাদ। কীর্তনের পদে যদি অমৃতের স্বাদ না পাই তাহলে বুঝতে হবে হয় আমার ঐ রসাস্বাদের বোধ নাই, বুদ্ধি নাই, না হলে কীর্তন পরিবেশকের ভঙ্গি হয়তো ঠিক নেই, কিংবা পরিবেশ অনুযায়ী নির্বাচন ঠিক হয়নি। মহাপ্রভু বলেছেন, 'সর্বাত্মস্নপনম্' অর্থাৎ কীর্তন এমন গান যা পারে সর্ব আত্মায় স্নান বা আত্মার সার্বিক স্নান করাতে।[১৪৭] কীর্তনগানে যে প্রেম বিশ্লেষণ করা হয় তা একই সাথে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত আবার আপামর জনসাধারণের অনুভূত প্রেম। কীর্তনগান হোক সার্বজনীন এই প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

১. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, প্রকাশন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৫৮

২. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬, পৃ. ৫১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৪. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, প্রকাশক ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট, লি. প্রকাশকাল ১৯৮৫, পৃ. ৫৭

৫. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়*,প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৯০, পৃ. ৫৭

৬. Roy Bimal, *Bharatiya Sangita Prasanga,* 1987 (Beng.), Calcutta, Publishing, 1996

৭. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক,প্রকাশকাল ১৯৯৬, পৃ. ১৫

৮. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত*, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বই মেলা, ১৯৯৬

৯. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ১৫

১০. প্রাগুক্ত, ১৯৯৬. পৃ. ১৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৫. শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিতম '*শ্রীমদ্ভাগবতম্*' প্রকাশকাল ১৩৭২, প্রকাশক শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, পৃ. ২১০

১৬. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক,প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২০. শ্রী অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট,১৯৮৮, পৃ. ৬৫০

২১. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক ১৯৯৮, পৃ. ২২

২২. মনোজবিকাশ দেবরায়, *শ্রীনরত্তোম দাস ঠাকুরের পদ ও পদাবলী*, অন্বেষা প্রকাশনা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮, পৃ. ৭০

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২৪. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ২৬-৩৬

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪১

২৯. সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, প্রকাশন : দেব সাহিত্য কুটীর, পৃ. ৭৮১

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮১

৩১. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *শ্রীমদ্ভাগবতম*, দশম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২০, প্রকাশক : শ্রীমহানমব্রত এন্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট, পৃ. ৫৩

৩২. সুবোধচন্দ্র মজুমদার, *শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ*, দ্বাবিংশ অধ্যায়, প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীর, পৃ. ৭৮১

৩৩. মনোজবিকাশ দেবরায়, *শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের পদ ও পদাবলি*, প্রকাশক : অন্বেষা প্রকাশনী, প্রকাশকাল : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮, পৃ. ২৬৩

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৩৫. শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রকাশক : ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, প্রকাশকাল ১৯৮৮, পৃ. ৮২১

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২১

৩৭. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক. প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩-৫৪

৩৮. শ্রীগীতগোবিন্দ

৩৯. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক,প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

৪০. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ৬০

৪১. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক,প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৯৩, পৃ. ৫৭

৪৯. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সূত্রধর প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২৩ জুন ২০২০, পৃ. ভূমিকা

৫০. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৯৮, পৃ. ১৩৬

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৫৩. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, প্রকাশনা : মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল ১৯৯৬, পৃ. ৯৭

৫৪. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, প্রকাশনা : মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩

৫৫. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৩

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৫৭. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 112

৫৮. মনোজবিকাশ দেবরায়, *শ্রীনরত্তোম দাস ঠাকুরের পদ ও পদাবলী*, অন্বেষা প্রকাশনা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮, পৃ. ২১৬

৫৯. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 114

৬০. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ৬০

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৬৪. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, ৫৭

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬৬. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 115

৬৭. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালার কীর্তনের ইতিহাস*, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃ. ১৬৩

৬৮. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১০৮

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৭০. তাপসী ঘোষ, *দর্শনের সাথে সঙ্গীতের নান্দনিক সম্পর্ক*, (এম ফিল, অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র), পৃ. ১২৩

৭১. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 115

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৭৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমেদ শরীফ সম্পাদিত, '*মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*' প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল : জুন ১৯৬৯, পৃ. ৬৭

৭৪. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*' প্রকাশনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৬৮

৭৫. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 116

৭৬. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া'* প্রকাশনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৭১

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, ও ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পদাবলী পরিচয়ের কিছু অংশ

৭৯. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১০১

৮০. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাঙ্গালার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ১৭৭

৮১. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া'* প্রকাশনা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৬৯

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৮৩. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক,প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ১৮৪

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৯০. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, নবপর্যায়, প্রকাশনা : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৬৮, পৃ. ২

৯১. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশনা : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৯৮, পৃ. ১৯১

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৯৫. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৮৬, পৃ. ১২১

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১০৩. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া'* প্রকাশনা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৬৮

১০৪. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 120

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০৭. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 120-121

১০৮. অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য, কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে, সাহিত্য রং বেরং পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল : ১৪২৩, পৃ. ১৬

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১১০. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাজ্ঞালা কীর্তনের ইতিহাস*, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭

১১১. প্রাগুক্ত, ১৫৭

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১১৪. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া'* প্রকাশনা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৬

১১৫. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাজ্ঞালা* কীর্তনের ইতিহাস, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃ. ১৫৯

১১৬. Bimal Kumar Ray, *Sastriya and music Culture of Bangal Vol.1,* Sharada Publishing House 1996, p. 121

১১৭. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাডেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ১৫৩

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১১৯. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাজ্ঞালা* কীর্তনের ইতিহাস, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃ. ১৬২

১২০. ড. হরেকৃষ্ণ মুকোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১৫৯

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১২৩. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাজ্ঞালা* কীর্তনের ইতিহাস, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯, পৃ. ১৬২

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

১২৬. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ২২৩

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

১২৯. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ*,ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ২৪৬

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

১৩১. সংগৃহীত

১৩২. সংগৃহীত

১৩৩. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, প্রকাশনা : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৮১

১৩৪. মদুসূদন কিন্নরের ঢপ কীর্তন, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, প্রকাশকাল : ১৯৩৬, পৃ. ভূমিকা

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা

১৩৬. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১২০

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৪৪. ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ৭৭

১৪৫. অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য, প্রকাশন : সাহিত্য রং বেরং পাবলিকেশন, প্রকাশকাল : দোল পূর্ণিমা, ১৪২৩, পৃ. ৯৩

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়
বৈষ্ণব কবি-বৈষ্ণব দর্শন-চৈতন্য পার্ষদ ও বাংলার কীর্তনীয়া

বাঙলার প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলী গানের ধারাকে সুস্পষ্টভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে–জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস–তাঁরা চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিগোষ্ঠী, রচনা করেছেন বিভিন্ন পদ। অন্যদিকে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে ষোড়ষ-সপ্তদশ শতকে এবং চৈতন্যত্তর যে শত শত বৈষ্ণব মহাজন কবি ও কীর্তনীয়ার অবির্ভাব হয়েছে তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক পৃথক ধারায় অনুপ্রেরণা পেয়ে পদাবলীর পদ রচনা করেছেন এবং বড় বড় কীর্তন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে শ্রীচৈতন্যদেবের চারটি দার্শনিক মতবাদের উপরে। এই অধ্যায়ে প্রাক্ চৈতন্যযুগের জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের জীবনী ও বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁদের অবদান, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও তাঁর জীবন দর্শন বা দার্শনিক মতবাদসহ তাঁর নিকট পার্ষদ ও চৈতন্যত্তর যুগে বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধক ও ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন কীর্তন সম্প্রদায় ও বাংলা গানের পরিমণ্ডলে কীর্তনের ধারাবাহিকতা ও কীর্তনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবো–

প্রথম পরিচ্ছেদ
জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি

৫.১ জয়দেব

দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী।[১] জয়দেব বাঙালি নন, উড়িষ্যার অধিবাসী এমন একটা ধারনা উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। জয়দেবের গ্রামের নাম নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে।[২]

কেন্দুবিল্বের বর্তমান নাম জয়দেব-কেন্দুলী। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, কায়স্থ, সুদগোপ, তাম্বুলী, কামার, নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, শুঁড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগ্‌দী, হাড়ি, বাউড়ি প্রভৃতি জাতি বাস করে। লোকসংখ্যা খুবই কম। গদীর মোহান্ত আছেন। জমিদারী ও অন্যান্য দেবোত্তর সম্পত্তির আয় মন্দ হবে না। প্রায় আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পূর্বে রাধারমণ ব্রজবাসী নামক জনৈক সাধু শ্রীধাম হতে তীর্থ দর্শনে এসে এখানেই অবস্থান করেন। কেন্দুবিল্বের গদী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ধমানের রাজবাটী হতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেন্দুবিল্বের শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর বর্তমান মন্দির বর্ধমান রাজবাটীর ব্যয়েই ১৬১৪ সালে নির্মিত হয়। রাধারমণের পরবর্তী মোহান্তগণের নাম (২) ভরত দাস, (৩) প্যারীলাল, (৪) হীরালাল, (৫) ফুলচাঁদ, (৬) রামগোপাল, (৭) সর্বেশ্বর, (৮) দামোদর। দামোদর ব্রজবাসী আততায়ীর হাতে নিহত হলে তাঁর চেলা শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী গদীর অধিকার প্রাপ্ত হন।[৩]

বগুড়া জেলায় কেন্দুল নামে গ্রাম আছে। ডাকঘরের নাম কেন্দুলী। বর্তমানে কয়েক ঘর হিন্দুর বাস। গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধ ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[৪] গ্রামের দুই পার্শ্বে দুইটি নদী–পূর্ব প্রান্তের নদী নাম হারাবতী, পশ্চিমের নদী তুলসী গঙ্গা। গ্রামে পূর্বে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের ভগ্ন মন্দির হতে কয়েকটি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। গ্রামের পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশ পরিমিত একটি পরিখার চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীরেরও ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। গ্রামে প্রবাদ যে, কবি জয়দেব এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত প্রায় পঞ্চাশ/ষাট বিঘা পরিমিত একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর নাম জয়দেব ঠাকুরের পুকুর। এখনো হিন্দু মুসলমানে আদি ব্যাধি নিবারণের জন্য জয়দেব ঠাকুরের পুষ্করিণীতে স্নান করে এবং পূজা মানত

করে। এই গ্রামে জয়দেবের নামে বৎসরের কোনো একটা সময়ে মেলা হতো। প্রায় পঞ্চাশ বছর মেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।[৫] জয়দেব ঠাকুরের পুষ্করিণীর পাড়ে আগে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসত। আজো পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত জায়গা ও খানিকটা আবাদী জমি দেখিয়ে লোকে বলে এটাই জয়দেবের ভিটা। গ্রামের অপর দুইটি পুষ্করিণীর নাম–শূলপাণি ও সিদ্ধপীঠ। প্রবাদ আছে জয়দেবের দুইজন বন্ধু শূলপাণি ও মাধবাচার্য্যের নামানুসারেই পুষ্করিণীর দুইটির এইরূপ নাম হয়েছে। মাধবাচার্য্য সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।[৬] তাঁরই নামে হারাবতীর পূর্বতীরে একটি গ্রাম আজো মাধাই নগর নামে পরিচিত। গ্রামটি হিন্দুপ্রধান এবং গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের বাস। গ্রামে দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ এখনো আছেন। শূলপাণি পুষ্করিণীর পাড়ে একটি ভাঙ্গা মন্দির ও দেবমূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। (কেন্দুলীর দক্ষিণে প্রায় সাত ক্রোশ দূরবর্তী বারইল (বগুড়া) গ্রামবিবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল কর্তৃক এই প্রবাদ ও বিবরণ সংগৃহীত)।

ফরিদপুর জেলায় পিঙ্গলা নামে একটি গ্রাম আছে।[৭] এই গ্রামে বাৎস্যগোত্রীয় কাঞ্জিলাল উপাধিধারী অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। এদের পারিবারিক কিংবদন্তী–কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পূর্বে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে এদের বাস ছিল। বীরভূম মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হলে এদের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে পালিয়ে আসেন। [বীরভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫][৮] সবদিক বিবেচনা করলে বাংলার বীরভূমের দাবিই জোড়ালো। দ্বিজমোহন দাস রচিত 'ভক্তমাল' এবং বনমালী দাসের 'জয়দেব চরিত্রে' বীরভূমের কেন্দুবিল্বকেই জয়দেব নিজ পরিচয় দিয়েছেন।[৯] গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের শেষ শ্লোকে আছে–

'শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।"[১০]

কবি জয়দেবের বাড়ি, কেন্দুবিল্ব গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ চিত্রটি ২০১৮ সালের
মকর সংক্রান্তিতে জয়দেব মেলায় ধারণ করা

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী। তাঁর একজন বন্ধুর নাম পরাসর। জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী।[১১]

'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থেও জয়দেব পত্নীর এ নাম সমর্থিত।[১২] টীকাকারেরা কেউ কেউ অবশ্য 'পদ্মাবতী' অর্থে লক্ষ্মী বা রাধা ধরেছেন। প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস বলেছেন, 'পদ্মাবতী নাম জয়দেব ভার্যা।' 'রোহিণীরমণ' এই বিশেষণটি দেখে কউ কেউ বলেন, রোহিণী তাঁর আর এক স্ত্রীর নাম, কেউ কেউ মনে করেন রোহিণী পদ্মাবতীরই আর এক নাম। সহজিয়ারা বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া।[১৩]

পদ্মাবতীসহোদরা রোহিণী নামেতে।
তারে গুরু কৈল রস আস্বাদিতে॥[১৪]

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেব স্বয়ং গীতগোবিন্দ পদসংগীত গেয়ে শোনাতেন বলে জানা যায়। আর এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে জয়দেবের গানের সঙ্গে পদ্মাবতী নৃত্য পরিবেশন করতেন।[১৫] তাতে নাট্যের আবেদনে গেয় বিষয়টিকেই মূর্ত করে তোলা হতো নৃত্যের মাধ্যমে।[১৬] সেক শুভোদয়া গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক হিসেবে জয়দেবের উল্লেখ আছে।[১৭] রূপগোস্বামী

সম্পাদিত পদ্যাবলী'তে লক্ষ্মণ সেনের নামে দুটি শ্লোক আছে।[১৮] সদুক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোক দুটির একটি যুবরাজ কেশব সেনের নামে চিহ্নিত।[১৯] শ্লোকটি হলো–

আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূণ্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ পৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥[২০]

যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন, আমি ডেকেছি বলে আজকের উৎসবে রাধা এই রাতে শূন্য ঘর ফেলে চলে এসেছে। ভৃত্যেরা মধুপানে মত্ত। কুলবধূ একাই বা যাবে কি করে? অতএব বৎস, তুমি একে ঘরে রেখে এসো। যশোদার একথা শুনে রাধামাধবের মধুর অলসদৃষ্টি জয়যুক্ত হোক।[২১]

এই শ্লোকটিতে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন রাধাকে বাড়ি নিয়ে যেতে, আর গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিতে নন্দ শ্রীরাধাকে বলছেন কৃষ্ণকে বাড়ি নিয়ে যেতে। রাজাও যুবরাজকে খুশি করবার জন্য জয়দেবই তার রচিত শ্লোক অনুকরণে গীতগোবিন্দের শ্লোকটি লিখে থাকুন আর জয়দেবের অনুকরণে লক্ষ্মণ সেন বা যুবরাজই শ্লোকটি লিখ থাকুন, উভয়ে যে সমকালীন ছিলেন তা বোঝা যায়।[২২]

জয়দেব-পদ্মাবতীর সংগীতক্ষমতা সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত। হলায়ুধ রচিত 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে বর্ণিত বুঢ়ণ মিশ্রের কাহিনী থেকে পদ্মাবতী জয়দেবের অলৌকিক সংগীত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৩] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দরবার নটী কলাবন্ত' গ্রন্থে 'সেক শুভোদয়া' থেকে নিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'মিথিলার সঙ্গীতাচার্য বুঢ়ণ মিশ্র।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় একদিন তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমার নাম বুঢ়ণ মিশ্র। সঙ্গীত ও নানা শাস্ত্রে আমার সমান অধিকার। আমি উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের নিকট থেকে জয়পত্র নিয়ে এসেছি।

তখন সভায় কথা উঠল, 'আপনি একটি রাগালাপ করুন মিশ্রজী।'
বুঢ়ণ পটমঞ্জরী রাগের আলাপ শোনালেন।
অমনি নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের সমস্ত পত্র ঝরে পড়ল।
এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে ধন্য ধন্য রবে ভরে গেল রাজসভা।
এমন অসামান্য গুণীকে এখানে কে পরাস্ত করবেন?
সভার প্রশংসাধ্বনির সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হতে থাকল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অগ্রসর হলেন না অন্যকোন গায়ক।

তখন আগন্তককেই লক্ষ্মণ সেন জয়পত্র দিতে উদ্যত হলেন।

এমন সময় পদ্মাবতী প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন গঙ্গাস্নানে।

বিপুল হর্ষ আর বাদ্যধ্বনি শুনে তিনি রাজসভায় উপস্থিত হলেন। বৃত্তান্ত শুনে পদ্মাবতী বললেন, 'আমি এবং আমার স্বামী বর্তমান থাকতে সঙ্গীতে জয়পত্র নেবেন কে? আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দিন।'

'আপনার স্বামীর কথা পরে হবে। উপস্থিত আপনি একটি রাগালাপ করুন।'

পদ্মাবতী সম্মত হয়ে গান্ধার রাগের আলাপ শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় উজান বইতে লাগল নোঙর করা নৌকাগুলো। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্যে সভার সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা মন্তব্য করতে লাগল—একি বিস্ময়কার কাণ্ড! গাছ তো তবু সজীব। মিশ্রজীর গানে গাছের পাতা ঝরেছে। কিন্তু এইসব অচেতন বস্তু নৌকা উজান বেয়ে চলে গেল এমন প্রভাব সঙ্গীতের!

এখন দুজনের মধ্যে জয় নির্ণয় হবে কিভাবে?

কথা হল, এবার সংগীত স্থগিত রেখে শাস্ত্র বিচার হবে দুজনের মধ্যে।

কে জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রবিচারে স্থির হোক। কিন্তু বুঢ়ণ মিশ্র বললেন, 'স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি শাস্ত্রবিচারে ইচ্ছুক নই। এ রাজ্যে দেখি পুরুষেরা মূর্খ'। তাঁর এই কথায় পদ্মাবতী গৃহে স্বামীর কাছে সংবাদ পাঠালেন। বার্তা পেয়ে জয়দেব উপস্থিত হলেন রাজসভায়। সমস্ত বিবরণ শুনে জয়দেব বললেন, বৃক্ষের পত্র ঝরার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? এখন বসন্তকাল। পত্র আপনি ঝরে থাকে।'

বুঢ়ণ মিশ্র বলেছেন, 'কিন্তু একদিনে একসঙ্গে তো সব পাতা ঝরে পড়ে না।'

তখন জয়দেব বললেন, 'বেশ, ওই শাখায় নবপত্র সঞ্চার করুন।'

বুঢ়ণ স্বীকার করলেন, 'তা আমি পারব না।'

জয়দেবকে প্রশ্ন করা হল, 'আপনি পারেন কি?'

'জয়দেব জানালেন, 'অবশ্যই' বলে তিনি বসন্ত রাগে আলাপ করলেন। আপনি নতুন পাতায় ভরে উঠলো নিস্পত্র অশ্বত্থ বৃক্ষটি। দেখে বুঢ়ণ মিশ্র পরাজয় স্বীকার করলেন। তখন জয়দেবের উদ্দেশ্যে ধন্য ধন্য ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল রাজসভা।

জয়দেব পদ্মাবতীর জীবৎকালের দীর্ঘকাল পরে এই কাহিনী সংকলিত হয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এর অলৌকিকত্বটুকু বাদ দিলে বিষয় দাঁড়ায় জয়দেব-পদ্মাবতী উভয়েই সংগীতে মহাপারঙ্গম ছিলেন এবং রাজসভায় তারা নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন।'[২৪]

জয়দেব রচিত সংস্কৃত ভাষার শেষ সাহিত্য গীতগোবিন্দ। 'বাংলা গান ও গীত সাহিত্য বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন সে কথা অকপটেই স্বীকার করা যায়। পরবর্তীকালের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের আদর্শে বিপুলভাবে প্রভাবিত।' আখ্যান রচনায়, সৃষ্টিতে, চরিত্রসৃষ্টিতে, পালাকরণে এবং প্রবন্ধগীতির অনুসরণে বড়ুচণ্ডীদাস জয়দেব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'চৈতন্য পরবর্তী যুগে ঠাকুর নরোত্তম দাসের উদ্‌যোগে পদাবলী কীর্তনপদ্ধতি প্রবর্তনায়ও গীতগোবিন্দের পদগায়নকলা যথেষ্ট প্রভাব রাখে। পালা বিন্যাসে ও রসের উপস্থাপনায় গীতগোবিন্দের আদর্শ অনুসৃত হয়।'[২৫]

জয়দেবের পদাবলীর প্রথম প্রচারস্থল গৌড়, দ্বিতীয় উড়িষ্যা, তৃতীয় অন্ধ্রের কুচিপুড়ি এবং তারপর কেরল রাজ্যে। সেখানে ত্রয়োদশ শতকের রাজা রবিবর্মার কাল থেকে গীতগোবিন্দের প্রচলন। কোজিখাড়ের জামোরিন মন্দিরে উপাসনাকালীন সংগীতানুষ্ঠানে প্রথম গীতগোবিন্দের পদরূপায়ণ প্রবর্তিত হয়। ক্রমে জয়দেবের পদাবলী সমগ্র কেরল রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গীতগোবিন্দ সেখানকার সংগীত ও নৃত্যের অপরিহার্য উপাদানরূপে গৃহীত হয়। এর ফলে সেখানকার আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্যকলার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সেখানে প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যেরও ভিত্তি ছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দ। 'গীতগোবিন্দ পদগানের ভিত্তিতে কেরলে 'অষ্টপদী নাট্যম' নামে এক প্রকার লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে 'কৃষ্ণনাট্যম'। এই 'কৃষ্ণনাট্যমে'র ধারা থেকেই কথাকলি নৃত্যের উদ্ভব।[২৬] কোট্টারাকার রাজা কেরল বর্মা (১৭শ শতক) কৃষ্ণনাট্যের প্রতিপক্ষ রূপে যে রামনাট্যের প্রবর্তন করেন তাতেও জয়দেবের পদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। মালাবারের এক জামোরিনের রচনা 'কৃষ্ণনাটকম' থেকে বর্তমান গুরুভায়ুরের 'কৃষ্ণাট্টম' নৃত্য পদ্ধতি গড়ে ওঠে। 'কৃষ্ণনাটকম' গীতগোবিন্দের আদর্শেই রচিত হয়েছিল।'[২৭]

দক্ষিণী সংগীতের কেন্দ্রীয় পুরুষ সন্ত ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৬) তাঁর 'প্রহলাদ ভক্তি-বিজয়ম'-এর সূচনায় অন্যান্য সন্তের সঙ্গে জয়দেবকেও অভিবাদন জানিয়েছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় গীতগোবিন্দের রচনাকারের আসন দাক্ষিণাত্যে যে কতো উর্চ্চে। অধ্যাপক এন.এস. রামচন্দ্রনের মতে 'ত্যাগরাজের গীতনাট্যগুলো, বিশেষ করে নৌকাচরিতম গীতগোবিন্দের প্রেরণায় রচিত।'[২৮] সপ্তদশ

শতক থেকে তামিলনাড়ুতে গীতগোবিন্দের রূপায়ণ প্রবর্তিত হয়।[২৯] রামুড়ু ভাগবতার সেখানে জয়দেবের গীত-নৃত্য প্রচলিত করেন। তিনিই গীতগোবিন্দের অষ্টপদী গান সেখানে জনপ্রিয় করে তোলেন। অন্ধ্রের নৃত্যকলার মতো তামিল নৃত্যেও গীতগোবিন্দের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তাঞ্জোর জেলায় রচিত শিবাষ্টপদী জয়দেবের অষ্টপদী আদর্শে গঠিত হয়। 'কথাকলি নৃত্যাভিনয়ে উদ্বোধনী শ্লোকানুষ্ঠানের যে রীতি, তাও গীতবোগিন্দের দৃষ্টান্তে নিষ্পন্ন হয়েছিল।'[৩০]

এ থেকেই বোঝা যায় সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকলায় বিশেষ করে বৈষ্ণব পদালীতে গীতগোবিন্দের প্রভাব ছিল কত গভীর। প্রকৃতপক্ষে উত্তরভারতীয় সংগীত ও নৃত্য অপেক্ষা দক্ষিণভারতীয় সংগীত ও নৃত্যে জয়দেব অনেক বেশি অনুসৃত হয়েছেন।[৩১] সেখানকার শাস্ত্রীয় নৃত্যে এক বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে গীতগোবিন্দের পদরূপায়ণকলা।

৫.২ চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কিছু অংশ খণ্ডিত বলে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কবির জন্মকাল ১৪০৩ থেকে ১৪১৭ অথবা ১৩৮৬ থেকে ১৪০০ সালের কোন এক সময়। অন্য মতে ১৩২৫ সাল।[৩২] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবির জীবনকাল ১৩৭০ থেকে ১৪৩৩ সাল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, ছাতনার রাজা হামির উত্তর ১৩৭৩ থেকে ১৪০৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময়ে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন।[৩৩]

কবির ধর্মমত সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। কবি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সুদক্ষ অনুবাদক ও রসজ্ঞ কবি। সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণ হতে পারেন বলে কারও কারও ধারনা। তবে ভণিতায় তিনি দ্বিজ ব্যবহার করেননি।[৩৪] তাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন জন্মগত সামাজিক বন্ধনের দিক থেকে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন। 'চণ্ডীদাস বৈষ্ণবও ছিলেন না কিংবা সহজিয়া তান্ত্রিকও ছিলেন না। চণ্ডীদাস ছিলেন সনাতনপন্থী হিন্দু এবং তাঁর উপাস্য ছিলেন চণ্ডীদেবী।'[৩৫]

কবি কাব্যের আদ্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও চণ্ডীদাস ভণিতা আছে। সব ভণিতার সঙ্গে বাসলী দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। কবির নাম যে বড়ু চণ্ডীদাস তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভণিতা থেকে অনুমিত হয় কবি শাক্তদেবী বাসলীর সেবক ছিলেন।[৩৬] বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর

কাব্যের ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও রুচিবোধের যে স্বাতন্ত্রতা দেখিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদাবলীর চণ্ডীদাস থেকে পৃথক কবি বলে বিবেচনা করা হয়।[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বেশ মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সে হিসেবে ১৬৮২ সালে পুঁথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল। পুঁথিটি অবশ্যই এই চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতর।[৩৮] ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'সম্ভবত চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত।' ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা, 'পুঁথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে।' যোগেশচন্দ্রের মতে, এ পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ সালের পূর্বে নয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের মত সমর্থন করেন।[৩৯]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্ত পুঁথিটি কবির স্বহস্তে লিখিত নয়–পরবর্তীকালে এক বা একাধিক লিপিকারের লেখা। তাই এর রচনাকাল লিপিকালের পূর্বেকার। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ সালের পূর্বের বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[৪০] তাছাড়া রসবিচারে কাব্যটির ভাষা চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বলেও ধরা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস আদিমধ্যযুগ তথা চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ সালে। বড়ু চণ্ডীদাস এর আগেই কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৪১] জনশ্রুতি অনুসারে কবির জন্মকাল ১৩২৫ থেকে ১৪১৭ সালের মধ্যে। চণ্ডীদাস যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সমর্থনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।[৪২] জয়ানন্দ মিশ্র (জন্ম ১৫০৫ সাল) তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন :

> 'জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
> শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ॥'[৪৩]

১৫৮১ সালে রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

> বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
> আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥[৪৪]

সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেন নি, করলে এই কাব্যকে ভক্ত বৈষ্ণবেরা মাথায় করে রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমন ভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না। তাঁর মতে, পনের শতকের শেষার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন।[৪৫]

বিভিন্ন মতামত ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে ড. আহমদ শরীফ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এভাবে : 'পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস–মালাধর বসু–শাহ মুহম্মদ সগীর–বিজয়গুপ্ত–বিপ্রদাস–কবি চন্দ্র মিশ্র প্রভৃতির ভাষা থেকে প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শন, জয়দেবের বিশেষ প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত লোকায়ত অপৌরাণিক

কাহিনী, স্থূলতা, আদিরসসর্বস্বতা, উক্তি ও ঘটনার পৌনঃপুনিকতা, স্থানে স্থানে উক্তির ও ঘটনার উল্লেখে পূর্বাপর অসামঞ্জস্য, নায়ক চরিত্রের গুণাভাব, কথকতা সুলভ ঘটনা ও পদবিন্যাস, লোক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক এবং পদাবলী সংকলন গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের অভাব, একাধিক পুঁথির অপ্রাপ্যতা প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী এ গ্রন্থ নিশ্চিতই চৈতন্য-পূর্বকালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সালের আগে রচিত।'[৪৬]

অনুমান করা যায় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেন।[৪৭] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ সালের মধ্যে রচিত।'[৪৮]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালের রচনা। কবি বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক পালাগান রচনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার চরম বিরাগ ক্রমে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরম অনুরাগের একান্ত আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হয়েছে। *চৈতন্য-আবির্ভাবের পর রাধাকে* জন্ম থেকেই কৃষ্ণময়ী ও মহাভাবস্বরূপিণী রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে।[৪৯] রাধা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতত্ত্বের ধারণা করা চলে। কাব্যে অনুসৃত রসপদ্ধতি, চরিত্র ও বিষয় ভাবনা ইত্যাদি চৈতন্যপূর্ব যুগের বলে অনুমিত হয়।[৫০]

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব স্থান সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে তাঁর জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর, আবার কারও মতে বাঁকুড়ার ছাতনা।[৫১] নানা প্রবাদ, সহজিয়া গ্রন্থ প্রভৃতি অনুসারে বীরভূমের নান্নুর বাসলী দেবীর পীঠস্থান এবং চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। আবার বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাসলী দেবীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের ভিটার প্রবাদও প্রচলিত আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের 'চণ্ডীদাসচরিত' গ্রন্থে ছাতনার দাবি প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছে।[৫২] প্রাচীন পদে ও বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে রামী-চণ্ডীদাসের সাধনতীর্থ হিসেবে নান্নুরের বহু উল্লেখ আছে।[৫৩] চণ্ডীদাস নাম থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি 'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীকে পূজা মানিআঁ তবে তাঁর পাইবে দরশন'–এ থেকে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস চণ্ডীমূর্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন। ছাতনার বাসলী দেবী চণ্ডীমূর্তি এবং নান্নুরের বাসলী দেবী সরস্বতীমূর্তি বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বড়ু চণ্ডীদাসকে ছাতনার অধিবাসী হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[৫৪] তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। হয়ত কোন একজন চণ্ডীদাস ছাতনায়, অন্য কেউ নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

'চণ্ডীদাস ও তাঁর প্রণয়িনী সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর একজন সাধনসঙ্গিনী ছিলেন, তিনি রজকিনী। তাঁর আরো নাম ছিল–তারা, রামতারা, রামী।'[৫৫] 'হয়ত বাসলী মন্দিরে, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতলীকে দেখে শুভদৃষ্টিতে উদ্বেলিত হৃদয় চণ্ডীদাসকে কবি করে তুলেছিল।'[৫৬] সতের শতক থেকে এ ধরনের গল্প প্রচলিত। তবে তা সত্যাশ্রিত কিনা সঠিক বলা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭। পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো হলো : জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।[৫৮] রাধাবিরহ খণ্ডের বিষয়বস্তু রয়েছে পরিশিষ্ট-২এ।

৫.৩ বিদ্যাপতি

ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, বিদ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৫৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ১৩৯০ থেকে ১৪৯০ সালের মধ্যেই বিদ্যাপতির জীবন আবর্তিত হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ বিস্তারিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ধারনা করেছেন যে, বিদ্যাপতি ১৩৬০-৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ সালের মধ্যে পরলোকগমন করেন।[৬০]

'বিদ্যাপতি প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি (১৪০০-১৫০৬ সাল) মৈথিলি (ইন্দো-আর্যভাষা) বাংলায় পদ রচনা করেছেন। তিনি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন। এজন্য তাঁর পদাবলীর ভনিতায় শিব সিংহ ও তাঁর মহিষী লছমী দেবীর নাম যুক্ত আছে।[৬১] তাঁর পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁর পদ আস্বাদন করতেন।[৬২]

তিনি বিস্ফি (সর্হবিসফি) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর পরিবার বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ্য কৌলীনের অধিকারী ছিলেন।[৬৩] অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি রাজসভায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন এবং একজন সভাসদরূপে পরিগণিত হন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাজপণ্ডিত

পদের মর্যাদা লাভ করেন এবং সারাজীবন এই পদেই একটির পর একটি নরপতি ও তদীয় মহীষীর শ্রদ্ধা ও আনুকল্য লাভ করেছিলেন।'[৬৪]

বিদ্যাপতির সঙ্গীতাবলীতে নিঃসৃত হয়েছিল জগৎ ও জীবনের তত্ত্ববিষয়ক অনেক নিগূঢ় কথা, সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল বাঙালির জাতীয় ঐক্য ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা।[৬৫] অর্থনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক দিক থেকে সময়টা ছিল দুঃসময়। বাংলাদেশে তখন ধনছিল, টোল-চতুষ্পাটি ও পণ্ডিত ছিলেন অজস্র। তবু সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছিল হাহাকার। এ অবস্থাতেই এক সার্থক চিত্র পাওয়া যায় বিদ্যাপতির এ কয়েকটি ছত্রে :

কত বিদগ্ধ জন, রস অনুমানই
অনুভব কাহুক না পেখঁ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুরাইতে
লাখে না মিলয় এক॥[৬৬]

'বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বহুবিচিত্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতাকা, লিখনাবলী, ভাগবত-অনুলিপি, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, দূর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং সেইসঙ্গে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ও শৈব পদ। সুতরাং ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি, পত্র রচনারীতি এবং সেইসঙ্গে শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসের পদাবলী রচনায় কবির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।'[৬৭] এই গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, অবহট্ঠ এবং মৈথিল তিনেরই নিদর্শন রয়েছে। দেশীয় অবহট্ঠ ভাষায় কীর্তিলতা রচনার কারণ দেখাতে কবি লিখেছেন–

সক্কয় বাণী বহুঅণ ভাবই
পাউঅ রস কো মন্ম না পাবই।
দেসিল বঅনা সবজন মিট্ঠা
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্ঠা॥[৬৮]

Vidyapati reveals himself in these poignant lines :

'Since my birth have I feasted on beauty,
yet my eyes are insatiate.
For eyes have I pressed heart upon heart,
yet mine knows on peace.'[৬৯]

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি জয়দেবের ভানানুসারী। সেজন্য, বিদ্যাপতিকে অনেকে অভিনব জয়দেব আখ্যা দিয়েছেন।রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র লীলা কবির কাছে আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়েছিল বলে তিনি রাধা কৃষ্ণ লীলার পদই বেশি রচনা করেছিলেন। পদ প্রায় পাঁচ শতাধিক।[৭০] বিদ্যাপতির পদগুলো স্থানভেদে মর্যাদার তারতম্য ঘটেছে। মিথিলাবাসী ও হিন্দিভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির শৈব ও শাক্ত পদগুলোর উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপরদিকে বাংলাদেশের বিদ্যাপতির সব পদই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক।[৭১] বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেণিবিভাগ এ রকম–

ক) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক,

খ) হরগৌরী ও কালী বিষয়ক,

গ) গঙ্গা বিষয়ক,

ঘ) প্রহেলিকা জাতীয়, এবং

ঙ) দেবতা সম্পর্কবর্জিত বিভিন্ন ধরনের পদ।[৭২]

'কবিবর শ্রীবিদ্যাপতি রচিত কাব্য, বর্ণ এবং রাগের যে গীতগুলো ছিল, সেইগুলো এবং প্রায় সেইগুলোর মতো বা সেগুলোর অনুসরণে রচিত যেসব রাগে নিবদ্ধ গীত খ্যাতিলাভ করেছিল, কোনো প্রকারে সেগুলোকে একত্রিত করে ধীমান শ্রীমন নরপতি কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক নিযুক্ত লোচন সেইগুলো লিপিবদ্ধ করলেন।[৭৩] লোচন মিথিলার দেশী সংগীতকে অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেশীয় গীতাদির মধ্যে সুদেশীয় রচনা হিসাবে মিথিলার অপভ্রংশ ভাষায় শ্রীবিদ্যাপতি কবি কর্তৃক নিবদ্ধ গীতসমূহকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৭৪]

বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায়। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'এ ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট। বিদ্যাপতির পদ প্রচারে এই ভাষার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী, এই জন্যই বোধহয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি হয়েছে।'[৭৫]

সুকুমার সেনের মতে, 'অবহট্ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা, মৈথিলি, হিন্দি, রাজস্থানি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাগুলো অল্পবিস্তর পূর্ণ পরিণত রূপ ধরবার পরেও অবহট্ঠের আদর কমেনি দরবারি সাহিত্যে, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে। ব্রজবুলি কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধুভাষা।'[৭৬]

সুকুমার সেন মনে করেন, ‘মোরাঙ নেপালের রাজসভার আততায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে অবহট্‌ঠের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।’[৭৭]

পনের শতকেই মিথিলা, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে পদাবলী রচনার রীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আসামে পনের শতকের বিখ্যাত কবি শঙ্করদেব এবং ষোল শতকে তাঁর শিষ্য মাধবদেব ব্রজবুলিপদ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন।[৭৮] ড. সুকুমার সেন বলেন, ব্রজবুলি বাংলার একটি উপভাষা, তবে কথ্য নয়, সাহিত্যিক এবং এই উপভাষার রসপুষ্টিও ঘটেছে বাংলা ভাষার আশ্রয়ে এবং বাঙালি কবিদের হাতে। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর লীলাকীর্তনের আসর জমে উঠেছিল ব্রজবুলি পদের কল্যাণে।[৭৯] এই অপূর্ব ভাষাটির জন্য বঙ্গীয় কবিরা বিদ্যাপতির কাছে প্রধানত ঋণী। বিদ্যাপতির পদাবলীই বাঙালি কবিদের ব্রজবুলিতে পদচারণার প্রেরণা দিয়েছে—শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে।[৮০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব দর্শন

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।[৮১] তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিলেট থেকে নবদ্বীপে যান এবং শচীদেবীকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করেন। তখন নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র এবং ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিদের নিবাস ছিল। এ কারণেই সিলেট থেকে জগন্নাথ মিশ্র ও আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এসে নবদ্বীপে বাস শুরু করেছিলেন।[৮২]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃপুরুষের ভিটা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃপুরুষের ভিটা
স্থান : ঢাকা দক্ষিণ, শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট)
চিত্র ধারণ : ২০১৮ সালের মার্চ মাসে

চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই, দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে 'চৈতন্য' নামে পরিচিত হন।[৮৩] চৈতন্যদেবের জীবনীকার বৃন্দাবনদাসের মতে, তিনি জগতকে কৃষ্ণনাম বলিয়েছেন, কৃষ্ণের কীর্তন প্রকাশ করেছেন,

তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আবার জয়ানন্দের মতে, কৃষ্ণই চৈতন্য সন্ন্যাসী হয়ে জগতকে চৈতন্য দান করেছেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।[৮৪]

চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে স্নান-উপাসনারত ব্রাহ্মণ-ভক্ত নরনারীকে বিব্রত করায় তিনি আনন্দ পেতেন। পরিণত বয়সেও তিনি অপরকে পরিহাস ও উত্যক্ত করে আনন্দ পাবার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁরও সন্ন্যাসী হওয়ার আশঙ্কায় লেখাপড়া থেকে তাঁকে প্রথমত বঞ্চিত রাখা হয়। পরে নিজের আগ্রহাতিশয্যে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যৌবনে সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন এবং টোল খুলে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যান। ব্যাকরণশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।[৮৫] সন্ন্যাসপূর্ব কালে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। গঙ্গার ঘাটে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে দেখেন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী বিয়ের অল্পদিন পরেই সর্প দংশনে মারা যান। মায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া।[৮৬]

২৩ বৎসর বয়সে গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান করতে গিয়ে তিনি প্রখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ পান এবং ১৫০৮ সালে তাঁর নিকট তিনি দীক্ষা নেন।[৮৭] দীক্ষার পর তিনি ভাগবত প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন; প্রেমের মন্ত্র তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

২৪ বৎসর বয়সে ১৫১০ সালের ২৯শে মাঘ তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন।[৮৮] তখন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চৈতন্যদেব পুরীতে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।এসময় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাতেন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। তিনি ছিলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। তিনি গৌরসুন্দরের হ্লাদিনীশক্তি বা শ্রেয়সী শক্তি। ব্রজলীলায় প্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন। —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান-৯৬।[৮৯] শ্রীচৈতন্য কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গৌড় প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি দু বছর কাটান। এই দীর্ঘ কাল তীর্থাদি পর্যটনের ফলে তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিত-দার্শনিকের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রেমধর্মের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী,

সাকর মল্লিক (রূপ গোস্বামী) ও দবীর খাঁ (সনাতন গোস্বামী) স্বপদে অধিষ্ঠিত রূপ ও সনাতন।[৯০] জীবনের শেষ আঠার বছর চৈতন্যদেব পুরী ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। অধিকাংশ সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনে, গানে ও প্রেম উচ্ছ্বাসে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। নীলাচল বাসের বিশ বছর অন্তরঙ্গ লীলারসে অসংখ্য ভক্তচিত্তকে আনন্দ মথিত করে তোলেন, সেই সঙ্গে তিনি মধুরকণ্ঠের সুললিত নাম সংকীর্তনে সারাদেশকে করেছিলেন প্লাবিত। ১৫৩৩ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পুরীতেই দেহত্যাগ করেন।[৯১] জীবনের শেষ বার বছর তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকতেন। সে অবস্থার উল্লেখ করে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন :

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥[৯২]

মধ্যযুগে (১৪৮৬-১৫৩৩) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে দেশ জাতীয় মুক্তির পথের সন্ধান পাওয়া মানব প্রেমাদর্শনে সমৃদ্ধ বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং আধ্যাত্মভাব, চিত্রসৌন্দর্য ও মধুর প্রেমরসের এক সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হয়।[৯৩]

বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সারৎসার বিবৃত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ঋকবেদ সংহিতায়।[৯৪] বাঙলায় এ মতের উদ্ভব বহুকাল আগে ঘটলেও এ দেশে এর ভিত্তি প্রথম রচনা করেন রামানুজ। শঙ্করের নির্জলা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে যে প্রেমভক্তিবাদ হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রাণশক্তি, তাতেই নবপ্রাণের সঞ্চার করেন বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজ এবং এ মতই প্রেমধর্ম বা ভক্তিধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) হাতে।[৯৫] পরবর্তী সময়ে এ দর্শনেরই বিস্তৃত টীকাভাষ্য রচনা করেন বৃন্দাবনের রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট–এই ষড়গোস্বামী।[৯৬]

'নব্যন্যায়, স্মৃতিশ্রাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়নে যেমন বড় পরিচয় পাওয়া যায় বাঙালির মনস্বিতার, তেমনি বৈষ্ণবাচার্যদের দেয়া বৈষ্ণব র্দশনে ও রসশাস্ত্রে পাওয়া যায় বাঙালি সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন।'[৯৭] প্রেমভক্তিবাদ অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্য' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য'। চৈতন্যদেবের জ্ঞান, ভক্তি ও মানবতার বাণী অবলম্বনেই

তাঁর পার্ষদেরা রচনা করেছিলেন, ‘চৈতন্যভাগবত’, ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, ‘চৈতন্য মঙ্গল’সহ বিভিন্ন গ্রন্থ এবং শত সহস্র বৈষ্ণব পদাবলী।[৯৮] আর তখন থেকেই বাঙালি গভীরভাবে নিয়োজিত রইলো দার্শনিক তত্ত্ববিচার, তর্কবিচার ও রসতাত্ত্বিক সুর অনুসন্ধানে। মৃতকল্প বাঙালি নতুন প্রাণের স্পন্দন লাভ করলো বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ঐক্যের বাণীতে।[৯৯]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন দর্শন

প্রাক বৈষ্ণব যুগে উপমহাদেশীয় দর্শন ছিল একান্ত জ্ঞানমূলক এবং নিতান্তই নীরস ও প্রেমহীন। তাতে প্রেম ভক্তি ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তি চর্চা অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের স্থান ছিল নগণ্য। এখানেই বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বৈষ্ণবাচার্যগণ। তাঁরা প্রেমধর্ম বা প্রেমাত্মক দর্শনকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্বসাহিত্য রচনা করেন তা বাঙালি চিন্তা-ভাবনার তথা সমগ্র উপমাহাদেশীয় জীবনে নিয়ে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন দর্শন সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ ‘বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘চৈতন্যদেবের বড় অবদান হচ্ছে ভক্তিধর্মকে প্রেমধর্মে উন্নীত করা। ‘কিঞ্চিন্নুন’ পাঁচশ বছর আগে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্য সর্বসংস্কার ও গীতাস্মৃতির সর্বপ্রকার শাসনমুক্ত হতে পেরেছিলেন। চৈতন্য প্রভাবে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ যারা শূদ্রাদি অস্পৃশ্য মানুষকে গৃহপোষ্য পশুর বেশি মর্যাদা দিত না। কুলগৌরব, অভিজাত্যবোধ, বর্ণগর্ব, বিদ্যাভিমান, সংস্কৃতিচেতনা ও কুলবাচি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিহার করে ভক্ত মানুষের ভিড়ে মিলে মিশে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হল ধন্য ও কৃতার্থ। ষোল শতক সর্বার্থেই অবিশেষ বাঙালি জীবনে রেনেসাঁসের যুগ। বস্তুত বাঙালির মনে-মননে, সমাজে, ধর্মমতে–উদার মানবিকবোধজাত প্রীতিসুন্দর বিনয় মধুর বাসন্তী হাওয়ায় স্পর্শ লাগল, যার ফলে সংস্কৃতিতে সোনার ফসল ফলেছিল।’[১০০]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন দর্শন চারটি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত–

১. প্রেমতত্ত্ব,
২. অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ,
৩. দেহাত্তীর্ণ মহাপ্রেম,
৪. মানবতাবাদ।

প্রেমতত্ত্ববাদ

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবিতকালেই ভক্তদের কাছে ভগবানের অবতার বলে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনুসারীরা প্রেমধর্মে দীক্ষিত হন। চৈতন্যদেব বাল্যকাল থেকেই কবিতা ও সংগীত প্রিয় ছিলেন। এসব গানের ভাবগত প্রসঙ্গ তাঁর মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে ভক্তিভাবের উন্মেষ ঘটায়। তিনি প্রচার করলেন 'জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম ধর্ম, নাম সংকীর্তন'।[১০১] এজন্য ভগবতভক্ত হিসেবেই তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রেমতত্ত্বের মাধ্যমে এক উদার ধর্মমতের বন্ধনে সকলকে আকৃষ্ট করিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'ধর্মের নামে আচারে, বিচারে, নিষ্ঠা এবং পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ আনে, সমাজকে খোঁয়াড়ে পরিণত করে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাঁধায়। চৈতন্য সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ায় চলার পথের ডাক দিলেন তাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র একসঙ্গে জুটিতে সংকোচ বোধ করে নাই। নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, নীলাচলে, কাশীতে সর্বত্র মহাপ্রভুর সংকীর্তন-সাধনা সঙ্গীতের রসে উচ্ছ্বসিত হয়ে দেশের ভাবুক চিত্তভূমি আদ্র ও সরল করেছিল।'[১০২]

মানবসত্তা গঠিত জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম এ তিনটি বৃত্তি নিয়ে। অভাব বা প্রয়োজন থেকে কর্মের সূত্রপাত। পরমসত্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর অভাব, প্রয়োজন কিংবা দুঃখ বলতে কিছু নাই। মানুষের অভাব আছে বলেই প্রেমভক্তির মাধ্যমেই সসীম মানুষের পক্ষে পরম ঐশী প্রেম অর্জন ও উপলব্ধি সম্ভব।[১০৩]

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বা প্রেমের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্ব প্রচার করেছেন। এটা হলো গীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ। এতে কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান ভক্তিযোগের অঙ্গস্বরূপ গৃহীত হয়েছে।[১০৪] শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগে শ্লোক ৬-৭ এ ভক্তি ও কর্মকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

> "যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥শ্লোক-৬॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥শ্লাক-৭॥[১০৫]

অর্থাৎ যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য (অভিন্ন) ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।[১০৬]

জাতি নয়, শ্রেণি নয়, কুল নয়, ভক্তি ও প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়; প্রেম বা ভক্তিই মানুষের সর্বশেষ্ঠ সম্পদ। অতীতের জ্ঞানমূলক দর্শনের সসীম ও অসীমের, মানুষ ও দেবতার মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। বৈষ্ণবীয় প্রেমাত্মক দর্শনের ফলে স্বর্গ ও দেবতার সঙ্গে মানুষের দূরত্ব হ্রাস পেলো লক্ষণীয় ভাবে এবং 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'–এই বাণী স্বীকৃতি পেল ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের নির্যাস হিসাবে।[১০৭]

বৈষ্ণম মতে, পরমসত্তা কৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্মনয়, বরং এমন এক পরম পুরুষ যিনি ভক্তের পরমাত্মীয়। পরমপুরুষ এই ভগবান খণ্ডবুদ্ধি বা জ্ঞানের বস্তু নয়, বরং পরম উপাস্য ও প্রেমের বস্তু। তিনি রস স্বরূপ–'রসো বৈ সঃ'।[১০৮] আবার তিনি সবার প্রিয় বন্ধু ও আত্মা স্বরূপ। তিনি আদিতে এক ছিলেন; কিন্তু জীবনলীলা সম্ভোগের জন্য তিনি সৃষ্টিকে নিজের থেকে পৃথক করে পরিণত হলেন বন্ধুতে। তাঁর এই লীলা মাতৃলীলা, দীপলীলা ও বৃক্ষবনস্পতি লীলার অন্তর্নিহিত সত্যের দ্যোতক।[১০৯] গর্ভস্থ সন্তানকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মা যেমন বাৎসল্য সুখ অনুভব করেন, তেলকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে প্রদীপ যেমন নিজেকে উপলব্ধি করে এবং আপন দেহের ফল-পুষ্পকে ঝরিয়ে বৃক্ষ যেমন অনুভব করে তার সৃষ্টিশীল সত্তার সার্থকতাকে, তেমনি রস স্বরূপ পরমপুরুষ কৃষ্ণ নিজের দেহ থেকে রাধাকে বিচ্ছিন্ন করে বা বিয়োগের মধ্যে ভোগ করেন আপন লীলারূপ। 'রস স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বটে কিন্তু তবুও লীলাবিলাস ব্যাতিরেকে তাঁর স্বকীয় আনন্দ অনুভূত ও অভিব্যক্ত হয় না। তাই তো তিনি আত্মারাম হয়েও লীলারাম।'[১১০]

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের মধুর কোমল অনুভূতি দিয়েই আবেগমথিত হৃদয়কে পরস্পরের কাছে এনেছিলেন।[১১১] আহমেদ শরীফ মানব হৃদয়ে প্রেমের সাথে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন–'রাধা হলেন সৃষ্টির প্রতিক; আর কৃষ্ণ পরমস্রষ্টা। এ দুয়ের সম্বন্ধ জ্ঞানের নয়, প্রেমভক্তির সম্বন্ধ। প্রেম ও ভক্তি, এ দুইটি পারস্পারিক। দ্বৈত কল্পনা ছাড়া প্রেমভক্তি অসম্ভব। প্রেমাস্পদ ছাড়া প্রেম হয় না। ভগবান ও ভক্ত ছাড়া ভক্তির প্রশ্নও ওঠে না, আবার দু'জনে একাত্ম না হলেও প্রেমভক্তি হয় না। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা, রাধা ও কৃষ্ণ দুই হয়েও প্রেমের এক সসীম জীবনের কান্নাহাসি, শুভাশুভ সবই অসীমের লীলাবিলাসের উপকরণ। আবার অসীমের জন্য সসীমের

ব্যাকুলতাও অনিবার্য। এ যেন বারিবিন্দু ও সমুদ্রের সম্বন্ধের মতো বিন্দু বিন্দু বারি নিয়েই বিশাল সমুদ্র। বিন্দুর একলার শক্তি এতই তুচ্ছাতিতুচ্ছ যে এ দিয়ে তার আপন অস্তিত্বই বজায় রাখা দুষ্কর। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই সমুদ্রের জন্য বারিবিন্দুর ব্যকুলতা। বিন্দুরূপ সসীম জীবাত্মা ব্যাকুলতা অনুভব করে সমুদ্ররূপ পরমাত্মার জন্যে।'[১১২] সসীম অসীমের এ সম্বন্ধটিই চমৎকার ভাবে বিবৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়; 'অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।'[১১৩]

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

নিকট নিবিড় প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই যে সম্বন্ধ তা কি ভেদের সম্বন্ধ না অভেদের সম্বন্ধ? এই বিষয়ে বৈষ্ণব দর্শনে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত। মহাপ্রভুর মতে সাধনার পথ জ্ঞানকর্মবিবর্জিত বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। এ তত্ত্বের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থে।[১১৪] তাতে বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা নিছক ভেদের সম্বন্ধ নয়, আবার একেবারে অভেদের সম্বন্ধও নয়। কারণ তাতে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান। যেমন–আগুন ও আগুনের দাহিকাশক্তি পৃথক নয়, একসঙ্গে বিদ্যমান। আবার আগুনের তাপকে বাইরে থেকে অনুভব করা যায়। এ রকম যা অনস্বীকার্য অথচ যার হেতু নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাকেই বলা হয় অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বস্তু।'[১১৫] ঠিক তেমনি ভাবে মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক ঠিক এরকম। একে এক দৃষ্টিকোণ থেকে ভেদের এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অভেদের সম্বন্ধ বলে প্রতীয়মাত্র হয়। একে ভেদের সম্বন্ধ বলা যায় এজন্য যে, এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েই সত্য, উভয়েই বাস্তব। সন্তানকে বাদ দিয়ে মায়ের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি সৃষ্টি ব্যাতিরেকে স্রষ্টারও কোন মানে হয় না। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ দ্বৈতরাই দেখা দেয় অদ্বৈত রূপে; কারণ বৈষ্ণব মতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা, রাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, দুই হয়েও একাত্ম।[১১৬]

> 'যদ্যপি রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন
> তথাপি লীলার লাগি যুগপদ্বিভিন্ন।'[১১৭]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রাসলীলায় 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের খুব সুন্দর একটি উপমা দেওয়া হয়েছে–

মানুষের রাত হয় ১২ ঘণ্টায়, বিকাল পাঁচটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত। আর ব্রহ্মার রাত মানুষের রাত হিসাবে চারশো ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার বছর বড়। এতোগুলো বছর এই একটি

রাতের মধ্যে যুক্ত হয়েছে। তবেই তো রাসলীলা। অন্য পাঁচটা ঘটনার সাথে মিলবে না, মেলানো ঠিকও নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাধারণ মানুষের ঘটনা কখনোই মিলবে না, মেলানো যাবে না, এই জন্যই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'। মহাপ্রভু বলেছেন, 'তাঁর লীলা স্মরণ করো, তাকে অনুসরণ করে, লীলা করতে যেও না। কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করে গোলকের দিকে এগিয়ে যাও। ভগবানের লীলা জগতের সাথে গুলোয়ে ফেলনা।'[১১৮]

'বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মতানুসারে পরমতত্ত্ব হল হরি, অর্থাৎ ভগবান অর্থাৎ পরমেশ্বর। যাকে ব্রহ্ম বলা হয় তিনিই ভগবান, তিনিই পরমাত্মা।' ভগবানের স্বরূপশক্তি চিৎশক্তি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। চিৎশক্তিরূপে স্বরূপশক্তি ভগবানকে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ঐক্যরূপে, এক চরম অধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে ব্যক্ত করে, আর মায়াশক্তিরূপে স্বরূপশক্তি ভগবানকে জড়জগতের আকারে ব্যক্ত করে।'[১১৯] এই মতানুসারে জড়জগৎ, অদ্বৈতবেদান্তীরা যেরূপ মনে করেন মিথ্যা অবভাস তা নয়। 'চিৎ শক্তি সত্যকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে; মায়াশক্তি অংশকে সমগ্রের অধীনস্থ করে না দেখিয়ে, তাতে সমগ্র বস্তুরূপে ব্যক্ত করে সত্যের অযথার্থ রূপকে প্রকাশ করে।'[১২০] এই মতে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই। জীব ও ভগবান অভিন্ন, কেননা জীব ভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আন্তর সত্তার দ্বারা গঠিত। 'সৎ, চিৎ ও আনন্দ-এ তিনটি নিয়ে গঠিত পরমসত্তা শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ; এবং হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ-এ তিনটি তাঁর শক্তি। প্রেমের উৎপত্তি হ্লাদিনী শক্তি থেকে।'[১২১] প্রেমের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে স্তরে স্তরে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি অতি উৎকৃষ্ট বিমল আনন্দদায়ক ভাব। 'কান্তভাব ও মধুরভাব এদের চেয়েও উন্নত ও উৎকৃষ্ট।'[১২২] কারণ, এ দুয়ের মধ্যে সব ভাবের মিশ্রন রয়েছে। যেমন, সেবক সন্তুষ্ট হয় কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালন করে; মা আনন্দ পান সন্তান স্নেহের মাধ্যমে; স্ত্রী দাম্পত্য সুখ অণুভব করেন পতি-সোহাগিনী হয়ে। কিন্তু মধুর ভাবের সাধক এ ধরনের কোন একটি বিশিষ্ট সুখের প্রত্যাশী নন। তিনি অনুভব করেন সর্বাত্মক সুখ এবং উদ্বেলিত হন অনির্বাচনীয় আনন্দ লহরীতে।[১২৩] শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ এবং নিত্য বৃন্দাবনলীলার শুদ্ধাভক্তিপ্রেম-চেতনা একান্তই তার নিজস্ব বস্তু। ভগবান, জীব ও জড়জগতের মধ্যে সম্বন্ধ হলো অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অচিন্ত; কেননা যুক্তিতর্কের দ্বারা এই সম্বন্ধ বোধগম্য নয়। এই কারণেই এই মতাবাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে পরিচিত।[১২৪]

নিষ্ঠাবান ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ বিভোব হয়ে যান মধুর মহাভাবে। এই প্রক্রিয়ায় ভজন করার নাম মধুর ভজন। মধুর ভজনের অন্য নাম গোপীভজন। এ

ভজন নিঃস্বার্থ ও মুধুর।[১২৫] মহাভাব আপর্থিব ও লোকাতীত। মহাভাব বা মহাপ্রেমের মুল কথা দেবতা ও ভক্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম প্রেমের সম্বন্ধ। এ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত থাকে নির্মল আনন্দ। বৈষ্ণব মতে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর প্রভাবে ভক্ত যদি পরমসত্তার আনন্দঘন মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করতে পারেন, তবে সে স্বাদ পেতে পারে যথার্থ মুক্তির। এ মুক্ত অবস্থায়ই ভক্ত আস্বাদন করে ভগবানের সঙ্গে মিলনের পরমানন্দ।[১২৬]

দেহোত্তীর্ণ মহাপ্রেম

প্রতিটি সাধনার পথই নিজ নিজ ভাবে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে আত্মার অভিন্নতার ধারনার বিরোধিতা করেছে এবং ব্যক্তি যাতে তার আত্মার যথাযথ স্বরূপকে জানতে পারে তাঁর জন্য চেষ্টা করেছে। সাধনার পথ ভিন্ন হলেও তাদের মাধ্যমে উপলব্ধি হয় যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নয়, এক অভিন্ন বস্তু-শুদ্ধ চেতনা।[১২৭] 'বৈষ্ণবীয় দর্শনে এই পরম মহাপ্রেম দেহনিরপেক্ষ নয়। এর সূত্রপাত ঘটে দেহকে কেন্দ্র করে; কিন্তু বিকাশের উচ্চতার পর্যায়ে তা ক্রমশ অতিক্রম করে যায় দেহের বন্ধন এবং পরিণত হয় দেহোত্তীর্ণ অতীন্দ্রিয় প্রেমে। প্রেমের উপাদান যেমন দেহ, তেমনি মন বা আত্মাও তার অন্তর্গত। এখানে দেহ ও আত্মার যুগপৎ উপস্থিত। রাধা যেরূপে মুগ্ধ সেই 'রূপ' কামনাময় দেহকে আশ্রয় করেনি, দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধও থাকে নি। রাধাপ্রেম দেহকে অতিক্রম করে পরিশেষে পরিব্যাপ্ত হয়েছে আকাশে, মেঘালয়ে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, এক কথায় বিশ্বপ্রকৃতির সবদিকে। চণ্ডীদাসের রাধা তাই যথার্থই বলেন : 'দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি'।[১২৮]

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আলোচনা রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং 'ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ'তে এবং জীবন গোস্বামীর 'ষট্ সন্দর্ভে' গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দেহোত্তীর্ণ মহাপ্রেমের কথা বিবৃত আছে।[১২৯] রূপ গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যাবলম্বনে বৈষ্ণব রসের সামান্য অংশ বিবৃত হলো–

প্রাচীন সংস্কৃত রসশ্রাস্ত্রে নয়টি স্থায়ী ভাব ও রসের উল্লেখ করা হয়েছে–

'রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থম্‌ষ্টৌ প্রোক্তাঃ মহোহপিচ।'[১৩০]

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম–এই নয়টি মুলভাব। রূপান্তরিত নয়টি মূলভাব হল–

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।

বীভৎসোদ্ভুত ইত্যষ্টো রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত।[১৩১]

বৈষ্ণব আচার্যেরা এই নয়টি ভাব-রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রতি ভাব ও শৃঙ্গার রসকে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রতি বলতে কৃষ্ণরতি এবং তার রসরূপ বলতে ভক্তিরসাত্মক কৃষ্ণ-শৃঙ্গার বোঝানো হয়েছে। এই রতি ও শৃঙ্গার প্রেমই প্রতীকী রূপ লাভ করেছে বৃন্দাবনের পরকীয়া প্রেমে। তবে এই পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া নয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যেখানে সম্বন্ধ সেখানে লৌকিক প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, লৌকিক বিচারও একবারেই সমাঞ্জস্যবিহীন।[১৩২] উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ গোস্বামী এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

"রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনি কাহারো কথা॥" –চণ্ডীদাসের পদাবলী[১৩৩]

এখানে মূল বিষয় বিভাব, নায়িকা শ্রীরাধা। আহারে বিরতি, রাঙাবাস পরিধান, বেণী এলাইয়া কালো চুলে দেখা, মেঘসনে প্রলাপকথন, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের দিকে তাকানো–এসবই অনুভব। চিন্তা, আবেগ, উন্মাদ ভাব, হাসি নির্বেদ-এসব সঞ্চারীভাব, মূল স্থায়ী ভাব হল কৃষ্ণরতি রস, বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। 'বৈষ্ণব রস প্রবক্তারা রতিভাব এবং শৃঙগাররসের অর্থ সম্প্রসারিত করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায়, প্রিয়বস্তুর প্রতি মানব মনের অনুরাগই রতি। বৈষ্ণব ভক্তের সর্বপ্রিয় হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সুতরাং তাঁদের রতি হল কৃষ্ণরতি; তার রসরূপ হল প্রেমভক্তিরস।'[১৩৪]

আমরা যে পরকীয়া প্রেমের কথা বলছি তা কোন লৌকিক পরকীয়া নয়। এই পরকীয়া যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অর্জন করেছে দার্শনিক প্রতীকী রূপ। যেমন–শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শোনামাত্র কেউ আর ঘরে থাকতে পারে না। এই ধ্বনি শোনা মাত্র 'সতী ভুলে নিজপতি, মুনি ভুলে মৌন। শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণও।' এই বংশীধ্বনি শুনেই সবাই পাগলের মতো ছুটে যায় বনের দিকে-কেউ পতিসেবা করতে করতে, কেউ শিশুকে স্তন পান করাতে করাতে, কেউ বা এক চোখে কাজল, এক

কানে কুন্ডল, এক পায়ে আলতা পরে। একে আর যাই হোক পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট সাধারণ একটি নারীর লক্ষণ বলা যায় না। পতিপুত্রবর্তী নারীরা কখনো এভাবে দল বেঁধে ছোটাছুটি করে না।[১৩৫]

অভিনবগুপ্তপাদের অভিমত, 'কৃষ্ণভক্তির রতি এবং রসপরিণাম অচিন্ত্যভেদাভেদ গত কৃষ্ণস্বরূপশক্তি ও জীবশক্তির পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণভক্তি-ভাব অপ্রাকৃত, অলৌকিক, এর রসপরিনামের তো কথাই নাই। লৌকিক কাব্যশাস্ত্রে ভাবমাত্রই লৌকিক আর বিভাব এবং অনুভব-সঞ্চারী-মিশ্র বিভাবের সহায়তায় ভাবের যে আনন্দাত্মক পরিণাম কেবল তা-ই আলৌকিক। আবার এ 'অলৌকিক' এবং কৃষ্ণরতির অলৌকিক সমর্থকও নয়। কাব্যরসের অলৌকিক অপ্রাকৃত নয়, আলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক কার্যকারণ জন্য জনক প্রভৃতি সম্বন্ধবোধের অতিরিক্ত।'[১৩৬] রসাভিব্যক্তির ব্যাপারগুলোকে লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ধরা যায় না, অনুভবই তার সত্যতার একমাত্র সাক্ষ্য, তাই অ-লৌকিক। আর বৈষ্ণবের অলৌকিক হল যা লৌকিক বা মায়িকজগতের নয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। শব্দ দুটি এক হলেও এদের বাচকত্ব পৃথক। বৈষ্ণব ভক্তির রতি থেকে রসপরিণাম এবং তার কারণ কার্যসমূহ অর্থাৎ বিভাব অনুভাব (সাত্ত্বিকভাব) এবং সঞ্চারী সবই অপ্রাকৃত বলে পরিগণিত হয়েছে। বৈষ্ণব আলংকারিক 'ভাব' থেকে রসপরিণামের মৌলিক সূত্র যদ্যপি মেনে নিয়েছেন এবং স্ববাসনার স্বাদবিশেষকেই রসাবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন।[১৩৭] তবুও বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত রসশাস্ত্রের বিভাগ বৈচিত্র্যগুলো মেনে নেননি, পৃথক পথ অবলম্বন করেছেন এবং স্থানে স্থানে উন্নতিবিধানেরও চেষ্টা করেছেন।

কোন মতবাদই তর্ক, বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। মূল কথা রাধা কৃষ্ণের প্রেম লোকাতীত ও অপার্থিব। তাই প্রচলিত ভাষায় তার গাঢ়তা ও গুঢ়তা ব্যাখা করা যায় না। এই মহাপ্রেম মিস্টিকধর্মী দিব্যপ্রেম। এ পর্যায়ে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার সব ব্যবধান সম্পূর্ণ তিরোহিত। বৈষ্ণবের ভাষায় একেই বলে শ্রীরাধার আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ।

মানবতাবাদ

সমকালীন বিশ্লেষণী মানদণ্ডের বিচারে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব ও প্রেমভক্তিবাদকে যথার্থ দর্শন বলা যায় কি-না, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অবকাশ হয়তো আছে। তবে কোন বিতর্কে না গিয়েও নির্বিঘ্নে বলা যায় যুক্তিতর্কের তত্ত্বীয় কসরত ছাড়াও মানবিক বলে দর্শনের যদি অপর একটি দিক থেকে থাকে তাহলে বৈষ্ণববাদ জীবনমুখী ও মানবধর্মী দার্শনিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে।

'ধর্মই বলি, কাব্যই বলি, আর দর্শনই বলি–এদের সবার লক্ষ্য ও উপজীব্য জীবন। এ জীবন ন্যায়, সত্য, সন্দুর ও কল্যাণপুষ্ট মানবজীবন। ধর্মতত্ত্ব ও কাব্য সাহিত্যের মতো, দর্শনও জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।[১৩৮] জীবনের সঙ্গে দর্শনের যোগ এত ঘনিষ্ঠ বলেই তো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ যুগে যুগে স্বীকৃতি পেয়েছেন গণচেতনার ধারক, বাহক ও সংরক্ষক হিসেবে।[১৩৯]

চৈতন্য জীবন দর্শন বা বৈষ্ণব দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে আলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদেরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং বাস্তব জীবন দর্শন নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। এ পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্মকাহিনী ও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী। মহাপ্রভুর 'জীবন দর্শন' সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।[১৪০] চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দোপধ্যায় মন্তব্য করছেন, 'এতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁর সর্বত্যাগী পার্ষদগণের জীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগুঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণবসমাজের বাইরে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজ, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলেই এই জীবনদর্শনগুলো শুধু জীবন দর্শনই হয় নাই–এতে বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে প্রকার বাহুল্য দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করতে হবে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গেলে চৈতন্য-দর্শনের সাহায্য অপরিহার্য।[১৪১]

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন দর্শন কেবল অতীন্দ্রিয় ও পরমার্থিব পর্যায়েই সীমিত ছিল না। একই সঙ্গে তা বিস্তৃত ছিল মানব সম্পর্কের ব্যাপক পরিমণ্ডলে এবং পরিণতি লাভ করেছিল সার্বিক মানবপ্রীতিবাদে। তার প্রমান আমরা পাই ১৫৪৮ সালে বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', ১৫৫০ থেকে ১৫৫৬ সালের মধ্যে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', ১৬১৫ সালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করে।[১৪২]

বৃন্দাবনদাসকে মহাপ্রভুর জীবন দর্শন রচনার ব্যাস বলা হয়। তিনি চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন যেভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে তাঁর কবিত্বশক্তি, রচনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তিনি শুধু শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শন রচনার জন্যেই আগ্রহী ছিলেন না, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।[১৪৩] চৈতন্য জীবন দর্শনকে পরিচ্ছন্ন ঘটনার মাধ্যমে সাজিয়ে কবি নিজ নিজ ভাবাদর্শ ও রুচি-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সংগীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে তাঁর বর্ণনায় যথার্থ রসমাধুর্যের

সমাবেশ ঘটেছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক বর্হির্মূখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবনদাসের সামান্য ক্রটিবিচ্যুতি ধরা পড়লেও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' ঐতিহাসিক তথ্যের আকরস্বরূপ।'[১৪৪]

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর এই শ্লোকটি দিয়ে শুরু করেছেন–

'ভালং যস্য প্রশস্তং শশধরবদনং উন্নতদীর্ঘনাসাং,
বিম্বোষ্ঠং কম্বু কণ্ঠং কনকগিরিনিভং ফুল্লপঙ্কোরুহাক্ষং।
আজানুস্পর্শহস্তং কটিতটালিসদ্রক্তকৌপীনবাস,
বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং নিখিলজনমনস্তাপসন্তাপমোচং।'[১৪৫]

এই কাব্যে চৈতন্য জীবন দর্শনের আদিরসাত্মক লীলার যে বর্ণনা করা হয়েছে তা 'ভাবগত', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণ', 'ভবিষ্যপুরাণ', 'নারদ পঞ্চরাত্র', 'মহা-ভাগবত' প্রভৃতির অনুসরণ করেই বর্ণনা করেছিলেন। সম্ভবত চৈতন্যের ভাব দর্শন বর্ণনার জন্য কাব্যটিতে রসের সঞ্চার হয়েছিল।[১৪৬] তিনি চৈতন্যজীবনের প্রচলিত ঐতিহ্যের আলাপ না করেও কাব্যের অসংখ্যা খণ্ড বিচ্ছিন্ন মুহূর্তকে গীতিরস স্নিগ্ধ করে তুলেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা বর্ণনাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত গ্রন্থ। সর্বাপেক্ষা সুলিখিত গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থের পরিচয়।[১৪৭] ভাবুক বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এই জীবন দর্শন কাব্যটি ভক্তি সাধনার জীবনবেদ। শ্রীচৈতন্যের ভাব আস্বাদনের সহায়ক হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক। বৈষ্ণব সমাজে তা উপনিষদের মত মর্যদা পেয়েছে। চৈতন্যজীবন দর্শনের চেয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠা করা এ কাব্যের প্রধান লক্ষ্য বলে কাব্যটি এত সমাদৃত।[১৪৮]

বৈষ্ণবীয় মানবতাবাদের কল্যানেই মধ্যযুগের বাঙালি নতুন করে উপলব্ধি করেছিল 'জীবে ব্রহ্ম' এবং 'নরে নারায়ণ'। চৈতন্য দেবের কাছে মানবপ্রেম ছিল সর্বাত্মক মিলনের নামান্তর এবং এ প্রেমই তিনি প্রচার করেছেন সর্বত্র। এ প্রেমের বাণীকেই তিনি অনুশীলন করেছেন আজীবন। একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য; 'পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণনাম করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, তিনি বাঙালির সম্মুখে যে গৌরবের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলে না।'[১৪৯] বস্তুত, সেদিনের ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবিভেদের পরিবেশে মানুষে মানুষে যখন রচিত

হয়েছিল এক বিরাট বৈষম্য, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো যখন প্রবেশধিকার ছিল না সামাজে, ঠিক তখনই শ্রীচৈতন্য এগিয়ে এলেন সাম্য, সৌভ্রাত্ত ও বিশ্বমানবতার এই অমোঘ বাণী নিয়ে–

'বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে।
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে।'[১৫০]

বৈষ্ণব দর্শনে সাম্য, প্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের যে বাণী বিঘোষিত, তা কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রচারিত নয়, বরং নিবেদিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ রচনায়। 'মহাপ্রভুর প্রভাবেই জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এক নতুন ধর্মে গড়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ শুদ্রের ভেদ ভুলেছে, শ্রীচৈতন্য স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সকল বিভিন্নতা দূর করে এক অখণ্ড মানবজাতি গড়ে তুলতে পারলে তবেই হবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ এবং সেই সমাজের জন্য যা কিছু করা হবে, তা হবে সেই অখণ্ড জাতিরই মঙ্গল-সাধন।'[১৫১]

বহু যুগের লালিত মূল্যবোধ ও মুল্যমান হারিয়ে সমকালীন মানুষ নিপাতিত হয়েছে এক অসহায় নিরবলম্ব অবস্থায়। দিকে দিকে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাস, হানাহানি, সংকীর্ণ স্বার্থের কুৎসিত লড়াই। সমগ্র জগৎ ও মানুষের মূল অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিবাদে কতটুকু দর্শণ আছে, এ নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই না; শুধু এটুকু বলতে চাই তাঁর জীবন দর্শন মানবিকবোধ ও মানবতাবাদের বিকাশ।[১৫২] অনাবিল প্রেমশক্তিবলে মানুষ মুক্ত হতে পারে পাশবিক প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে এবং সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে সর্বজীব ও স্রষ্টার মধ্যে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার জীবন দর্শনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, হিন্দু ও মুসলমানে, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানে, এক কথায় মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ রাখেননি। এ প্রেম ও মানবিক আদর্শের স্পর্শে একাকার হয়ে যায় যুগ, জাতি, দেশ, ধর্ম এবং সমগ্র মানবতা। মহাপ্রভু বলেছেন, 'আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না। শ্বেতকায়ে কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখি না, ছোট বড় বুঝিনা, সবাই শক্তিময়, দয়াময়, প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি। সবশেষে বলতে চাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন দর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের মনে অনাবিল প্রেমবোধ সৃষ্টি করবে, সমগ্র দুনিয়ার বুক থেকে সব রকম সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের অবসানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দুনিয়ার সব মানুষ এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।'[১৫৩]

'Bengal at that time was going through the worst stage of religious and social degradation. Untouchability and castiesm humiliated the common man due to the

arrogance and highhandedness of the Brahmins. Blessed by Advaitacarya, Mahaprabhu took on the responsibility of eradicating the religious and social vices.'[১৫৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পার্ষদ

শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর। ছয় গোস্বামী–সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী ও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, দামোদর রায়, রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ দাস প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন হরিদাস জন্মগ্রহণ করেছেন খুলনায়, গদাধরপণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত চট্টগ্রামে। মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রাম থেকে নবদ্বীপে যান। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসেন এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহনের সময় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুর গৃহস্থাশ্রমে বাস করতেন। তিনিও চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মুরারি গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছেন সিলেটে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহধ্যায়ী হন এবং তিনিই প্রথম মহাপ্রভুর জীবনী লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়। নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহন করেন রাজশাহীর খেতুরীতে। পরবর্তী সময়ে গৃহ ত্যাগ করে বৃন্দবনে চলে যান। তিনি গড়ানহাটী ধারার প্রবক্তা। এর মধ্য থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস এবং গদাধর পণ্ডিতকে বলা হয় পঞ্চতত্ত্ব ,কারণ নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব আন্দোলন হয়েছিল এই পাঁচজনই ছিলেন তাঁর প্রধান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তম পরিচ্ছেদের ' শ্লোক ছয়'-এ পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥[১৫৫]

অনুবাদ–শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি–এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য–শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতারূপে তাঁর স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর দেহ অপ্রাকৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে পরমানন্দময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাই বলা হয় ভক্তরূপ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় ভক্তস্বরূপ। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছেন। শ্রীস্বরূপ

দামোদর, শ্রীগদাধর ও শ্রীরামানন্দ প্রমুখ ভক্তরা বিভিন্ন শক্তি। এর দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের বাক্য, 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'[১৫৬]–এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরো পার্ষদদের মধ্যে রয়েছেন–ছয় গোস্বামী, অষ্ট কবিরাজ, অষ্ট প্রধান মোহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, দ্বাদশ উপগোপাল ও চৌষট্টি মোহান্ত। নামের তালিকা রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী নামে পরিচিত চৈতন্যদেবের ছয় জন প্রখ্যাত শিষ্য বৃন্দাবনে অবস্থান করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁরা হলেন–সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট। প্রথমোক্ত তিনজন বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনায় এবং শেষোক্ত তিনজন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারা বাংলাদেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু চৈতন্যদেব কোনগ্রন্থ রচনা করে যাননি এবং ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্ত্র ও তৈরি করেননি, সেহেতু বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণলীলার দর্শন ও তত্ত্ব প্রচারে এই ছয় গোস্বামী বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১৫৭]

ছয় গোস্বমী ও পঞ্চতত্ত্বের জীবনীসহ বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া কীর্তনের গড়ানহাটী ধারার প্রবর্তক শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও হরিদাসের জীবনী তুলে ধরেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জীবনী

একচক্রধামে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্বাভাস সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে বলেছেন–দ্বাপরযুগের শেষে মাতা কুন্তীদেবীসহ পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমণ করতে করতে রাঢ়দেশে প্রবেশ করে একচক্রা গ্রামে অবস্থানকালে সেখানকার মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হন। যুধিষ্ঠির মহারাজ ভাবলেন–'অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু একচক্রাভূমির মতো পরম সৌন্দর্যে কোথাও মন আকৃষ্ট হয়নি। তাই মনে হয় এই একচক্রাভূমি শ্রীভগবানেরই লীলাস্থলী। এ ভূমির মহিমা শ্রীভগবান যদি কৃপা করে প্রকাশ করেন তবেই জানা যেতে পারে। এভাবে বিচার করতে করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। তখন ভগবান বলরাম যুধিষ্ঠির মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব এবং একচক্রা গ্রামে তিনি স্বয়ং যে নিত্যানন্দ রূপে আবির্ভূত হবেন তার ইঙ্গিত দিলেন। তারপর ভগবদ্ধাম শ্বেতদ্বীপের দর্শন প্রদান করে তিনি অন্তর্হিত হন।১৩৯৫

শতাব্দীর (ইংরেজি ১৪৭৩ সালে, ১২ জানুয়ারি) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী।[১৫৮]

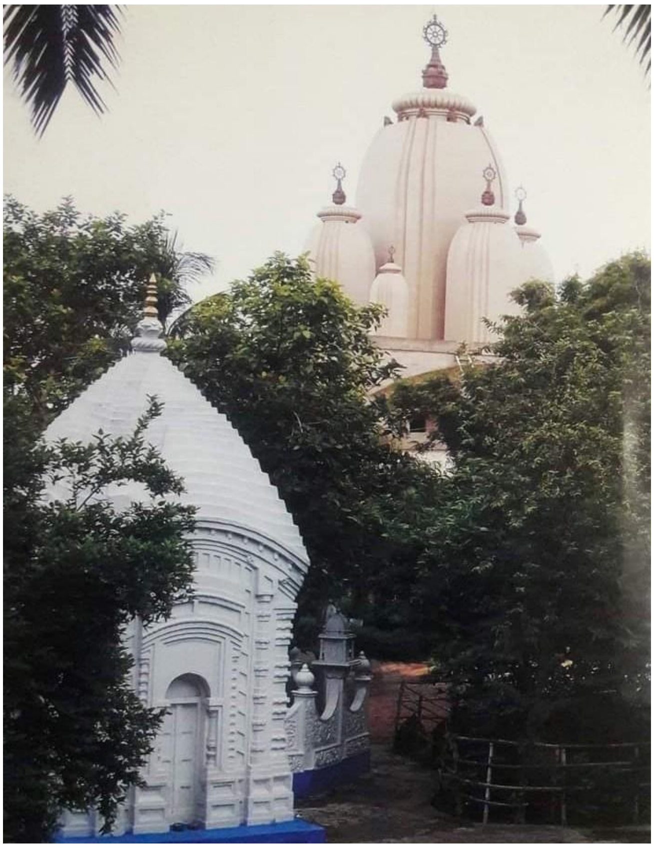

শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আঁতুর ঘর

নাড়ী পোঁতা, বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম

চিত্রটি ধারণ করেছি ৩১.১২.২০২০ তারিখে

দ্বাপর যুগে যিনি বলরামরূপে কৃষ্ণলীলার পুষ্টিবিধান করেছিলেন কলিযুগে চৈতন্যলীলায় তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।[১৫৯]

'সর্ব-অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥

—চৈ.চ. আদি ৫/৪-৬[১৬০]

তিনি কৃষ্ণলীলার অনুকরণে দেবতাদের সভায় পৃথিবী কর্তৃক আসুরিক অত্যাচার বর্ণন, কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্মলীলা, পুতনা বধ, মাখন চুরি, কালীয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি লীলাভিনয় করতেন। কখনো রাম লীলার অনুকরণে সেতুবন্ধন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ইন্দ্রজিৎ বধ। আবার শিশুদের সঙ্গে কখনো বামনরূপে বলীর সর্বস্ব হরণ ইত্যাদি যাবতীয় লীলা সম্পাদন করতেন।[১৬১]

নিত্যানন্দ ছিলেন হাড়াই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণস্বরূপ। একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে খুব যত্ন সহকারে সেবা করতে লাগলেন, রাতেও সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করলেন। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য ধারণপূর্বক বিচার করলেন—পূর্বকালে মহারাজ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাঁদতে কাঁদতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন এবং অনুনয়ের সঙ্গে বললেন—'আমাদের একমাত্র প্রানটি আপনাকে দিলাম। আপনি সর্বতোভাবে একে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন।'[১৬২]

'নিত্যানন্দ প্রভু তৈর্থিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রথমে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করে সেখানে 'শিব' দর্শন করেন। তারপর তিনি বৈদ্যনাথ তীর্থে একাকী গমন করেন। সেখান থেকে প্রয়াগে, তারপর পূর্বজন্ম স্থান মথুরায় গমন করেন। সেখানে স্নান করে ব্রজের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করেন। তারপর 'মদনগোপালদেব' দর্শন করে হস্তিনাপুর গিয়ে বলরামের স্মৃতি চিহ্ন দর্শন করে প্রণাম করেন। সেখান থেকে দ্বারকা, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করে পশ্চিম ভারতে গমন করে

মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন লাভ করেন। উভয়ের দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্ব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন।'[১৬৩] নিত্যানন্দপ্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন–

মাধবেন্দ্র বোলে প্রেমে না দেখিলুঁ কোথা। সেই মোর সর্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জানে॥

–চৈ.ভা আদি৯/১৮২-১৮৫[১৬৪]

কিছুদিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে পরম সুখে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করলেন।[১৬৫]

এরপরে তিনি ধনুস্তীর্থ, বিজয়নগর, অবন্তী দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী ধামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্যগীত করলেন। কয়েকদিন পরে তিনি গঙ্গাসাগর তীর্থে এলেন। সেখান থেকে শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন করলেন। ব্রজধামে এসে নিত্যানন্দ প্রভু এক অপূর্ব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।[১৬৬]

বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান করছেন। সর্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈববাণীতে শুনলেন–'তিনি এখন নদীয়াতে অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন বিলাস করছেন। তুমি সেখানে যাও।'[১৬৭]

অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তা জানতে পেরে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহাপ্রভু সোজা ঠিক শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহের বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে উপবিষ্ট আছেন। মহাপ্রভু বহুকাল পর প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও প্রাণের দেবতার দীর্ঘকাল পর সাক্ষাৎ পেয়ে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কী আশ্চর্য মিলন! নয়নে নয়নে যেন দুজন-দুজনার রূপ দর্শনে বিভোর।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে কী মধুর মিলন দৃশ্য! দুজনার নয়ন জলে দুজন সিক্ত হচ্ছেন। ভক্তগণ তখন ঘর ঘন হরিধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হলো।[১৬৮]

শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু জননীর ন্যায় ভাবতেন।[১৬৯] মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণের কাছে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলেছেন–নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ, আমা হতে কিছুমাত্র

ভেদ নাই।[১৭০] শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের আহ্বান করলেন–মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে নাম প্রচার করতে লাগলেন।[১৭১] শ্রীমহাপ্রভু গৌরচন্দ্র জীবোদ্ধারের জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় করলে নিত্যানন্দ প্রভু তা বুঝতে পারলেন।[১৭২] তিনি বুঝতে পারলেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।[১৭৩] নিত্যানন্দ প্রভু বললেন–'তুমি একবার সকল ভক্তের নিকট তোমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করো। তারপর তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করো।' নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করেন। ভক্তগণের কাছে সব ব্যক্ত করলেন।[১৭৪] মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ–এই তিনজন মহাপ্রভুর পশ্চাৎ অনুসরণ করেছিলেন।[১৭৫] গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে মহাপ্রভু স্নান ও স্তব-স্তুতি করলেন। কিন্তু তখন পরিধানের জন্য সঙ্গে কোনো কৌপীন বা বহির্বাস ছিল না। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য প্রভু নতুন কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে নৌকায় সেখানে উপস্থিত হলেন।[১৭৬]

অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তিনদিন উপবাসের পর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতাচার্যের ভবনে ভোজন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর জননী শচীমাতাকে নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসেন। স্বীয় জননী শচীমাতাকে দর্শন করে শ্রীমহাপ্রভু দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন।[১৭৭] এভাবে শচীমাতা ও মহাপ্রভুর মিলন হলো। দশদিন যাবৎ শচীমাতা রন্ধন করে মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন। সকল ভক্তগণের সাথে নৃত্য-কীর্তনে অতিবাহিত করে মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত–এ চারজন মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করলেন।[১৭৮]

শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন–'আপনি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করে সেখানকার ভক্তগণকে সুখী করে পাপী তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাম দাস, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস ও শ্রীপুরন্দ পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।[১৭৯] পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্তন মহোৎসব করতেন।[১৮০]

পানিহাটি গ্রামে কিছুদিন থাকার পর নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে শুভ বিজয় করলেন।[১৮১] শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন বণিক কুলকে উদ্ধার করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য ভবনে আগমন করলেন।[১৮২] কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থানের পর নবদ্বীপের মায়াপুরে শচীমাতাকে দর্শনের জন্য আগমন করলেন।[১৮৩]

তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি। নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি॥

সেই মতে সর্বদ্যে আইলা আই-স্থানে। আসি নমস্করিলেন আই চরণে॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখি শচী আই। কি আনন্দ পাইলেন–তা’ অন্ত নাই॥

–চৈ. ভা. অন্ত ৫/৪৯৬-৪৯৮[১৮৪]

নিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে মহাসংকীর্তন বিলাস করতে লাগলেন।[১৮৫] তিনি যখন পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন, সে সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যনন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।[১৮৬]

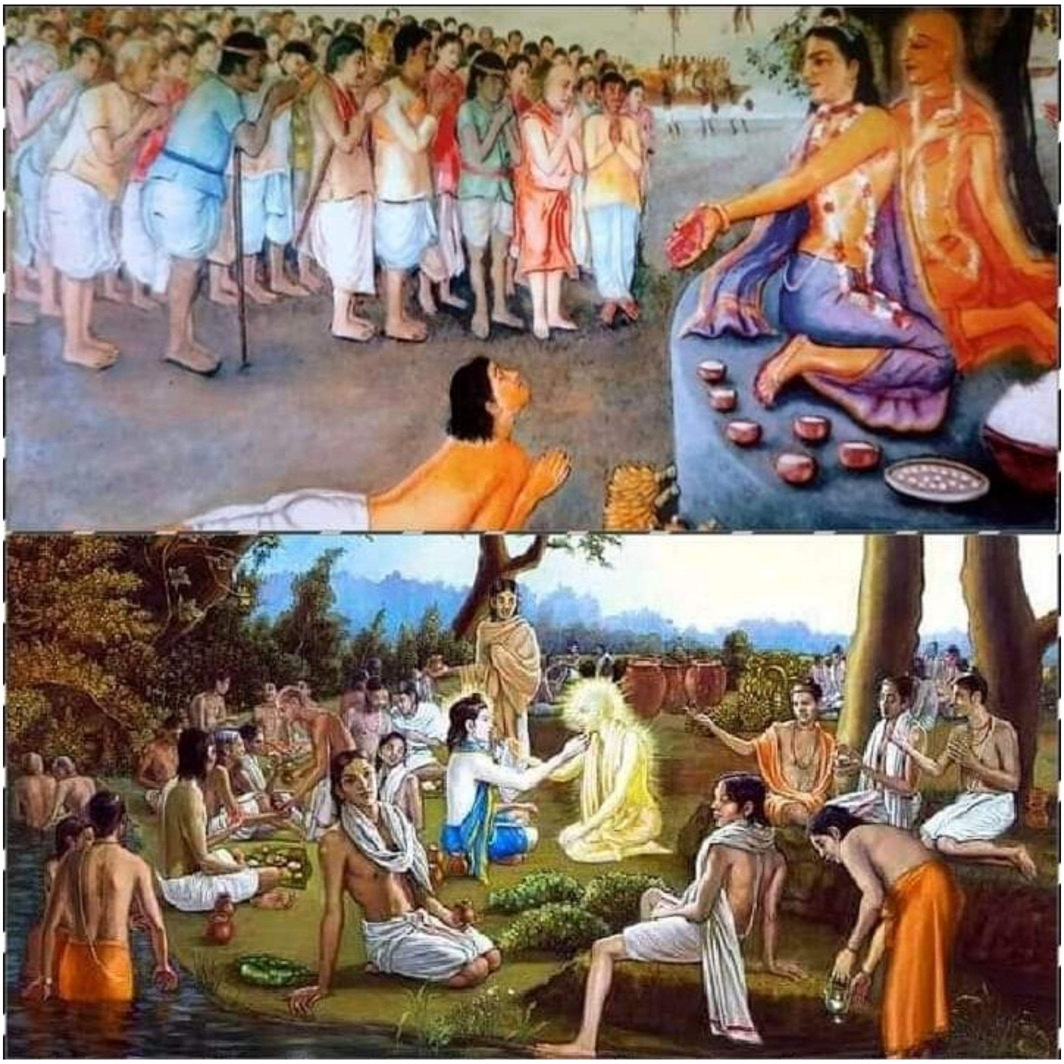

দধি চিড়া উৎসবের অঙ্কিত চিত্রটি পরম্পরা বই থেকে সংগৃহীত

প্রথম সাক্ষাতেই প্রভুর স্নেহের আহ্বান। যার ধন তাঁকে না জানিয়ে যদি কেউ নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে তাকে চোর বলে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সম্পত্তি।[১৮৭] রাঘুনাথ নিত্যানন্দকে না জানিয়ে,

তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে মহাপ্রভুর চরণ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। রঘুনাথ দুবার শান্তিপুর গিয়ে এবং তাঁর নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাবার চেষ্টা করেছেন। এটাই রঘুনাথের নিত্যানন্দ ধন চুরির চেষ্টা। তাই তিনি রঘুনাথকে চোর বলে সম্বোধন করেছেন।[১৮৮]

তখন নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে নিকটে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধারণ করে বললেন, 'তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও।' প্রভুর নির্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। সেই থেকে পানিহাটিতে চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[১৮৯]

নবদ্বীপের অদূরে বড়গাছির শালিগ্রামের নিকট পণ্ডিত সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুজন সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর নিত্যানন্দ প্রভু পত্নীদের সঙ্গে কিছুদিন কৃষ্ণদাসের গৃহে অবস্থানের পর নবদ্বীপে চলে আসেন। সেখানে শচীমাতার গৃহে উপস্থিত হয়ে স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে গেলেন। সীতা ঠাকুরাণী দুজনকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর শান্তিপুর থেকে পত্নীদ্বয়কে নিয়ে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গৃহে গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্তন শেষে খড়দহে গমন করেন।১৫২২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নিত্যানন্দ প্রভু বসুধা-জাহ্নবাকে নিয়ে খড়দহে আসেন।[১৯০] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর খড়দহে আগমন, শ্রীহরিনাম প্রচার, বসবাস এবং প্রায় সর্বক্ষণ পরিকর বেষ্টিত সংকীর্তন ভক্তিরসধারার প্লাবনে সমগ্র সমাজকে এমনভাবে আন্দোলিত করেছিলেন যে, খড়দহ ক্রমশ এক মহাবৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়েছিল। খড়দহে কুঞ্জবাড়িতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসবাস করতেন। এ বাড়িতেই পুত্র বীরচন্দ্র প্রভুর এবং কন্যা গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব স্থান এখনো বর্তমান আছে।[১৯১] মহাপ্রভুর অপ্রকটে মুহ্যমান নিত্যানন্দ প্রভু একদিন তাঁর পত্নীদ্বয়কে নিয়ে জন্মভূমি একচক্রায় গমন করেন। শ্রীবঙ্কিমদেবের আদেশপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবঙ্কিমদেবের দেহে লীন হন। বৈষ্ণব দিগদর্শনীর মতে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যলীলায় গমন করেন।[১৯২]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে পদকর্তা বিশ্বরূপের একটি পদ—

যদি নিতাই না হত, কেমনে কি হত, এ ঘোর কলিতে গতি।
গৌর সন্ধান, দিয়া মহাদান, কে শোধিত জীবের মতি॥
গোরা নামাক্ষরে, কত সুধা ঝরে, কিবা তার আস্বাদন।
যদি সেধে না পিয়াত, কোন কলিহত, জুড়াত তাপিত জন।
উদিল নিতাই, ত্রিভুবনে তাই, ডাকিল প্রেমের বান।
তাহে ভক্তহংস, পতিত বংশ, প্রেম পাথারে করিল স্নান॥
বদনে নিতাই, গুণ-গাও ভাই, দয়ালের শিরোমণি সে।
গৌর প্রেমে, সে হেন মাতোয়াল, দিশাহারা প্রতি নিমেষে॥
গোরা গোরা বলি, মারে মালসাট, কভু পড়ে ভূমে আছাড়ি।

ধুলায় ধূসর, হয় কলেবর, কভু কাঁদে বাহু পসারি॥
ব্রজ বনবাসে, সে উজ্জ্বল রসে, শ্রীরাম-শ্যামের পিরীতি।
সে রস ছানিয়া, সুধা নিঙাড়িয়া, দেখাইল তার মুরতি॥
প্রেমের আশ্রয়ে বিষয় নিতাই, সহায় শোধিতে ধরে।
দাস বিশ্বরূপ কয়, হেন যে নিতাই, বলিহারি যাই তার॥

শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীহরি কীর্তনের প্রথম গায়ক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূর্বক যাঁরা লোককল্যাণ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য পথিকৃৎ হলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। শাস্ত্রজ্ঞানে, কৃষ্ণভক্তিতে এবং ভক্তি প্রচার কার্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলে অদ্বৈত আচার্য। তিনি ছিলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। পঞ্চতত্ত্ব হলেন গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর। বৈষ্ণব জগতের বিখ্যাত অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান সুনামগঞ্জের লাউড় পরগণার নবগ্রামে। ১৪৩৪ সালে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুবেরাচার্য্য এবং মাতার নাম লাভাদেবী। অদ্বৈতের পিতৃপ্রদত্ত নাম কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল-স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে 'প্রভু' শব্দে সংজ্ঞায়িত হয়েছেন। অদ্বৈত শিশুকালাবধি মেধাবী ছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে যে একজন মহাপুরুষ বলে খ্যাত হবেন, তখনই তাঁর লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছিল; তখনই তাঁর সর্ব্বভূতে দয়া ও গুরুজনে একান্ত ভক্তি ইত্যাদি দর্শনে সকলেই প্রীত হলেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। যে কোনো বিষয়, যত কঠিন হোক, একবার মাত্র পাঠ করলেই কখনো তা ভুলতেন না। এইজন্য সকলে তাঁকে শ্রুতিধর বলতো। কাজেই অল্পকালের মধ্যেই বিবিধ শাস্ত্রে তিনি সুশিক্ষিত হয়ে উঠলেন।[১৯৩] সপ্তগ্রামের ধনি জমিদার হিরন্যদাস ও গোবর্ধন দাসের অর্থানুকূল্যে তিনি সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা সীতা ও শ্রীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থিত মহামানব চৈতন্য মহাপ্রভু। আচার্য তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট নিমাই পণ্ডিত যেদিন অদ্বৈতশিরে চরণার্পণ করেন, সেই দিনই আচার্যের সর্বসংশয় তিরোহিত হয়েছিল। এইদিন মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন–

'তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি।
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতর।

নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবে দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্বজীব উদ্ধারিতে।'[১৯৪]

আচার্য অদ্বৈত কাঁদতে কাঁদতে বললেন–

'আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥'[১৯৫]

এইদিন আচার্যদেব গঙ্গাজলে এবং চন্দনাক্ত তুলসীমঞ্জরীসহ নানা উপচারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ পূজা করেন। তখন বিশম্ভর বলেন, 'তোমার জন্যই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করিব, আমার গুণগান করিয়া যেন সমস্ত সংসার নৃত্য করে। ব্রহ্মা-শঙ্কর-নারদাদি যে ভক্তির জন্য তপস্যা করেন, আমি সেই ভক্তিই সর্বসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিব।'[১৯৬] শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সংকীর্তনে শ্রীচৈতন্যদেবের নামগানের প্রবর্তন। তাঁকে অনুসরণ করেই বিভিন্ন কবিগণ গৌরলীলা নিয়ে পদ রচনা করেছেন।

'মহাপ্রভুর অপ্রকটের পঁচিশ বছর পর তিনি অপ্রকট হন। ভক্তি কল্পবৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ। ইনি সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করতেন।' তিনি নিজেকে মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করতেন।[১৯৭]

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥[১৯৮]

'যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এ জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্তা, ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য তাঁরই অবতার। হরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তাঁর নাম অদ্বৈত, ভক্তি শিক্ষক বলে তাঁকে আচার্য বলা হয়। সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।'[১৯৯]

শ্রীবাস

শ্রীবাস ছিলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। অপর নাম শ্রীনিবাস। পূর্বাবতারে তিনি ছিলেন নারদ, আর শ্রীবৃন্দাবন দাস ছিলেন বেদব্যাস। জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রীহট্টে (বর্তমান সিলেট)। শ্রীবাসের পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। জলধরের পাঁচটি পুত্র–নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী। সুবিখ্যাত শ্রীবৃন্দাবন দাস নারায়ণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবাসের স্ত্রীর নাম মালিনী দেবী। শ্রীবাস নবদ্বীপে বাস করতেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তাঁর গৃহে মহাপ্রভু সংকীর্তন করতেন। শ্রীবাসের গৃহই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম লীলাক্ষেত্র। শ্রীবাস গৃহেই তাঁর প্রথম প্রকাশ। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীবাস ন্যায় দর্শন চর্চা করতেন অর্থাৎ যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রথম যৌবনে একদিন গঙ্গাস্নানের পথে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত শুনে ভাবাবিষ্ট হন। যদিও ব্যাখ্যায় ভক্তির প্রসঙ্গ ছিল না, তবু তিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণে হেসে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। দেবানন্দের চেলারা বিরক্ত হয়ে শ্রীবাসকে সেখান থেকে টেনে তুলে পথে বসিয়ে দেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত কয়েকদিন দেবানন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন তাঁর কৃপায় দেবানন্দ নিজ ভুল বুঝতে পারেন। মহাপ্রভুর উপদেশে দেবানন্দ শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করলে শ্রীবাস দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। এরপর থেকে শ্রীবাস নিয়মিত ভগবত ও গীতা পাঠ করতেন।

শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তমদাস ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ১৫৫৬ সালের কিছু আগে অথবা কিছু পরে। তিনজনই জীব গোস্বামীর কাছে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের হাত দিয়ে গোস্বামী গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। মঞ্জরী সাধনার পদ্ধতি গড়ে তোলেন নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। 'মঞ্জরী সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মিলনেই পরমানন্দস্বরূপ জেনে যুগলমিলনে অখণ্ড আনন্দ উপলব্ধি তাঁদের প্রয়াস। তবে মঞ্জরী সাধক সাধিকা নিজদেহে কৃষ্ণ বা রাধার অস্তিত্ব কল্পনা করে নরনারীর যুগ্ম সাধনা দ্বারা আনন্দানুসন্ধান করেন না। মঞ্জরী সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মিলনই পরমানন্দস্বরূপ জেনে যুগলমিলনের লীলাপুষ্টির জন্য মঞ্জরীর অনুগত হয়ে প্রেমসেবার অধিকার প্রার্থনা করেন। সেবাধিকার লাভই সাধকের চরম সার্থকতা, এতেই আনন্দের উপলব্ধি হয়। আনন্দের উপলব্ধিই মুক্তির উৎস।'[২০০]

গয়া প্রত্যাগত প্রেমোন্মাত্ত নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিতই প্রথম বলেছিলেন 'গোত্রং নো বর্ধতাম্', 'গোত্র বাঢ়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার।' হট্টগোলের দিনে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতই নিমাই পণ্ডিতকে উদ্বোধিত করেছিলেন। নিমাইয়ের পরিবার অর্থাৎ মিশ্র পরিবারে সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পণ্ডিতপত্নী মালিনী দেবী শচী দেবীর (নিমাইয়েরই মা)

সখীস্থানীয় ছিলেন।[২০১] সুতরাং শ্রীবাসের বাক্যে শচীদেবী আশ্বস্ত হয়েছিলেন। শ্রীবাসের সৌভাগ্য যে তাঁর গৃহেই প্রথম মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। 'শ্রীবাসের সৌভাগ্যের সীমা নেই। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু এমনভাবে আর কারো কাছে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীবাস শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত ব্রহ্মমোহাপনোদম অধ্যায়ের ব্রহ্মা স্তব পাঠ করতে লাগলেন। যাঁকে শৈশবে কোলেপিঠে করেছেন, যাঁর প্রথম যৌবনের অজস্র ঔদ্ধত্য হাসিমুখে সয়েছেন, শচীদুলাল সেই নিমাই পণ্ডিতকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানরূপে বরণ করে নিলেন। কোনো দ্বিধা নাই, কোনো কুণ্ঠা নাই, কোনোরূপ উপেক্ষা নাই, শ্রীবাস একাগ্র নিষ্ঠায় বিশ্বাস করলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতিই শচীনন্দনরূপে আর্বিভূত হয়েছেন। তিনি স্তব করতে লাগলেন–

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন যিনি বর্ণ পীতবাস যাঁর॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার॥"[২০২]

মহাপ্রভুর কীর্তনে তাঁর আশপাশের লোকজন যখন বিরক্তিবোধ করত তখন তিনি শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন করতেন। মহাপ্রভু দীর্ঘ এক বছর শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন করেছেন।

কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥ শ্লোক-৩৬[২০৩]

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচালনায় সেই সংকীর্তন শ্রবণ করে পাষণ্ডীরা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছিল। তাই শ্রীবাস ঠাকুরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তারা নানারকম যুক্তি করেছিল। একদিন রাতে যখন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে সংকীর্তন হচ্ছিল, তখন গোপাল চাপাল নামে এক কটুভাষী বাচাল ও পাষণ্ডী ভবানীপূজার ব্রাহ্মণ সামগ্রী নিয়ে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের দরজায় রেখে দেয়। ভবানীপূজার সামগ্রীর মধ্যে ছিল জবাফুল, কলাপাতা, রক্তচন্দন, আদি উপকরণসহ। মদ্যভাণ্ডারও সঙ্গে রেখেছিল। সকালবেলায় শ্রীবাস ঠাকুর তাঁর গৃহের দরজার সামনে সেই সমস্ত উপকরণগুলো দেখেন ও প্রতিবেশীদের দেখান। তখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সেই ভদ্রলোকেরা মেথর ডেকে সে স্থানটি পরিস্কার করান এবং গোবর ছড়িয়ে দেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতে গোপাল চাপালের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। শ্রীবাস গৃহই মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হলো। 'সাত প্রহর ধরে ভাবের মহাপ্রকাশে তিনি শ্রীবাস গৃহেই প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল। রাতে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু পাছে মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্তন কোনো বিঘ্ন ঘটে, তাই শ্রীবাসের অনুরোধে শ্রীবাসপত্নী রুদ্ধকণ্ঠে সে শোক

সংবরণ করেছিলেন। শ্রীবাসও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই নৃত্য কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় উদাহরণ কোথায়? মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীবাস কুমারহট্টে চলে যান। মহাপ্রভু রামকেলি যাবার সময় এবং ফেরার সময় শ্রীবাস গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীবাসকে বর দান করলেন—জরা তোমাকে আক্রমণ করবে না, লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষা করতে হয় তথাপি তোমার গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশ পথ পাবে না।'[২০৪] এরপরে দেশে ফিরে শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা শুরু করেন। অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু বৈষ্ণব তাঁর কাছে এসে গোস্বামীশাস্ত্রে পাঠ নিতেন। অনেকে তাঁর শিষ্যও হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সপরিজন মল্ল রাজা (বিষ্ণুপুরাধিপতি)। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন। কাটোয়ার গদাধরদাস এবং যদুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের সশ্রদ্ধ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

গদাধর পণ্ডিত

পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম গদাধর পণ্ডিত। চট্টগ্রামের বেলেটিয়া গ্রামে ১৪০৮ সালে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীল মাধব মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীমতি রত্নাবতী দেবী।[২০৫] তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি ছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ও মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী। গদাধর নীলাচলে মহাপ্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাতেন।[২০৬]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন—পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকাশের জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেন না তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা বিবিধ চিৎ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। *বেদে* বলা হয়েছে, *পরাস্যশক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে*—'পরমেশ্বর ভগবানের পরা শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।' *বেদের* এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, চিৎ-জগতে অন্তহীন রস বা বৈচিত্র্য রয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তত কোন ভেদ নেই। কিন্তু রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তস্বরূপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্ত-অবতান রূপে, গদাধর প্রভু ভক্তশক্তিরূপে এবং শ্রীবাস প্রভু শুদ্ধ ভক্তরূপে—এই পঞ্চ প্রকারে বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ ও ভক্ত-অবতারই স্বয়ং, প্রকাশ ও অংশরূপে বিষ্ণুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধ ভক্ত—বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন শক্তিতত্ত্ব। যদিও ভগবানের চিৎ-শক্তি ও তটস্থা শক্তি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা হচ্ছে আশ্রিততত্ত্ব এবং শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন আশ্রয়তত্ত্ব। তাই, যদিও তাঁরা একই স্তরে স্থিত, তবুও অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের জন্য

বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বৈষম্য কখনই সম্ভব নয়, কেন না উপাস্য ও উপাসককে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

'গদাধর পণ্ডিত গৌরসুন্দরের হ্লাদিনীশক্তি বা শ্রেয়সী শক্তি। ব্রজলীলায় প্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন।'[২০৭] 'গদাধর পণ্ডিতকে বলা হতো লক্ষ্মী ও রাধার অবতার।' (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৫৩) তাঁর শিষ্যরা মিলে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, চৈতন্যবল্লভদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধক। গদাধর পণ্ডিতের গোষ্ঠী মধুর রসে সাধনা করতেন। গদাধরদাসও মধুর রসে গোপীভাবের উপাসক ছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৫৪, ১৫৫ চৈ. ভা. ৩/৫)। এই ভাব নিয়ে গদাধরদাস একটি গোষ্ঠী গেড়েছিলেন। তাঁর গোষ্ঠীর সদর ছিল কাটোয়ায়।

যদুনন্দন চক্রবর্তী গদাধরের প্রধান শিষ্য। কুলিয়ানিবাসী চৈতন্য পরিকর বংশীবদন চট্ট তাঁর পিতা দুকড়ি চট্টর ভজন প্রনালী অনুসারে বৈষ্ণব তান্ত্রিক রসরাজ উপাসনার গোষ্ঠী চালাতেন। বংশীবদনের পর এই গোষ্ঠী চালাতেন তাঁর ছেলে চৈতন্যদাস। মহাপ্রভুর অপ্রকটের এগার মাস পর গদাধর পণ্ডিত পুরীধামে জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় অপ্রকট হন। (বৈ অ ৩:১১৯৯-১২০১)[২০৮]

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ছয় গোস্বামী

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী–

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

–নরোত্তম ঠাকুরকৃত নাম সংকীর্তন

–(গৌর-পদতরঙ্গিণী পৃ. ৩৪০)[২০৯]

ছয় গোস্বামী হলেন–সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং রঘুনাথভট্ট গোস্বামী। এই ছয় গোস্বামীর চরণে বন্দনা করি, তাতে সকল বিপদ বিনাস হয়ে সকলের আশা পূর্ণ হয়।

ছয় গোস্বামীর ভিতর চারজনের উল্লেখ শ্রীরূপ ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' লিখবার সময় উল্লেখ করেছেন–

গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথ ভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা, প্রথম বিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ ॥ ১ ।৪ ।২১[২১০]

বিশ্বনাথ কবিরাজ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র টীকায় একমাত্র রঘুনাথদাসের উল্লেখ করেছেন, রঘুনাথভট্টের নাম করেননি।

মুরারি গুপ্তের কড়চায় গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীবের নাম লেখেননি। কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যে এবং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে', জয়ানন্দ ও লোচনদাসের ' চৈতন্যমঙ্গলে' রূপ ও সনাতন ছাড়া অন্য কোনো গোস্বামীর নাম নেই। অবশ্য কর্ণপুরের শুধুমাত্র 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে ছয় গোস্বামীর নাম আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে আছে–

শ্রীরূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সবার পাদপদ্মে করি নমস্কার॥[২১১]

ছয় গোস্বামী নিয়ে আলোচনার আগে রূপ-সনাতনের হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও গৌড় থেকে পলায়নের কাহিনী এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। দবীর খাস (সনাতন) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর সাকর মল্লিক (রূপ) ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী। মহাপ্রভু রূপ-সনাতন নামকরণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ে রামকেলিতে এসে গোপনে এই দু'জনকে দীক্ষা দিয়ে যান। এরপর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে রূপ গৌড় ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। সনাতনও পালাতে পারেন এই আশঙ্কায় হুসেন শাহ তাঁকে কারাগারে বন্দি করলেন। রূপ সনাতন দু'জনকে ছেড়ে রাজ্য চালনা দুঃসাধ্য তাঁর পক্ষে। সনাতন কারারক্ষককে দশসহস্র মুদ্রা ঘুষ দিয়ে পালিয়ে কাশী এসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রভু প্রেমাবেশে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।[২১২] সনাতন তাতে সংকোচবোধ করলে প্রভু বললেন–

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
[চৈ. চ. মধ্য : ২০ প.]

দু'মাস কাশীতে থেকে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল শিক্ষা দিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রভুদত্ত শিক্ষাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসদর্শনে রূপ দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাপ্রভু সনাতনকে নানাদিকে থেকে কৃষ্ণ-রাধা প্রেমলীলার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার মধ্যে নরলীলাকেই সর্বোত্তম বলেছেন।

কৃষ্ণের যতেক খেলা   সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর   নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ॥
[চৈ. চ. মধ্য : ২১ প.]

সনাতন গোস্বামী

ছয় গোস্বামীর অগ্রগণ্য গোস্বামী সনাতন। সনাতন, রূপ ও অনুপম এই তিন ভ্রাতা দক্ষিণাদেশীয় কর্ণাটকবাসী বৈদিক শাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ অনিরুদ্ধের বংশধর। এঁদের মধ্যে সনাতন জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তাঁর জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ আছে। সেই মতবিরোধের মধ্য থেকে সার সংগ্রহ করে মনে হয়েছে তাঁর জন্ম ১৪৮২ সালে এবং মৃত্যু ১৫৬৪ সালে। সন্ন্যাসের পঞ্চম বছরে (১৫১৪-১৫১৫ সালে) শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলি গ্রামে এলে সনাতন ও রূপ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দুজনেই তখন গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের মন্ত্রী।[২১৩]

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রূপ ও সনাতন উভয়েই সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। রূপ আগেই তাঁর পরিবার পরিজনদের ও অর্থাদি সরিয়ে ফেলেন এবং সনাতনের জন্য দশহাজার মুদ্রা কোনও এক মুদির কাছে গচ্ছিত রাখেন।

রূপ আগে চলে গেলে সনাতনও অসুস্থতার ভান করে রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করার সময় সনাতনকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইলে সনাতন রাজী হন নি। তখন হোসেন শাহ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে উড়িষ্যা অভিযান করেন। পরে কারারক্ষীকে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিয়ে সনাতন পলায়ন করেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে উপস্থিত হন কাশীতে। সনাতন কাশীতে দুমাস শ্রীচৈতন্যের কাছে ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝে নিয়ে তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তিনি চৈতন্যের নির্দেশ মতই কাজ করতে থাকেন–

ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।
কৃষভক্তি কৃষপ্রেম সেবা প্রবর্তন
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।[২১৪]

সনাতন রচিত গ্রন্থগুলোর নাম হল–১। বৃহদ্ভাগবতামৃত ২। হরিভক্তিবিলাস ৩। লীলাস্তব বা দশম চরিত (এটি পাওয়া যায় নি) ৪। বৈষ্ণব তোষণী।[২১৫]

এছাড়াও সনাতন গোস্বামী রচিত 'তাৎপর্যদীপিকা' নামে মেঘদূতের টীকাও পাওয়া গেছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থে এই বইয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সনাতন গৌড়ে থাকার সময় এটি রচনা করেছিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন। রূপ তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজের সৃজনী শক্তিকেও। ষড়গোস্বামীর মধ্যে রচনা প্রাচুর্যে ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে রূপই আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে তথা কৃষ্ণকথার নব-রূপায়ণে রূপ গোস্বামীর সৃষ্টির গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি শ্লোক থেকে–

বৃন্দাবনীয়ং রসকেলিবার্ত্তাং
কালের লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃসঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥[২১৬]

'ঈশ্বর যেমন বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে বিধাতার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃন্দাবনের হারিয়ে যাওয়া রাসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।'

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। সনাতনের আগেই রূপ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম সংসার ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় প্রয়াগে। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রয়াগে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। সেখানে তাঁরা একমাস থেকে আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড়ে অনুপমের মৃত্যু হয়। রূপ ও অনুপম গৌড় থেকে নীলাচলে যাত্রার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু অনুপমের মৃত্যু হওয়ায় রূপের কিছু বিলম্ব হল। রূপ এরপর নীলাচল থেকে ফিরে গৌড়ে গিয়ে নিজের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে আবার বৃন্দারণে ফিরে গেলে সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়। রূপ এরপর থেকে আমৃত্যু বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নি। সম্ভবতঃ ১৫৫৪ সালে সনাতনের তিরোভাবের দু' একবছর পর রূপ দেহত্যাগ করেন।[২১৭]

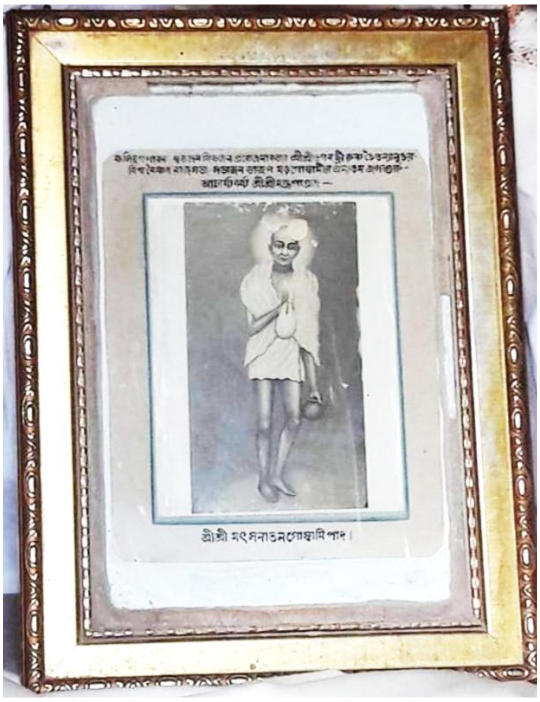

শ্রীরূপ গোস্বামী
চিত্রটির সংগ্রাহক : অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য

শ্রীরূপ গোস্বামীর বংশ তালিকা–

- সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু
  - অনিরুদ্ধ
    - রূপেশ্বর
      - পদ্মনাভ
        - পুরুষোত্তম
        - জগন্নাথ
        - নারায়ণ
        - মুরারি
        - মুকুন্দ
          - কুমার
            - সনাতন
            - রূপ
            - বল্লভ
              - জীব
    - হরিহর

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রাক্-উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ :

ধ. হংসসূত (২) উদ্ধবসন্দেশ (৩) বিগদ্ধ মাধব (৪) ললিত মাধব (৫) দানকেলিকৌমুদী (৬) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৭) উজ্জ্বলনীলমণি।

উত্তর-উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ :

(১) মথুরামহিমা (২) পদ্যাবলী (৩) নাটকচন্দ্রিকা (৪) সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত

(৫) কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি (৬) বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা (৭) লঘু গণোদ্দেশদীপিকা

(৮) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা প্রভৃতি।[২১৮]

শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র শ্রীরূপের সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করাতে জীবের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। তাঁর দুই পিতৃব্যের ভাবগুলোকেই তিনি কাব্যে, তত্ত্বে ও দর্শনে ব্যাখ্যা করেন।[২১৯]

জীবের পিতা ছিলেন রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ রামোপাসক বল্লভ। জীব ১৫০৮-১৫০৯ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের চরণ আশ্রয় করেন এবং তাঁদের কাছে ভক্তি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হয়েছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে শ্রীজীবই ছিলেন সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। কবিরাজ গোস্বামীর একতম গুরু। গৌড়দেশ থেকে আগত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দদাস ঠাকুরও তাঁর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। ভক্তিরত্নাকরের শেষে উদ্ধৃত জীবের চারখানি পত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তাঁরা যখন যে সমস্যায় পড়তেন, শ্রীজীব বৃন্দাবন থেকে তাঁর সমাধান করে পাঠাতেন। চৈতন্যধর্মের বর্তমান রূপ, প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই নির্মিত। জীবের বহুমুখী প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও স্মৃতিবিষয়ক নানা গ্রন্থে।[২২০]

শ্রীনিবাস আচার্যাদির সঙ্গে তিনি গোস্বামীগ্রন্থসমুদয় বঙ্গদেশে পাঠান। তাঁর রচিত ভক্তিগ্রন্থাদি হল—হরিনামামৃতব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, গোপাল-বিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব-মহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুত, গোপালচম্পূ (পূর্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ), গোপালতাপনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীবিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকাকর চরণচিহ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকা,

ভাগবতসন্দর্ভ বা ষটসন্দর্ভ (তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ), সর্বসম্বাদিনী (ষটসন্দর্ভের পরিপূরক পরিশিষ্ট)।[২২১] এগুলোর মধ্যে জীবের সুবৃহৎ কাব্য গোপালচম্পূ প্রধানতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে রচিত। এই কাব্যের পূর্বখণ্ডে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে মথুরা ও দ্বারকালীলা। পূর্বচম্পূতে এই কাব্যরচনা সম্পর্কে কবির নিজস্ব স্বীকারোক্তি হল, 'পূর্বে রচিত কৃষ্ণসন্দর্ভের কৃষ্ণতত্ত্বই এখানে কাব্যকারে পরিবেশন করা হয়েছে'।

গোপালভট্ট গোস্বামী (আদি ১, ১০; মধ্য ১৮)-ষড় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। পিতৃব্য পবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। পিতামাতা অপ্রকট হলে তাঁদের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ প্রণেতা, কবিরাজ গোস্বামীর ছয়জন শিক্ষাগুরুর মধ্যে ইনি একজন। ব্রজলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। (নাথ ৬:২৭২)

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপালভট্ট সম্পর্কে প্রায় কিছুই লিখে যান নি। এই গোপালভট্ট কে ছিলেন সে সম্পর্কেও সংশয় আছে। আমরা দুজন গোপাল ভট্টের নাম পাচ্ছি। একজন শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিমল্লের পুত্র (চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় এঁর গৃহে চারমাস অবস্থান করেছিলেন) আর একজন দাক্ষিণাত্যবাসী নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র।[২২২]

'হরিভক্তিবিলাস'-রচয়িতা প্রথম গোপাল ভট্টকেই এক্ষেত্রে ষড়গোস্বামীর অন্যতম ধরা হয়। ইনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলেছেন। কারো কারো মতে সনাতন সংক্ষিপ্তভাবে 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করে গোপাল ভট্টকে বিস্তৃত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এটিকে সনাতনের রচিত বলে মনে হয় না। কারণ গ্রন্থটিতে পুরীর রথযাত্রার উল্লেখ নেই, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্তির কথা থাকলেও রাধাকৃষ্ণের মূর্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু রাধার পূজার কথা বলা হয়েছে।

গোপালভট্টের নামে আরোপিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি India office Catalague-এর (Vol II p. 1470, No-3897-99)নামহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। রচয়িতা হিসেবে গোপাল ভট্টের নাম রয়েছে। এটি গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং চারটি অধ্যায়যুক্ত–(১) বসনচৌরকেলি (২) ভারখণ্ড (৩) পারখণ্ড ও (৪) দানখণ্ড। সংস্কৃত সাহিত্য

পরিষদ গ্রন্থাগারে ‘দানখণ্ড’ নামে একটি পুঁথি গোপাল ভট্ট আরোপিত দেখা যায় (পুঁথি নং ৪২৭)। এর নাম দানখণ্ড হলেও এতে বস্ত্রহরণ খণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ড নামে আরও তিনটি খণ্ড আছে।[২২৩]

রঘুনাথদাস গোস্বামী (আদি ১, ৫, ১০; মধ্য ১, ২, ১৬, ১৮’ অন্ত্য ৩, ৪, ৬, ৯, ১২ ১৪, ১৬, ১৭, ১৯)-হরিদাস ঠাকুর যখন চান্দপুরে ছিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বালক, পাঠশালায় পড়তেন। অবসর সময়ে তিনি বলরাম আচার্যের গৃহে গিয়ে হরিহাস ঠাকুরকে দর্শন করতেন। এই রঘুনাথ দাসই শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী–ষড়-গোস্বামীর অন্যতম–নামে খ্যাত হন। (নাথ ৫:১৩২)-ইনি পূর্বলীলায় রসমঞ্জরী, মতান্তরে রতিমঞ্জরী বা ভানুমতী। শ্রীযদুনন্দন আচার্যের শিষ্য। ষোলবছর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করে তাঁর অপ্রকটে শ্রীরাধাকুণ্ডে এসে নিয়মপূর্বক ভজন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ স্তবাবলী, দানকেলিচিন্তামণি, মুক্তাচরিতম্, প্রভুর প্রিয়ভক্ত (বৈ অ ৩:১৩২৫)।[২২৪]

শ্রীচৈতন্য যে নব ভাবরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাতে সমাজের উচ্চ কুলোদ্ভব, অভিজাত অথবা ধনী উচ্চবিত্তের প্রতি পক্ষপাত ছিল না, বরং সমাজে যারা পতিত, অবহেলিত ও অকিঞ্চন তাঁরাই ধন্য হয়েছিলেন তাঁর কৃপালাভে। তিনি কোনও দরিদ্র পতিতকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেন নি। বরং যারা উচ্চবিত্ত ও প্রতাপশালী তারা এসে মস্তক লুণ্ঠিত করেছে তাঁর শ্রীচরণে, ধন্য হয়েছে তাঁর কৃপাকটাক্ষলাভে। রঘুনাথদাসের মত ধনীর সন্তানও ‘ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী’, ত্যাগ করে তাঁর প্রেমধর্মের শরণ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুকঠোর সন্ন্যাসজীবনও যাপন করেছেন।

রঘুনাথদাসের আবির্ভাব ১৪৯৮ এবং তিরোভাব ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ভূস্বামী গোবর্ধন দাস তাঁর পিতা।[২২৫] বাল্যকালে রাজোচিত ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি লালিত পালিত হন। কৈশোর থেকেই একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করে পিতা অপ্রাপ্ত যৌবনেই একটি অতিসুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কৈশোর কালেই চৈতন্যদেব রামকেলি যাওয়ার পথে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করার সময় রঘুনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব তাঁকে বলেন, ভিতরে নিরাসক্ত থেকে বাইরে ঐশ্বর্যভোগ করতে। রঘুনাথ স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করে নিরাসক্তচিত্তে গৃহকর্ম করতে লাগলেন। এইসময় পানিহাটিতে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ভেতরে বৈরাগী ও বাইরে বিষয়ভোগী রঘুনাথকে নিত্যানন্দ ‘চোরা’ সম্বোধন করে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য চিড়াদধি মহোৎসবের ব্যবস্থা করতে বলেন। বৈষ্ণবসমাজে এই

'দণ্ডমহোৎসব' আজও প্রতিবছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পাণিহাটিতে পালন করা হয়। এরপর পাছে তিনি সংসার ত্যাগ করে যান–তাই তাঁকে কঠোর প্রহরার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি দুর্গম অরণ্যপথে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের কাছে উপস্থিত হন। রঘুনাথ জীবনাচরণে আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কঠোর বৈরাগ্যব্রত সবারই বিস্ময় উৎপাদন করে। পিতা তাঁর কাছে পাচক ব্রাহ্মণ, দাস ও অর্থ পাঠিয়ে দিলে তিনি দাস ও পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় করে দিয়ে অর্থটুকুই গ্রহণ করেন এবং সেই অর্থে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। অতঃপর পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে তিনি ভিক্ষা চাইতেন। পরিশেষে সব ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য ছাড়া, তিনি যে সুকঠোর তপশ্চর্যা শুরু করলেন–তা অভূতপূর্ব। মন্দিরের ফেলে দেওয়া পঁচা বাসী ভাত–দুর্গন্ধের জন্য যা গরুরাও খেতে পারত না–তিনি তাকেই ধুয়ে পরিষ্কার করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর তিনি বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে গিয়ে একা বাস করতেন এবং চৈতন্য প্রদত্ত গোবর্ধন শিলাতে কৃষ্ণপূজা করতেন। ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র অব্রাহ্মণ (কায়স্থ) হয়েও তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন–তাঁর সুকঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য।

রঘুনাথভট্ট গোস্বামী (আদি ১, ৫, ১০; মধ্য ১৭, ১৮, ২৫; অন্ত্য ১১, ২০)-ষড়গোস্বামীর অন্যতম। পিতা তপন মিশ্র মহাপ্রভুর আদেশে কাশীতে বাস করতেন। মহাপ্রভু কাশীতে গিয়ে তপন মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা করতেন। তখন রঘুনাথভট্টের সৌভাগ্য হয় প্রভুসেবার। প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে থাকার জন্য একবার নীলাচলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকমাস পর প্রভু আবার কাশীতে পিতামাতার সেবার জন্য পাঠান। পিতামাতার অপ্রকটের পর আবার নীলাচলে যান। তখন প্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠান এবং শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের চরণাশ্রয় করতে উপদেশ দেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর সভায় শ্রীভাগবত পাঠ করতেন। (নাথ ১:৪৩২)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' জীবনী কাব্যটি পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিকতা ও রসমাধুর্যে অদ্বিতীয় বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কাব্যটি তত্ত্বশাস্ত্রের আকর, তবে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। চৈতন্যের মর্ত্যলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব ইত্যাদি উচ্চ দার্শনিক সূক্ষ্মতায় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি এ কাব্যে

চৈতন্যদেবের প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করে চৈতন্যজীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মনন-নিষ্ঠ আকার দিয়ে বাঙালি-মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র হয়ে আছেন।[২২৬]

কৃষ্ণদাস আনুমানিক ১৫২৭ সালে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে আসেন এবং সেখানে তিনি রূপ, সনাতন প্রমুখ চৈতন্য অনুচরগণের সাক্ষাৎ পান।[২২৭] এখানেই তিনি বৈষ্ণব আচার্যগণের সহায়তায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি পাণ্ডিত্য ও রসবোধে সে আমলে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। বৃন্দাবন্দে বৈষ্ণব আচার্য ও গুরুদের অনুরোধে কবি সম্ভবত ১৬১৫ সালে বৃদ্ধাবস্থায় এ কাব্য রচনা করেছিলেন।[২২৮] এতে তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্বনে চৈতন্যজীবনী ঢেলে সাজাতে গিয়ে প্রামাণিকতাকে গুরুত্ব দেন নি। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা বর্ণনাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কবি প্রথম জীবনে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাবিষয়ক 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে আমলে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত গ্রন্থ। সর্বাপেক্ষা সুলিখিত গ্রন্থ হিসেবে জীবনী সাহিত্যে এ গ্রন্থের পরিচয়। ভাবুক বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে কাব্যটি ভক্তি সাধনার জীবনবেদ।

ভক্তকবির দৃষ্টি নিয়ে তিনি রাধা ও শ্রীচৈতন্যকে এক করে দেখেছেন :

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ভব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥[২২৯]

যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে কবি বক্তব্যের তীক্ষ্ণ, সংহত ও যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই জন্য তাঁর কাব্যে শৈল্পিক কলাকুশলতার অভাব ঘটেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কাব্যটির বহু অংশ কেবল দার্শনিক বিচারের আশ্রয়, সে কারণে তা প্রায় নিত্যপাঠ্য মন্ত্রের মহিমা লাভ করেছে। কবি কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষণের দ্বারা সঞ্জীবিত ছিল। তাঁর প্রাণ ছিল বৈষ্ণব-ভাব-বিশ্বাসে ভরপুর। তাই যুক্তিতথ্য, বিচার পাণ্ডিত্যকে ছাপিয়ে সেই বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তা বৈষ্ণব ভক্তজনের পক্ষে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্যের ভাব আস্বাদনের সহায়ক হিসেবে এ গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক। বৈষ্ণব সমাজে তা উপনিষদের মত মর্যাদা পেয়েছে। চৈতন্যজীবনের তথ্যাদির চেয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠা করা এ কাব্যের প্রধান লক্ষ্য বলে কাব্যটি এত সমাদৃত। বাঙালির মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও খুব সুলভ নয়। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্য লেখা।'[২৩০]

বল্লভ মিশ্র (শ্রীচৈতন্যের শ্বশুর)

বল্লভ মিশ্র সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুই বিয়ে, তাঁর প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভ মিশ্র নবদ্বীপবাসী হয়েছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর পিতা মাতাসহ, মাতৃস্বসৃপতি প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁর শ্বশুর বল্লভাচার্য্যেরও পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্টেই ছিল। ('স্বরূপ চরিত' নামক ময়মনসিংহের এক ঐতিহাসিক (কুলগ্রন্থ) পুঁথি থেকে এ বিষয়ে জানা যায়)। শ্রীহট্টবাসী মাণিক্য মিশ্র নামক জনৈক বৈদিক বিপ্রের বল্লভ নামে এক পুত্র হয়, এই বল্লভ অত্যন্ত সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণু ভক্তি পরায়ন ছিলেন, নবদ্বীপে তিনি অল্পকাল মাত্র অধ্যয়ন করে তীক্ষ্ণ প্রতিভা বলে কৃতিত্ব প্রকাশপূর্বক অধ্যাপক হতে 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপে গৃহাদি নির্মাণ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যান। এখানেই বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে চৈতন্য মহপ্রভুর বিয়ে হয়। বিয়ের প্রায় ১২ বছর পর চৈতন্য মহাপ্রভু পিতৃভূমি শ্রীহট্টে আগমন করেন। (এই আগমন বৃত্তান্ত চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে আছে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কোনো বর্ণনা দেওয়া নাই।) শ্রীহট্টেই তাঁর আগমনকালে দৈবক্রমে লক্ষ্মীনাথের সাথে দেখা হয়। তিনি পরম পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আকার প্রকার ও ভাব স্বভাব দর্শনে তাঁর বোধ হয় যে এই পরম সুন্দর যুবক মানুষ নয়—ইনি নরবেশী নারায়ণ।

> 'লক্ষ্মীনাথ বলে প্রভু দেখি যে লক্ষণ।
> তাহাতেই বোধ হয় তুমি নারায়ণ॥'
>
> -স্বরূপ চরিত

তিনি গৌরাঙ্গকে বল্লভ মিশ্রের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে মহাপ্রভু চারদিন অবস্থান করেন। চারদিন অবস্থানের পরে তিনি বাজিতপুরের পথে শ্রীহট্টের বুরুঙ্গাতে এসেছিলেন, এটাই তাঁর শ্রীহট্টে প্রথমাগমন। সন্ন্যাসের পর তিনি শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

মুরারি গুপ্ত

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী লেখক হিসেবে মুরারি গুপ্ত কৃতিত্বের অধিকারী। মুরারি গুপ্ত কেবল প্রথম চৈতন্য-জীবনী লেখকই নন, তিনি চৈতন্য জীবনী রচনার অবিতর্কিত আদর্শের প্রবর্তনকার। ড.

বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ সালের মধ্যে। মুরারি গুপ্ত বাংলাদেশের সিলেটের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থটি সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই বা তিরোধানের পরে লিখেছিলেন।'[২৩১] মুরারি গুপ্ত যখন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন তখন মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যের প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি বিদ্যমান। 'মুরারি কৈশোরে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন এবং বালক সুলভ চাপল্যে গৌরাঙ্গ তাঁকে কেমন অপদস্থ করতেন বৃন্দাবনদাস সেই ছবি এঁকেছেন।' এই মন্তব্যে বোঝা যায় কৈশোর থেকেই মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপে বসবাস করতেন। পরবর্তী জীবনে মুরারি চৈতন্যের পরম ভক্ত হন। ভক্তিতত্ত্বে কিছুটা প্রাবল্য দেখিয়ে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের ওপরে স্থান দিয়ে গৌরপারম্যবাদ প্রচার করেন। মুরারি গুপ্তের লিখা *'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'* মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন বলে অধিকাংশ ঘটনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি মুরারি গুপ্ত চৈতন্য জীবনীর প্রথম দিকের সন্ন্যাস জীবন পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্য ও শেষ লীলা অন্যের রচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে এ বিষয়ে লিখেছেন–

'আদি লীলা মধ্য যত প্রভুর চরিত্র
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।'[২৩২]

মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পার্ষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মুকুন্দ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপ হতেই তিনি মহপ্রভুর সঙ্গী। মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সাথে পুরী চলে যান।

'শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী।'[২৩৩]

চট্টগ্রামের চক্রশালায় জন্ম নেওয়া মুকুন্দ দত্ত ছিলেন বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের দিনে মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে বললেন, 'মুকুন্দ খড়জাটিয়া। কখনো দন্তে তৃণ, কখনো হাতে জাঠা। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কখনো বলে জ্ঞান বড়, কখনো বলে ভক্তি বড়। মুকুন্দকে দর্শন দিব না। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন কখনো কি দর্শন পাবো না? মহাপ্রভু বললেন, কোটি জন্মের পর পাবে। মুকুন্দ নেচে উঠলেন 'পাবো তো; কোটি জন্মেও তো পাবো। মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন দিলেন।[২৩৪] এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, মহাপ্রভু প্রায়ই রসিকতা করে কথা বলতেন।

মহাপ্রভুর গৃহস্থাশ্রমে বাস করতেন শ্রীবাসুদেব দত্ত। দুই ভাই-ই মহাপ্রভুর শাখা। এছাড়া সেই সময় বাসুসেব দত্ত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস জননী নারায়ণী দেবীসহ মহাপ্রভুর আশ্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, "সমস্ত জগতের পাপভার আমাকে দাও, আমি নরকে বাস করি, জীবকে তুমি মুক্তি দাও। মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'তুমি প্রহ্লাদ, তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু ভগবান তোমাকে কেন কষ্ট দিবেন? তুমি যাদের মঙ্গল কামনা কর, তারা অবশ্যই মুক্ত হবে।'[২৩৫] মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত কতবছর বয়সে মহাপ্রভুর সংস্পর্শে গিয়েছিলেন সেটি সঠিক কোথাও পাওয়া যায়নি। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সাক্ষাৎ পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্তের দুটি প্রাচীন কুটীর আজও চট্টগ্রামে কালের সাক্ষী হয়ে আছে জরাজীর্ণ অবস্থায়। তবে এখনোও নিয়মিত কীর্তন হয় এবং কুটীরদ্বয়কে ঘিরে সবাই কীর্তনানন্দে মুগ্ধ হয়ে যান।

বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের জন্মভিটায় শেষ নিদর্শন দোল মন্দির ও শিব মন্দির
চিত্র ধারণ করেছি ২০১৮ সালের জুন মাসে
স্থান : ছনহরা ইউনিয়ন, পটিয়া, চট্টগ্রাম

এর ঠিক পাশেই রয়েছে শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব ভূমি মেখল গ্রাম। এই গ্রামেই ১৪০৭ সালে শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক আবির্ভূত হন। 'মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'বাপ' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ব্রজলীলায় শ্রীপুণ্ডরীকই ছিলেন বৃষভানুরাজ।'[২৩৬] চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল গ্রামে শ্রীশ্রী পুণ্ডরীকের বাড়িতে মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, জগৎচন্দ্র গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, লোচনদাসকে নিয়ে মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত কৃষ্ণ ভজনে প্রমহ হতেন। সেই সুবাদে বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের কুটিরেও আসতেন মহাপ্রভুর এই পার্ষদেরা এবং কীর্তনানন্দে মেতে উঠতেন সবাই।[২৩৭]

শ্রীশ্রী পুন্ডরীক ধাম, মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
চিত্র : ২০১৭ সালের ৭ জুন

ভক্ত হরিদাস (জন্ম? মৃত্যু : ১৫২১)

খুলনা জেলার বুঢ়ণ গ্রামে ভক্ত হরিদাস জন্ম গ্রহন করেন। 'জয়ানন্দ বলেছেন, হরিদাসের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতা মনোহর। মতান্তরে হরিদাসের মাতার নাম গৌরী দেবী, পিতার নাম সুমতি শর্মণা। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন, 'মনোহর চক্রবর্তী সুব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কলাকাছি গ্রামে এখনও লোকে মনোহরের ভিটা দেখিয়ে দেয়। আমরা সে গ্রামে গিয়ে ভিটা দেখেছি। চক্রবর্তী বংশীয়েরা ১৭/১৮ পুরুষ কলাকাছিতে বাস করছেন।'[২৩৮] এখানে গ্রামের নামও বিতর্কীত। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুমান করেন হরিদাসের জন্মের দুই তিন বৎসর পরে মনোহর স্বর্গারোহণ করলে উজ্জ্বলা দেবী পতির চিতায় সহমৃতা হন। এই সময় পিরালীদের অত্যাচারে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সেই অবস্থায় পাশ্চবর্তী গ্রামে হকিমপুরের হবিবুল্লা নিজ গৃহে হরিদাসকে নিয়ে লালন পালন করেন। অনেকে মনে করেন পিতা মাতার দেওয়া নাম হরিদাস আবার অনেকে মনে করেন হরিনামে অভূতপূর্ব নিষ্ঠার জন্য তার নাম হরিদাস।

'প্রথম যৌবনেই হরিদাস হবিবুল্লার গৃহ ত্যাগ করে যশোর জেলার বেনাপোল গ্রামের বনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করতেন। প্রাতঃস্নান, তুলসী সেবা ও নাম জপ, নামকীর্তন এসবই ছিল ভজন। মাসে এককোটি নাম করবেন, এটা ছিল তাঁর ব্রত।'[২৩৯] পাশের গ্রামেই রামচন্দ্র খাঁ নামে এক জমিদার বাস করতেন, হরিদাসের নিষ্ঠা ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠা তাঁকে অসহিষ্ণু করে তোলে। সেই কারণেই হরিদাস বেনাপোল থেকে গৌড় রাজধানী, সেখানে থেকে ফুলিয়া সপ্তগ্রাম হয়ে শান্তিপুর চলে যান। 'প্রেমোদ্দাম, অক্রোশ, পরমানন্দ নিত্যানন্দের করুণার সঙ্গে সর্বংসহা ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা জেতা হরিদাসের সুদিব্য দৃঢ় ভক্তির এবং অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠার শুভ সম্মেলনে যে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের উদ্ভব ঘটেছিল তাতে অবগাহনের সুযোগ না পেলে, দুরাচার দুর্দ্ধর্ষ জগাই-মাধাই 'সাধুরে স মন্তব্যঃ' গীতার এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্তস্থলে পরিগণিত হতেন না, এ-কথা সত্য। উপযুক্ত পাত্র বলেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই দুই জনকেই নাম-প্রেম প্রচারের আদেশ দান করেছিলেন।'[২৪০]

এরপরে হরিদাস জগন্নাথক্ষেত্রে (পুরী) আসলেন। মহাপ্রভু বার বার তাকে আহ্লাদ করলেন, কিন্তু হরিদাস কিছুতেই ভক্তগোষ্ঠীতে প্রবেশ করবেন না। অবশেষে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ধরণীর ধূলি হতে তাঁকে বক্ষে তুলে নিলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্যের সাথেই নীলাচল এসেছিলেন। মহাপ্রভুর দ্বাদশ বছর পূর্বেই ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রাখলেন। হরিদাস চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, বিভিন্ন অত্যাচারের হাত থেকে হরিদাসকে রক্ষার জন্যই মহাপ্রভু দ্রুত মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বৃন্দাবনদাস লিখেছেন–

'যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শ্রীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারো সহিতে'॥
(চৈ.ভা.মধ্য : ১০ অধ্যায়)[২৪১]

হরিদাসের নির্বাণের পর তাঁর দেহ কোলে নিয়ে প্রেমাবিষ্টাভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য কীর্তন করলেন। বিমানে (দোলা বিশেষ) চড়িয়ে কীর্তন সহকারে সমুদ্রে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রজলে তাঁকে স্নান করিয়ে বালুকার গর্ত করে নিজে তাঁকে সযত্নে শুইয়ে বালিচাপা দিলেন। হরিদাসের মহোৎসবের ভিক্ষাতেও নিজে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু। মহোৎসব ভোজনে নিজ হাতে অন্ন পরিবেশন করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসের মৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩১-১৫৮৭)

নরোত্তম ঠাকুর রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনের নবরূপ প্রবর্তন করেন। কীর্তনের এই নবরূপের নাম গড়ানহাটী। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার খেতুরীতে (প্রেমতলী) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও মাতার নাম নারায়ণী দত্ত। কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল খেতুরী, তিনি রাজা বলেই পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নরোত্তমের বয়স যখন প্রায় বিংশতি তখন তার বাবা রাজ কার্যোপলক্ষে গৌড় দরবারে গেলে এই সুযোগে নরোত্তম গৃহত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে চলে যান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর যত্নে নরোত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এর পরে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর ভাব শিষ্য শ্রীলোকনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। লোকনাথ গোস্বামী এসময় বৃন্দাবনে বাস করতেন, আদিনিবাস যশোর জেলায় তালখড়ি গ্রামে। বাবার নাম পদ্মনাভ ও মায়ের নাম সীতাদেবী। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন শুনে তিনি দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন। দক্ষিণে গিয়ে শুনলেন মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরেছেন এবং সেখান থেকে বৃন্দাবনে এসেছেন। লোকনাথ গোস্বামী ব্রজধামে ফিরলেন। শুনলেন তিনি কয়েকদিন পূর্বে বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে গিয়েছেন। লোকনাথ গোস্বামী প্রয়াগ গমনে উদ্যত হলে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে সংকল্প ত্যাগ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাথে লোকনাথ গোস্বামী আর সাক্ষাৎ হয় নি। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনে কাউকেই দীক্ষাদান করবেন না। কিন্তু নরোত্তম সংকল্প করলেন লোকনাথের কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করবেন। নরোত্তমের দৈন্যে আকৃষ্ট হয়ে লোকনাথ গোস্বামী কৃপা পূর্বক তাকে দীক্ষা দান করেছিলেন।'[২৪২] দীক্ষা লাভ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আজন্ম সঙ্গীতানুরাগী নরোত্তম সঙ্গীতশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের অদ্বিতীয়

গীতপারঙ্গম সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস স্বামীর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন। মুলতানের অন্তর্গত উছা গ্রামে হরিদাসের জন্মভূমি। নাদবিদ্যায় সিদ্ধিলাভে জীবনে তার বৈরাগ্যের উদয় হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে শুভাগমন করলে তিনিও বৃন্দাবনে বসবাস শুরু করেন। সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভাগায়ক তানসেন হরিদাস স্বামীর অন্যতম ছাত্র। দ্বিতীয় ছাত্র নরোত্তম ঠাকুর। তানসেন ধ্রুপদের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যজন নরোত্তম ঠাকুর বাঙালার কীর্তনে বিজ্ঞানসম্মত প্রনালীতে রূপান্তর এনেছেন। কৃষ্ণানন্দের অগ্রজের নাম পুরুষোত্তম দত্ত। পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম সন্তোষ। নরোত্তম খেতুরীতে এসে সন্তোষের হাতে রাজ্যভার অপর্ণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর (১৫৮২-মতান্তরে ১৫৮৩ বা ৮৪ সালে) জন্মতিথি ফাল্গুন পৌর্ণমাসীতে নরোত্তম খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রোজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত এই ছয়টি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই উপলক্ষে খেতুরীতে বাঙালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় আচর্যগণ, বৈষ্ণব সম্পদায়ের জ্ঞানী গুণী গায়ক, বাদকসহ বহু ব্যক্তি এই মহোৎসবে উপস্থিত হন। এই উৎসবেই নরোত্তম কীর্তনের যে ধারার গান করেছিলেন সেই ধারার নাম গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী ধারা। প্রথমে তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা করে পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস গানের পদ্ধতি খেতুরীর মহোৎসবেই প্রবর্তিত হয়।

'তুয়া প্রিয় পদ সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
করি কিবা কার্য নহে সিদ্ধি॥'[২৪৩]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নরোত্তম ঠাকুর উপরের পদাবলিতে শ্রীচরণসেবা প্রার্থনা করেছেন। পদাকর্তা কাতরে বলছেন, হে করুণাসিন্ধু প্রভু, আমার তোমার কাছে এক দুর্লভ ধন আছে। আমি তোমার পদতলে পড়ে সেই ধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি। এই ধন হলো তোমার পদকমলের সেবা করার অধিকার। এটি আমাকে দাও। আমাকে কৃপা কর। আমি প্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিলাম–

'হে শ্রীগুরুদেব! করি এই নিবেদন।
চৈতন্যচরণে সদা থাক মোর মন॥'[২৪৪]

খেতুরী ধাম

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রের মন্দির দুটি নরোত্তমদাস ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ চিত্রের নরোত্তম দাস ঠাকুর যে পাথরে বসতেন, পঞ্চম চিত্রে নরোত্তমদাস ঠাকুর যে ছয়টি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
চিত্র ধারণ করেছি ৭.১৪.২০২০ তারিখে।

ষোল শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু করে আঠার শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় দেড়শো বছর ধরে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখার যে বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর সহচরগণের জীবনদর্শন অবলম্বনে যে জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার তথ্য, দর্শনতত্ত্ব ও কাব্যগুণে ছিল সমৃদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের জীবনদর্শন থেকেই জীবনচরিত শাখার সূত্রপাত হয়ে প্রমাণ করেছে যে ধর্মশাস্ত্র থেকে মানুষ মহত্তর মানবলীলার সৌন্দর্য পায় বলেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠে। শ্রীচৈতন্যের জীবনদর্শন প্রভাব ফেলেছে নরোত্তম ঠাকুরের সমস্ত মানবসত্তায়। তাঁর মতে 'Caitanya was the source of inspiration for vaisanava kavy and sangita. His influence and contribution in this sphere were great. (Sastriya sangita of Bengal through the ages.)[২৪৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আদি কীর্তনীয়া

চৈতন্যদেবের ধারায় আদি কীর্তনীয়া চৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি ছিলেন কাব্য ও সঙ্গীতপ্রিয় এবং নৃত্য ও গীতকুশলী। নৃত্য, গীত, বাদ্য তিন মিলেই নামকীর্তন। কীর্তনগান ভক্তিধর্মের প্রাণপ্রবাহ স্বরূপ। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে অনেক গায়ক, বাদক নর্তক ও কবি ছিলেন। সর্বপ্রধান চৈতন্য পরিকর দুইজন অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ। দুইজনেই নাচ ও গানে পারঙ্গম।[২৪৬] তবে গায়ক হিসেবে প্রথমেই নাম করতে হয় নবদ্বীপ পর্বের মুকুন্দ দত্ত ও নীলাচলপর্বের স্বরূপ দামোদরের। তারপর তিনভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব গোষ্ঠীর গায়ক। তিনি খুব বড় গায়েন ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। চৈতন্য গোষ্ঠীর সবাই তাঁর গানে মুগ্ধ হতো, 'মুকুন্দের গানে দ্রব সকল মহান্ত' (চৈ.ভা. ১/৭)।[২৪৭] চৈতন্যদেবের ভাব মুকুন্দ ঠিক বুঝতে পারতেন এবং সেই মতো গান করতেন। 'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে' (চৈ. চ. ২/৩)।[২৪৮] স্বরূপ দামোদরও কম নন। তিনি বলতেন 'প্রভুর অন্তর মর্ম রসের সাগর' (চৈ. চ. ২/১০)।[২৪৯] স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দর সঙ্গে মিলে চৈতন্যদেব একান্তে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী গান করতেন। পদাবলী গানের মতো সম্মেলক সংকীর্তনেও মুকুন্দ দত্ত ও স্বরূপ দামোদর ছিলেন স্বচ্ছন্দাচারী। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষও চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় গায়েন।

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।

তিন ভাইর কীর্ত্তন প্রভু পায়েন সন্তোষ॥

(চৈ.চ ২/১১)[২৫০]

চৈতন্যদেবের অন্য পার্ষদদের মধ্যে গায়ক হিসেবে নাম ছিল শ্রীবাস ও তাঁর ছোট ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত ও তাঁর ছোট ভাই বাসুদেব দত্ত এবং ছোট হরিদাসের। নীলাচলের রথাগ্রে কীর্তনে চৈতন্যদেবের নিজস্ব চার দলের মূল গায়েন ছিলেন মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস ও গোবিন্দ ঘোষ। শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত খুব ভাল গায়ক ছিলেন। তাঁর গানে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হতেন (চৈতন্য চরিতামৃতম ১৪/২৬)।[২৫১] চৈতন্যদেব বাসুদেব দত্তর গানেরও সমাদর করতেন (চৈ. চ. ২/১৪)।[২৫২] এছাড়া ভাল কীর্তন করতেন হরিদাস ঠাকুর, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, জগদীশ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বিষ্ণুদাস, শ্রীকান্ত সেন, শুভানন্দ ও গঙ্গাদাস। নাচে পটু ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্যর দুই ছেলে অচ্যুতানন্দ ও গোপাল, নরহরি সরকার ও তাঁর ভাইপো রঘুনন্দন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' জগদীশ পণ্ডিতকে বলা হয়েছে 'নৃত্যবিনোদী' (শ্লোক ১৪৩)।[২৫৩]

নিত্যানন্দ নেচে গেয়ে প্রচার করতেন। তাঁর দলে বেশ কয়েকজন গায়েন ও বায়েন যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভ্রাত গোবিন্দ ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই ছাড়া ছিলেন মীনকেতন রামদাস ও রাঘব পণ্ডিত। ঘোষরা তিনভাই গান ধরলে নিত্যানন্দ সেই সঙ্গে নাচতেন–

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিনভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥

(চৈ. ভা. ৩/৫)[২৫৪]

তিন জনের মধ্যে মেজভাই মাধবের যশ ছিল সবচেয়ে বেশি। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর পরম অনুরাগী। বৃন্দাবনদাস মাধবের প্রশংসা করে বলতেন–

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
তেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়েন।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥[২৫৫] (তদেব)

নিত্যানন্দর প্রচার পর্যটনের সময় খড়দহে গদাধরদাসের বাড়িতে মাধব ঘোষ দানখণ্ড কীর্তন করেছিলেন। সে গান হয়েছিল অপূর্ব–

ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি॥[২৫৬] (তদেব)

নিত্যানন্দর তিরোধানের পরেও কীর্তনে তাঁর গোষ্ঠীর খ্যাতি কিছুটা বজায় ছিল। খড়দহে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর সদরে ছিলেন গায়ক মীনকেতন রামদাস আর নৃত্যকুশল নৃসিংহ চৈতন্য। নিত্যানন্দর পুত্র বীরভদ্র নাচ গানে পারদর্শী ছিলেন।[২৫৭]

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ এবং তাঁর ভাই নরহরি ও ছেলে রঘুনন্দন তিনজনেই চৈতন্য পরিকর। এই তিনজন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা নৃত্যগীতবাদ্যকুশল ছিলেন। কীর্তনকুশলতার জন্য রঘুনন্দন ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুর নিবন্ধগীত শুরু করার উপক্রম করলে রঘুনন্দন খোল ও করতালে মালা ও চন্দন স্পর্শ করিয়ে নরোত্তম ও তাঁর চার সহযোগীকে মালা, চন্দন পরিয়ে দেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব স্বয়ং এভাবে কীর্তনীয়াদের বরণ করতেন। খেতুরী মহোৎসবের পর জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন ঘুরে খড়দহ ফেরার পথে শ্রীখণ্ডে আসলে রঘুনন্দন তাঁর প্রীতির জন্য ভুবনমঙ্গল কীর্তন করে সমবেত বৈষ্ণবদের মুগ্ধ করেছিলেন। 'যৈছে গীতবাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন'। নিরুপম গীতবাদ্য নৃত্যে শ্রোতারা আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন (ন. বি. ৯ বিলাস)।[২৫৮] রঘুনন্দনের পর শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের ধারায় উল্লেখযোগ্য তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ও কানাইয়ের ছেলে মদন ঠাকুর। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে (১৩/১৮৯) আছে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের স্মরণ মহোৎসবে 'তেঁহো (কানাই) সংকীর্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন'। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশ পুরুষানুক্রমিক কীর্তন চর্চার জন্য বিখ্যাত। তাঁদের ঘরানা স্বতন্ত্র।[২৫৯]

কীর্তন পরিবেশনের আদিরূপে অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য ও তাঁর দল

গোস্বামীশাস্ত্র শিখিয়ে যে তিনজনকে জীব গোস্বামী প্রচারের জন্য বাঙলায় ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নরোত্তমের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্য ভক্তিশাস্ত্র পড়াতেন। কীর্তনে তাঁর নাম খুব পাওয়া যায় না। খেতুরী মহোৎসবে তিনি নেচেছিলেন বলে জানা যায়। তবে নাচে বোধ হয় তাঁর খুব একটা পটুতা ছিল না। গানের সঙ্গে খানিকটা নাচার পর শ্রীনিবাস 'নাচিতে না পারে হইল বাউলের পারা' (প্র.বি. ১৪ বিলাস)।[২৬০] সংকীর্তনে খুব বড় ছিলেন শ্যামানন্দ। সংকীর্তন দ্বারা সাধারণে প্রেমভক্তি প্রচারে তাঁর উৎসাহ ছিল নিত্যানন্দের তুল্য। কীর্তনের দলবলসহ শ্যামানন্দ ঘুরে বেড়াতেন। নিত্যানন্দ প্রচার করেছিলেন ভাগীরথী অঞ্চলে। শ্যামানন্দর প্রচারক্ষেত্র বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সংযোগস্থলে মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলায়।[২৬১] নিত্যানন্দর মতো তিনিও মহাসমারোহে নেচে গেয়ে নাম সংকীর্তন করে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মহোৎসব করতেন।[২৬২] কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্যামানন্দপ্রকাশ', 'প্রেমবিলাস' (১৯ বিলাস) ও 'ভক্তিরত্নাকর' (১৫ তরঙ্গ) গ্রন্থে শ্যামানন্দর কীর্তন ও মহোৎসব করে প্রচারের বিবরণ আছে।

শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাই যেই পথে যায়
প্রেমে মত্ত হঞা লোক হরি বলি ধায়॥ (শ্যা. প্র. ৫-৫)[২৬৩]
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে মহামত্ত বঙ্গে।
হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে॥
গ্রামের সব লোক শুনি উৎকণ্ঠে ধাইল।
কিবা মহাপ্রভু আসি পুন জাত হৈল॥ (শ্যা. প্র. ১৪/৫-৬)[২৬৪]

শ্যামানন্দর প্রধান শিষ্য রসিকমুরারি বা রসিকানন্দ। ইনিও গুরুর মতই সংকীর্তনপ্রৌঢ়।

শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে॥ (ভ. র. ১৫/৮৬)[২৬৫]

চৈতন্যপন্থী সকল গোষ্ঠীতেই গান বাজনা ও নাচের চলন ছিল। খেতুরী মহোৎসবে সশিষ্য নরোত্তম ছাড়া আরও অনেকে গান করেছিলেন।

নানা দেশী গায়ক গায়েন নানা গীত।
নদীয়া বিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত॥

চতুর্দিকে নানা বাদ্য বায়েন বাদক।
নানা দেশ রীতে নাচে যতেক নর্তক॥
কহিতে কি জানি সুখ সিন্ধু উথলয়ে।
যে জানে যে বিদ্যা তা কৌতুকে প্রকাশয়ে॥

(ভ. র. ১০/৬৭১-৭৩)[২৬৬]

খেতুরী উৎসবের বর্ণনায় নরোত্তমদাসের দল ছাড়াও কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর ও নর্তক গোপালের নাম জানা যায়।[২৬৭] খেতুরী মহোৎসবের পর হতে নরোত্তমদাসের প্রেরণায় রীতিমতো প্রণালীবদ্ধ কীর্তনচর্চার শুরু হয়। উৎসবের উদ্যোক্তা গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন গীত ও বাদ্যনিপুণ (ভ.র. ১৪/১৫, ১২১-৩৩)।[২৬৮] মহোৎসবের পর খেতুরীতে প্রতিবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহোৎসব হত। দ্বিতীয় বারের মহোৎসবেও অনেক মহান্ত এসেছিলেন এবং কীর্তনের সমারোহ হয়। এবার নরোত্তমদাসের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন দেবীদাস ও মাধব আচার্য। করতালবাদক ছিলেন গৌরাঙ্গদাস ও গোবিন্দদাস। গান করেছিলেন গোকুলদাস, গোবিন্দদাস এবং নরোত্তমের খুড়তুত ভাই, শিষ্য ও পোষ্টা সন্তোষ দত্ত। অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম এবং রামচন্দ্রদাস নাচ ও গান করেছিলেন।[২৬৯]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের খুব প্রসার হয়েছিল। গড়ানহাটী ঢঙের পর মনোহরশাহী, মন্দারিণী, রেণেটি ও ঝাড়খণ্ডী ঢঙের উদ্ভব ও বিকাশ এর প্রমাণ। মনোহরশাহীর জন্মসূত্রে শোনা যায় কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের নাম। মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়নাডালের কীর্তনিয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ঝাড়খণ্ডী ঢঙের প্রবর্তক গোকুলানন্দ সপ্তদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কীর্তনীয়া। অষ্টাদশ শতকের বড় কীর্তনীয়া হিসেবে রেণেটি ঢঙের উদ্ভাবক বিপ্রদাস ঘোষ এবং এই ঢঙের গায়ক বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের নাম করতে হয়। ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক রূপচাঁদ চাটুর্জ্যেও অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত গায়ক।[২৭০]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত কীর্তনীয়া

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হতে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত যেসব খ্যাতনামা কীর্তনীয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের বেশ কয়েকজনের পরিচয় ও কীর্তির বিবরণ সাহিত্যেরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।[২৭১] এছাড়া গুরু পরম্পরা ও ড. মৃগাঙ্কা শেখরের 'বাংলায় কীর্তন গান' বই-এ কিছু কীর্তনীয়ার পরিচয় রয়েছে। এই পুস্তকগুলোতে সব বাংলা সাল হিসাব করা হয়েছে। সেখান থেকেই সংক্ষিপ্তভাবে বাংলার কিছু খ্যাতনামা কীর্তনীয়ার জীবনী লিখেছি এই পরিচ্ছেদে–

ময়নাডাল

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সেবক মঙ্গল ঠাকুর। মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র। প্রথম রাধিকাপ্রসাদ, দ্বিতীয় গোপীরমণ, তৃতীয় শ্যামকিশোর। তিন পুত্রের বংশধরগণ বড় বাড়ির ঠাকুর, মধ্যম বাড়ির ঠাকুর ও ছোট বাড়ির ঠাকুর নামে পরিচিত। বড় বাড়িতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র যুগল-বিগ্রহ, মধ্যম বাড়িতে শ্রীরাধাকান্ত যুগল-বিগ্রহ ও ছোট বাড়িতে মঙ্গল ঠাকুরের কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহ দেব শালগ্রাম, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপাদত্ত শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রবাদ আছে, নৃসিংহের মাতার মৃতবৎসা দোষ ছিল। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে গিয়ে মঙ্গল ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। ঠাকুরের নিকট পুত্র কামনা করলে ঠাকুর চর্বিত তাম্বুল দিয়ে বলেন–এবার তুমি পুত্রসন্তান লাভ করবে এবং সেই পুত্র দীর্ঘজীবী হবে। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পুত্র প্রাপ্ত হন, এই পুত্রই নৃসিংহ। পরবর্তী সময়ে মঙ্গল ঠাকুর নৃসিংহকে দীক্ষা দান করলেন।

ময়নাডালে শ্রীমহাপ্রভু মন্দির
চিত্রগ্রাহক কীর্তনীয়া শ্রী নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর মহাশয়, ১৭ জুলাই, ২০২০

নৃসিংহের একমাত্র পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র, রাজবল্লভ, আনন্দবল্লভ ও ভুবনবল্লভ। ময়নাডালে তিন পুত্রেরই বংশধর বর্তমান আছেন। এই বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ও মৃদঙ্গবাদক আবির্ভূত হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। ময়নাডালে কীর্তনের চতুষ্পাঠীতে ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভপূর্বক বহু ব্যক্তি মৃদঙ্গবাদনে ও কীর্তনগানে খ্যাতিলাভ করেন। পায়র গ্রামের স্বনামধন্য মৃদঙ্গবাদক জটে কুঞ্জদাসের ছাত্র ইলামবাজার-নিবাসী নিকুঞ্জ বাইতি ও ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর সমসাময়িক মৃদঙ্গবাদক। উভয়েই মৃদঙ্গবাদ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতির নাম আজও কীর্তনগায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন। কিশোরী মিত্র ঠাকুর, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর ময়নাডালের মুখ রক্ষা করে গিয়েছেন।

১২৭৫ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর তাঁর কীর্তন শিক্ষার আদি গুরু। কিছুদিন বহরমপুরে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বাড়িতে থেকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসী মহারাজের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কয়েকবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়েও পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করে আসেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ কীর্তনগায়কগণের মধ্যে রাসবিহারীকে অন্যতমরূপে গণনা করা হতো। ১৩৫৪ সালের ৬ই ফাল্গুন ইনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন। পুত্র শ্রীনবগোপাল মিত্র ঠাকুর গীতিসুধাকর ও শ্রীগোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর সুধাকণ্ঠ কোলকাতায় থেকে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক ময়নাডালের ধারা রক্ষা করেছেন। ময়নাডালের অন্য দুইজন সুগায়কের নাম শ্রীনদীয়ানন্দ ও শ্রীমাণিক মিত্র ঠাকুর।[২৭২]

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু

শ্রীনিত্যানন্দের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকার–শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে দারপরিগ্রহ। সম্প্রদায় রক্ষার জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হয়েছিলেন। সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা-বসুধা ও জাহ্নবী। নিত্যানন্দ এই দুইজনকেই বিয়ে করেন। জাহ্নবী দেবীর সন্তান হয় নাই। বসুধার পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু। বসুধার একটি কন্যাও হয়েছিল, নাম গঙ্গাদেবী। শ্রীবীরচন্দ্র জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজের সর্বজনমান্য নেতা শ্রীবীরচন্দ্র। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করতেন। পিতার মতো বীরচন্দ্রও বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি এই প্রেমোদ্দাম আচার্য সারা বাংলায় এবং বাংলার বাইরে অকুণ্ঠ কণ্ঠে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমমন্ত্র প্রচার করেছেন।

মাধব আচার্যের সঙ্গে গঙ্গাদেবীর বিয়ে হয়। বীরচন্দ্র প্রভুর দুই পত্নী শ্রীমতি ও নারায়ণী। বীরচন্দ্রের তিন পুত্র–গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। কন্যার নাম ভুবনমোহিনী। নামসংকীর্তন ও লীলাকীর্তন-প্রচারে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অক্লান্ত প্রয়াস বৈষ্ণব ইতিহাসের বিষয়ীভূত হয়ে আছে। লীলাকীর্তনে তাঁর আবেগের কথা শ্রীনরোত্তমবিলাসে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। নরোত্তম লীলাকীর্তন আরম্ভ করেছেন–

'চারিদিকে বৈষ্ণবমণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভায় সুন্দর।'

কথিত আছে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু 'বারশত ন্যাড়া ও তেরশত নেড়ী' নামে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী একটি বৃহত্তর দলকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেছিলেন। এর বাইরে গৌর-নিতাই এর উপাসনা করে, কিন্তু নিজেদের পূর্ব প্রথা রমণীসাধনা আজও পরিত্যাগ করে নাই, এমন লোকদেরও শ্রী বীরচন্দ্র প্রভু গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ এই সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত হয়েছে।

শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দের জন্ম মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। তাঁদের অনেক পুত্র ও কন্যা জন্মের পরই মরে যায়। তাই শ্যামানন্দের পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন দুঃখী। এই দুঃখীই শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরে দণ্ডেশ্বরে এসে বাস করেন। পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে দুঃখী কালনায় আসেন এবং হৃদয়ানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক শ্রীগৌর-শ্রীনিত্যানন্দের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়ানন্দ তাঁর নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণদাস। কিছু দিন পরে হৃদয়ানন্দের সম্মতিক্রমে শ্রীজীবের কাছে শিক্ষালাভার্থ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন গিয়ে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনেই তিনি আচার্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে সৌহৃদ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

শিক্ষা শেষ করে শ্যামানন্দ কালনায় ফিরলেন। বৈষ্ণবগণের বহু শাখা-প্রতিশাখায় তিলকচিহ্নের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনিবাসাচার্য-সম্প্রদায়ের তিলকের আকার বংশপত্রের মত। নরোত্তম শাখার তিলক যেমন চম্পক-কলিকা, আর শ্যামানন্দ হতে এই সম্প্রদায়ের তিলক হয়েছে নূপুরাকৃতি। হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের নূপুরাকৃতি তিলক দেখে বিস্মিত হলেন এবং গুরুর আদেশ-লঙ্ঘনে—গুরু-নির্দেশিত তিলকের অপহ্নব-সাধনে শ্যামানন্দকে আশ্রম থেকে বের করে দিলেন। শ্যামানন্দ মনের দুঃখে গঙ্গাতীরে পড়ে রইলেন। তিনরাত গত হলে হৃদয়ানন্দ স্বপ্ন দেখলেন শ্রীগৌর নিত্যানন্দ অভূক্ত রয়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলেন—শ্রীমতি ললিতাজীর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীমতি রাধারানীর চিহ্নিত সেবক শ্যামানন্দ আজ তিনদিন তিনরাত্রি উপবাস আছেন। হৃদয়ানন্দ নিজে গিয়ে গঙ্গতীর হতে শ্যামানন্দকে বুকে তুলে নিলেন। গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটল।

শ্যামানন্দ জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। বহু ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে তিনি উড়িষ্যার নৃসিংহপুরে বাস করতেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীশ্যামানন্দের শাখাভুক্ত। শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে রসিক মুরারিই সর্বপ্রধান। অন্যান্য প্রধানগণের নাম–

রাধানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মনোহর।
চিন্তামণি বলভদ্র শ্রীজগদীশ্বর॥
উদ্ধব অক্রুর মধুবন শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ গদাধর শ্রীআনন্দানন্দ॥
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে॥
সদাভাসে সঙ্কীর্তন সুখের তরঙ্গে॥ (ভক্তিরত্নাকর)[২৭৩]

কৃষ্ণদয়াল চন্দ (১২০১ সাল–১২৮৮ সাল)

মুর্শিদাবাদ জেলার সমৃদ্ধ জনপদ পাঁচথুপি। বহু সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত এবং ঐশর্যশালী ব্যক্তি আপন আপন কীর্তি-গৌরবে রাঢ়ে এই জনপদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কৃষ্ণদয়াল চন্দ জন্মসূত্রে এই পাঁচথুপির অন্যতম অলঙ্কার। জাতিতে সুবর্ণবণিক, পিতার নাম দীনবন্ধু চন্দ। কৃষ্ণদয়াল সাধারণের নিকট চান্দজী নামে পরিচিত ছিলেন। ভক্তরা বলতেন চান্দজী মহাশয়।[২৭৪]

শ্রীমহাপ্রভুর সময়েই রাঢ়দেশ পদাবলী-কীর্তনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাঢ়দেশেই কীর্তনের মনোহরশাহী সুরের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীখণ্ড, কান্দরা ও ময়নাডালের নাম মনোহরশাহী সুরের সঙ্গে অমর হয়ে আছে। পরবর্তীকালে বীরভূমের ইলামবাজার, মুলুক প্রভৃতি গ্রাম মনোহরশাহী কীর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজরা মনোহরশাহী সুরের একজন সুবিখ্যাত কীর্তনগায়ক ছিলেন। কৃষ্ণহরির কীর্তনের দল ছিল না। ইনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। কৃষ্ণদয়াল কৃষ্ণহরির নিকট কীর্তন শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিষয়ী সজ্জনগণের এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে চন্দজী যেমন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন, তেমনই কীর্তন গানও করতেন। চন্দজী মনোহরশাহী সুরের একজন দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়ারূপে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ আচণ্ডাল নরনারীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট কীর্তন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত দাস বৃন্দাবনে গমন করলে নীলমণি প্রভু তাঁকে কীর্তন শেখার জন্য রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে কৃষ্ণদয়াল চন্দের নিকট পাঠিয়ে দেন। অদ্বৈত দাস কয়েকবারই পাঁচথুপিতে এসেছেন এবং এক একবার মাসাবধিকাল থেকে কীর্তন শিক্ষা করে গেছেন। নীলমণি প্রভু সুকবি এবং সুগায়ক ছিলেন। তিনি অদ্বৈত দাসের নিকট কীর্তন শিক্ষা করতেন।

কৃষ্ণদয়াল চন্দ আপন চরিত্র-গৌরব এবং বৈষ্ণবোচিত আচার-ব্যবহারে ও বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠানে রাঢ়দেশে এক নবভাবের জোয়ার এনেছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর নিকট কীর্তন শিখে জীবিকার সংস্থান ও সুযশ লাভ করে গিয়েছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান ছাত্র অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী। পণ্ডিত বাবাজীর নিকট কীর্তন শিখে যাঁরা চান্দজীর ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নীলমণি প্রভুর সুযোগ্য পুত্র প্রভুপাদ গৌরগোপাল ভাগবত ভূষণ. শ্রীল গদাধর দাস বাবাজী, শ্রীত্রিভঙ্গ দাস ও শ্রীভক্তিভূষণ দাস বাবাজী এবং শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।

মনোহর চক্রবর্তী

পায়ের বড়বাড়ির পরমানন্দ গোস্বামীর দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্তী বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। মাতামহের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন ও কীর্তনগান শিক্ষা করে তিনি সারা বাংলায় প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। ইলামবাজারের বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়–

নিমাই চাঁদের বাজলো খোল।
তাঁতি ভাতি চরকা তোল॥[২৭৫]

ইলামবাজার অঞ্চলে বহু তাঁতির বাস ছিল। নিমাই চক্রবর্তী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ইলামবাজারেরই একটি পাড়া ভগবতীবাজারে। শ্বশুরালয়ের সম্পত্তি পেয়ে তিনি ভগবতীবাজারে এসে বাস করেন। নিমাই-এর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দীনদয়াল। দীনদয়ালও কীর্তনগানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনদয়ালের পুত্রের নাম মনোহর চক্রবর্তী। কীর্তনগানের নৈপুণ্যে ইনি পিতা-পিতামহকেও অতিক্রম করেছিলেন। ১২২৫ সালে মনোহরের জন্ম হয়। মনোহর পিতার কাছে শিক্ষা শুরু করে কান্দরার ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। সেকালের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক জটেকুঞ্জ মনোহর চক্রবর্তীর ডানের বাদক ছিলেন। কীর্তনীয়া গণেশ দাস কৈশোরে মনোহরের কীর্তন শুনেছিলেন। মনোহর দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর রূপার করতাল ছিল, তাতে পাঁচরঙ্গের রেশমের থোপনা ঝুলত। উত্তরীয় চাদরখানি তিনি কোমরে বাঁধতেন না। চাদর তাঁর বক্ষের উপর ঢেঁড়ার চিহ্ন এঁকে দুই স্কন্ধের পৃষ্ঠের দিকে ঝুলে থাকত। সেই সময়ের প্রধান কীর্তনীয়াগণ মনোহরকে শ্রদ্ধা করতেন।

দীনদয়ালের সহোদর ভ্রাতা আনন্দচাঁদ ও বেণীমাধবও সুগায়ক ছিলেন। আনন্দচাঁদ ও বেণীমাধব দীনদয়ালের দোঁহারী করতেন। নিমাই-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান (দীনদয়ালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)

উদয়চান্দ। উদয়চান্দ পৃথক সম্প্রদায় গঠনপূর্বক কীর্তনগানে প্রায় পিতার মতই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনদয়াল অপেক্ষাও তাঁর গানের খ্যাতি ছিল। উদয়চান্দের পুত্র অখিল। অখিলেরও কীর্তনের প্রশংসা ছিল, তবে মনোহরের সুযশের প্রভায় অখিলের নাম ঢাকা পড়েছিল। মনোহরের জীবদ্দশাতেই অখিলের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। মনোহরের সন্তানাদি ছিল না। তিনি অখিলের পুত্র নবীনকে যত্নপূর্বক গান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনোহরের তিরোধানের অল্পদিন পরেই নবীন পরলোক গমন করেন। তিনি অধিক দিন দল চালাতে পারেন নাই। নবীনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গৌর, কনিষ্ঠ কেশব। জটেকুঞ্জের শিষ্য খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক নিকুঞ্জ বাইতি কেশবকে কীর্তন-শিক্ষা দিয়ে দল গঠন করেন। বড় বংশের সন্তান বলে সকলেই কেশবকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে জয়দেব কেন্দুবিল্বের মেলায় পৌষসংক্রান্তি হতে তিন দিন শ্রীরাধাবিনোদের আঙ্গিনায় লীলাকীর্তন গাইতেন। ধুলোটের দিন মোহান্ত এসে মূল গায়ককে একখণ্ড উণীবস্ত্র মাথায় বেঁধে দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। কেশব পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। কেশব কুড়মিঠা গ্রামে বিয়ে করেছিলিন। বিয়ের অল্পদিন পরেই কেশবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

অদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী)

জন্ম ১২৪৪ সালে। নাম ব্রজকিশোর রক্ষিত, পিতার নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। জাতি বারেন্দ্র কায়স্থ। জন্মস্থান বাংলাদেশের পাবনা জেলার উল্লাপাড়া স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে। শৈশবেই পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায় এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁকে প্রতিপালন করেন। বাংলা ও পার্সী ভাষায় সামান্য শিক্ষালাভপূর্বক স্থানীয় এক জমিদার-বাড়িতে চাকরী নিয়েছিলেন। সেই সময়ে পাবনা জেলাতেই তাঁর বিয়ে হয়; স্ত্রীর নাম ব্রজসুন্দরী।[২৫৫]

এই সময়ে ব্রজকিশোর চাকরী ছেড়ে এবং পত্নীকে ত্যাগ করে কাটোয়ায় চলে যান। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ কোন গোস্বামী-সন্তানের উপদেশে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এই জন্যই নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। যেজন্যই হোক দীক্ষাগ্রহণের পর ব্রজকিশোরের নাম হয় অদ্বৈতদাস।

কাটোয়া থেকে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অবস্থানপূর্বক অদ্বৈতদাস কিছুদিন সাধনভজন করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঅদ্বৈত কুলভূষণ প্রভুপাদ শ্রীনীলমণিগোস্বামী মহোদয়ের কাছে অদ্বৈতদাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। নীলমণি প্রভু

সুগায়ক ছিলেন, লীলাকীর্তনে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অদ্বৈতদাস কীর্তন শিখতে উৎসুক জেনে নীলমণি প্রভু তাঁকে রাঢ়দেশে পাঠিয়ে দেন।

সে সময়ে রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে স্বনামধন্য কীর্তনাচার্য কৃষ্ণদয়াল চন্দ বর্তমান ছিলেন। চন্দজীর অসাধারণ খ্যাতি। শ্রীমদ্ভাগবত এবং উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে চন্দজীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সে সময় লীলাকীর্তনের তিনি একজন স্বনামধন্য গায়ক এবং শিক্ষাদাতা। অদ্বৈতদাস চন্দজীর কাছে কীর্তনগান শিখেছিলেন। কান্দীর খ্যাতনামা কীর্তনাচার্য দামোদর কুণ্ডুও তাঁর শিক্ষাগুরু। ময়নাডালের সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরও অদ্বৈতদাসকে সযত্নে কীর্তনগান শিক্ষা দিয়েছিলেন।

রাঢ়দেশ থেকে একবার তিনি পুরীধামে গমন করেছিলেন। কীর্তনশিক্ষা সমাপ্ত হলে দীক্ষাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্তন গাওয়ার অভিপ্রায়ে অদ্বৈতদাস কাটোয়ায় আসলে পত্নী ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ব্রজসুন্দরী মাতা ও ভ্রাতা রামলাল গুণকে নিয়ে পতির অনুসন্ধানে রাঢ়দেশে এসেছিলেন। গুরুর আদেশে, কাটোয়ার বৈষ্ণবমণ্ডলীর অনুরোধে অদ্বৈতদাস পত্নীকে গ্রহণ করেন।

সস্ত্রীক অদ্বৈতদাস কাটোয়া থেকে নবদ্বীপে এসে গোরাচান্দের আখড়ায় বাস শুরু করেন। ব্রজসুন্দরী সন্তানসম্ভাবনা হলে ভক্তবৃন্দ একটি বাড়ি খরিদ করে দিলেন। অদ্বৈতদাস, স্ত্রী ও কয়েকমাসের কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াসহ সেই বাড়িতে এসে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করেন। নবদ্বীপে থাকাকালে তিনি কীর্তনগান করে দক্ষিণা গ্রহণ করতেন। নয় বৎসর বয়সে কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার বিয়ে হয়। কন্যার বিয়ের পর অদ্বৈতদাস কাশিমবাজারের বদান্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কীর্তনের টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর কয়েক বৎসর পরে পাবনার তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের অনুরোধে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেন। রাজর্ষির কুঞ্জে তিনি নিয়মিত কীর্তনগান করতেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানও করতেন। ১৩২০ সালে পত্নী ব্রজসুন্দরী দেহ ত্যাগ করেন। ১৩২৮ সালে কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। পত্নীর দেহত্যাগের পরে পণ্ডিত বাবাজী কন্যার কাছে এসে নবদ্বীপে বাস করতেন। কন্যা লোকান্তরিতা হলে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে যান। ১৩৩৭ সালে এই স্বনামধন্য সুপণ্ডিত এবং রসজ্ঞ গায়ক নিত্যধামে প্রস্থান করেছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগলাভে ধন্য হয়েছিলেন। স্বনামধন্য সাহিত্যসাধক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র।

রসিক দাস

অনুরাগী দাস কীর্তনে খুব নাম করেছিলেন। তিনি দক্ষিণখণ্ডে বিয়ে করেন। পত্নীর নাম ক্ষুদুমণি দাসী। এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী ক্ষুদুমণি লোকান্তরিতা হলে অনুরাগী স্বগ্রামে যজানেই পুনরায় বিয়ে করেছিলেন। অনুরাগীর প্রথম পক্ষের পুত্র রসিক দাস। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র রতন দাস ও গৌর দাস। রতন দাস রসিক দাসের দলের শির দোঁহার ও দলের কর্তা ছিলেন। গৌর দাস কোলকাতায় বাস করতেন। কোলকাতার বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন গৌর দাস।

অনুরাগী দাস রসিক দাসকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি ছাত্রদের এবং রতন ও গৌরকে গান শেখাতেন; কিন্তু রসিক সেখানে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। শ্রুতিধর বালক রসিক আড়ালে দাঁড়িয়ে গান শিখত এবং দূর থেকে পিতাকে শুনিয়ে সেই গান গাইত। পিতা জ্বলে উঠতেন। এই অবস্থা বেশীদিন চলল না। রসিকের মাতুল তাকে দক্ষিণখণ্ডে নিয়ে আসলেন এবং সোনারুন্দীর রাজবাড়ির কীর্তনগায়কের নিকট গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রসিক দাস কীর্তনের দল করলেন, বয়স তখন চৌদ্দ-পনর বৎসর।

একবার কান্দরায় দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়াগণ উপস্থিত হয়েছেন। মানকর থেকে নন্দ দাস এসেছেন। বীরভূম তাঁতিপাড়ার নিতাই দাস, ইলামবাজারের মনোহর চক্রবর্তী ও ময়নাডালের বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর এসেছিলেন। গঙ্গা নাপিত, কালহৃদয় ও জামাই হৃদয় এসেছিলেন। আর এসেছিলেন বন্দীপুরের আখুরে গোপালের ভাগ্নে, হুগলী-বাসুদেবপুরের তরুণ গায়ক বেণী দাস। অনুরাগী দাসও এসেছিলেন। কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর বনমালী ঠাকুর তখন যুবক, তিনিও তরুণ বয়সেই কীর্তনগানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে বনমালী ঠাকুর অনুরাগ দাসের পরেই রসিকের আসর নির্দিষ্ট করলেন। তখনকার দিনে এই আসরে বড় বড় কীর্তনীয়াগণের গান হলে শ্রীমতীর পূর্বরাগ হতে আরম্ভ করে রসপর্যায় অনুসারে গান চলতো।

অনুরাগী দাস কিছু জানতে পেরেছিলেন কি না শ্রীমহাপ্রভুই জানেন, তিনি এমন অবস্থায় গানের বিরাম দিলেন যার গৌরচন্দ্রিকা স্থির করতে অভিজ্ঞ কীর্তনীয়াকেই ধান্দায় পড়তে হয়। তার পরেই রসিক গান আরম্ভ করলেন। রসিকের তদুচিত-গৌরচন্দ্রিকা, রসপর্যায়-নির্দিষ্ট পালাগান, ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং বিশুদ্ধ তানলয়ে যেমন অভিজ্ঞ কীর্তনীয়াগণ, তেমনই সাধারণ নর-নারীও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অনুরাগী দাসও আড়ালে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। তিনি ছুটে এসে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন। পিতাপুত্রের চোখের জলে বহুদিনের ব্যবধান ভেসে গেল। উভয়েরই হৃদয় বিষাদমুক্ত হলো। পিতা-পুত্রের মিলনে সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

মনোহর চক্রবর্তীর দলে ছিলেন জটেকুঞ্জ দাস। তিনিই ছিলেন প্রধান বাদক। জটেকুঞ্জ দাস রসিককে আশীর্বাদ করেছিলেন, কালে তুমি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হবে। কুঞ্জ দাসের আশীর্বাদ সত্য হয়েছিল। রসিকের সমকালে তিনিই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন।

কীর্তনের 'কাটাধরা' তাল রসিক দাসের সৃষ্ট। সেকালে রসিকের গানের দক্ষিণা ছিল প্রতি পালায় একশত এক টাকা। রসিক স্থায়ীভাবে দক্ষিণখণ্ডেই বাস করতেন। রসিকের পুত্র নন্দ দাস ও রাধাশ্যাম দাসও কীর্তন-গানে সুযশ অর্জন করেছিলেন। ১৩২০ সালের ১০ই চৈত্র মহাবারুণীর দিন বাঙলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই সুরসিক গায়ক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন।[২৭৭]

বর্ধমান জেলায় বহরান স্টেশনের কাছে ঝামটপুর গ্রাম। এই গ্রামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন। আশ্বিনের দুর্গোৎসবের পর শারদ শুক্লা একাদশী তিথি কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। রসিক দাস এই তিথিতে ঝামটপুরে উৎসবের প্রবর্তন করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন নিজে স্বদলে ঝামটপুরে উপস্থিত হয়ে লীলাকীর্তন করতেন। তাঁর নির্দেশে বহু কীর্তনীয়া ঐ উৎসবে গান করতে আসতেন। এখনোও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অখিল দাস

বীরভূমের কান্দরকুলো গ্রামে রাজারাম (জাতিতে সূত্রধর) চৈতন্যমঙ্গল গান করতেন। অখিল দাস রাজারামের পুত্র। ১২৬০ সালে অখিলের জন্ম হয়।[২৭৮] অখিলের পাঁচ বৎসর বয়সে মাতা পরলোকগমন করলে গ্রামের বিহারী মণ্ডলের মাতা অখিলকে পুত্রের মত যত্নে প্রতিপালন করেন। সাত বৎসর বয়সে অখিল পিতৃহারা হন। অখিল ও বিহারী সমবয়সী। দুইজনের বয়স যখন দশ-বার বৎসর, তখন তাঁরা ওস্তাদ বহুবল্লভের নিকট কীর্তন শিখতেন। অখিল খোলের বাজনাও শিখেছিলেন।

বহুবল্লভের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করে অখিল দক্ষিণখণ্ডের রসিক দাসের নিকটে গান শিখতে যান। রসিক পরম যত্নে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিছুদিন শিক্ষাদানের পর রসিক দাস অখিলকে কীর্তনের দল করতে উপদেশ দেন। গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করে অখিল কান্দরকুলো গ্রামে ফিরে দল তৈরি করলেন। ভূষণ চক্রবর্তী ডানের মৃদঙ্গবাদক, সহোদরপ্রতিম বন্ধু বিহারী মণ্ডল ডানের দোঁহার। এই

সুগঠিত দল নিয়ে অখিল দাস কীর্তন গাইতে বের হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অখিলের নাম হয়ে গেল। খ্যাতনামা কীর্তন-গায়করূপে তিনি সারা বাঙলায় খ্যাতি অর্জন করলেন। অখিলের পরবর্তী নামকরা দোঁহার দ্বারিকা দাস, তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার গড্ডাসিংড়ির লোক। হরেকৃষ্ণ দাস পরে অখিলের দলে খোল বাজিয়ে খুব নাম কিনেছিলেন।

বীরভূমের বহু স্থানে চব্বিশ প্রহর এবং নবরাত্র নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। নামসংকীর্তনের আসরে একজন, দুইজন, তিনজন, এমনকি চারজন পর্যন্ত লীলাকীর্তন-গায়ক আমন্ত্রিত হতেন। এই শ্রেণির আসরে অখিল দাস প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। অনেক স্থানে তাঁর বাঁধা আসর ছিল। ১৩৩৩ সালে ৬ই আষাঢ় অখিল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছিলেন। অখিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিতাইপদ একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র হরিপদ দাস কোলকাতা বাগবাজারে শ্রীমদনমোহন মন্দিরের কীর্তনগায়ক ছিলেন।[২৭৯]

শচীনন্দন দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফতেসিংহ পরগনার মাণিক্যহার গ্রাম। কীর্তনীয়া শচীনন্দন মাণিক্যহারের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্যহরির পুত্র গৌরসুন্দর। আবির্ভাব ১১৯৮ সাল; তিরোভাব ১২৩৯ সালের ২২শে চৈত্র শুক্লা চতুর্দশীতে।[২৮০] গৌরসুন্দরের তিন পুত্র—প্রথম রাধাসুন্দর, দ্বিতীয় কৃষ্ণসুন্দর, তৃতীয় গিরিধারীলাল। রাধাসুন্দর সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর সংস্কৃতশাস্ত্রে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার অর্জন করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর বড় মধুর ছিল এবং তিনি কীর্তনগানে পারদর্শী ছিলেন। শচীনন্দন কৃষ্ণসুন্দরের কাছেই কীর্তন গানের শিক্ষা নেন। শচীনন্দনের পিতার নাম বনমালী দাস। বনমালী মৃদঙ্গবাদ্যে সুদক্ষ ছিলেন। বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাস কীর্তনীয়ার দলে তিনি মৃদঙ্গ সঙ্গত করতেন। বনমালী পুত্র শচীনন্দনকেও অতি যত্নে মৃদঙ্গ শিক্ষা দিয়েছিলেন। বনমালীর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়েছিল বাছরা গ্রামে। জামাতা রাধাবল্লভ দাসও কীর্তন গান করতেন। শচীনন্দন ভগিনীপতি রাধাবল্লভের দলে মৃদঙ্গ বাজাতেন।

কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর মহাশয় অতি যত্নে শচীনন্দনকে কীর্তন শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনোহরশাহী গীতি-পদ্ধতির সাথে বিশুদ্ধ রসপর্যায় এবং বিবিধ পদ ও তাদের উপযোগী আখর প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই শচীনন্দনের শিক্ষা সমাপ্ত হলো এবং পিতার সাহায্য উপযুক্ত দোঁহার, বাদক সংগ্রহপূর্বক তিনি একটি সম্প্রদায় গঠন করলেন। বনমালী দাস

বহুদিন পুত্রের দলে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নন্দকিশোর দাসের পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস শচীনন্দনের মৃদঙ্গবাদক নিযুক্ত হন।

বনমালী যখন বাছরার দীনবন্ধু দাসের দলে খোল বাজাতেন, সেই সময় কিশোর গণেশ দাস দীনবন্ধুর দলে দোঁহারি করতেন। গণেশের উপর অবিচার হওয়ায় বনমালী তাঁকে দীনবন্ধুর দল থেকে নিয়ে আসেন এবং নিজের বাড়িতে রেখে পুত্রের মত যত্নে শচীনন্দনের সঙ্গে কীর্তনশিক্ষা দান করেন। গণেশকে দীনবন্ধুর দল হতে ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় বনমালী নিজেও দীনবন্ধুর দল ত্যাগ করেছিলেন।

১২৬৩ সালের কার্ত্তিক মাসে শচীনন্দনের জন্ম হয়। ১৩৩৩ সালে বৈশাখ মাসে ষট্‌পঞ্চমীর দিন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।[২৮১] বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্তনগায়কগণের মধ্যে শচীনন্দন অন্যতম। অনেকেই তাঁকে বড় মূল গায়ক রসিক দাসের পরেই স্থান দিতেন।

গণেশ দাস

নদীয়া জেলায় ধাওয়াপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের নয়নানন্দ দাসের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার হতে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন। নয়নের (পুত্রের নাম আনন্দ) পৌত্র শালগ্রাম বাল্যে বড় দুর্দান্ত ছিলেন। শালগ্রামের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাই গান শিখে মূল গায়ক হন। তৃতীয় শ্রীদাম শির দোঁহার ও চতুর্থ সুবল মৃদঙ্গবাদক হয়ে দল গঠন করেন। সুবলের পুত্র মহেশ। মহেশের পুত্র গণেশ দাস। ১২৬৭ সালে ৬ই অগ্রহায়ণ গণেশ দাস ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন।[২৮২]

বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাস একজন নামকরা কীর্তনীয়া ছিলেন। গণেশ এই দলে দোঁহারি করতেন। সাত-আট বৎসরের বালক গণেশ গ্রামের যাত্রার দলে গান শিখতেন। পরে পিতার নিকট দুই-একটি কীর্তনের গানও শিখেছিলেন। গণেশ কিছুদিন শচীনন্দনের দলে দোঁহারি করেছিলেন। শচীনন্দনের পিতা বনমালী দাস পুত্রের সাথে গণেশকেও যত্ন করে কীর্তন শিখিয়েছিলেন। কোন গ্রামে শচীনন্দন গান করতে গেলে শচীনন্দন ও গণেশকে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া গান শুনিয়ে আসতে হতো। ১২৭৯ সালে ১০ই চৈত্র গণেশের মাতা পরলোকগমন করেন।[২৮৩] ১২৮১ সালে গুরু বনমালী দাসের গোলোকপ্রাপ্তি ঘটে। গণেশ বাড়ি ফিরে কীর্তনের দল গঠনে উদ্যোগী হন।

গণেশ দাস শ্রীধাম নবদ্বীপের বড় আখড়ায় গান করতে আসলেন। নবদ্বীপে গণেশের বাঁধা আসর হয়ে গেল। নবদ্বীপেই রসিক দাস গণেশকে ধর্ম পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গণেশের বয়স যখন ঊনিশ বৎসর, সেই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃবিয়োগের পর গণেশ নবদ্বীপেই আবার গান করতে

আসলেন। তাঁর গান শুনে বেণী দাস তাঁকে ডেকে পাঠালেন। রসিকের সাথে গণেশের ধর্মপিতাপুত্র সম্বন্ধে শুনে বেণী তাঁকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করলেন। পিতা নাই, শিক্ষার পথ বন্ধ হয়েছে, অতএব এখন দল ভেঙ্গে দিয়ে কিছুদিন গান শিক্ষা করব, গণেশ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে বেণী দাস নিষেধ করলেন। গণেশ বেণী দাসের গান শুনতে গিয়ে আসরে বসেই গান শিখে আসতেন। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণখণ্ডে রসিকের বাড়িতে গিয়েও গান শিখতেন। তিনি কিছুদিন পণ্ডিত বাবাজীর নিকটেও শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ১৩৪৪ সালে ৩১শে আশ্বিন রাত আট ঘটিকায় এই মধুকণ্ঠ গায়ক নিত্যধামে প্রস্থান করেছেন।[২৮৪]

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার বোলপুরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে বরা গ্রাম। এই গ্রামের রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। রামলালের পিতাও রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল এবং কীর্তনগান করতেন। রামলালের পুত্র অবধূত বন্দৌাপাধ্যায় ১২৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২৮৫] অবধূতের জন্মের বৎসরেই রামলাল পরলোকগত হন। বীরভূমের চাকটা গ্রাম-নিবাসী অবধূতের মামা বিপিনবিহারী ঠাকুর মহাশয় ভাগ্নেকে নিজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করেন। অবধূতের বয়স তখন দশ বৎসর। ঠাকুর মহাশয় তাঁকে কান্দী রাজবাড়িতে নটবর গোস্বামী মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করে দেন। এইসময় কান্দীতে একজন বিখ্যাত কীর্তনগায়ক ছিলেন—দামোদর কুণ্ডু। পাঁচথুপির কৃষ্ণদয়াল চন্দের মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না হলেও মনোহরশাহী সুরের কীর্তন-গায়কগণের মধ্যে কুণ্ডু মহাশয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে পরিচিত ছিলেন। অবধূত টোলে সংস্কৃত শিখতেন, দামোদর কুণ্ডুর নিকট কীর্তনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মামা বিপিনবিহারীও খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ছিলেন। তিনিও অবসর সময়ে ভাগ্নেকে শিক্ষাদান করতেন।

ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পর ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে সর্বপ্রথম তিনি নবদ্বীপে গান করতে আসেন। সেই বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা, তাঁর সুর ও তালের সহজাত মাত্রাবোধ নবদ্বীপের বৈষ্ণব ও পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কীর্তনীয়াগণের মধ্যে খেসর মাড়গাঁয়ের রাধিকা সরকার মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন। প্রায়র গ্রাম-নিবাসী অক্ষয় দাস পরিণত বয়সে ঘুড়িসার মহামহোপাধ্যায় রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নপূর্বক উজ্জ্বলনীলমণি আদি অধিগত করেছিলেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। অক্ষয় দাসকে তিনি অতি যত্নে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়েছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনেক শ্লোক অক্ষয় দাস মুখস্থ বলতে পারতেন।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্প বয়সেই দল করেত বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার আগ্রহ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের চেষ্টায় শ্রীমদ্ভাগবত ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় রসিক দাসের নিকটেও গান শিখেছিলেন। এই জন্য রসিকের পুত্র রাধাশ্যামকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। কথায় কথায় রসিক দাসের ঋণ স্বীকার করতেন। কথা দিয়ে কথা রক্ষার জন্য তিনি সাধ্যেরও অতিরিক্ত প্রয়াস পেতেন। কাটোয়ার কাছে এক বৈষ্ণবের আখড়ায় তাঁর বার্ষিক গানের ব্যবস্থা ছিল। এক বৎসর গানের বায়না নিয়ে তিনি সাত আট ক্রোশ দূরে এক গ্রামে গিয়েছিলেন। রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘরের বাইর যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তিনি সেই দুর্যোগেই সদলে পায়ে হেঁটে বের হয়ে পড়লেন। মধ্যাহ্নে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন কোন আয়োজন নাই। আখড়াধারী বৈষ্ণব কি করে জানবেন যে এই দুর্যোগে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত একজন খ্যাতনামা কীর্তনীয়া এই বিনা দক্ষিণায় গানের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করবেন। সেদিন প্রসাদ গ্রহণ করতে অপরাহ্ণ হয়ে গিয়েছিল। কুড়মিঠা গ্রামে বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি যথাসময়ে সদলে উপস্থিত হয়ে রূপানুরাগ গানে সকলকেই আনন্দ দান করেছিলেন। যত্রসামান্য পাথেয় ভিন্ন এক কপর্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গানে রস যেন মূর্ত হয়ে উঠত। বাংলার বহু বৈষ্ণব বহু পণ্ডিত, বহু নরনারী তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। রসজ্ঞ শ্রোতৃসমাজে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল। এই সদালাপী নিরভিমান রসজ্ঞ ও ভাবুক গায়ক বাঙলার অলঙ্কার ছিলেন। বহু দিন চাকটা ত্যাগ করে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শক্তিপুরে গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন। বহু ছাত্র শক্তিপুরে তাঁর নিকট কীর্তন শিক্ষা করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৩৫১ সালের ২৩শে বৈশাখ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীর দিনে এই বহুজনপূজ্য গায়ক নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছিলেন। বাংলার স্বনামপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীমান্ নন্দকিশোর দাস তাঁর স্মৃতিরক্ষা করেছেন। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের ধারা নন্দকিশোর অব্যাহত রেখেছিলেন।

ফটিক চৌধুরী

পিতা-মাতার দেওয়া নাম কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী। শৈশবে মাতৃহীন হলে পিসিমা তাঁকে রাজশাহী জেলার ব্যাঙ্গারী গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তিনিই ফটিক বলে ডাকতেন। কৃষ্ণবন্ধু ফটিক নামেই পরিচিত ছিলেন।

ফটিকের জন্ম হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার হাসনপুর, ডাকঘর—দৌলতাবাদ ১২৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা গঙ্গাপূজার দিনে। বিদ্যারম্ভ হলো রাজশাহীতে পাঠশালায়। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত

পড়েছিলেন। সেখানেই একজন বড় ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। সা রে গা মা সেধে দুই-এক পদ ধ্রুপদ ও দুই-চারিটি খেয়াল গান শিখেছিলেন। পিতা ছোটখাট জমিদার ছিলেন, বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। সতের আঠার বৎসর বয়সে তিনি বাড়ি ফেরেন। উনিশ বৎসর বয়সে বগুড়া জেলার পার্বতীপুরের জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়।

পিতা বৈঠকী গান পছন্দ করতেন না, ভালবাসতেন কীর্তন। এইজন্য কীর্তন শিখবার আগ্রহ হয়। মুর্শিদাবাদ বরোঁয়া থানার কুঁকড়োজোল নিবাসী জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন উঁচুদরের কথক ছিলেন। ফটিকের শিখবার আগ্রহ, একাগ্রতা এবং প্রতিভা দর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাঁর উপর একটা মমতা জন্মেছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাদরে ফটিককে গ্রহণ করলেন। ফটিক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। এরপরে পিতার সম্মতি নিয়ে বীরভূম ময়নাডালে গান শিখতে গেলেন। ময়নাডাল রাঢ়ের অন্যতম বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ। সেখানে কীর্তন ও মৃদঙ্গ-শিক্ষার চতুষ্পাঠী ছিল। বহু ছাত্র সেই চতুষ্পাঠী হতে কীর্তন ও মৃদঙ্গে পারদর্শী হয়েছেন। ময়নাডালের মিত্রঠাকুরগণ বিদ্যাদানের মত অন্নদানেও অকৃপণ ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ময়নাডালের ভান্ডার চিরপূর্ণ ছিল।

ফটিকের গান শুনে শ্রীল সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিতে লাগলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা অর্পণা দেবী একবার রাঢ়দেশের কয়েকজন কীর্তনীয়াকে কোলকাতায় এনেছিলেন; সেইবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁদেরকে গুণানুসারে উপাধিও বিতরণ করেছিলেন। ময়নাডালের বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাসবিহারী মিত্রঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ফটিক চৌধুরী আলাপ করেছিলেন। রাসবিহারী বলেছিলেন, 'আমার হাতে কত মার খেয়েছিস মনে আছে? ফটিক উত্তরে বলেছিলেন, তা আর মনে নেই। কীর্তনীয়া হলে কি হয় তোদের সব খোলপিটানো শক্ত হাত। তোর কিলে আমার পিঠে এখনো ব্যথা ধরে আছে। তবে কি জানিস, আমারো জোর কম ছিল না, কিন্তু কি জানি গুরুগোষ্ঠী বেশী মারলে যদি অপরাধ হয়, তাই অল্পেই রেহাই দিতাম। রাসবিহারীর সঙ্গে ফটিকের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পৌঢ় বয়সেও অটুট ছিল।'[২৮৬]

সুধাকর মিত্র ঠাকুর মহাশয় পুনরায় ফটিককে ময়নাডালে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আর তাঁর যাওয়া হয় নাই। বাড়িতে থেকেই গ্রামের ছেলেদের নিয়ে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় কীর্তন গান গাইতেন। সংবাদ পেলে বিভিন্ন স্থানে ভক্তদের বাড়িতে গান গাইতে যেতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুরের ভক্তপ্রবর দেবকীনন্দ সেন মহাশয়ের আশীর্বাদ সম্বল করে ফটিক কীর্তনের দল গঠন করলেন। বৎসর

দুই পরে অর্পণা দেবী ফটিক চৌধুরীকে কোলকাতায় আনেন। সে যাত্রায় তিনি একমাস কোলকাতায় ছিলেন। অর্পণা দেবীর উপাধিদানের আসরেও ফটিক উপস্থিত হয়েছিলেন।

ফটিক গানে আখর খুবই কমই দিতেন। গানের ব্যাকরণে তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। রাগালাপে, সুরমূর্ছনায়, আবৃত্তির মাধুর্যে তিনি সমগ্র আসর মাতিয়ে রাখতেন। গানের দ্বারা মনোহরশাহীর সঙ্গে রেণেটী মিশানো–ভঙ্গীটি তিনিই করেছিলেন। ১৩৪৪ সালের ৫ই ফাল্গুন খাগড়ায় গঙ্গাতীরে আপন জামাতার গৃহে রাত বারটা ত্রিশ মিনিটের সময় শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা স্মরণ করতে করতে এই শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত গায়ক সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন।[২৮৭]

যদুনন্দন দাস

কীর্তনীয়া যদুনন্দন দাস বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী বিরাহিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১২৭৯ সালে ৪ঠা মাঘ।[২৮৮] পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র দাস; মাতার নাম চিন্তামণি দাসী। কৈশোরে গ্রামের পাঠশালায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। গ্রামের সুজন মৌলিক, নিতাইসুন্দর মজুমদার মনোহরশাহী কীর্তনগানের অধ্যাপক ছিলেন। যদুনন্দনের পিতাও কীর্তনের বড় বড় তালের গান জানতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই পিতার নিকট এবং মৌলিক ও মজুমদার মহাশয়ের নিকট যদুনন্দন কীর্তনগান শিখেছিলেন। পরে তাঁরা নিত্যধামে গমন করলে যদুনন্দন দক্ষিণখণ্ডের সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীরসিক দাস মহাশয়ের কীর্তনের দলে প্রায় সাত বৎসরকাল দোঁহারি করেছিলেন। এরপর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং একটি সম্প্রদায় গঠনপূর্বক মূল গায়করূপে গান করতে শুরু করেন। বিরাহিমপুরের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সদলে তিনি মহাপ্রভুকেই প্রথম গান শুনিয়েছিলেন। এরপর বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস ও প্রেমদাস প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব গায়ককে সাথে নিয়ে একটি কীর্তনের দল গঠনপূর্বক শ্রীমন্দিরে, কুঞ্জে এবং নানা স্থানে গান করতেন।

কান্দীর রাজকুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে যদুনন্দনকে এনে রাস গান শুনতেন। গান শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি যদুনন্দনকে কোলকাতায় নিয়ে আসেন এবং কাশীপুর রাজবাড়িতে শ্রীগোপাল-বিগ্রহের গায়ক নিযুক্ত করেন। একজন মৃদঙ্গবাদক ও দুইজন দোঁহার সঙ্গে থাকত; যদুনন্দন সকালে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় গোপাল জীউকে গান শোনাতেন। কুমার বাহাদুর গুণগ্রাহী ছিলেন। কুমার বাহাদুরের অর্থসাহায্যে তিনি গ্রামে কিছু ধানের জমি কিনেছিলেন। কুমার বাহাদুর যদুনন্দনের বিবাহের ব্যয়ও বহন করেছিলেন।

কাশীপুরে প্রায় ছয় বৎসর তিনি ছিলেন। কুমার বাহাদুরের পরলোকগমনের পর যদুনন্দন এবার বিরাহিমপুরে এসে দল গঠন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দলের খুব সুনাম হলো। যদুনন্দন প্রায়

শতায়ু লাভ করেছিলেন। পরলোকপ্রাপ্তির এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দল চালিয়ে গেছেন। সারা বাঙলায় কীর্তনগানে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যদুনন্দন দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। মূল গায়করূপে আসরে দাঁড়ালেই শ্রতাবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠতেন। তাঁর কণ্ঠও মধুর ছিল। কীর্তন পরিবেশনের ভঙ্গিও ছিল সুন্দর। তিনি মনোহরশাহী সুরের সুনিপুণ গায়ক ছিলেন। এই রসজ্ঞ গায়ক ১৩৭৩ সালের ২০শে চৈত্র নিত্যধামে প্রস্থান করেন।

রাধারমণ দাস

বাঙলার স্বনামধন্য কীর্তনীয়া পণ্ডিত বাবাজীর (অদ্বৈত দাসের) ছাত্র রাধারমণ দাস ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরবর্তী লাখুরিয়া গ্রামে।[২৮৯] পিতার নাম রসিক দাস, জাতিতে বৈষ্ণব। রাধারমণের কণ্ঠ বড় মধুর ছিল, তিনি কীর্তন শেখার চেষ্টা করেন।

বর্ধমান জেলার নিরোল গ্রামের রাম-ঋষি নামে বিখ্যাত রামানন্দ ও ঋষিকেশ দুই ভাই-এর কীর্তনগানের তখন খুব শুনাম। দুই ভাইয়েরই সুকণ্ঠ ছিল। রাধারমণ প্রথম যৌবনে এই দুই ভাইয়ের নিকটেই কীর্তন শিখেছিলেন।

রাধারমণ গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় পালিয়ে আসলেন। রাধারমণ সংবাদ পেলেন—মুর্শিদাবাদ জেলার খর গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক অখিল দাস গোয়াবাগানে বাসা করে আছেন। তিনি কীর্তনও জানতেন। অন্যান্য গানও জানতেন, কিন্তু বিখ্যাত কীর্তনীয়া পান্না দাসীকে হালকা সুরের ঢপ কীর্তন শিখাতে গিয়ে মনোহরশাহী ধারার গান, দাগী গান, চর্চার অভাবে প্রায় ভুলেই বসেছিলেন।[২৯০] রাধারমণ তাঁর নিকট গান শিখলেন। রাধারমণ শ্রীমহাপ্রভুকে স্মরণ করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পাবনা তাড়াশের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় শ্রীধামবৃন্দাবনে কীর্তন শিক্ষাদানের জন্য একটি চতুষ্পাদী প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। আপন ধর্মানুরাগ ও চরিত্র-মাধুর্যে এই ধনকুবের জনসাধারণের কাছে রাজর্ষি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কীর্তনের টোলের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত বাবাজী। ছাত্রদের বৃত্তি ছিল মাসিক ছয় টাকা। তখনকার দিনে তাতে একজন মানুষের বেশ চলত। রাধারমণ পণ্ডিত বাবাজীর শরণ নিলেন। তিনিও রাধারমণের কণ্ঠমাধুর্যে প্রীত হয়ে তাঁকে টোলে ভর্তি করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে রাধারমণের নিকট সব শুনে তিনি লাখুরিয়ার রসিক দাসকে সংবাদ দিলেন, এমনকি কিছুদিন পরে রাধারমণকে গৃহে পাঠিয়ে তাঁর তরুণী পত্নীকেও শ্রীধামে আনলেন।

রাধারমণ কোলকাতায় এসে রায় বাহাদুর রসময় মিত্রের সুনজরে পড়েন। মিত্র মহাশয় কীর্তন গাইতেন এবং কীর্তন ভাল জানতেন। তাঁরই সুপারিশে রাধারমণ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর গায়করূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গত করবে কে? অনেক খুঁজে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়শ-নিবাসী কোপা হরিদাসকে পাওয়া যায়। তিনি দেহরক্ষা করলে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর গোষ্ঠ দাস রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। হরিদাস জাতিতে ছিলেন সূত্রধর, আর গোষ্ঠ ছিলেন বাইতি। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির বাঁধা গায়ক বলে তাঁর অন্য কোন স্থানে কীর্তন গাইবার সুযোগ ছিল না। তাই বাঙলার পল্লীর লোক তাঁর নাম জানে না। পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় নিখিল সঙ্গীত সম্মেলনে একাধিকবার রাধারমণকে কীর্তন গানের সুযোগ দিয়েছিলেন। রাধারমণের একটি পুত্র ছিল, তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন। দুইটি কন্যা। ১৩৩৬ সালের ১১ই চৈত্র এই সুগায়ক সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।

অবধৌত দাস

শ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের পর মহাপ্রভুর জীবন-কথা নিয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন শ্রীবৃন্দাবন দাস, এর পরেই কবি লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। লোচনের নিবাস ছিল মঙ্গলকোটের কাছে কোগ্রাম। লোচন শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। এক সময় চৈতন্যমঙ্গল গানের বহুল প্রচলন ছিল। চৈতন্যমঙ্গলের সিদ্ধ গায়ক ছিলেন অবধৌত দাস।

বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের নিকট মধুডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামে ১২৬৬ সালে অবধৌত দাসের আবির্ভাব।[২৯১] পিতার নাম নীলকমল দাস। তাঁরা পুরুষানুক্রমে কেউ চৈতন্যমঙ্গল গান করতেন, কেউ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। অবধৌত প্রথম যৌবনেই বীরভূমের কীর্তন ও মৃদঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র ময়নাডাল গ্রামে গিয়ে তদানীন্তন স্বনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিখ্যাত গায়ক রসিক দাসের দলে কয়েক বৎসর এবং পরে রাধিকাপ্রসাদ সরকারের দলে কিছুদিন মৃদঙ্গ সঙ্গত করে অবধৌত যখন একজন গণনীয় বাদকরূপে সুযশ অর্জন করছেন, সেই সময় হঠাৎ তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বয়স তখন ত্রিশ বৎসর অতীত হয়েছে। অনেক চিকিৎসায় ফল না পেয়ে নিকটবর্তী জুবুটিয়া গ্রামে জম্পেশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়ে তিনি ধরনা দেন। মহাদেব কৃপাপূর্বক সদয় হয়ে বলেছেন, ‘কোন ভয় নাই। তুমি রোগমুক্ত হয়েছে। গৃহে গিয়ে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান শিক্ষা কর, শ্রীচৈতন্যগুণগানই তোমার এই ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। এই গানই তোমার জীবিকার অবলম্বন হবে এবং এই গানেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।’ শিববাক্য ব্যর্থ হয় নাই। প্রায় নিরক্ষর অবধৌত চৈতন্যমঙ্গল গানে খ্যাতি ও অর্থের সঙ্গে বহু গুণী জ্ঞানী ও ভক্তের কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহিমায় তাঁর সাধনা সার্থক হয়েছিল। তাঁর গান শুনে একদিকে

যেমন সেকালের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক রসিক দাস, স্বনামধন্য গায়ক গণেশ দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রভূত প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে ভগবদ্ভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ, বাবাজী মহারাজের শিষ্য ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী, শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, কীর্তনাচার্য শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রমুখও তেমনই তাঁর গানে প্রীত হয়েছেন। প্রবাদ আছে, ময়নাডালের শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোৎসব গানের সময় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল। শ্রীবিগ্রহের উত্তরীয় সিক্ত হয়েছিল। শ্রীধাম নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থের সর্বত্রই তিনি সমাদৃত হয়েছেন, ভক্তগণের কৃপা লাভ করেছেন। তিরাশি বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপ করতে করতে ১৩৪৯ সালের গোষ্ঠাষ্টমীর মাত্র চারদিন আগে এই ভক্ত গায়ক নিত্যধামে গমন করেন।[২৯২]

নন্দকিশোর দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় দোপুখুরিয়া-বাজার গ্রাম। এই গ্রামে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব-পরিবারে ১৩১৭ সালে ১২ই অগ্রহায়ণ নন্দকিশোর জন্মগ্রহণ করেন।[২৯৩] পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক। বহু ছাত্র তাঁর নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরেজি পর্যন্ত অধ্যয়নপূর্বক নন্দকিশোর শক্তিপুরের রামচাঁদ দত্তের নিকট কিছুদিন হরিনামামৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন। পাঠদ্দশাতেই পিতার নিকট এবং কীর্তনের আসরে গান শুনে তিনি 'গোষ্ঠ' ও 'দান' গান শিখেছিলেন। বাংলার বিখ্যাত কীর্তনীয়া অবধুত বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দকিশোরের কণ্ঠমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গোষ্ঠ ও দানের এক একটি পদ শুনে তাঁকে নিজের দলে গ্রহণ করেছিলেন। ষোল বৎসরকাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে নন্দকিশোর দোঁহারি করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রিয় ছাত্র মৃদঙ্গবাদক বিষ্ণু দাসের নিকট নন্দকিশোর বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন।

শক্তিপুরের নিকট গৌরীপুরে গুরুদেব শ্রীললিতমোহন গোস্বামীর শ্রীপাটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে ষোল বৎসরের বালক নন্দকিশোর প্রথম কীর্তন-গান করেন ১৩৩৩ সালে। নন্দকিশোরের বয়স যখন সাতাশ বৎসর, তিনি দল নিয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে গান করতে গেলেন প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর বাড়িতে। নবদ্বীপে এই তাঁর প্রথম গান।[২৯৪]

প্রথম দিনের গানেই তখনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্ববেত্তা প্রাণগোপাল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলী নিয়ে নন্দকিশোরকে 'লীলাগীতিসুধাকর' উপাধি দান করলেন। সেই দিন থেকে নবদ্বীপে তাঁর বাঁধা আসর হয়ে গেল। প্রভুপাদের বাড়িতে এবং ধুলোট-মহোৎসবে

গিয়ে তিনি নবদ্বীপে বেশ কয়েক দিন লীলাকীর্তন পরিবেশনপূর্বক আপামর সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভুবনেশ্বর সাধু-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দবাড়িতে নন্দকিশোরের গান শুনে দেশ-বিদেশের বহু লোক পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

নন্দকিশোর প্রথম বাঙলার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গান করতে গিয়ে তিনি বহু বৈষ্ণবের কৃপালাভ করেছেন। দিল্লি শহরেও গানে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কোলকাতায় প্রায় সর্বত্রই নন্দকিশোর পরিচিত। সুমিষ্ট কণ্ঠ, পরিবেশনের পারিপাট্য, তালমানে সাবলীল অধিকার, পদাবলীর উচ্চারণ-মাধুর্য এবং রসবোধ তাঁকে কীর্তনীয়া-মহলে উচ্চ স্থান দিয়েছে।

শ্রীরথীন ঘোষ

বিখ্যাত কীর্তনগায়ক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ যেন কীর্তন গাওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতা স্বর্গগত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আকস্মিকভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। একজন লোক এই অষ্টধাতু নির্মিত বিগ্রহ দুইটি বিক্রয় করতে এসেছিলেন। তিনি মূর্তি দুইটি কিনে পত্নী শ্রীমতী বীণাপাণির হাতে দেন। রথীন্দ্রনাথ এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৩২৮ সালের ১৫ই আশ্বিন মহালয়ার পুণ্যদিনে। চৌদ্দ পনের বছর বয়সের রথীন্দ্রনাথ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে শিখতে লাগলেন খেয়াল ঠুংরী টপ্পা।[২৯৫]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে অনেকের মত বীরেন্দ্রনাথও সপরিবারে কোলকাতা ছেড়ে যান এবং নবদ্বীপধামে গিয়ে বাস করেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ গায়ক (শিবা) পশুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র একই কারণে নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। রথীন্দ্র এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশ্র রথীনকে প্রায় বৎসরকাল ধরে গান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই রথীনের পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের পর রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং চলে যান।

বন্ধুরা চাঁদা তুলে (শিবা) পশুপতির কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণু মিশ্র, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী ও ওস্তাদ মোস্তাক আলি খাঁকে দার্জিলিং উপস্থিত করলেন। পালা করে এক-একদিন এক-একজনের বাড়িতে সঙ্গীতের বৈঠক বসতে লাগল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়া বসু এই বৈঠকের নিয়মিত শ্রোত্রী ছিলেন। দুই-এক দিন পরে মায়া বসুর অনুরোধে কীর্তনের মূল গায়কদের মত তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও গান করেন।

কোলকাতা ফিরে রেণুপদ অধিকারীর নিকট কীর্তন ও সুখেন্দু গোস্বামীর নিকট মার্গসঙ্গীতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কীর্তন শিখতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন বাঙলার কীর্তনীয়াগণ কর্মসিদ্ধ। তাঁরা গুরুমুখে গান শিখেছেন, গান পরিবেশনের সময় বুঝতে পারেন না, কি অপূর্ব রসাবেশে শ্রোতৃগণকে

মুগ্ধ করে তাঁদের গান। কিন্তু স্বরগ্রামের অভ্যাস না থাকায় বিশুদ্ধ স্বরালাপ হতে তাঁরা যেন মাঝে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েন। অথচ পদাবলীর অনেক পদের উপর রাগ ও তাল লেখা আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে তানসেনের সঙ্গীতগুরু শ্রীল হরিদাস স্বামীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে আসছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত লীলাগান কখনো বেসুরো বেতালা হতে পারে না। বহু কীর্তনগায়ক তালের দিকে দক্ষতার পরিচয় দেন, কিন্তু গান গাওয়ার সময় পর্দা ঠিক রাখতে পারেন না। এইজন্য রথীন্দ্রনাথ কীর্তন নিয়ে সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছেন, প্রভাতের গান খণ্ডিতা, কুঞ্জভঙ্গ, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি গান তিনি প্রভাতের উপযোগী সুরেই গাইতেন। উত্তরগোষ্ঠ বৈকালিক সুরেই গাইতে হবে। অবশ্য রাত্রিকালের গানে সকল সময় সময়োচিত সুর সংযোগ করা যায় না এবং তাতে দোষ হয় না। কারণ সঙ্গীতশাস্ত্র বলে, 'রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে'। এই নিরলস সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। সুমিষ্ট কণ্ঠ, বিশুদ্ধ সুর-তালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি, পদাবলীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবিশ্লেষণ এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় ও লীলাগানের রসপর্যায় অনুসরণে নিষ্ঠা, সেই সঙ্গে আখরের পারিপাট্য রথীন্দ্রনাথকে স্বনামপ্রসিদ্ধ করে তুলেছে।

কয়েকটি ছায়াচিত্রেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বৃন্দাবনলীলা, নিত্যানন্দ প্রভু, নৃত্যের তালে তালে, মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী, নদের নিমাই, শেষ চিহ্ন, রাধাকৃষ্ণ, রূপ সনাতন, মহাতীর্থ কালিঘাট প্রভৃতির নাম করতে পারি। রথীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত রেডিও-গায়ক। প্রাচীন সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতির সুরকার ও গায়করূপেও সুনাম আছে। তিনি কীর্তনগান গাইতে গিয়ে নানা স্থান হতে বহু উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

সব কীর্তনীয়া বংশেই যে নিষ্ঠাভরে গানবাজনার চর্চা ছিল তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে গানবাজনা পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন জীবনে অনেক কীর্তনীয়ার গান শুনেছিলেন। গায়ক ও বাদকের পারিবারিক পরিচয় তিনি ভালই জানতেন। পুরুষানুক্রমিক কীর্তনীয়াদের সম্বন্ধে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের মত জেনে রাখা দরকার–

> যাহারা বংশপরম্পরা কীর্তন গাহিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা বাড়ির ছেলেদের জীবিকার্জনের অবলম্বনস্বরূপ হয় কীর্তন, না হয় খোলের বাজনা শিক্ষা দিতেন। কেহ ভালই শিখিত। কেহ বা অল্পস্বল্প শিখিয়া পূর্বপুরুষের গৌরবে তরিয়া যাইত। ইহারা লেখাপড়া প্রায় শিখিত না, কোন রকমে পদাবলীটা আবৃত্তি করিতে পারিলেই খুব শিক্ষা হইয়াছে মনে করিত। এমন কীর্তনীয়াও দেখিয়াছি, ভাল গায়ক অথচ সমস্ত পদের অর্থ ভালরূপে জানে না। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ : ২৪২)।[২৯৬]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এইরূপ পেশাদারী কীর্তনীয়াদের হাতে কীর্তনগানের খুব ক্ষতি হয়েছে। সম্প্রতি কিছু কিছু পেশাদারী গায়ক লীলাকীর্তন গানকে যতদূর সম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তুলবার

চেষ্টা করছেন। এর ফলেও কীর্তন গানের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীখণ্ডের সীতানন্দ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন–

> 'আজকাল পাঠকের স্থান পরিগ্রহ করেছেন কিছু মূল গায়ক। গৌরচন্দ্রিকাসহ ৫। ৬ খানি পদ গান করে বাকীটা বক্তৃতা দ্বারা বুঝিয়ে গায়ক লীলাটি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বড় তালের গান কদাচিৎ শোনা যায়। দোঁহার সঙ্গে এবং ঢপ কীর্তনের সঙ্গে ছোট আখর ও ছুটকী বাজনায় বাজীমাৎ করার বিষয়টি প্রায়ই চোখে পড়ে। প্রথম থেকেই নায়ক ও নায়িকার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এবং নানা বিপরীত রসের অবতারণা করে শ্রোতার বাহবা আহরণের প্রচেষ্টাই বেশী (সীতানন্দ ঠাকুর ১৯৭৭ ঃ ৪৭-৪৮)।'[২৯৭] কীর্তন শিক্ষা হতে হবে গুরুমুখী। তাহলেই শুদ্ধ কীর্তনের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশকাল : জন্মাষ্টমী-১৩৩৬, পৃ. ৪৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৯. জ্যোতিভূষণ চাকী অনুবাদ, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, নবপত্র প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২২শে জুন, ১৯৭৯. পৃ. ১৪৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২৩. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩

২৪. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দরবারী নটী কলাবন্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২২১-২২৩

২৫. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৭. দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দরবারী নটী কলাবন্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২২১-২২৩

২৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশন : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৬

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৫

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৩. জয়ানন্দ মিশ্র, চৈতন্যমঙ্গল

৪৪. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৪৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৬

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৯. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা ৭০০০৭৩, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ২৫-২৭

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৫৫. নীলরতন সেন, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, সাহিত্যলোক প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ভূমিকা

৫৬. প্রাগুক্ত, ভূমিকা

৫৭. প্রাগুক্ত, ভূমিকা

৫৮. প্রাগুক্ত, ভূমিকা

৫৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৮

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৬১. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, পৃ. ১৯৬

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৬৩. লোচন শর্মা বিরচিত, *রাগ তরঙ্গিনী*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ সম্পাদনা ও ভাষান্তর রাজ্যেশ্বর মিত্র ভূমিকা ১৩৯১, পৃ. ১

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৬৬. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৯

৬৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩২

৬৮. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী* পরিচয়(নব পর্যায়),প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৪

৬৯. Annada Sankar and Lila Roy, *Bengali Literature,* Published by Paschimbanga Bangal Akademi, January 2000. pa. 16

৭০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩৩

৭১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৭৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

৭৫. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়* (নব পর্যায়), প্রকাশন : সাহিত্য লোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩

৭৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫

৭৭. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : (*নবপর্যায়*)*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫

৮০. কালিদাস রায়, *পদাবলী সাহিত্য*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কোলকাতা ১৩৮৩, পৃ. ১৪-১৬

৮১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : (নবপর্যায়)*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ১৪

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৮৭. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১৩৪

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৮৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৫

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯২. ড. ননী গোপাল গোস্বামী, চৈতনোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, পৃ. ২০৬

৯৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৫০

৯৪. ডক্টর আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৪১

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৯৬. ড. সুকুমার সেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবনী সাহিত্য, পৃ. ১৫৩

৯৭. ড. আমিনুল ইসলাম বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৮

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১০০. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৫৫

১০১. ড. সুকুমার সেন, *শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবনী সাহিত্য*, পৃ. ১৫৩

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১০৪. শ্রীমদ্ভাবদগীতা, দ্বাদশ অধ্যায়. ভক্তিযোগ, পৃ. ৭০৯

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

১০৭. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪১

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১১১. আহমেদ শরীফ, *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ. ১৬০
১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১১৪. শ্রীজীব গোস্বামী, *'ষট সন্দর্ভ'* ইসকন, ২৭ অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ২৪৫
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
১১৬. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪২
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১১৮. শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা*, ইসকন ২০১৬, পৃ. ভ
১১৯. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড*, প্রকাশন : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, মে ১৯৯৯, পৃ. ৪৪
১২০. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৩
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১২৯. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় (নবপর্যায়)*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৫০
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৩৫. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৫
১৩৬. ড. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব রস*, পৃ. ১৮২
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

১৩৮. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৪১. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদাস, জানুয়ারি ১৯৯৮.পৃ. ১৫৭

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

১৪৫. শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, *'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'* প্রকাশনা : বেণীমাধব শ্রীল'স লাইব্রেরি, কোলকাতা, জুলাই ২০১৪, পৃ. সূত্রখণ্ড-১

১৪৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৬১

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

১৪৯. রমেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ)*, পৃ. ২৭৪

১৫০. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রকাশন :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৫৪. Bimal Kumar Roy. Madhyayaga-Sharada Publishing House, 1996, p. 143

১৫৫. শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা*, পৃ. ৪১৩

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

১৫৭. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ)*, উৎস প্রকাশন, ২০১৭, পৃ. ৩৭৮

১৫৮. শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, বলরাম তত্ত্ব, পৃ. ২১৬

১৫৯. চৈতন্যচরিতামৃত, আদিপর্ব-৫, পৃ. ৪-৫

১৬০. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১২৮

১৬১. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ১৮২

১৬২. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ১৮৫

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

১৬৪. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৩০

১৬৫. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৩২

১৬৬. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ১০৫-১০৬

১৬৭. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৩১-১৩২

১৬৮. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুন ২০১১, পৃ. ১৩৭

১৬৯. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৩৫

১৭০. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যলীলা, ১৩/৮/১০

১৭১. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৩৮

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৭৪. ড. ননী গোপাল গোস্বামী, চৈতনোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, প্রকাশন কলিকাতা ১৩৭৯, পৃ. ২০৬

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

১৭৮. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যলীলা, ৫ম অধ্যায়, পৃ. ২৩০

১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬-৪৯৮

১৮৪. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৪২

১৮৫. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যলীলা, ৫ম অধ্যায়, পৃ. ৬২৬-৬২৯

১৮৬. গুরু পরম্পরা, ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৪৩

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১৮৯. প্রাগুক্ত, ১৪৫

১৯০. সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, প্রকাশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশকাল জুন ২০১১, পৃ. ১৪০

১৯১. নন্দলাল শর্মা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অভিধান, উৎস প্রকাশন মে ২০১৫, পৃ. ১৫৬

১৯২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, গুরু পরম্পরা ও হিতেশরঞ্জন স্যানালের বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস বই থেকে নেওয়া।

১৯৩. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ)*, উৎস প্রকাশন, ২০১৭, পৃ. ৩৭৮

১৯৪. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল : আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১২৫

১৯৫. চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা

১৯৬. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, মে ২০১৫, পৃ. ৩৭

১৯৭. ব্রহ্মা-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়, প্রকাশক ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ২৭ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৪৬

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২০০. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল : আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১২২

২০১. শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অদিলীলা, পৃ. ৯০৪

২০২. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ) উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল : ১৯১০, পৃ. ৫৩৬

২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬

২০৫. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশনা, প্রকাশকাল : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, পৃ. ৯৬

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

২০৮. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা *কীর্তনের ইতিহাস*, প্রকাশন : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ২০১২, পৃ. ১২৮

২০৯. *নরোত্তম ঠাকুরকৃত নাম সংকীর্তন*, গৌর-পদতরঙ্গিনী, পৃ. ৩৪০

২১০. শ্রীরূপ গোস্বামী, *উজ্জ্বলনীলমণি*, প্রকাশন : রাধা পুস্তকালয়, পুনর্মুদ্রণ, বইমেলা ২০১৩, পৃ. ২৩৪

২১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২১২. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, প্রকাশন : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৬৮, পৃ. ৩৩

২১৩. নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল: ২০১৫, পৃ. ২৮৩

২১৪. সত্যবতী গিরি, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৯৫

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২১৮. শ্রীরূপ গোস্বামী, *উজ্জ্বললীলমণি*, প্রকাশন : রাধা পুস্তকালয়, পুনর্মুদ্রণ, বইমেলা ২০১৩, পৃ. ২৩৬

২১৯. নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল: ২০১৫, পৃ. ২৭৪

২২০. সত্যবতী গিরি, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবশিলিং, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৩৭

২২১. নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল : ২০১৫, পৃ. ১২০

২২২. সত্যবতী গিরি, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবশিলিং, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৭৪

২২৩. নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল: ২০১৫, পৃ. ২৫০

২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

২২৫. সত্যবতী গিরি, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৪১

২২৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬৩

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

২৩০. প্রাগুক্ত,, পৃ. ১৬৪

২৩১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচায়* (নবপর্যায়), সাহিত্যলোক এপ্রিল ২০০০. পৃ. ৩৩০

২৩২. নীলরতন সেন, 'চৈতন্য জীবনী কাব্য', সাহিত্যলোক, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ২২৬

২৩৩. নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী, *'শ্রী হট্টে মহানাম'*, প্রকাশক : শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার, ৯ই জুলাই, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৩৮

২৩৪. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ১৫০

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৩৬. নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী, 'শ্রী হট্টে মহানাম', প্রকাশক : শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ৯ই জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৪২

২৩৭. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ১১৪

২৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২৩৯. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী, প্রকাশনা : শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ২০১৫, পৃ. ১১১

২৪০. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশ, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ২০৩

২৪১. নীলরতন সেন, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় (নব পর্যায়), প্রকাশনা : সাহিত্যলোক, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫

২৪২. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ১৬৬

২৪৩. মনোজবিকাশ দেবরায়, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের পদ ও পদাবলী, অন্বেষা প্রকাশন, অমর একুশে বই মেলা ২০১৮, পৃ. ২৬২

২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

২৪৫. Chhaya Chatterjee, Sastriya Sangit of Bangal through the ager Vol.1, Sharada Publishing House, Delhi. 1996, page-146

২৪৬. প্রাগুক্ত

২৪৭. চৈতন্য ভাগবত, ১/৭

২৪৮. চৈতন্যচরিতামৃত, ২/৪

২৪৯. প্রাগুক্ত, ২/১০

২৫০. প্রাগুক্ত, ২/১

২৫১. চৈতন্যচরিতামৃত, ১৪/২৬

২৫২. প্রাগুক্ত, ২/১৪

২৫৩. গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৪৩

২৫৪. চৈতন্য ভাগবত, ৩/৫

২৫৫. তদেব

২৫৬. তদেব

২৫৭. প্রাগুক্ত

২৫৮. ন. বি. বিলাস

২৫৯. ভক্তিরত্নাকর, ১৩/১৮৯

২৬০. প্রেম বিলাস ১৪ বিলাস

২৬১. কৃষ্ণদাসের শ্যামনন্দন প্রকাশ, (৫-৫)

২৬২. প্রাগুক্ত, ১৪/৫

২৬৩. ভক্তিরত্নাকর, ১৫/৮৬

২৬৪. শ্যামনন্দন প্রকাশ

২৬৫. ভক্তিরত্নাকর, ১৫/৮৬

২৬৬. প্রাগুক্ত, ১০/৬৭১-৭৩

২৬৭. প্রেমবিলাস, ১৯

২৬৮. ভক্তিরত্নাকর, ১৪/১৫, পৃ. ১২১-১৩৩

২৬৯. ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা, প্রকাশন-ইসকন, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ২৭ অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ৬

২৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৭২. সাহিত্যরত্ন, ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, প্রকাশন–পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১৫৯

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

২৭৫. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা *কীর্তনের ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কোলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৩

২৭৬. ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা, প্রকাশন-ইসকন, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ২৭ অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ৮৮

২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২৭৮. সাহিত্যরত্ন, ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১৭৯

২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

২৮২. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কোলকাতা, প্রকাশন–১৯৮৯, পৃ. ১৭৫

২৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২৮৬. সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ১৯১

২৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২৯০. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যাড কোম্পানি, কোলকাতা–প্রকাশকাল, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৪

২৯১. সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১৯৭

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২৯৫. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যাড কোম্পানি, কোলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৭

২৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

২৯৭. প্রাগুক্ত, ১৭০

চতুর্থ অধ্যায়
লোকনাট্য

লোকনাট্য শব্দটি আধুনিক। কিন্তু নাট্য শব্দটি বেশ পুরানো। তবে কোন লোকসমাজেই এই শব্দ দুটি প্রচলিত নেই। আমরা যাকে বিশেষ অর্থে লোকনাট্য বলি, তা ব্যাপকভাবে লোকসমাজের কাছে 'গান'। গীতিসংলাপে পালাগুলো ভরা বলেই হয়তো গান।[১] ড. সুকুমার সেন নাট্য শব্দটির একটি অর্থ করেছেন। তাঁর ভাষায় নাট্য হচ্ছে 'নাটের কর্ম'। এর ভিত্তিতে লোকনাট্যকে লোকনাটের (যে লোকনাট্য করে) কর্ম বলা যেতে পারে। কিন্তু নট বললেই বৃত্তিধারী এক বিশেষ শ্রেণির কথা মনে আসে। লোকনাট্যে নটবৃত্তিধারী কোন শ্রেণি নেই বলেই মনে হয়।[২]

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে রচিত 'ঋগ্‌বেদের কথা'।[৩] এই গ্রন্থের একাধিক সূত্রে পূর্ব-ভারত তথা বঙ্গভূমিতে প্রচলিত প্রাচীনতম নাট্য ঐতিহ্যের ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন–অথর্ব সংহিতায় ব্রাত্যখণ্ডে এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটকল্প ব্রাত্যের দিগ্বিজয়যাত্রার বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা থেকে জানা যায়–সম্রাটকল্প ব্রাত্যের দিগ্বিজয় যাত্রায় তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন পার্শ্বচর থাকতো। এই পার্শ্বচরদের 'পুংশ্চলী' ও 'মাগধ'-এর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কেননা, 'পুংশ্চলী' হচ্ছে নারী–এই নারী ছিল নৃত্য-গীত পটিয়সী নটী এবং 'মাগধ' হচ্ছেন পুরুষ, যে পুরুষ ছিল বাদ্যকার–গল্পকথক নট। আর এই নট-নটীদ্বয় উভয়ে ছিল যুদ্ধের অবসরে নৃত্য, গীত, অভিনয় দেখিয়ে সম্রাটকল্প ব্রাত্যের মনোরঞ্জন করতো।[৪] শুধু বেদেই নয় পুরাণ, উপনিষদ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা পরবর্তীকালে পূর্বভারতে, অর্থাৎ বঙ্গভূমিতে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সেইসব নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অনুশীলন প্রচার হয়।

লোকনাট্য শব্দের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

লোকনাট্যের রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ে ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য অস্বীকৃত। সেখানে গ্রামসমাজের বা লোকসমাজের সমস্ত গোষ্ঠী একাকার। 'Folk art crosses the borders of class, religion and Country. The classicl often impores these barriers because of its esoteric nature.[৫]

সংস্কৃতে নৃৎ ধাতুর মোটামুটি মানে সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করা। এই অর্থে ধাতুটির ব্যবহার ঋগ্‌বেদে এক আধবার আছে। প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছেন যে তৎসম 'নৃত্য, নট, নাট্য, নাটক এবং তদ্ভব 'নাচ, নাটক, নাটুয়া (<লেটো, লেটো)' একই 'নৃৎ' ধাতু থেকে উৎপন্ন।[৬]

'নৃত্য, নাচ, নৃৎ ধাতু থেকে উৎপন্ন বটে কিন্তু নট, নাট্য ও নাটক, নাট, নাটুয়া সাক্ষাৎভাবে যে নট্‌ ধাতু থেকে এসেছে সে ধাতুটি নৃৎ ধাতুর পূর্বতন বিকার জাত মনে করতে হয়। সংস্কৃত নাট্য যে নট্‌ ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ আসলে ছিল নড়াচলা করা, স্পষ্ট অঙ্গ চালনা করা। এই নট ধাতুটি নৃৎ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে তাণ্ডব নাচে। কিন্তু কথ্য সংস্কৃতে যে ধাতুটি স্বকীয় বিশিষ্ট অর্থে সচল ছিল তার প্রমাণ হল বাংলার মতো আধুনিক আর্য ভাষায় নড় ধাতুর অস্তিত্ব।[৭]

লোকনাট্যের ইতিহাস অন্বেষণের প্রশ্নে সুকুমার সেন বলেছেন, আনুমানিক ৪র্থ শতকে পাণিনির সময়ে বাঙলার জনসাধারণের মাঝে নট এবং বিশেষ প্রকারের নাট্যধারার প্রচলন ছিল। সেই সময় শুধু নট শব্দই নয় সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন 'নাট্য' শব্দ প্রচলিত ছিল। নাট্য শব্দটির অর্থ হলো 'নটের কর্ম'। এই শব্দ থেকে অনুমান করা হয়–পাণিনির সময়ে 'নটকর্ম' জীবিকারও বিষয় হয়।[৮] ইংরেজি Folk মানে লোক। লোক বলতে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক অঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষ ধরনের প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কারশাসিত গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়কে বোঝায়। গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যে উদ্ভুত গ্রামীণ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং গ্রামীণ জনগণের সামনে উপস্থাপিত নাটই লোকনাট্য। লোকনাট্য সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকে উদ্ভুত হয়। সেজন্য গীত ও নৃত্য লোকনাট্যের উল্লেখযোগ্য অংশ। অর্থাৎ যারা নিজেদের আবেগ, মনন, দর্শন প্রভৃতি অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় বিশেষ একটা রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, যাতে থাকে অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, কথা, সুর, আসর, বিশেষ ধরনের বেশভূষা ও সাজসজ্জা এবং যা কেবল অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত, তাকে বলা হয় লোকনাট্য।[৯] পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যের মধ্যে উদাহরণ প্রসঙ্গে কয়েকবার নটের উল্লেখ করেছেন।[১০] সেখান থেকেই আমরা তাঁর সময়ে–খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্তত পূর্বভারতে নটকর্মের যে চর্চা ছিল সে বিষয়ে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।[১১]

পতঞ্জলির সময়ে এবং তার আগে (পাণিনির কালে) ও পরে (কালিদাসের কালে) গ্রন্থিক ছাড়াও অন্য রকমের কথক ছিলেন। এঁদের এক শ্রেণিকে কালিদাস মেঘদূতে অবন্তীর প্রসঙ্গে 'কথাকোবিদ গ্রাম বৃদ্ধ বলে' উল্লেখ করেছেন। কালিদাসের উল্লিখিত কথাকোবিদগণ পেশাদার ছিলেন কিনা জানিনা, তবে পাণিনি–পতঞ্জলির কালে যে আখ্যান-আখ্যায়িকা বিবৃত করে তা জনমনোরঞ্জন জীবিকার এক উপায় ছিল বলেই মনে হয়। পতঞ্জলি লিখেছেন–

'তথা য এতে শিল্পিনো নাম তেহপি স্বভূত্যর্থমেব

প্রবর্তন্তে বেতনং চ লপস্যামহে মিত্রাণি চ *নোভবিষ্যন্তীতি*।’

অর্থাৎ ‘তারপর এই যাদের শিল্পী বলি তারাও নিজের স্বার্থের জন্যই কাজ করে। (তারা ভাবে) বেতন আমরা পাব, বন্ধুলাভও আমাদের হতে পারে।’ এই আখ্যান-আখ্যায়িকা বলতে পতঞ্জলি অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই বুঝিয়েছেন।

বাংলা লোকনাট্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১. লোকনাট্য সাধারণ লোকদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছে পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা শিল্পীগোষ্ঠী ও দর্শক–সকলেই লোকায়াত স্তরের মানুষ।

২. শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে মাঠ, ঘাট ও বারোয়ারীতলায় এই নাটকের উদ্ভব ও অভিনয় দেখা যায়।

৩. খোলা আকাশের নিচে, মুক্ত ও অবারিত আঙিনায় লোকনাট্যের অভিনয় হয়। বদ্ধ জায়গায় ও বেষ্টিত প্রেক্ষাগৃহে নাটক যখন এল তখনই নাটক আলোকবহুল ও শিল্পরস সমৃদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তার ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

৪. সুগঠিত ও শিল্পসম্মত নাটকের নিয়মকানুন সব ধরাবাঁধা, কিন্তু লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল, দর্শকদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাতে নতুন নতুন উপাদান কেবলই প্রবেশ করতে থাকে।

৫. লোকনাট্যের ক্ষেত্রে যেসব মানবিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয় সেসব জায়গাতেই ধর্ম ও নীতির আদর্শ জোরালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার বাহনরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সনাতন ভাবধারা ও ঐতিহ্য এই লোকনাট্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে এসেছে।

৬. লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য রয়েছে। খোলা জায়গায় দূরের দর্শকবৃন্দকে ধরে রাখতে হলে সঙ্গীতের প্রয়োগ বেশি হওয়া প্রয়োজন। শুধু কথা সেখানে অচল।

৭. লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি ও সুরের প্রাধান্য আসা স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি অপেক্ষা জোরালো ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনই সেখানে বেশি। অতিশয়িত ভাব প্রকাশের জন্য সেই অভিনয়ে বহু জায়গায় মুখোসের ব্যবহার হয়।

আরও কয়েকটি লক্ষণ এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় :

এক. লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ বা অঙ্গ লোকনৃত্য। অভিনেতাদের সাজসজ্জা অতিসাধারণ, লোকনাট্যে লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

দুই, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্যকৌতুক, তামাসা, ঠাট্টা (কখনও কখনও তা আদিরসাত্মক) প্রভৃতির আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ লোকনাট্যে হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া হয় (ভাঁড়, লোকনাট্যের একটি প্রধান আকর্ষণ)। কখনও আবার ব্যঙ্গের কথাঘাতে দর্শকদের পুলকিত করা হয় (এটা অনেকটা মিছরির ছুরির মতো)।

তিন. লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত (এখন লেখার প্রচলন হয়েছে)। লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান, সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে, মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে, দর্শকদের মনকেও টেনে রাখে।

চার. বাংলার লোকনাট্য বিয়োগান্তক নয়, মিলনান্তক। সংঘাত নাটকীয় উৎকণ্ঠা তাতে আছে।

পাঁচ. সামাজিক আখ্যাত লোকনাট্যে বিরল নয়, রূপকথার নাট্যরূপ লোকনাট্যে স্থান পায়। পীর ফকিরও লোকনাট্যের চরিত্র হয়। মহাকাব্যের চরিত্র নিয়েও লোকনাট্য মঞ্চস্থ হয়। লোকনাট্যে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর অপেক্ষা লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাই লোকনাট্যের গতি সর্বত্রগামী।

ছয়. লোকনাট্যে সামাজিক জীবনযাত্রার অভ্যন্তরের সংঘাত কখনও কখনও দেখা যায়। শ্রমজীবী নর-নারীর কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-নিরাশা কখনো পরোক্ষ কখনো প্রত্যক্ষে লোকনাট্যে প্রকাশ পায় এর বিচিত্র রূপ। রসিকজনেরাই এর সন্ধান পান।

প্রাচীন বাংলাদেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল উৎস অস্ট্রিক ও অনার্য জনসমাজ। সমাজ গড়নের প্রাক মুহূর্তে আদি মানুষের জীবিকা ছিল খাদ্য আহরণ ও ফল সংগ্রহ। শিকারী জীবনের চরম আনন্দময় মুহূর্তে নৈশবিলাস এবং আমোদ-প্রমোদ সেদিনের মানুষের অন্যতম উৎসব ছিল। আদিম জীবন ও সমাজে বিবর্তনের কৃষ্টি এল। প্রাচীন ভারতের আদিবাসী অস্ট্রিক বা দ্রাবিড়দের নাচ-গান ও অভিনয় প্রিয়তায় ঐতিহাসিক নজির প্রচুর। বাংলার সংস্কৃতি মুখ্যত দ্রাবিড় অনার্য এবং আর্যদের সম্মিলিত সাধনার ফলশ্রুতি।[১২]

প্রথম পরিচ্ছেদ
বেদে নাট্যধারার অভিনয় অনুসন্ধান

মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করলো অর্থাৎ গ্রামের সৃষ্টি হলো। এই গ্রাম শব্দটি মূলত বেদের শব্দ এবং বৈদিক সূত্র ধরেই এই শব্দটির নানাভাবে বিকাশ ঘটেছে। নির্দিষ্ট স্থানে জনবসতি প্রাকবৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম নামকরণ বৈদিক যুগ থেকেই হয়। বর্তমানে যেমন শহর ও গ্রাম তখন ছিল গ্রাম ও অরণ্য।[১৩]

লোকনাট্যের উৎপত্তির কথা যদি বলি তাহলে প্রথমেই আসে বেদের কথা। বেদের কোন একটি অংশে নাট্যবীজ রয়েছে সেটি উল্লেখ করলে পুরো বিষয়টিই থেকে যাবে অস্পষ্ট। সহজে বোঝার জন্য বেদের বিভিন্ন ভাগ বা প্রকার তুলে ধরেছি। বেদের অনেক অংশেই নাটকের বীজ আছে, ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে নাটকের বীজ বেশি আছে।[১৪] ঋগ্‌বেদের পরে জীবন্ত সাহিত্যের গতি স্তব্ধ হওয়ার কারণে নাটক সৃষ্টি হতে দেরি হয়েছে।[১৫]

বেদ হিন্দু ধর্মের আদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। সংগীতের শুরু বেদ থেকেই। বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিত এফ. ম্যাক্রমূলার (X Max Muller)। তাঁর অভিমত হলো, ভারত ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের (খ্রি. পূর্ব ৫০০ অব্দ) পূর্বেই বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ পূর্ণরূপ ধারণ করে। সেই হিসাবে বেদ সংহিতার কাল মোটামুটি ১০০০-৮০০ খ্রি. পূর্ব অব্দ। জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে বালগঙ্গাধর তিলক বেদের সংহিতার সংকলন কাল খ্রি. পূর্ব ৬০০০ অব্দ সিদ্ধান্ত করেছেন।[১৬] জার্মান পণ্ডিত এম. ভিন্তারনিৎস (M. Winternitz) ভাষ্যতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বেদের কাল নির্ণয়ে সচেষ্ট হন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন খ্রি. পূর্ব ২০০০ বা ২৫০০ অব্দে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খ্রি. পূর্ব ৭৫০-৫০০ অব্দের মধ্যেই ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদসহ সমগ্র বৈদিক সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, নৃত্য, অভিনয় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। পণ্ডিত ভিন্তারনিৎসের সিদ্ধান্তকেই অনেকটা যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়।[১৭]

বেদ কথাটির বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ জানা। প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্রই বেদ। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকে বেদ বলা হয়। প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায় নেই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ হতে লাভ করা যায়, সেই জন্যই এই ধর্মগ্রন্থকে বেদ বলে। বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুত প্রবচন। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের

মতে বেদ কোন লৌকিক বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান নয়। বেদ এক অলৌকিক অখণ্ড জ্ঞানরাশি যার সাহায্যে মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের সন্ধান পায়। বেদ প্রকৃতই ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণী। এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সনাতন ধর্মের উৎস, সকল কর্মের মীমাংসা, সমস্ত জ্ঞানের পরিণতি ও ভারতবর্ষে নাট্য, সংগীতের উৎস।[১৮] লিখনপ্রাণালী সৃষ্টি হবার পূর্বে বেদ শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি পরম্পরায় চলে আসছিল বলে এর অপর নাম শ্রুতি। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ। বেদের প্রামাণ্য অন্যকিছুর উপর নির্ভর করে না। কারণ বেদ অপৌরুষেয়; স্বয়ং ব্রহ্মার নিঃশ্বাসরূপেই বেদ প্রকটিত হয়েছে। বেদ সকল শাস্ত্রের মূল।[১৯] বেদকে বলা হয় নিগম—সমগ্র জ্ঞান নির্গত হয়েছে যে আকর হতে। বেদকল্পবৃক্ষের গলিত ফল হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত, গলিত ফলটি সুপরিপক্ক। 'গলিত ফলং' পরিচয়টি অতীব নিগূঢ়ার্থ। বেদমন্ত্রে আছে, পরমব্রহ্মের সংবাদ চেষ্টা করেও জানা যায় না, তিনি সাধনের অতীত। তাঁকে জানা যায় শুধু করুণায়। তিনি প্রয়াস-সাধ্য নহেন, প্রসাদলভ্য। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। গলিত ফল পরিচয়ের মধ্যে এই তত্ত্বটি লুকিয়ে আছে।

ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রধানত এই চারভাগে বেদ বিভক্ত হলেও বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি এবং মূলত বেদ চার শ্রেণিতে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। মূল চার ভাগের বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের মধ্যে কোন শ্রেণির মধ্যে নাট্য বীজ আছে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছি এবং সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে কিভাবে লোকনাট্যে প্রবেশ করেছে সেই বিষয়টি দেখিয়েছি। বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় তুলে ধরেছি।

বেদের ভাগগুলো নিম্নরূপ—

ঋগ্‌বেদ

ব্রাহ্মণ—ঐতরেয়, কোষীতকি বা শাংখ্যায়ন

আরণ্যক—ঐতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন

উপনিষদ্—ঐতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন

(সাংখ্যায়ন বা শাংখ্যায়ন উভয় বানানই শুদ্ধ)

সামবেদ

ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, ছান্দোগ্য, জৈমিনীয় বা তবলকার, সামবিধান, আর্ষের, বংশ ও দেবতাধ্যায়।

আরণ্যক—ছান্দোগ্য।

উপনিষদ্—ছান্দোগ্য, কেন।

যজুর্বেদ

যজুর্বেদ প্রধানত দুই প্রকার। কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ–

ব্রাহ্মণ–তৈত্তিরীয়

আরণ্যক–তৈত্তিরীয়
উপনিষদ্-কাঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণ।

শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা–
ব্রাহ্মণ-শতপথ
আরণ্যক-বৃহদারণ্যক
উপনিষদ-বৃহদারণ্যক, ঈশ

অথর্ববেদ
ব্রাহ্মণ-গোপথ
আরণ্যক-নেই
উপনিষদ-প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য।

বেদের মূল চার ভাগ হলো–

সংহিতা–বিষয়সমূহ যেখানে সংহত বা একত্র করা হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋক্ বা মন্ত্রের সংকলন।[২০]

ব্রাহ্মণ–ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ মন্ত্র বা বেদ মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রের বিবিধ ব্যাখ্যাসহ বেদের যে অংশে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ রয়েছে।

আরণ্যক–আরণ্যক পাঠ্য গ্রন্থ। কর্ম ও জ্ঞানের সন্ধি সঠিক সেতু। রূপক যজ্ঞের প্রাধান্য বেশি।

উপনিষদ–উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শন ভাগ। বেদান্ত হচ্ছে অন্ত বা শেষাংশ। বেদের সারবস্তু এখানে আছে বলে বেদান্ত।

এবার ঋগ্, সাম, যজু, অথর্ব এই চার বেদের আলোচনায় বিস্তারিত জানতে পারবো–

ঋগ্বেদ–ঋক অর্থ মন্ত্র। এই গ্রন্থের রচনার উর্ধ্বতম সীমা ধরা হয়েছে ১৬০০ খ্রি. পূর্ব অব্দ। ঋগ্বেদকে শুধু ভারতীয় চিন্তার নিদর্শন নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগোষ্ঠীগত সমস্ত জাতির ও ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেন। "The Rigveda is undoubtedly the oldest literary monument of the Indo-European Languages."[২১] ঋগবেদের পাঁচ শাখার নাম পাওয়া যায়–শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মণ্ডুক। এখন শুধুমাত্র শাকল শাখাটি বর্তমান আছে।[২২]

ঋগ্বেদ সংহিতার দু'প্রকার বিভাগ দেখা যায়–

১. মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক;

২. অষ্টম, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র।

প্রথম বিভাগটি বৈদিক অনুষ্ঠানের এবং দ্বিতীয়টি বেদাধ্যয়নের উপযোগী। ঋগবেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে বলা হয় ঋক্। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে সূক্ত গঠিত, কয়েকটি সূক্তের সমষ্টিকে বলা হয় অনুবাক। এরূপ কয়েকটি অনুবাক নিয়ে একটি মণ্ডল। ঋগ্বেদে মোট ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত এবং ১০৪৭২টি ঋক্ আছে। এ ছাড়া ১১টি 'বালখিল্য' সূক্ত এবং কতকগুলো 'খিলসূক্ত' যা পরিশিষ্ট ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ অনুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে ৮টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায় এবং ২০০৬টি বর্গ। ঋগ্বেদের মণ্ডল বিভাগটি প্রাচীনতম এবং বহুল প্রচলিত।[২৩]

সমগ্র ঋগ্বেদ ১০টি খণ্ডে বা মণ্ডলে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকটি অন্তর্গত মন্ত্রগুলো এক একটি বিশেষ ঋষি পরিবারেই রচিত হয়েছে।[২৪] ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন দশম মণ্ডলটি অপরগুলোর তুলনায় অনেক পরবর্তীকালের রচনা।[২৫]

ঋগ্বেদে সঙ্কলিত সূক্তগুলো আদিতে যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন পরবর্তী যুগে এগুলোকে নানাভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক সময় প্রাচীন ঋক্গুলোর এমনকি প্রাচীন শব্দগুলোর নতুন অর্থ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও হয়েছে। ঋগ্বেদের সামগ্রিক ভাষ্য বলতে আমরা যা পাই তা হলো খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের সায়ণের রচনা।[২৬]

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে নাটকের বীজ আছে। কেন নাটক সৃষ্টি হতে দেরি হলো তার কারণ তো খুব কঠিন নয়। ঋগ্বেদের পরে জীবন্ত সাহিত্যের গতি স্তব্ধ হয়েছিল। ঋগ্বেদের কোন কোন জীবন্ত কবিতায় যে নাট্যবীজ ছিল তা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপে প্রকট না হয়ে যজ্ঞকাণ্ডে ব্যবহৃত আখ্যানে প্রসাধনের মতো ব্যবহৃত হতে থাকে।[২৭] ঋগবেদের কোন কোন আখ্যানসূক্ত 'কণা-কাব্যনাট্য' বা 'নাট্যকাব্য কণিকা'।[২৮] রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের মূল যে বেদ তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের পরমাত্ম সূক্তে বলা হয়েছে–সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। ঋক্, ১০.১২৯.৪

সামবেদ–সো ধাতুর উত্তর মনিন প্রত্যয় করে সামন্ পদ নিষ্পন্ন হয়। সামন্ অর্থ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের বেদই সামবেদ। সামবেদই আর্য সঙ্গীতের উৎস। "The Samaveda Samhita is not

without value for the history of Indian Sacrifice and magic and the ganas attached to it are certainly very important for the history of indian music.[২৯]

সামবেদের যুগের অন্তিমপর্বে যে 'সারিগা প্রভৃতি সাতটি স্বরের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই একমত। "The scale of the music ordinarily ranged from one to four notes but during the later saman period, rose to seven notes."[৩০] শার্ঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ 'সঙ্গীতসুধাকর' গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনাথের উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়–

"সামানি হি ক্রুষ্ট (প্রথম-দ্বিতীয়)
মন্ত্রাতিস্বার্যাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ (তৃতীয় চতুর্থ)।"[৩১]

ভারতীয় সঙ্গীতের কেউ কেউ সেই তিনটি স্বরকে ষড়জ, ঋষব, নিষাদ বলতে চান, আবার কেউ কেউ ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম বলেন।

মানুষের যেমন সামের সুরে প্রসন্ন করা যায় তেমনি দেবতাদের প্রসন্ন করতেও ক্রমে সামগান প্রবর্তিত হলো। এইভাবেই লৌকিক অভিচারাদি কর্ম হতে সামগানের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হলো এবং সাথে অভিনয় যুক্ত করা হলো। সামবেদ যতই প্রাচীন হোক তবু ঋগ্‌বেদের হিসেবে অনেকটা নতুন। সামগানের ওহা, হোই, হোরি, হুম, হো প্রভৃতি শব্দার্থহীন সুরের টান স্তব মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। লোক সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সামগানে বহুবিচিত্র সুর হয়েছে। এখানে সংগীত, নাটক এবং দর্শন 'সকাশে সাম্নম্ অনধ্যয়নম্ গীতিষু সামাখ্যা তদ্যোগাদ্বেদ বচনম্'।[৩২]

ঋক্ মন্ত্রগুলোর উপর সাতটি স্বর প্রয়োগ করে বিভিন্ন ছন্দে ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সামগান করা হতো। যদিও বিশুদ্ধ সাহিত্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে সামবেদ ঋগ্‌বেদের কতকগুলো শ্লোকের সঙ্কলন মাত্র, তা সত্ত্বেও সামবেদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। আদিম সমাজ জীবনের স্বল্প অভিনয় যুক্ত সঙ্গীতের তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালে পুরোহিতেরা এই গানগুলোকে যে উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করুন না কেন, সামবেদের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সামবেদের যুগেরও অনেক পিছনের দিকে যেতে হবে।[৩৩]

যজুর্বেদ

সামবেদ যেমন উদ্‌গাতা পুরোহিত শ্রেণির সঙ্গীতের পুস্তক, যজুর্বেদ তেমনি অধ্বর্যু নামক পুরোহিত শ্রেণির কর্মকাণ্ডের উপযোগী গ্রন্থ। যজ্ ধাতুর অর্থ যজন করা। যজ্ ধাতুর সাথে উসি প্রত্যয় যোগ

করে যজুস্ পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যজুর্বেদ অর্থ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদ (যজুর্যজতেঃ–নিরুক্ত ৭.১২.৪)। যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ বলেই যজুঃ এই নামকরণ–

যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥ বায়ু, ৬০.২২[৩৪]

অর্থাৎ (ঋক্ ও সামব্যতীত) যা যজুর্বেদে অবশিষ্ট, তার দ্বারা যজ্ঞের যোজনা করা হল। যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যুঃ, যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁর প্রধান ভূমিকা। সায়ণাচার্য বলেছেন, 'অধ্বরং–যুনক্তীতি অধ্বর্যুঃ' অর্থাৎ যজ্ঞকে যিনি যুক্ত বা সম্পাদিত করেন তিনি অধ্বর্যু। অধ্বর্যু পদের এই ব্যুৎপত্তি ও যজ্ঞের সঙ্গে যুজর্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই সূচিত করে। যজ্ঞানুষ্ঠানে যজুর্বেদই প্রধান বলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য অন্য সকল বেদ বাদ দিয়ে সর্বাগ্রে যজুর্বেদেরই ভাষ্য রচনা করেছেন।

যজুর্বেদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক Winternitzবলেছেন, "without the Yajurveda we can not understand the Brahmanas and without these we not understand the Upanisads."[৩৫]

যজুর্বেদ দুভাবে বিভক্ত–শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। শুক্ল যজুর্বেদের একটি মাত্র শাখাই পাওয়া যায়। যার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখা–কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল বা কঠ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা এবং মৈত্রায়ণী সংহিতা। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কৃষ্ণ যজুর্বেদ অধিকতর প্রাচীন এবং কৃষ্ণ যুজর্বেদের বিষয়বস্তুকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা রচিত হয়েছে। যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ স্থানবিশেষে শ্লোকে ও স্থানবিশেষে গদ্যে রচিত। পরবর্তী সময়ে এই গদ্যকেই নাটকে রূপ দেওয়া হয়।[৩৬] এই সংহিতার সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ৪০তম অধ্যায়টি সুপ্রসিদ্ধ ঈশোপনিষদ। এটিই একমাত্র উপনিষদ যা সংহিতার সঙ্গে যুক্ত।[৩৭]

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের প্রায় এক সপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত।[৩৮] প্রবর্তক ঋষিদের নাম-অনুযায়ীই এই সংহিতাটি অথর্বাঙ্গিরস বেদ, ভৃগু আঙ্গিরস সংক্ষেপে অথর্ববেদ নামে অভিহিত হয়। এর অপর নাম 'ব্রহ্মবেদ'। অথর্ববেদ মূলত গৃহকর্মে অর্থাৎ গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী করেই সঙ্কলন করা হয়েছে। অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নেই বলেই এটি ঋক্-সামাদি ত্রয়ীর মধ্যে

পরিগণিত হয়নি। আবার অনেকে মনে করেন ‘ত্রয়ী’ শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হয়ে মন্ত্রবিভাগ লক্ষিত হয়েছে। এর মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণিতে (পদ্য, গদ্য ও গীতি) বিভক্ত। এই গদ্যাংশই অভিনয় করে কোথাও কোথাও দেখান হতো।[৩৯]

‘অথর্ববেদের দেবতারা অধিকাংশই ঋগ্বেদের যুগের দেবতা, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতেও অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। অথর্ববেদে যে দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায়, তাও ঋগ্বেদ অপেক্ষা পরবর্তী যুগের চিন্তা প্রবণতাকে নির্দেশ করে। ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করলেও অথর্ববেদকে ঋগ্বেদ থেকে পরবর্তীকালের বলে মনে হয়। তবে অথর্ববেদের সকল অংশ যে ঋগ্বেদ সংহিতার সকল অংশ থেকে পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছে, তা বলা যায় না। এমনকি, অথর্ববেদের কোন কোন অংশ ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ থেকে প্রাচীন না হলেও সমসাময়িক তো বটেই।’[৪০] অথর্ববেদের ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি পরিমাণে বাস্তববাদী।

অথর্ববেদের একটি শাখা ‘পৈপ্পলাদ’ এতকাল অপূর্ণ অবস্থায় বর্তমান ছিল। সাম্প্রতিককালে উড়িষ্যার এক গ্রাম থেকে দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় পৈপ্পলাদ শাখার সম্পূর্ণ সংহিতা আবিষ্কার করেছেন। এই পৈপ্পলাদের মধ্যে নাট্যবীজ লুকায়িত আছে বলে দুর্গাচরণের লিখনিতে প্রকাশ পেয়েছে।

একটি মত প্রচলিত আছে—বেদের যে মন্ত্রগুলোতে অর্থানুসারে ছন্দ ও পদ ব্যবস্থা আছে, সেই মন্ত্ররাজি ‘ঋক্’। ঋক্ মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে মন্ত্রগুলো গান করা হয়, সেগুলো সাম এবং ঋক্ ও সাম লক্ষণযুক্ত মন্ত্ররাজি ছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহকে (গদ্য ও পদ্য উভয়রূপ) ‘যজুঃ’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ ঋক্ ও যজুঃ লক্ষণযুক্ত, পৃথকত্ত্ববোধক বিশিষ্ট কোন লক্ষণ নাই। তাই ত্রয়ী বলতে অথর্ববেদও বোধ্য। ‘অস্য মহতো ভূত সৎ নিঃশ্বসিতমেতৎ ঋগবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ’ (বৃ. উ. ২. ৪, ১০. ১. ২.৪. ৫. ১১) অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের নিঃশ্বাস এই ঋগ্বেদ, যজুবেদ, সামবেদ ও অথর্বাঙ্গিরস বা অথর্ববেদ।[৪১] বেদের এই আলোচনায় একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পারি বেদের কোথাও কোথাও অভিনয়ের কথা উল্লেখ থাকলেও নাট্যবীজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেদের আনাচে কানাচে জুড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উপনিষদে নাট্যবীজ অনুসন্ধান

লোকনাট্যের উৎপত্তি অনুসন্ধানে বেদের মতো উপনিষদও সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছি–

উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শন ভাগ। উপনিষদ শব্দটি উপ-নি পূর্বক 'সদ্' ধাতু ক্বিপ প্রত্যায় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। উপনিষদের এক নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত), বেদের শেষ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার, এই জন্য এর নাম বেদান্ত এবং অজ্ঞাত নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে অপর নাম হয়েছে উপনিষদ্।[৪২] আচার্য শঙ্কর বলেছেন "সৈয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষছব্দ বাচ্যা।[৪৩] Hooritz বলেছেন, "Pannishad means Forest gathering disciples siting near their teachers engaged in religious discussion."[৪৪] উপনিষদ শব্দটিকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে প্রথম গ্রহণ করেন দ্রাবিড়াচার্য। শঙ্করাচার্য তাঁর অর্থকে গ্রহণ করেছেন 'ব্রহ্মগময়িতৃত্বেন যোগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্' (কঠ ভাষ্য)।

রাধাকৃষ্ণাণের মতে উপনিষদসমূহ রচিত হয় খ্রি. পূর্ব ১০০০ হতে খ্রি. পূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে। বাল গঙ্গাধর তিলক বহু গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ৪০০০ খ্রি. পূর্ব অব্দে বেদ সঙ্কলিত (রচিত নয়) হয়। হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস তখন থেকে প্রায় ৫১০০ বছর পূর্বে দ্বাপরযুগের শেষে ভারতযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ব্যাসদেব কর্তৃক বেদ সঙ্কলিত হয়।[৪৫] উপনিষদ শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকার–

ক) যারা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হয়ে (উপ) নিশ্চয়ের সঙ্গে (নি)-এর অনুশীলন করেন, এটি তাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে নাশ করে (সদ্), এজন্য ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ।[৪৬]

খ) ম্যাক্সমূলার বলেছেন, 'শিষ্য গুরুর নিকট বসে এই বিষয় চর্চা করতো বলেই এর নাম উপনিষদ।'[৪৭]

গ) 'সদ্' ধাতুর অর্থ জীর্ণ করা বা বিনাস করা। 'নি' অর্থ নিশ্চিতরূপে নিঃশেষে। যে বিদ্যা মানুষের জন্মমৃত্যুর কারণ বা অবিদ্যাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে বা বিনষ্ট করে সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ। উপ অর্থ নিকটে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করে যে বিদ্যা, যে পরম জ্ঞান মুক্তিকামী জীবকে

পরব্রহ্মের নিকটে নিয়ে যায়, পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনরূপ সেই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ বলে।[৪৮]

ঘ) যা আত্মজিজ্ঞাসু বা মুক্তিকামী মানুষকে ঈশ্বরের সমীপে গমনের পথ দেখায় তাই উপনিষদ (উপ সমীপে নিষীদত্যনয়েত্যুপনিষদ অথবা উপ সমীপং নিষাদয়তিগময়াতীত্যুপনিষৎ বাচকং নাম ইতি)।[৪৯]

ঙ) ডয়সন উপনিষদ্‌কে রহস্যগত জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। গুরুর সান্নিধ্যেতে বসে আয়ত্ত হতো বলে তার নাম উপনিষদ।

চ) "Upanishad means a confidential secret siting."[৫০]

রাধাকৃষ্ণাণের মতে, উপনিষদের সংখ্যা ২০০টি। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিক উপনিষদে ১০৮টি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১০টি ঋগ্‌বেদের, ১৯টি শুক্ল যজুর্বেদের, ৩২টি কৃষ্ণ যজুর্বেদের, ১৬টি সামবেদের এবং ৩১টি অথর্ববেদের অন্তর্গত বলে বর্ণিত। নিম্নে যথাসম্ভব তার তালিকা প্রদত্ত হলো–

ঋগ্‌বেদীয় উপনিষদ্–ঐতরেয়, কৌষীতকি, বহবৃচ, নির্বাণ, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, অক্ষমালিকা, মৃদ্‌গল, সৎভাগ্য, ত্রিপুরা।

শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ–বৃহদারণ্যক, ঈশ, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবালা, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, তারক, পৈঙ্গল, অধ্যাত্ম, ভিক্ষু, তাবসার, সাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্কা, তুরীয়াতীত, ব্রাহ্মণমণ্ডল এবং মুক্তিক।[৫১]

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় উপনিষদ্– তৈত্তিরীয়, কাঠ, শ্বেতাশ্বতর, কঠরুদ্র, ব্রহ্ম, কৈবল্য গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিক, সর্বসার শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্তি, স্কন্দ, শারীরিক, যোগশিক্ষা একাক্ষর, অক্ষি, অবধূত, হৃদয়, বরাহ, পঞ্চব্রহ্ম, যোগকুণ্ডলিনী, প্রাণাগ্নিহোত্র, কলিসন্তরণ ও সরস্বতীরহস্য।[৫২]

সামবেদীয় উপনিষদ্–ছান্দোগ্য, কেন, আরুণি, মৈত্রেয়ী, মৈত্রায়ণী, বজ্রসূচী, যোগচূড়ামণি, বাসুদেব, সন্ন্যাস, মহাঅব্যক্ত, কুণ্ডিক, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল, জাবালি।

অথর্ববেদীয় উপনিষদ–প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, অথর্বশিরঃ, অথর্বশিক্ষা, বৃহজ্জাবাল, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, ত্রিপুরতাপনী, জবালা, নারদ,শরভ, সীতা, রামরহস্য, দেবী, কৃষ্ণ, গণপতি, অন্নপূর্ণা, পাশুপত, সূর্যাত্মা, গরুড়, শাণ্ডিল্য মহানারায়ণ, পরিব্রাজক, ভস্ম, মহাবাক্য, ভাবনা, পরমহংস, দত্তাত্রেয় এবং হয়গ্রীব।[৫৩]

শঙ্করাচার্য্য প্রধান বারখানা উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে–ঐতরেয়, কৌশীতকী, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ঈশ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য। এছাড়া অর্বাচীন উপনিষদ আছে ১৩৮ খানা। বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠভাষায় উপনিষদ অনূদিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের বহুল প্রচলন করেন।

কোন বেদের সাথে কোন উপনিষদ যুক্ত তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো–

ঋগ্‌বেদ
- ঐতরেয়
- কৌষীতকি

সামবেদ
- ছান্দোগ্য
- কেন

শুক্ল যজুবেদ
- বৃহদারণ্যক
- ঈশ

কৃষ্ণ যজুর্বেদ
- তৈত্তিরীয়
- কঠ
- শ্বেতাশ্বতর

অথর্ববেদ
- প্রশ্ন
- মুণ্ডক
- মাণ্ডুক্য

এর মধ্যে ছান্দোগ্য ও কেন এ রয়েছে উপনিষদের সঙ্গীতের অংশ। এই সঙ্গীতকেই পরবর্তী সময়ে নাট্যে রূপ দেওয়া হয়।[৫৪] যাঁরা ছন্দ অর্থাৎ বেদগান করেন তাঁদের নাম ছান্দাগ্য। ছান্দোগ্যদের ধর্ম ও শাস্ত্রকে ছন্দোগ বলা হয়।[৫৫] এই উপনিষদে ব্রহ্মকে শ্যাম বলা হয়েছে। এই উপনিষদে 'সত্যকামজাবালা' ইত্যাদি কাহিনী আছে যাদের মাধ্যমে নানা তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে এবং এই কাহিনীই নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে।তৈত্তিরীয় উপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের মূল বিবৃত হয়েছে। (প্রথম অধ্যায়ের গীতগোবিন্দে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)

শঙ্করাচার্য্য অধ্যাত্মপ্রকাশ, আর্য্য সপ্তশতী, উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য, ভট্টিকাব্য টীকা, মোহমুদ্গার, শিবানন্দলহরী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। ব্রহ্মসূত্রে এবং উপনিষদগুলোর যে সকল ভাষ্য তিনি লিখেছেন তাদের উপর ভিত্তি করে আমরা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের পরিচয় পাই। অদ্বৈতবাদের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যই সাধারণ লোক শঙ্করের মতকে অদ্বৈতবাদী বলে জানে।[৫৬]

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো–

ব্রহ্ম সত্য
জগৎ মিথ্যা
জীব ব্রহ্মস্বরূপ।[৫৭]

তার দর্শনে আমরা সামগানের প্রভাব লক্ষ করি।[৫৮] বৈদিক সংগীতের মধ্যে প্রবেশ করা এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল।[৫৯] দু'একজন তথাকথিত আধুনিক বিশেষজ্ঞের কণ্ঠে সামগান শুনে নানারূপ ধারণা গঠন করা হয়েছে যে শঙ্করের সময়ে কিছু কিছু সামগানের প্রচলন ছিল। সেগুলো নাট্য আঙ্গিকে পরিবেশিত হত।[৬০]

রামানুজ–রামানুজ বলেন, ব্রহ্মই চরম সত্য ও সত্তা। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়, বিশেষণযুক্ত, ব্রহ্ম জগৎ বিশিষ্ট, কাজেই ব্রহ্ম সবিশেষ ও সগুণ। ব্রহ্ম অসংখ্য সদগুণের আধার।[৬১] 'রামানজু সৎকার্যাবাদের এবং পরিণামবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে।'[৬২] তিনি বলেন, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সচেতন পুরুষ। তিনি ভক্তের ভগবান করুণাময় ও কৃপাসিদ্ধু। সে জন্যইতো আমরা সবাই তাঁর কৃপার ভিখারী। উপাসনায় ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপার অধিকার অর্জন করতে হয়। ভক্ত যখন ভগবানের গুণগান করেন বিভিন্ন সুরে, ভগবান সেই সুরের মধ্যে অবস্থান করেন। 'শঙ্করের নির্জনা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে যে প্রেমভক্তিবাদ হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রাণশক্তি, তাতেই নবপ্রাণের সঞ্চার করেন দ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজ। বৈষ্ণব ধর্মের চার সম্প্রদায়–শ্রী-ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়। রামানুজ হলেন ঐতিহাসিকভাবে শ্রী মতের প্রচারক। রামানুজের সময়ে সংগীতের কিরূপ ছিল তা অনুমান করা কঠিন তবে সামগানের অল্পকিছু উদাহরণ পাওয়া যায়।'[৬৩] তবে সেইসব সামগানের কোন নাট্যরূপ দেওয়া হতো কিনা সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় না।

মাধব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমাধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের দ্বৈতমত ব্যাখা করেন। মাধ্বাচার্যের মতে ব্রহ্ম জীব থেকে ভিন্ন, প্রত্যেক জীব অন্য জীব থেকে ভিন্ন, জীব ও জগৎ ভিন্ন। 'জ্ঞানের আদি কারণরূপে নিত্য, নির্দোষ, পূর্ণ ব্রহ্ম সর্বকতা এবং সর্বদাতা রূপে বিষ্ণু। তাঁর মতে ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। দ্বৈতবাদ স্থাপন করে মাধ্বাচার্য ভক্তিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।[৬৪] মাধ্বাচার্যের মতে ঈশ্বর ও জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তিপথের একমাত্র উপায়।[৬৫] গীতাভিনয় তাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের উপাসনার পথ হিসাবে।[৬৬]

প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্ব এই তিনজন উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন। আধুনিককালেও রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এটির বঙ্গানুবাদ করেন এবং ঋষি অরবিন্দ এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন।[৬৭] ঋষি অরবিন্দের যে আশ্রমগুলো রয়েছে সেখানে শুরু থেকেই ব্রহ্মমন্ত্রের পাশাপাশি অভিনয় ও সংগীত রয়েছে উপাসনার মাধ্যম হিসাবে। ঋষি অরবিন্দ বৈষ্ণব পদাবলী শুনতেন এবং বিদ্যাপতির কিছু পদ তিনি অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদগুলো রয়েছে ঋষি

অরবিন্দের ‘Song of Vidyapati’ গ্রন্থে। তবে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সারৎসার বিবৃত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ঋগবেদ সংহিতায়।

ঋষি অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি, ভারত
চিত্রটি ধারণ করা হয়েছে ২০১৭ সালের মে মাসে

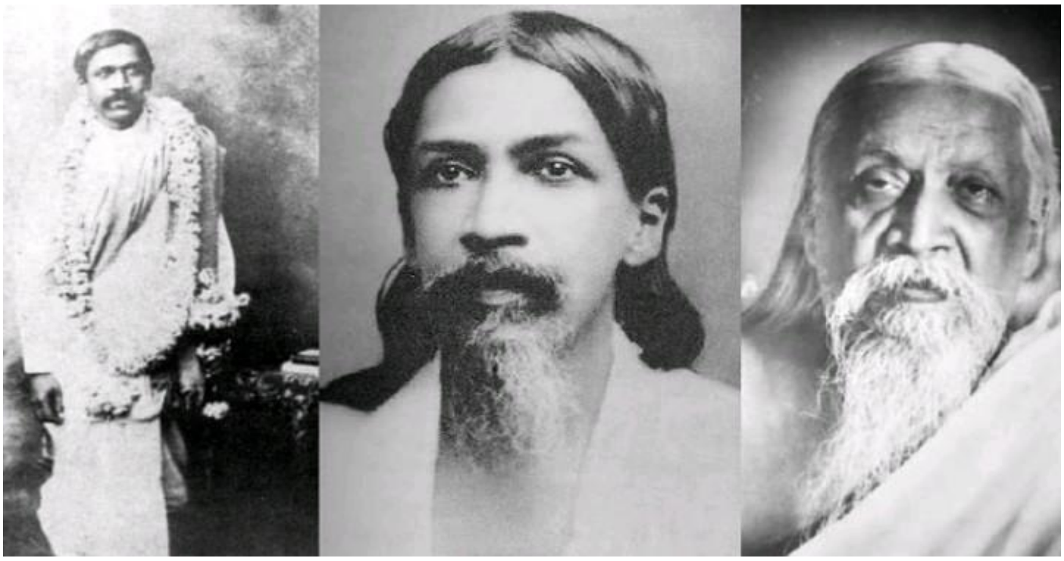

ঋষি অরবিন্দের তিন বয়সের তিনটি ছবি

বাংলাদেশের এ মতের উদ্ভব বহুকাল আগে ঘটলেও এদেশে এর ভিত্তি প্রথম রচনা করেন রামানুজ। শঙ্করের নির্জলা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে যে প্রেমভক্তিবাদ হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রাণশক্তি, তাতেই নবপ্রাণের সঞ্চার করেন বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজ এবং এমতই প্রেমধর্ম বা ভক্তিধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) হাতে। সেই কারণে রামানুজের দর্শনে আমরা সংগীত ও অভিনয়ের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করতে পারিনা। প্রাথমিক বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ বৈদান্তিক ঈশ্বর। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত মতে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন, বিষ্ণু কৃষ্ণের অবতার, কৃষ্ণই বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্তা। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব কৃষ্ণ ও বিষ্ণু স্তোত্রাদি আছে তা বহুলাংশে অদ্বৈতবাদাত্মক।

আধুনিককালে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য এই পাঁচজন অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে কেবল অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ–এই পাঁচ প্রকার মতবাদ প্রচার করেছেন।

নির্ম্বাক রামানুজের মত ত্রিতত্ত্ববাদী। ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ এই তত্ত্বত্রয়। ব্রহ্মকে রামানুজ বিষ্ণু ও নির্ম্বাক কৃষ্ণ নামে অভিহিত করেছেন এবং বিষ্ণুর নিত্য সহচারী লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণের নিত্য সহচারী রাধা–এই মাত্র সাম্প্রদায়িক প্রভেদ, শঙ্করের মতে ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য। রামানুজ ও মধ্বের মতে বিষ্ণু এবং নির্ম্বাক ও বল্লভের মতে কৃষ্ণই ব্রহ্ম।

নির্ম্বাক দর্শনের কিছুটা সাদৃশ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাথে থাকলেও একথা বলা যাবে না যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পুরোপুরি নির্ম্বাক দর্শনানুসারী। সেভাবে দেখলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সাথে ব্রহ্মবৈবর্তের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

তাই বলা যায়, প্রাথমিক গৌড়ীয় ধর্ম দর্শনের ভিত্তি শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও রামানুজ নিম্বার্ক মাধ্ব বল্লভ ও চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-এর মাধ্যমে ভক্তিবাদে গিয়ে পৌছেছে। আর এর পুরোটা জুড়েই রয়েছে সংগীত ও নাট্যাভিনয়ের অস্তিত্ব।

ব্রহ্ম-মাধ্বর্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণের তালিকা–

১. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ২. শ্রীব্রহ্মা, ৩. শ্রীনারদ মুনি, ৪. শ্রীল ব্যাসদেব, ৫. শ্রীমধ্বাচার্য, ৬.শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ, ৭. শ্রীনৃহরি তীর্থ, ৮. শ্রীমাধব তীর্থ, ৯. শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ, ১০. শ্রীজয়তীর্থ, ১১. শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ, ১২. শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ, ১৩. শ্রীজয়ধর্ম তীর্থ, ১৪. শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ, ১৫. শ্রীব্যাসতীর্থ,

১৬. শ্রীলক্ষ্মীপতি, ১৭. শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, ১৮. শ্রীল ঈশ্বরপুর, ১৯. শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ২০. শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, ২১. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, ২২. শ্রীল রূপ গোস্বামী, ২৩. শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, ২৪. শ্রীল সনাতন গোস্বামী, ২৫. শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, ২৬. শ্রীল জীব গোস্বামী, ২৭. শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ২৮. শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর, ২৯. শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, ৩০. শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, ৩১. শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, ৩২. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ৩৩. শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, ৩৪. শ্রীল শক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ।

শ্রীল জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি এবং পুরুষোত্তম তীর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বিধায় তাঁদের নাম এই তালিকায় রাখছিনা। (গুরু পরম্পরা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পুরাণে নাট্যধারার অভিনয় অনুসন্ধান

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক ধরনের কাহিনী কেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ পুরাণ নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে এগুলোর প্রচার এবং একাধারে ইতিহাস, কাহিনী, দর্শন ও কাব্য হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ জীবনেরই মতো বিরাট অখণ্ড সর্বন্ধর, সবংসহ সদ্ভাব ও বিরোধ উভয়েই পূর্ণ, সংগতার্থ ও অসংগতার্থ উভয় প্রকারের বাণী বা বচন পুরাণে বিদ্যমান।'[৬৮] বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করেই পালা কীর্তন, বিভিন্ন নাটক, লোকনাট্যের বিভিন্ন পালা রচিত হয়েছে। নিম্নে আমি বিভিন্ন পুরাণের বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

পুরাণ বিষয় নিয়ে আলোচনা গবেষণার বয়স অন্ততঃ শত বৎসরের কম নয়। পণ্ডিত উইলসনকে এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক বলা যায়। তিনি বলেন, 'পুরাণ হলো মিথ নির্ভর, অনৈতিহাসিক ও কল্পনাশ্রয়ী।'[৬৯] উইলসনের সমসাময়িক ভ্যানস কেনেডি পুরাণকে প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে গণ্য করেছেন।[৭০] তবে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন নি।

পুরাণের অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাগুলো লুকিয়ে আছে, সেগুলো পড়লে প্রতি মুহূর্তে অবাক হয়ে যাই। 'যা নেই পুরাণে, তাই নেই মননে অর্থাৎ ভারতীয় মনন ও মানসিকতার সর্বত্র পুরাণের প্রভাব চোখে পড়ে।'[৭১] পুরাণের কাহিনীর মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক-একটি রূপ যেমন পরিস্ফুটিত হয়েছে, তারই পাশাপাশি দেখা গেছে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির (নিচু শ্রেণির মানুষ) মানুষের কাহিনী। এইভাবেই পুরাণ ভারতীয় সমাজের সর্বাত্মক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।[৭২] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যভাগে পুরাণ সম্পর্কে এভাবে দেওয়া আছে–'পুরাণ সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ (খ্রি. পূর্ব ৬০০-৪০০) ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ রচনা করেন।' সেখানে পুরাণ আঠারটি উল্লেখ করা হয়েছে। আঠারটি পুরাণ হলো–

ব্রহ্মপুরাণ
পদ্মপুরাণ
বিষ্ণুপুরাণ
বায়ুপুরাণ
ভাগবতপুরাণ
নারদীয়পুরাণ

মার্কণ্ডেয়পুরাণ
অগ্নিপুরাণ
ভবিষ্যপুরাণ
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
লিঙ্গপুরাণ
বরাহপুরাণ
স্কন্দপুরাণ
বামনপুরাণ
কূর্মপুরাণ
মৎস্যপুরাণ
গরুড়পুরাণ ও
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এসব পুরাণে সৃষ্টির কথা, বড় বড় রাজবংশের কথা, ধর্ম-কর্ম ও ব্রতনিয়মের কথা আছে।[৭৩] পুরাণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্য এবং এই বিষয়গুলো পালাকীর্তন, যাত্রা এবং লোকনাট্যে কিভাবে এসেছে সেটি বোঝার জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করেছি–

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ–মহাপুরাণের অন্যতম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ চারখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডে সৃষ্টি নিরুপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের মাহাত্ম বর্ণন প্রভৃতি; তৃতীয় খণ্ডে গণেশ ও পরশুরামের উপাখ্যানাদি এবং চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পেয়েছে।[৭৪] পরবর্তীতে এসব কাহিনী নিয়ে লীলাকীর্তনের বিভিন্ন পালা, যাত্রা ও লোকনাট্যের পালাও লিখা হয়েছে। অনেক বছর আগে অনুসন্ধিৎসু মুনিদের কাছে স্বয়ং বায়ু এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বিবৃত করেছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যে বসে এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেদব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ, সুত, শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে আবার এই কাহিনী বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তন লুকিয়ে রয়েছে। রয়েছে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য, যুগের ভাগ, মন্বন্তেরের ইতিহাস, জম্বুদীপ, ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন ভূখণ্ডের ভৌগলিক বিবরণ।

অগ্নিপুরাণ–দৈনন্দিন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীকভাবে যুক্ত থাকা সমস্যার সমাধান কল্পেও এই পুরাণ একটি আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে আছে সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সূত্র। এছাড়া সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্বাচিত অংশ। অগ্নিপুরাণ একটি জ্ঞান সমুদ্র বিশেষ। স্বয়ং অগ্নিদেব একসময় দেবতা, ঋষি, মুনি ও ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে এই পুরাণ বিবৃত করেছিলেন। পরে বেদব্যাস এই জ্ঞানভাণ্ডারটি বশিষ্টদেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুতের হাতে তুলে

দেন। সুত নৈমিষ্যারণ্যে এসে শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে এই পুরাণ কাহিনী বিবৃত করেছিলেন।

ব্রহ্মপুরাণ–সুপ্রাচীনকালে প্রজাপতি দক্ষ পৃথিবীর রহস্য জানার জন্য আগ্রহী হয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা নিজের মুখে এই কাহিনীগুলো বলেছিলেন বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল ব্রহ্মপুরাণ। মহামুনি পরাশরের ছেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই কাহিনী শুনেছিলেন ব্রহ্মার কাছে। তিনি তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণ সুতকে এই কাহিনী বিবৃত করেন। সুতের মনে এই কাহিনী চিরস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। সুত নৈমিষ্যারণ্যে এসে বিভিন্ন মুনি-ঋষির কাছে এই কাহিনী বিবৃত করেন। এইভাবেই ব্রহ্মপুরাণ ভারতীয় পুরাণ ইতহাসে এক অসাধারণ আভিজাত্য লাভ করে।

বামনপুরাণ–পুলস্ত্য ঋষি দেবর্ষি নারদকে এই পুরাণের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ব্যাসদের এটি লিপিবদ্ধ করেন। আর ব্যাসদেবের শিষ্য সুত এই কাহিনী শৌনক প্রমুখ ঋষিদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। এই বামনপুরাণের মধ্যে ঋষি, নারায়ণ ইত্যাদি অলৌকিক ক্ষমতা বিবৃত হয়েছে। আবার বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের নাতি দৈত্যরাজ বলির আধিপত্য ভগবান বিষ্ণু বামন রূপে কীভাবে নষ্ট করেছিলেন সে কথাও বলা হয়েছে। সেজন্যই এই পুরাণের নামকরণ করা হয়েছে বামনপুরাণ।

কূর্মপুরাণ–'কূর্মপুরাণ দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম, জগতের উৎপত্তির বিবরণ, কৃষ্ণ চরিত্র, যুগধর্ম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে ঈশ্বরগীতা, ব্যাসগীতা, তীর্থমাহাত্ম্য, প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।'[৭৫] এই পুরাণ রচনার অন্তরালে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। এই কাহিনীকে অবলম্বন করেই পরবর্তী সময়ে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। কাহিনীটি হলো–দুর্বাসা মুনির অভিশাপে স্বর্গলোক একদা লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়েছিল। তখন নারায়ণের পরামর্শ মতো দেবতারা অসুরদের সাথে সন্ধি করেন। তাঁরা মন্দার নামক পর্বতটিকে ক্ষীরোদ সাগরে নিয়ে আসেন। সেটিকে ব্যবহার করেন মন্থন দণ্ড হিসেবে। আর বাসুকি নাগ হয় রজ্জু। দেবাসুররা মিলিত হয়ে সমুদ্রকে মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু এক বিরাট আকারের কূর্মের রূপ ধারণ করে ওই মন্দার পাহাড়টিকে তাঁর পিঠে ধারণ করেছিলেন। এই সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত উঠেছিল। দেবতারা তা পান করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। আর অসুররা শুধুমাত্র শ্রম দিতে বাধ্য হয়। নারদ মুনির প্রশ্নের উত্তরে কূর্মরূপী ভগবান এই পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তাই এই পুরাণের নামকরণ করা হয়েছে কূর্মপুরাণ। লোমহর্ষণ মুনি ব্যাসদেবের কাছে এই পুরাণের কাহিনী শুনে পরবর্তীকালে তা ঋষিদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন।

ভাগবতপুরাণ–শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুদের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদান্ত-দর্শন বা উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। এই সূত্রটি নিয়েই ভাগবাত আরম্ভ। উভয় গ্রন্থেরই

চরম বস্তু ব্রহ্ম। পার্থক্য হলো ব্রহ্মসূত্রে পরম তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মভূমিতেই আছেন, আর ভাগবতে পরম ত্তত্ত্ববস্তু মানবভূমিতে নেমেছে (ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, পৃ. ঠ)। এতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল আদর্শ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথার বর্ণনাভঙ্গিতে। প্রায় চতুর্দশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত এই ভাগবত সকল পুরাণের মুকুটমণি।[৭৬] তাই সূতমুনি বলেন–

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামুচ্যতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ!॥"
[ভাঃ ১২/১৩/১৬-১৭][৭৭]

অর্থাৎ হে দ্বিজগণ! নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগানের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণসমূহের মধ্যে সেইরূপ ভাগবত শ্রেষ্ঠ। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশী সর্বোত্তম, পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবতও তেমনি সর্বোত্তম।[৭৮]

দ্বাপরযুগ ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে আর একবার এই জাতিকে বাঁচিয়ে ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত। মহাপ্রভু এসে দান করলেন ঘরে ঘরে, নরে নরে কৃষ্ণপ্রেমধন আর নিবিড় মানব–প্রীতি। 'কৃষ্ণকে ভালবাস আর কৃষ্ণের জনগণকে ভালবাস'–এই মহাবাণী দিলেন গৌরসুন্দর সবাইকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মধ্যস্থতায়–'মধ্যস্থ শ্রীভাগবতপুরাণ।'[৭৯]

ভাগবত শুধু একটি গ্রন্থই নয়, ভাগবত একটি বিশেষ প্রকারের জীবন-ধারা। ভাগবতের প্রসঙ্গ নিত্য আস্বাদনে নরনারী এক দিব্য জীবন-প্রনালী লাভ করল। ফলে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থান্ধতা, বিদ্বেষ, সমাজ হতে কমে গেল। মানুষে মানুষে মিলনের বাঁধা রইল না। একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠায় জাতি বাঁচল।

'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।'[৮০]

ভাগবতে মূলত শ্রীকৃষ্ণলীলার কথাই বিবৃত হয়েছে। ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণের শারদীয় রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে (ভাগবত ১.২.৯.১)। ভাগবতকার ভাগবত শেষ করতে গিয়ে যে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করেছেন, আমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি–

'ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।

তথা কুরুস্ব দেবেশ! নাথস্তং নো যতঃ প্রভো॥

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।

প্রণামো দুঃখ শমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥' ১২/১৩/২২-২৩

হে প্রভু! যোগেশ্বর! জন্মে জন্মে যাতে আপনার চরণকমলে আমার ভক্তি জন্মে আপনি কৃপাপূর্বক তদ্রূপ বিধান করুন। কারণ আপনিই আমাদের নাথ। যাঁর নামসংকীর্তন সর্বপাপ–বিনাশক, যিনি নিবারক (সর্বদুঃখ দূর করেন), আমি সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে প্রণাম করি।[৮১]

নারদীয়পুরাণ–অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে যে ছয়টি পুরাণকে সাত্ত্বিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, নারদীয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি কাহিনীর মাধ্যমে হরি ভক্তির কথাই সশ্রদ্ধ চিত্তে ঘোষিত হয়েছে।[৮২]

মার্কণ্ডেয়পুরাণ–কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন মহর্ষি জৈমিনি। তিনি মহাভারত অধ্যয়ন করেন। মাহাভারতকে আমরা পঞ্চম বেদ বলে থাকি। এই মহান গ্রন্থটি অধ্যায়ন করার পর তাঁর মনে কিছু সংশয় জেগেছিল। সংশয় নিরসনের জন্য তিনি এলেন মহামুনি মার্কণ্ডেয়র কাছে। তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, যাঁকে আমরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের ধারক ও বাহক বলে থাকি, সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন নররূপ ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন? তিনি আরও জানতে চেয়েছিলেন, দ্রৌপদীকে কেন পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হতে হয়েছিল? আর যিনি অনন্ত শক্তি তিনি কেন বলদেব রূপে ব্রহ্মহত্যা করলেন? দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের অকাল প্রয়ান কেন হয়েছিল? এইসব জটিল পৌরাণিক প্রশ্নের উত্তর আছে মার্কণ্ডেয়পুরাণের পাতায় পাতায়। এছাড়া আছে এমন কিছু কাহিনী যার মধ্যে জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসার সংমিশ্রণ দেখা যায়। মার্কণ্ডয়পুরাণকে একটি জ্ঞানগর্ভ মহান সাহিত্য সম্ভার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।[৮৩] শাক্ত দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সম্মিলিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শাক্ত দর্শনে তথা তান্ত্রিক ধর্মে গৃহীত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী শুম্ভাসুরকে বলছেন–'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' অর্থাৎ আমিই একমাত্র জগতে বিরাজমান আছি। তিনিই শক্তি, তিনিই চনকাকৃতি। চনক (ছোলা) যেমন দুটি দানাকে ধারণ করে একটি আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে একত্ত্বের প্রকাশক হয়, তেমনি চিৎ (জ্ঞান) ও অচিৎ (জড়বস্তু) উভয়কে একটি সত্তা দ্বারা বেষ্টিত করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই চিৎ অচিৎ উভয় ব্যপ্ত সত্তাই শক্তি। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে। কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন–'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'– যে তুমি সেই আমি; আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। (মার্কণ্ডেয়, ৯০, ৩)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ : রচনার বিশালত্বে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়, বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে অনেক সমালোচক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মবৈবর্তকেই শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলে থাকেন।[৮৪] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ চারটি খণ্ডে বিভক্ত–ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড। চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও

দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পেয়েছে।[৮৫] অষ্টাদশ পুরাণ কাহিনী সমগ্রতেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত– উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৬]

ব্রহ্মখণ্ডে বিবৃত হয়েছে সৃষ্টি প্রকরণের বিভিন্ন বিষয়।[৮৭] এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে নারদের প্রতি ব্রহ্মায় অভিশাপ, শিবের দ্বারা নারদমুনির জ্ঞানলাভ, দক্ষশালে চন্দ্রের যক্ষাব্যাধি এবং শিবের নিকট নারদের দীক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গ।[৮৮] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের বসন্তকালীন রাসলীলার বর্ণনা আছে (ব্র. বৈ. ৪.২৮.৬/৪.১৩.১১৮)। আর একটি কথা একমাত্র এই পুরাণেই রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যথাবিধি বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মা ছিলেন সেই বিবাহের কন্যাকর্তা ও পুরোহিত (ব্র. বৈ৪,১৫.১২৮–৩৪)। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুরাণে পরকীয়া তত্ত্বের সমর্থন করা হয়নি। তবে একটি কথা বলে রাখা ভাল নির্ম্বাক দর্শনের সাথে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও কোন পুরাণই এককভাবে কোন দর্শন বা মতবাদকে অনুসরণ করে চলেনি।

প্রকৃতিখণ্ডে আছে কীভাবে প্রকৃতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছে, তার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা। আমরা কীভাবে কোন দেবীকে এবং দেবতাকে পূজা করবো তার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৯]

গণপতিখণ্ডে আছে হরি ব্রতাদির ফল এবং গণপতির জন্ম রহস্য উন্মোচন। শনির দৃষ্টিতে কীভাবে গণেশের মুণ্ডপাত হয়েছিল, সেই কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীটিও এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। গনেশ কেন এক দণ্ডের অধিকারী, আর আছে পরশুরামের কাহিনী।[৯০]

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের উৎপত্তি বিষয়ে নানা গল্প বর্ণিত হয়েছে। আর আছে শ্রীমতির ভয়ে কেন কীভাবে বিরজা নদীরূপ ধারণ করেছিলেন সে কথা। আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাহিনী এবং জন্মাষ্টমী ব্রত কথা, কিভাবে পুতনা রাক্ষসীকে বধ করা হয়েছিল, আছে রামকৃষ্ণের বনান্তরালে কথোপকথনের ইতিহাস এবং কংসবধের কাহিনী।[৯১]

শিবপুরাণ : ব্যাসদের রচিত এই শিবপুরাণ হল এক বিশাল গ্রন্থ। এই পুরাণের ছয়টি ভাগ আছে–জ্ঞান সংহিতা, বিদ্যেশ্বর সংহিতা, কৈলাস সংহিতা, বায়বীয় (পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ), আর ধর্ম সংহিতা। এই পুরাণে দেবাদিদেব শিবের কথাই বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া এই পুরাণে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য। আর আছে প্রাচীন রাজাদের কাহিনী, আছে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের আনুপূর্বিক বর্ণনা। এছাড়া গণেশের বিয়ের খবর, শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে সুদর্শন চক্র লাভ করলেন, নন্দী, ভৃঙ্গি ও সোমনন্দীর আসল পরিচয় ইত্যাদি।

বরাহপুরাণ : একাদশ পুরাণ কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে বরাহপুরাণের পাতা থেকে। একসময় মহাপ্লাবনে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত অনন্ত জলরাশি। তখন

ব্রহ্মার একান্ত অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু বরাহ মূর্তি ধারণ করলেন। তিনি জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। এরপর দৈত্য হিরণাক্ষকে বধ করে পৃথিবীর অশান্তি দূর করেন। তারপর বরাহ রূপ ধরে এই পুরাণ কথা বিবৃত করেন। তাই এই পুরাণের নামকরণ করা হয়েছে বরাহপুরাণ। ভগবান বিষ্ণু যে কী অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন, তিনি ইচ্ছা করলে যে কী অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন, বরাহপুরাণের মাধ্যমে তাই বলা হয়েছে।

মৎস্যপুরাণ : ভগবান বিষ্ণু একবার মৎস্যাবতার হয়ে মহাপ্রলয় হতে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। তাঁর নির্দেশে মনু মহারাজ অলৌকিক জলযানে সৃষ্টির যাবতীয় বীজ সঙ্গে নিয়ে মৎস্যরূপী বিষ্ণুর পাখনায় সুদীর্ঘ কাল নোঙর করেছিলেন। এইসময় বিষ্ণু মনুকে আদিপুরুষ সম্পর্কে নানা কাহিনী বিবৃত করেন। এছাড়া তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলোও ব্যাখ্যা করেছিলেন। ওই পুরাণ কাহিনীর নাম হল মৎস্যপুরাণ। বেদব্যাস পরে এই কাহিনী সংকলন করে প্রিয় শিষ্য সুতের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন। সুত নৈমিষ্যারণ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসু মুনি-ঋষিদের সামনে এই পুরাণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণ : ভবিষ্যপুরাণে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, কবীর, নানক প্রমুখের জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। আবার ব্রাহ্মধর্মের কাহিনীও আছে।

পদ্মপুরাণ : পদ্মপুরাণকে একটি মহাপুরাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পুরাণকে ব্যাসদেব পাঁচভাগে ভাগ করেছেন–(ক) সৃষ্টিখণ্ড, (খ) ভূমিখণ্ড, (গ) স্বর্গখণ্ড, (ঘ) পাতালখণ্ড, (ঙ) উত্তরখণ্ড। প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষির নানান বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। তিনি একদিকে যেমন ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, অন্যদিকে বিভিন্ন তীর্থের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেন। ভূমিখণ্ডে পৃথু, যযাতি ইত্যাদির সঙ্গে কিছু মুনি-ঋষির পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। স্বর্গখণ্ডে সৃষ্টিখণ্ডের মতো ধর্ম, ব্রত, যুধিষ্ঠির প্রমুখ রাজ-রাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। পাতালখণ্ডে আছে রামচন্দ্রের কাহিনী। উত্তরখণ্ডে সাগর রাজার কাহিনী, ভাগবত, গীতা ইত্যাদির সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণ : এই পুরাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করা। তাই এই পুরাণের নামকরণ করা হয়েছে বিষ্ণু পুরাণ। আমরা সচ্চিদানন্দ ভগবান কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তির কথা জানি। এই তিন প্রকার শক্তি হল সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী (বিষ্ণু ১.১২.৩৯)। হ্লাদিনী শক্তিদ্বারাই তিনি নিজে আনন্দ ভোগ করেন এবং জীবকে আনন্দ দেন। রাধাই মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। প্রেমেই প্রকৃত আনন্দ, তাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হয়েছে–হ্লাদিনীই সার প্রেম। প্রেম চরমোৎকর্ষ পায় মহাভাবে। রাধা সেই মহাভাব-স্বরূপিণী এবং পরম আহ্লাদরূপিণী।

গরুড়পুরাণ : গরুড়পুরাণকে সাত্ত্বিক পুরাণ বলা হয়ে থাকে। এই পুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতা তাঁর বাহন গরুড়। মহর্ষি বেদব্যাস এই পুরাণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুত মুনিকে শুনিয়েছিলেন। সুত মুনি নৈমিষারণ্যের ঋষিমণ্ডলীর কাছে এই পুরাণ কাহিনী প্রচার করেন। যেহেতু এই পুরাণের প্রথম বক্তা ভগবান শ্রীগোবিন্দ; তাই আমরা বুঝতে পারি যে, এই পুরাণ পাঠ করলে আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে।

গরুড়পুরাণ দুটি খণ্ড আছে–পূর্বখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। পূর্বখণ্ডে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আছে সূর্য-চন্দ্র বংশের বিবরণ, পাপ করলে কীভাবে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আমরা পাপস্খলন করতে পারি, তার বিবরণ। উত্তরখণ্ডে আছে মানুষের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিতব্য নানা পারলৌকিক ক্রিয়ার ওপর আলোচনা। আছে বৃষোৎসর্গ, প্রেতত্বনাশকর্ম ইত্যাদি।

গরুড়ের প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দ যখন উত্তরদান করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি এর মধ্যে কল্পনার কোনো স্থান নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত প্রশ্ন মনে জাগে, মহাত্মা বিষ্ণু তা সাবলীলভাবে উত্তর দিয়েছেন। গরুড় পুরাণ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি এর সাথে বাস্তবতার যোগসূত্র কতখানি।

স্কন্দপুরাণ : আঠারোটি পুরাণর মধ্যে অন্যতম হল স্কন্দপুরাণ। এই পুরাণে মোটি ছয়টি খণ্ড আছে–(১) কাশীখণ্ড, (২) উৎকলখণ্ড, (৩) প্রভাসখণ্ড, (৪) মাহেশ্বরখণ্ড, (৫) বৈষ্ণবখণ্ড এবং (৬) ব্রহ্মখণ্ড। শিবপুত্র কার্তিকের অপর নাম হল স্কন্দদেব। তিনি এই পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন বলে এই পুরাণকে স্কন্দপুরাণ বলা হয়। এর মধ্যে প্রভাসখণ্ড ও বৈষ্ণবখণ্ড পালাকীর্তন ও লোকনাট্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[৯২] তবে প্রভাসখণ্ড অবলম্বনে যে পালাটি করা হয় সেটি মূল পালাকীর্তনের পালা হিসেবে বিবেচ্য নয়। এটি লোকনাট্যের অন্তর্গত। (তথ্যসূত্র : অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য)

লিঙ্গপুরাণ : স্বয়ং ব্রহ্মা এই লিঙ্গপুরাণ রচনা করেছিলেন। তিনি এটি লিখেছেন মূলত মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রমাণ করার জন্য।পরবর্তীকালে লোমহর্ষণ সুত, মহামুণি ব্যাসদেবের কাছে জ্ঞাললাভ করে নৈমিষ্যারণ্যে এই পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করেন। সেখানে বিভিন্ন মুণির মধ্যে শৌনকও উপস্থিত ছিলেন। এইসব পৌরাণিক কাহিনীই বিভিন্ন নাটকে স্থান পেয়েছে বিশেষভাবে। পরবর্তী সময়ে এইসব কাহিনী লোকনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে।

পুরাণের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি বৈষ্ণব কাব্য–সাহিত্য, যাত্রা নাটকাদি, লোকনাট্য-ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব অধিক রয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ পদকর্তার পদাবলীতে, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণের মত উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব অথবা মৎস, বায়ু বা অগ্নিপুরাণের মত নানাবিধ

তথ্যে সমৃদ্ধ না হলেও কবিকর্মের যে দুটি প্রধান উপাদান ‘প্রেম ও গল্প’ বা কাহিনী তা এই পুরাণে প্রচুর পরিমাণে আছে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এই প্রেমভাবের দ্বারা এবং কৃষ্ণমঙ্গল তথা পরবর্তী যাত্রা, নাটকাদি, লোকনাট্য ‘প্রেম ও গল্প’ উভয়ের দ্বারা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অস্তিত্ব

প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অস্তিত্ব প্রথম সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে। গ্রন্থটির 'প্রবৃত্তিব্যঞ্জক' অধ্যায়ে অঞ্চলভেদে চতুর্বিধ বৃত্তি আশ্রিত নাট্যের কথা বলা হয়েছে। ভরতমুণি প্রবৃত্তি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন–'নানাদেশ বেষভাষাচারাবার্তা' ঃ অর্থাৎ দেশ-বেশ-ভাষা ও রীতি অনুসারে চার ধরনের প্রবৃত্তি বর্তমান রয়েছে। এগুলো হলো–আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী এবং ওড্র-মাগধী।[৯৩] ভরতমুণির বর্ণনা মতে, সেকালে যে সকল অঞ্চলে ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে পূর্ব-ভারত তথা পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশও রয়েছে। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন–এই ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি হচ্ছে উত্তেজনাপূর্ণ আবেগদীপ্ত বাচিক অভিনয়।' ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাট্যবিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে–এই ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি ভারতী ও কৈশিকী প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রচিত। এর মধ্যে কৈশিকী বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত। আর কৈশিকী বৃত্তির জন্য ব্রহ্মা আলাদাভাবে তেইশজন অপ্সরা তৈরি করেছিলেন। এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৈশিকীর প্রয়োগ সম্ভব নয়। ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে এর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বসন-ভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–এর পোশাক বা আহার্য হবে মনোরম এবং এই প্রবৃত্তি আত্মা হচ্ছে 'ক্রিয়া' ও 'রস'। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভরতমুণি আরো বলেছেন–এ হচ্ছে 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সহযোগে দলিত-অঙ্গাভিনয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রয়োগ বিচারে ভরতকৃত 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য'-এর রীতি ভিন্ন। এর মধ্যে 'নৃত্ত' হচ্ছে জনপ্রিয় লৌকিক নাট্যাভিনয়–যা ছন্দ-তালে সাধারণ অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর এতে নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত কোনো মার্গীয় মুদ্রারীতির অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয় না। ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে কৈশিকী প্রসঙ্গের বিবরণে 'নৃত্ত' শব্দটির ব্যবহার দেখে প্রাচীনকালের ওড্র-মাগধী নাট্যরীতির লৌকিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হয়ে ওঠে। কাল বিচারে বলা যায়, ওই ওড্র-মাগধী রীতি ভরতমুণি এবং তাঁর পূর্বকালেও প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় নাট্যশাস্ত্রের 'প্রচলিত রূপটি'র নিম্নতর সীমারেখা অষ্টম শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।[৯৪]

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোঠার কাজ
চিত্রগুলো ধারণ করেছি ২০২০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি

অষ্টম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলায় 'বুদ্ধ নাটক' নামে আরেক ধরনের বিশেষ রীতির নাট্যধারার অস্তিত্ব ছিল।[৯৫] এটি বুদ্ধ বিষয়ক নাটক, মতান্তরে সহজিয়া পন্থায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে পরিবেশিত নাট্য। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় নবম শতকে রচিত চর্যাকার বীণাপা'র (১৭ সংখ্যক) চর্যায় আছে—

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥'[৯৬]

এর অর্থ বজ্রধর নাচে দেবী গায় সুতরাং বুদ্ধ নাটক 'বিসম' (বিপরীতভাবে) হয়ে উঠল। এ থেকে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙলায় এ শ্রেণির নৃত্যগীতনির্ভর নাট্যের প্রচলন ছিল। চর্যাপদে এ শ্রেণির নাট্যের নৃত্য পদ্ধতির সংকেতও লক্ষ্য করা যায়—

'এক সো পদমা চউসটঠী পাখুড়ী।
তহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী॥'[৯৭]

এ সাধন পদ্ম বটে। কিন্তু পদ্মের পাপড়ির চৌষট্টি কলা ডোম্বী বা ডুমনি নৃত্যে প্রযুক্ত হত বলে মনে করা যায়। এ ছাড়া চর্যার প্রাচীন বাঙলা নাট্যে নট নটীর রূপসজ্জা রক্ষার নিমিত্তে 'নটপোটিকা' (নেড়পেড়া) ও নানা বাদ্যযন্ত্রের যেমন লাউতন্ত্রী, হেরুকবী প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায়।

চর্যাপদের পরিবেশন রীতি সম্পর্কে বলা যায়, এ সকল পদ (উত্তরকালে বৈষ্ণবীয় পদকীর্তনের মত) আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়, নানাবিধ কাহিনী ও বর্ণনা সহযোগে পরিবেশিত হত অর্থাৎ তা শুদ্ধগীত মাত্র নয়, পদকর্তা দীর্ঘ সময় ধরে নানা বর্ণনা ও কাহিনীসহ আসরে পরিবেশন করতেন।[৯৮]

চর্যায় উল্লিখিত নৃত্য-গীত প্রসঙ্গে নুতন ভাবে দৃষ্টিপাত করেন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের চর্যার সংগ্রাহক শশিভূষণ দাসগুপ্ত (১৯১১-৬৪)। তিনি ১৯৬৩ সালে নেপাল থেকে একশোটি নতুন চর্যাপদ সংগ্রহ করে আনেন এবং জানান তাঁর সংগৃহীত চর্যার গানগুলো পাওয়ার সময় পর্যন্ত নেপালে বজ্রাচার্যরা তা নৃত্যগীতি সহযোগে পরিবেশন করতেন এবং নাচ গানের সময় হাতে লেখা পুঁথি ব্যবহার হতো।[৯৯] এইরকম ব্যবহারে কোনো পুঁথি নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার নকল করে নেওয়া

হতো। নষ্ট চর্যার পদ বা গানগুলো মূলত নৃত্য ও গীত পরিবেশনার পাণ্ডুলিপি। তবে চর্যায় সঙ্কলিত পদসমূহের নৃত্য-গীতমূলক পরিবেশনায় পূর্ব, মধ্য ও অন্তে খুব সম্ভবত কাহিনী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বর্তমান থাকতো।[১০০]

তিব্বতে প্রাপ্ত রেখাচিত্রে ১৮ জন পদকর্তার সাক্ষাৎ মিলেছে। এদের জীবনবৃত্তান্ত ও তিব্বত থেকে সংগৃহীত রেখাচিত্র অবলম্বনে নাট্যধারার অভিনয় সূত্র অনুসন্ধান করে দেখা যায় চর্যায় উল্লেখিত 'বুদ্ধ নাট্যকে' নারী-পুরুষের যে নৃত্য ও গীতের বিবরণ পাওয়া গেছে তিব্বত থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলোতে তার সংকেত দেখা যায়। চর্যাপদকর্তাদের মধ্যে সরহপা অন্যতম। তিনি বাদ্য বাজিয়ে দোহা গাইতেন এ বিষয়ের প্রমাণ সরহপার রেখাচিত্রে পাওয়া যায়।[১০১]

চর্যার সর্বাধিক পদের রচয়িতা হচ্ছেন কাহ্নপা। দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৮৪৯) কাহ্নপা পণ্ডিত ভিক্ষু নামে খ্যাত হয়ে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করেন। তিনি একাধিক পদে বাদ্য, গীত, নৃত্য প্রসঙ্গ এবং সেকালের বাদ্যযন্ত্রের নাম (ডমরু, পঠহ, মাদল, কর বা ঢোল, কাঁসি) ও নৃত্যে বা যোগাচার যাত্রায় ব্যবহৃত কিছু সাজ অলঙ্কার বা অঙ্গ আভরণ (ঘণ্টা, নূপুর, কণ্ডল, মুক্তাহার, হাড়ের মালা) এর নাম উল্লেখ আছে।[১০২]

চর্যাপদকর্তাদের কেউ কেউ প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পদকর্তাদের জীবন-বৃত্তান্তে দেখা গেছে সরহপা দোহা গাইতেন। তিনি বীণাযন্ত্র সহকারে পদাবলী গান করতেন। বীণাপার রেখাচিত্রেও তাঁকে বীণা বাদনরত অবস্থায় দেখা যায়।[১০৩] অন্যদিকে সরহপা গীত বা দোহা গেয়ে রাজা-প্রজা সব শ্রেণির মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন।[১০৪]

সার্বিক দিক বিবেচনায় এসে গবেষকগণ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের বাংলায় প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সজ্জিত নর-নারীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে পরিবেশিত নৃত্য-গীতের অভিনয় বলে সনাক্ত করেছেন।[১০৫]

গীতগোবিন্দ–প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির প্রমাণ মেলে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যে। গানই গীতগোবিন্দের প্রাণ। সবগুলো গান আবার গীতি সংলাপ। চরিত্র তিনজন–রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। প্রতি গীতে বাংলা মঙ্গল পাঁচালির মত ধুয়া আছে, ধুয়া (ধ্রুবা) উক্ত মঙ্গল গীতিনাট্য পরিবেশনায় দোঁহার কর্তৃক পরিবেশিত হত। তৃতীয় সন্দর্ভের একটি ধ্রুবা নিম্নরূপ–

ললিত–লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত- কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে
নৃত্যতি যুবতীজনে সমং
সখি-বিরহি-জনস্য দুরন্ত॥[১০৬]

গীতগোবিন্দের শ্লোকসমূহ সূত্রধার বা মূল গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হত এবং গানগুলো দোঁহার কণ্ঠে (ধ্রুবাসহ) গীত হত। এই গানের হাবভাব ফুটিয়ে তুলত মূল নর্তকী। অর্থাৎ 'গীতগোবিন্দে' অধিকারী ও দোঁহার-এর মধ্যে নর্তকীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তবে এক্ষেত্রে কয়টি চরিত্র নৃত্যে অংশ নিত এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেহেতু রাধা, সখী ও কৃষ্ণের পৃথক সংলাপ আছে, সেজন্য কারো কারো মতে, সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' তিনটি পৃথক চরিত্র দ্বারা অভিনীত হত।

'গীতগোবিন্দের ছন্দরীতি প্রকৃত অর্থে সংস্কৃত ছন্দের অনুসারী নয়, গীতগুলো 'মাত্রাবৃত্ত অপভ্রংশ ছন্দে' (ওমর খইয়াম, মেঘদূত, গীতগোবিন্দ, প্রণব বাহুবলীন্দ্র)।'[১০৭] তবে প্রতিটি গীত সুনির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীভিত্তিক। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, পদ্মাবতী বা তিন কুশীলব পরিবেশিত নৃত্যে ধ্রুপদী নৃত্যের মুদ্রা অনুসৃত হত।

প্রতিকী চিত্র : গীতগোবিন্দের পরিবেশনা

Jayadeva has instilled his kavya with giti which is its essence. Gitagavinda is neither a collection of prakirna type of gitas nor a rural giti-natya but is unique in its style of literature and music-the geya padas or the musical verses being its wealth. Jayadeva has composed in giti, the conversation between

Radha and krisna and also with sakhis, in exquisite language, using prakrta-matra-chandas or apabhramsa-chandas, deviating from the traditional style.[১০৮]

আসামের অঙ্কিয়া নাট, মিথিলার কীর্তনীয়া, উড়িষ্যার লীলানাটের আঙ্গিক গীতগোবিন্দের আঙ্গিকজাত। উড়িষ্যার সঙ্গীত নাটক 'জগন্নাথবল্লভের' সঙ্গে গীতগোবিন্দের ভাষার নিকট সম্বন্ধ রয়েছে।[১০৯] ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ঐ সকল অঞ্চলে পরিবেশিত নাট্যরীতি থেকে 'গীতগোবিন্দের অভিনয়ের অতীতাভাস পাওয়া যেতে পারে। সেকালের বাঙলা-মৈথিলি নাটকে গীতাধিক্যের উৎসও 'গীতগোবিন্দ'।[১১০]

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বাংলা ভাষায় রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে কবি বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের গানের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১১১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাট-গীতের পূর্ণ রূপের উদাহরণ।

Srikrsna-Kirtana is a akhyana-kavya on Radha-Krsna-Lila written in ancient Bengali language of Radha area. It has Several Chapters which had been for the first time arranged chronologically in palas or khandas (or episodes) on the lilas of Krsna, laying the foundation for vaisnava kirtana riti of later years. It is essentially of srngara-rasa and Candidasa gave preference and prominence to acting through verses on raga-Sangita, the bhanita by the poet is Badu Candidasa who was a devotee of Goddess Basuli.[১১২]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদশীর্ষে নাট্যনির্দেশক কিছু সংস্কৃত পরিভাষা পাওয়া যায়, যেমন– দণ্ডক, লগনী, দণ্ডকলগনী, চিত্রকলগনী, প্রকীন্নকলগনী, প্রকীন্নক, চিত্রলগনী-দণ্ডক, প্রভৃতি। পদশীর্ষে 'গীতগোবিন্দের মত সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। এসব সংকেত ও শ্লোক উত্তরকালের বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফল এবং তা সপ্তদশ শতাব্দীর পরে যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা যায়। আচার্য সুকুমার সেনের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুতুলনাচের কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মূলত নাট্যগীত। এতে সংলাপের প্রাধান্য রয়েছে। এ কাব্যে চরিত্র তিনটি–কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই।[১১৩] বৃন্দাবনখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সংলাপরীতির আংশিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি–

কৃষ্ণ : তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে।
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥

রাধা : সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে বড় নাগর
তোমারে কে দিবেক উত্তর।
ছাড়হ অলঞ্জাল না কর কচাল
এড় যাওঁ মথুরা নগর॥

কৃষ্ণ : তোহ্মাতে মজিল মোর মন ল॥
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
কেহ্নে নিঠুর বচনে॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল।[১১৪]

গবেষকগণ এ কাব্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদসমূহ বিচার করে দেখিয়েছেন– শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিরালম্ব বর্ণনাত্মক পদের চেয়ে সংলাপাত্মক পদেরই প্রাধান্য। এ কাব্যে পদধৃত উক্তি-প্রত্যুক্তি পাত্র-পাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও কাহিনীর অগ্রগতি সাধন করেছে।[১১৫] এ কারণেই এর আঙ্গিক হয়ে উঠেছে নাট্যমূলক। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গায়েন ও দোঁহারের মধ্যবর্তী স্থলে চরিত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক।[১১৫]

তীরহুতের ও নেপালের রাজসভায় এই ধরনের সঙ্গীতনাটক বিকাশলাভ করেছিল। সঙ্গীতনাটকের সবচেয়ে পুরানো এবং ভালো উদাহরণ হল মিথিলার রাজমন্ত্রী উমাপতি ওঝার (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদ) 'পারিজাত হরণ'। বিদ্যাপতিও এই ধরনের সঙ্গীতনাটক দু-একটি লিখেছিলেন। বাংলাদেশে 'কবিরাজ' গোবিন্দদাস (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ) একটি সঙ্গীতনাটক লিখেছিলেন। সে নাট্যবীজ গানগুলো রয়ে গেছে কীর্তন-পদাবলী হয়ে, নাটক-শাঁস বিলুপ্ত। চৈতন্যের সুহৃদভক্ত রামানন্দ রায় (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশকে) যে সঙ্গীতনাটকটি লিখেছিলেন তার গানগুলো শুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, গীতগোবিন্দের ধাঁচে। উমাপতি, গোবিন্দদাস ও রামানন্দ রায়, তিনজনেরই নাটকের বিষয় কৃষ্ণলীলা।[১১৬]

পুরানো বাংলা সাহিত্যে নাটক-অভিনয়ের ('অঙ্কের বন্ধনে নৃত্য') বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে আছে। মধ্য পঞ্চাশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি নিজে যাত্রাভিনয় করেছেন বলে তাঁর জীবনী পাঠে জানা যায়। কেউ কেউ একে যাত্রা না বলে নাটগীত বা লীলানাট্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের গীত, অভিনয় আর নৃত্যের সমন্বিত পরিবেশনা 'গীতাভিনয়' কিংবা প্রকৃত অর্থে যাত্রারই নামান্তর।

অভিনয়ের বিষয়টি মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' অংশের কাহিনীর মত ছিল। চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম' নাটকে।[১১৭] নাটকটি রয়েছে পরিশিষ্ট-১ এ।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতে জনসমাজে ও পণ্ডিতগোষ্ঠীতে যে বহুবিচিত্র নাট্য-রীতির প্রচলন ছিল তার নামমাত্র উল্লেখ পওয়া যায় সাগর নন্দীর 'নাটকলক্ষণ রত্নকোষ' গ্রন্থে (মাইল্‌স ডিলন সম্পাদিত)। পরবর্তীকালে সাহিত্যে (বাংলায়) ও লোকব্যবহারে যে বিভিন্ন নাট্যরীতির পরিচয় মিলেছে তা এই কয়ভাগে ফেলা যায়–

১. **সঙ্গীত-নাটক**–এই সঙ্গীত-নাটক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল পাঞ্চালিকা-আখ্যায়িকা এবং পদাবলী-কীর্তন।

২. **চিত্রগীত**–এ রীতি পাঞ্চালিকা-আখ্যায়িকা ও পদাবলী-কীর্তনের মাঝামাঝি। এখানে পুতুল অথবা প্রতিমার বদলে থাকত চিত্রপট (পূর্বতন যমপট)। চিত্র দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর জবানিতে গান চলত। এই রচনার পুরোনো ও দুর্লভ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই ধরনের ছবি (অথবা পুতুল) সহযোগে কৃষ্ণলীলা কাহিনী দেখে-শুনেছিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ে রামকেলি গ্রামের সন্নিকটে কানাইয়ের-নাটশালে তাঁর প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রায় উদ্যোগের কালে।

৩. **অঙ্কিয়**–"অঙ্কিয়" অর্থাৎ স্বাঙ্গ অভিনয়–এই ধরনের অভিনয়ের নিদর্শন পেয়েছি শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। আধুনিক কাল পর্যন্ত এই নাট্যরীতি চলে এসেছে ' নেটো'-য়।

(৪) **পাত্র-নৃত্য** (পাতা নাচ)–প্রাচীন শৌভিক রীতি। ধর্মঠাকুরের বিশিষ্ট চরিত্রের মুখোস পরে নাচ। কোন কোন অঞ্চলে গাজনে ও অনুরূপ অনুষ্ঠানে এ নৃত্য এখনও চলিত আছে।[১১৮]

নাট্যের শুরু যেমন বেদ থেকে তেমনি কীর্তনের শুরু পুরাণ থেকে। সেই ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়েছে লোকনাট্য ও কীর্তনের পরিসর। ষোড়শ শতাব্দীতে আসামের শঙ্করদেবের হাতে নাট্যকর্ম একটি বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি কৃষ্ণলীলা নিয়ে পাঁচটি ও শ্রীরামবিজয় নামে একটি পালা লিখেছিলেন। কৃষ্ণলীলা নিয়ে লিখেছেন– কালিয়দমন, পত্নীপ্রসাদ, ফেলিগোলাপ, রুক্মিণীহরণ ও পারিজাতহরণ। এগুলো যাত্রা নামেই উল্লিখিত হয়েছে, তাতে পুতুল নাচের সঙ্গে পদাবলী গানের ও কথকথার মিশাল আছে।[১১৯]

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নাটপালায় অত্যাধিক জনপ্রিয়তা তৈরি হয়, তা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্য আট পালা বা বারো পালায় বিভক্ত হয়ে নৃত-গীত সহযোগে অভিনীত

হতো। আর এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে লোকায়ত বাংলার সর্পদেবী মনসার আখ্যান।[১২০]

লোকনাট্যের ইতিহাস আলোচনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ-এর পরিবেশনা-রীতি সম্পর্কে গবেষকগণ জানিয়েছেন কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পূর্বাপর জনপ্রিয় ও আসরকেন্দ্রিক গেয়কাব্য। এইজন্য গায়ক-কথক-লিপিকররা মূল আখ্যানের সঙ্গে নিজের কাহিনী কোথাও কোথাও যুক্ত করেছেন। এর ফলে বাঙলা রামায়ণে নানা কালের ভাষা, উপাখ্যান, জনরুচি ও ধর্ম চেতনার প্রভাব বিদ্যমান। সমগ্র রামায়ণে রামভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব জাত। অন্যদিকে বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও রামায়ণে দৃষ্ট হয়। এভাবে রামায়ণ নানাকালের নানা চিহ্নপাতে বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব নিয়েই সকল কালেই সমকালের নিজস্ব রুচির পরিপোষক হয়ে অদ্যবধি বাংলার জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যধারা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।[১২১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কীর্তন ও পালাগান

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মধ্যে নতুন সংযোজন ঘটে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের দ্বারা। নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আন্তইন দা রোজারিও। তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পরে ১৬৭০ সালের দিকে হিন্দুদের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন বাণী ও আখ্যানকে আশ্রয় করে গান, কথোপকথন ও তর্কবিতর্কের মিশ্রণে এক ধরনের পরিবেশনারীতির প্রচলন করেন। যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। নাট্য পরিবেশনার এই ঐতিহ্য এখন লোকনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়।[১২২]

১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন অ্যাংলিকান ও যাজক সম্প্রদায়ের সম্মিলনে চার্চ অব বাংলাদেশ গঠিত হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে এক দুজন বিশপ এবং প্রায় ১৪,০০০ জন সদস্য ছিল। বাংলাদেশে ব্যাপ্টিস্টদের সংখ্যা মোট ১,৩৬,০০০ জন। বাংলাদেশে বৃহত্তম খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক, যাদের সংখ্যা বাংলাদেশে মোট পাঁচ লাখের খ্রিষ্টান জনসংখ্যার মধ্যে দুই লাখেরও বেশি।[১২৩]

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কীর্তন প্রতিযোগিতার আসরে আমি, প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স ও প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আজিজুর রহমান তুহিন। আয়োজনে–দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
চিত্র ধারণ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় কীর্তন আসরের স্থির চিত্র। চিত্রগুলো ধারণ করেছি ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, ফার্মগেট, ঢাকা

প্রথম থেকেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে বাংলার মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকগণ নিজেরাই বাংলার মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলে তাদের সে উদ্দেশ্য অদ্যাবধি তেমনভাবে সার্থক হয়ে উঠেনি। একই কারণে বাংলার ভাব-রসে নিমগ্ন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মূলত এদেশের ঐতিহ্যবাহী ধারায়ই সম্প্রসারণ। ধর্মান্তরিত হবার ফলে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি দেবতা-অবতারের পরিবর্তে ঈশ্বরপুত্র যিশু বা তাঁর ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে নামগান ও নাট্যপরিবেশন করে থাকেন। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রবর্তকদের মাহাত্ম্য প্রকাশক নাট্যপালায় হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন গানের উপরে সুর পরিচয় হিসেবে ‘নিমাই’ ‘গৌর নিতাই এসো আমার’, ‘কৃষ্ণ যায় রে কুঞ্জবনে, মন জানি কেমন করে’ ইত্যাদি উল্লেখ দেখে একথা অনুমান করতে বাধা থাকে না যে, খ্রিষ্টানদের নাট্য ঐতিহ্য মূলত এদেশীয় হিন্দু-বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গান ও নাটকের আসর থেকেই উৎসারিত।[১২৪]

ইতিহাস থেকেও জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান আন্তইন দা রোজারিও হিন্দুদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক সাধু আন্তনীর জীবন মাহাত্ম্য প্রকাশক পালা রচনা পরিবেশন করতেন। এছাড়া, বৃহত্তর বরিশাল জেলার খ্রিষ্টানদের মাঝে

প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা 'রামুর পালা'র মূল রচয়িতা হিসেবে হিন্দুধর্ম অনুসারী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর নাম জানা যায়। এই কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী গত শতকের প্রথম দিকে বরিশাল অঞ্চলে হিন্দুধর্মীয় পূজা উপলক্ষে কীর্তন পরিবেশন করতে এসে উক্ত এলাকায় বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে এসে জানতে পারেন–খ্রিষ্টানদের মধ্যে নিজস্ব কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয় নেই। অথচ খ্রিষ্টানদের অনেকেই গান-বাজনার সমজদার। তিনি উদ্যোগী হয়ে 'মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট' নামে যিশু খ্রিষ্টের জীবনী নির্ভর একটি খ্রিষ্টায় পালা রচনা করেন এবং পালাটি খ্রিষ্টান ধর্মভক্ত রামুয়েল গোমেকে শিক্ষা দেন।[১২৫] পরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে সেই পালাটি নিয়মিতভাবে রামুয়েল গোজেম পরিবেশন করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে পালাটি উক্ত এলকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রামুয়েল গোমেজের নাম অনুসারে এর পরিবেশনারীতির নাম হয়ে যায় 'রামুর পালা'। জানা যায়, যিশুর জীবনের আরো দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা শিক্ষাকে উপজীব্য করে একই সময়ে আরো দু'একটা পালা পরিবেশিত হয়ে থাকলেও শুধু রামুর পালাই একটি উত্তম পালার রূপ নেয়। বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় পালার যতোগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে এখনো এই পালাটিই উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে বরিশালসহ ঢাকা অঞ্চলে রামুর পালার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের নাট্য পরিবেশনা আখ্যানের ভক্তিবাদী উপস্থাপনেও আঙ্গিকের দুটি ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবদের পদাবলী কীর্তন, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়। অবস্থানগতভাবেও হিন্দু-বৈষ্ণব প্রধান এলাকা বরিশাল, ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় রামুর পালা, সাধু আন্তনীর পালা, মুক্তিদাতা যিশু বা যিশুর যাতনা ভোগের পালা, সাধ্বী আগ্নেশ প্রভৃতি নাট্যপালা প্রচলিত।[১২৬]

বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানায় ধর্মান্তরিত বাঙালি খ্রিষ্টানগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মমত হিন্দুধর্মীয় কীর্তন গানের আঙ্গিকে খ্রিষ্টধর্মীয় কীর্তন প্রবর্তন করেন। মেহেরপুর অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্মীয় সেই কীর্তন সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এখানে বসবাস প্রায় ১০০০ ঘর ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট গোত্রের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত খ্রিষ্টীয় কীর্তন সাধারণত ৬টি পালায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাগুলো হলো–জন্মপালা, লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার পালা, অপব্যয় পুত্রের পালা, সমরীয় পালা, জীবন পালা ও মৃত্যু পালা।[১২৭]

খ্রিষ্টানদের কীর্তন মূলত গৌড়লীলা অনুকরণে করা হয়ে থাকে, তবে আদিবাসীদের কীর্তন তাদের সংস্কৃতির আদলেই করে থাকে। ঢাকা, গাজীপুর, সাভার, ফরিদপুর, বরিশাল এইসব অঞ্চলের খ্রিষ্টীয় কীর্তন হুবহু নামসংকীর্তন ও লীলা কীর্তনের আদলে, সাজ সজ্জা একই রকম। শুধু বিষয়বস্তুর ভিন্নতা। বাংলাদেশে দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা প্রতিবছর ডিসেম্বরে

সবচেয়ে বড় কীর্তন আসরের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বড় বড় দল এই আয়োজনে অংশ গ্রহণ করে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়।

পালাকীর্তনে যে পদগুলো গেয়ে থাকেন সেগুলোও বৈষ্ণব পদের অনুকরণে লিখা ও গায়কী ঢং একই রকম।

যেমন–তাল ফেরতা এই গানটির কথা ও সুর প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স–

আজি মহারাজা এলো ভবে
বেথলেহেমের গোশাল ঘরে॥
চল আমরা সবে দলে দলে
পূজীতে যাই চরণ তলে ॥

হৃদয় বাণীর মাঝে এলে প্রভু দীনবেশে
নমি হে তোমায় মোরা নবরূপ সাজে ॥

ভালবাসলে, হৃদয় দুয়ার খুলে
ভালবাসলে মুক্তিদাতার রূপ নিয়ে
স্বর্ণকুন্দক গন্ধ রসে আলো জ্বাললে ॥
প্রভু ধরনীর কূলে দীনহীনের লাগি
পড়িলে দুখের মালা (কেন?)
স্বর্গ ত্যাজিয়া (প্রভুহে আমার–)
এ ভব সংসারে সহিলে কাঁটার জ্বালা ॥

নমি প্রভু তোমায়
অর্ঘ্যডালা সাজিয়ে মোরা ॥
আনন্দ আর উৎসবে আজ খ্রিষ্ট যিশুর গোশালায় ॥[১২৮]

বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত একটা রূপ হচ্ছে নাথপন্থা। প্রাচীনকালে নাথপন্থী সাধকগণ তাদের দেহ-সাধনা বা যোগ সাধনার কথা পদ্য আকারে মুখে মুখে রচনা করে আসরে পরিবেশন করতেন। এই প্রক্রিয়াতেই পরবর্তীকালে নাথগীতিকার উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন বাঙলার নিজস্ব ধর্মদর্শন নাথপন্থার নানা অতিলৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত গীতিকা, পালা ও নাট্য। প্রধানত নাথ সিদ্ধা মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, হাড়িপা ও গোরক্ষনাথের অমরত্ব ও সর্ববিপদজয়ী সাধনা বিষয়ে রচিত

গীত, যেমন–গোপীচন্দ্র ও ময়নাবতীর কাহিনী। মূলে নাথ গীতিকা চারজন ভিন্ন ভিন্ন গায়েন দ্বারা পরিবেশিত হয়। এতে ধুয়া থাকে 'হে রাজা', 'হে ময়না'।[১২৯]

সপ্তদশ শতকে কবি শুকুর মাহমুদ নাথগীতিকার ধারায় গুপিচন্দ্রের 'সন্ন্যাস' ও শেখ ফয়জুল্লা অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে 'গোরক্ষ বিজয়' রচনা করেন। এই নাথগীতিকা পাঠে জানা যায়–নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার সঙ্গে নৃত্য বাদ্য ও নাট্যের গভীর সম্পর্ক ছিল। আর একথার প্রমাণ আছে আনুমানিক ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে।[১৩০]

এসব কাহিনী একটিতে আছে সিদ্ধাদের ইতিহাস এবং গোরক্ষনাথ কর্তৃক মীননাথকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার; অপরভাগে আছে রানী ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী। প্রথমটি গোরক্ষবিজয়, অপরটি ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান নামে পরিচিত। প্রথমটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য পেয়েছে। অপরটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে কাব্যগুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।[২৩১] গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী জীবন-বিমুখ। ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নাথপন্থীদের এ কাহিনী গঠন করতে হয়েছিল বলে এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। তবে গোরক্ষবিজয়ের চেয়ে ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে মানবিক আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি।

শ্বাক্য পদ বড়ুয়া

কীর্তনীয়া শ্বাক্য পদ বড়ুয়ার পালাকীর্তন পরিবেশনার কিছু আলোকচিত্র। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, ডোমখালী, রাউজান, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন আসরে ধারণকৃত আলোকচিত্র
সময় : ২০১৭-২০১৮ সাল

সন্ন্যাস ব্রতের কঠিন দীক্ষা নাথ গীতিকার প্রধান প্রতিপাদ্য। এর সঙ্গে সর্বত্যাগী সুফিবাদের নৈকট্য থাকায় উত্তরকালে মুসলিম গায়েনরা এ ধরনের পালা রচনা ও পরিবেশনা করতেন। পালার ধারায় ভিন্নতর কাহিনী যুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে 'মোনাই তোনাই' শ্রেণির চরিত্রমূলক নাট্যের উদ্ভব। এ নাট্যের চরিত্র সকলেই মুসলমান। নাথ গীতিকার ধারায় বিদ্যাপতি 'গোরক্ষবিজয় নাটক' রচনা করেন, নেপালে রচিত হয় 'গোপীচন্দ্র নাটক' (কৃষ্ণদাস রচিত)। আসামে বহু পূর্ব থেকে 'গোপীচন্দ্রের গীত' প্রচলিত ছিল।[১৩২]

নাথ গীতিকা বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপকে আত্মসাৎপূর্বক উত্তরকালে নানা পুরাণের প্রসঙ্গ আত্মস্থ করে। সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ। উত্তরকালে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু নাথগীতিকার ধারায় ত্রিনাথরূপে পূজিত হন। এতে দেখা যায়, নিরঞ্জন শব রূপে ভেসে যেতে থাকলে শিবই তাঁকে চিনতে পারেন এবং সেই শব স্বীয় শীর্ষে ধারণপূর্বক শিব নৃত্যে মেতে ওঠেন। নিরঞ্জন বৌদ্ধ ধর্মের নিরাকার ঈশ্বর।[১৩৩]

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল বিশেষ করে বগুড়া, নাটোর, নওগাঁ ও রাজশাহী অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পালদের যুগাবাসনে নিম্নবর্ণের বৌদ্ধরা তান্ত্রিক ও শৈব আবরণে আত্মগোপন করে এবং তারা নিজেদের মধ্যে ধর্ম সঙ্করের ভিত্তিতে নতুন ধরনের ধর্ম উদ্ভাবন করে ধর্মসাংস্কৃতিক চর্চার সূত্রপাত করে, যা নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি হিসেবে পরচিতি পায়। লক্ষ্মণ সেনের

সময়ে বৌদ্ধ-যোগী গোরক্ষ-শিষ্যরা শৈব-সন্ন্যাসী হয়। বর্তমান নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বা যোগীসংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আভাস পাওয়া যায়।[১৩৪]

বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের কাছে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা পরাস্ত হলে বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় যখন নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি-পার্বণ ইত্যাদি রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু বিশেষত ধর্মঠাকুরের পূজারী, নাথযোগী, সহজযানী, মীননাথ গোরক্ষনাথপন্থী বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রান্তে ঠাঁই নিয়ে আত্মরক্ষা করে। তাদের সেই আত্মরক্ষার মধ্যে ধর্ম শঙ্কর ঘটে এবং নাথ-সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়। একই সঙ্গে সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।[১৩৫] যোগীর গান বা যুগী পর্ব সেই তৎপরতার ভেতর থেকেই জন্ম লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ এবং নাথসম্প্রদায়ের কীর্তনে ও পালাগানে বৈষ্ণব পদাবলী বা কীর্তনের প্রভাব অধিক মাত্রায় পড়েছে। পালার পদগুলোও সহজে বোঝার উপায় নাই যে কোনটি বৌদ্ধ ধর্মের আর কোনটি বৈষ্ণব পদাবলীর।[১৩৬] বৌদ্ধ পালাকীর্তনের অধিক প্রচলিত দুটি বই শ্রী সুধীর রঞ্জন বড়ুয়ার 'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী' (কীর্তন) এবং মোহন চন্দ্র বড়ুয়ার লিখা 'বুদ্ধ সন্ন্যাস' (পালা কীর্তন) যে গানগুলো রয়েছে প্রায় সবই পদাবলী কীর্তনের সুরে। যেমন শ্রী সুধীর রঞ্জন বুড়ুয়ার বই 'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী' কীর্তন বই-এর একটি পদ–

রাজার নন্দন রাজা আভরণ
ত্যজিয়ে রাজার ভোগ গো
কিসের অভাবে সন্ন্যাসী হইবে
কেমনে সহিবে দুঃখ গো সখা
কেমনে সহিব দুখ॥
কেমনে সহিবে তুমি।
সন্ন্যাসের কঠোর যন্ত্রণা " " "
এত কষ্ট কিসের কারণ?
কি অভাবে বনে গমন " " " "
কি অভাবে বনে যাবে?
ভাঙ্গিয়ে আনন্দের বাজার " " " "
রঙ্গভূমি করে শ্মশান " " " "
সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুন " " "
যেওনা যেওনা।
রঙ্গ-ভূমি করে শ্মশান " "
ভাঙ্গিয়ে আনন্দের বাজার " "
সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুন " "
অনিশ্চিতের আশায় প্রভু " "

বেদ পুরাণে পায়নি যাহা কেমন করে পাবে তাহা॥
সোনার সংসার আনন্দের বাজার
কি অভাবে ছেড়ে যাবে।
যৌবন বাসনা রেখে অপূরণ
কেনরে সন্ন্যাসী হবে॥
যে সুখের তরে জন্ম জন্মান্তরে
মানবে তপস্যা করে।
বিনা তপস্যায় পাইয়াছ সব
তোমার সাধের ঘরে॥
যেওনা।
ভাঙ্গিয়ে আনন্দের বাজার ”
রঙ্গ ভূমি করে শ্মশান ”
সোনার সংসারে জ্বালায়ে আগুন ”
অনিশ্চিতের আশায় প্রভু ”[১৩৭]

তথ্যসূত্র

১. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাডেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, পৃ. ২১৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৩. দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৭ ও ৯

৪. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল–এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৫

৫. Folk art theatre of India Balwant Gargi–পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া দেওয়া নাই।

৬. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল, ভাদ্র ৯১, পৃ. ২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯-১০

৯. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাডেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, পৃ. ২১৩

১০. প্রাগুক্ত ১১২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১৩. ড. রীনা দত্ত, *বাংলা কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১১

১৪. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য, নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, ভাদ্র ৯১, পৃ. ৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৬. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশনা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৭

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৯. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশনা, প্রকাশকাল, মে ২০১৫, পৃ. ২০৬
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
২১. Macdonell (মনীষী ম্যাকডোনেল), *A vedio reader for students*, p. 302
২২. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃ. ২০৯
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
২৪. প্রাগুক্ত, Hil. Vol.1, p. 1 and 7
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৬. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশনা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৪
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৯. Winternitz. *Hil*-1, p. 147
৩০. রামস্বামী অ্যায়ার, *স্বরমেলকলা নিধি*, পৃ. ৮৪
৩১. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশনা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮৪
৩২. ক্ষিতি মোহন সেন, *বেদোত্তর সংগীত*, কোলকাতা-৯, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১২
৩৩. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশনা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮৫
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৪৫. Winternitz. *Hil 1*, p. 147
৩৬. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশন, প্রকাশকাল, ২০১৫, পৃ. ৮৭
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৪০. Winternitz. *Hil 1*, p. 111অনুবাদ
৪১. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বৃ. উ. ২, ৪, ১০, ৪, ১২, ৪৫, ১১)
৪২. Deussen, *philosophy of uparisshad*, p. 14-15
৪৩. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশন, প্রকাশকাল, ২০১৫, পৃ. ৮৮
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, *(প্রথম খণ্ড)* ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ১৮
৪৮. ড. কানাইলাল রায়, বেদ রহস্য, মাহি প্রকাশন, প্রকাশকাল, ২০১৫, পৃ. ৯৭
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৫০. Deussen, *philosophy of upanisshads*, p. 13
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫৪. তাপসী ঘোষ, *এম.ফিল. গবেষণা পত্র*, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (অপ্রকাশিত), পৃ. ৬৬

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৫৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, *(প্রথম খণ্ড)* ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৭

৫৮. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, *(প্রথম খণ্ড)* ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৭৭

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৬১. তাপসী ঘোষ, *এম.ফিল. গবেষণা পত্র*, দর্শনের সাথে সংগীতের নান্দনিক সম্পর্ক (অপ্রকাশিত), পৃ. ৬৭

৬২. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, *(প্রথম খণ্ড)* ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ.৭৭

৬৩. রাজেশ্বর মিত্র, *বেদগানের প্রাকৃত রূপ*, মার্চ ১৯৮৪, কোলকাতা-৬, পৃ. ৩৫

৬৪. গুরু পরম্পরা, *ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়*, সারাংশ ও প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, (প্রথম খণ্ড) ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৪৩

৬৫. ড. কানাইলাল রায়, বেদ রহস্য, মাহি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১২

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬৭. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি*, *পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি*, পৃ. ১৮৬

৬৮. রমেশচন্দ্র দত্ত, *অথর্ববেদ সংহিতা*, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা-৭০০০০৭, পৃ. ৩৪

৬৯. ড. কানাইলাল রায়, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রসঙ্গ*, প্রকাশন-আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১৩

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৭৩. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশনা, প্রকাশকাল, মে ২০১৫, পৃ. ১৭১

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

৭৭. ভাগবত ১২/১৩/১৬-১৭

৭৮. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভাগবতম*, প্রাকাশক–শ্রীমহানাম ব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার স্ট্রীট, প্রকাশকাল, ৭ জুলাই ২০০৯, পৃ. ১

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. (খ)

৮০. সুবোধচন্দ্র মজুমদার, *শ্রীমদ্ভাগবত*, প্রকাশন, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কোলকাতা-৯, ২০০৪, পৃ. ৪

৮১. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভাগবতম*, প্রকাশক, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার স্ট্রীট, ২৯ এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ২

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৮৪. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশনা, প্রকাশকাল, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, পৃ. ২১৪

৮৫. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্*, ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট, কোলকাতা, পৃ. ৪৯

৮৬. পৃথ্বিরাজ সেন, *অষ্টাদশ পুরাণ কাহিনী সমগ্র*, প্রকাশনা গিরিজা লাইব্রেরী, কোলকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশকাল, কোলকাতা বইমেলা-২০১৪, পৃ. ১০

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৯৩. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য)*, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল–এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৭

৯৪. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) ভরত *নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, কোলকাতা ১৯৮০, পৃ. ১২

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৯৬. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃ. ২৩৭

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৯৯. শশিভূষণ দাসগুপ্তের উদ্ধৃতি, অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪

১০০. সেলিম আল দীন, *বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর*, থিয়েটার স্টাডিজ, জুন ১৯৯৫, পৃ. ১৪

১০১. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য)*, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১১

১০২. সাইমন জাকারিয়া, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ৭০

১০৩. অলকা চট্টোপাধ্যায়, *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী (অনুষ্টুক)*, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৮

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১০৫. সাইমন জাকারিয়া, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ৩১

১০৬. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, চর্চাকেন্দ্র, প্রকাশকাল ১৯৯৮, পৃ. ১১৮

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১০৮. Chhaya Chatterjee, *Sastriya Sangita and music culture of Bengal (Through the Ages) Vol-1,* Sarada publishing, Delhi-110035, p. 42

১০৯. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক*, চর্চাকেন্দ্র, প্রকাশকাল ১৯৯৮, পৃ. ১১৯

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১১১. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙলা-মৈথিলি নাটক*, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৩

১১২. Chhaya Chatterjee, *Sastriya Sangia and music culture of Bengal through the ages. vol. 1* (Sharada publishing house) p. 95

১১৩. সেলিম আল দীন, *বাংলা নাট্যকোষ*, ঢাকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৩০৮

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

১১৬. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৯৯১, পৃ. ৫৫

১১৭. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান* জনমাধ্যম ও সমাজিক পরিপ্রেক্ষিত, প্রকাশন বাংলা একাডেমি, জুন, ২০০৭, পৃ. ১১

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১২১. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক, (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র)* বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৩৫

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১২৩. মাইকেল এ লেয়ার্ড, খ্রিষ্টধর্ম, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৩, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়টিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, পৃ. ১০০

১২৪. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১৩৮

১২৫. ফাদার যোসেফ ম. গোমেজ (জীবন), রামুর পালার ইতিবৃত্ত, যোসেফ ডি. রোজারীও সম্পাদিত, মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট : রামুর পালা, ঢাকা : পাদ্রাশিবপুর খ্রিষ্টীয় ডেভলপমেন্ট কমিটি, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

১২৬. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১৪৭

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১২৮. নজরুল সংগীত শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স-এর কাছ থেকে সংগৃহীত

১২৯. সেলিম আল দীন, বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২০৪

১৩০. সুকুমার সেন, নট-নাট্য–নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশনা : ভাদ্র ১৯৯১, পৃ. ৮৬

১৩১. সেলিম আল দীন, বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২০৪

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৩৫. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ২৮২

২৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

১৩৭. শ্রী সুবীর রঞ্জন বড়ুয়া, *বুদ্ধের জীবনী ও বাণী*, প্রকাশক : শ্রী কাঞ্চন কান্তি বড়ুয়া, প্রকাশকাল : ১৯৯৬, পৃ. ৫৮

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট

নাট্যকর্মের ঐতিহাসিক প্রবাহ বাংলাদেশে দুটি ধারায় বয়ে এসেছে। অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যে অল্প-স্বল্প আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত শহর থেকে দূরে পল্লীকোণে যে 'নেটোর নাচ, কাচ' (প্রাচীনতর 'নাটুয়া নৃত্য', 'কৃত্য') প্রায় অনবলুপ্ত আছে তার থেকে যতটা অনুমান করা যায়। সে দুটি ধারা হল গীত-নাট ও নাটুয়া কাচ। গীত-নাট হল 'যাত্রা', নাটুয়া-কাচ হল 'নেটো' ('লেটো')। যাত্রা-পালার মুখ্য বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা তার মধ্যে প্রধান ছিল কালিয়দমন। এখানে স্মরণ রাখা ভালো, শঙ্করদেবের প্রথম এবং প্রধান নাটপালা হল কালিয়দমন। কৃষ্ণলীলার অন্যান্য কাহিনী যাত্রায় গৃহীত হলেও কালিয়দমন সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল বলে একসময় যাত্রার নামান্তর হয়েছিল কালিয়দমন।[১] অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ধনীর বৈঠকে ও শহুরে বারোয়ারিতে সমাদৃত ছিল। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও রুচি-পরিবর্তনের ফলে কৃষ্ণযাত্রা ছাড়া আর কোন যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছাতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙলা নাটকের ও অভিনয়-রীতির (সেই সঙ্গে কথকতার) প্রভাব গাঢ় হয়ে পড়ে এবং গীতাভিনয় উৎপন্ন হল। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধারা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এসে রুদ্ধস্রোত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নতুন করে গীতনাট সৃষ্টি করলেন।[২]

বাঙলা লোকনাট্যের ইতিহাস আলোচনায় দেখতে পাই পুরাণের সেই রাধা-কৃষ্ণের ভাবনা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের লোকনাট্য পর্যন্ত সর্বত্রই আমরা কীর্তন বা পদাবলীর ছোঁয়া পাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো অবশ্যই রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ আদিবাসী চাকমা, গারো, সাঁওতাল, রাখাইন, ত্রিপুরা, হাজং, মণিপুরী ইত্যাদি নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়েরও রয়েছে ঐতিহবাহী লোকনাট্য। অদূর ভবিষ্যতে বাঙলার লোকনাট্যে ইতিহাস আমরা আরো জানতে পারবো এবং উপস্থান করতে পারবো।[৩]

বাঙলা প্রচলিত সহস্র বছরের লোকনাট্যধারায় দুই ধরনের বৈচিত্র্য আমরা প্রত্যক্ষ করি–

১। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য,

২। আঙ্গিক বা পরিবেশনারীতির বৈচিত্র্য।

বিষয় ও বৈচিত্র্যের বিচারে বাঙলার ঐতিহাবাহী লোকনাট্যের ধারাকে সৈয়দ জামিল আহমেদ আট ভাগে ভাগ করেছেন–

1. Performances Related to Krsna and chaitanya.
2. Performances Related to Ramacnadra.

3. Performances Related to Siva and Kali.
4. Performances Related to Manasa.
5. Performances Related to Buddlism and Nathacult.
6. Performances related to Muslim and Legendary Heroer
7. Secular Performances
8. Hybrid Performances.[8]

সাইমন জাকারিয়া বিষয় বৈচিত্র্যের বিচারে বাংলাদেশের এতিহ্যবাহী লোকনাট্যধারাকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন–

১. ধ্রুপদী মহাকাব্য মহাভারত ও তার ভক্তিবাদী চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

২. ধ্রুপদী মহাকাব্য রামায়ণ ও তার চরিত্রসমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৩. বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার বিভিন্ন লীলা প্রকাশক আখ্যান

৪. বৈষ্ণবধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৫. লোকায়ত হিন্দু দেব-দেবী-কালী ও তাদের মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৬. লোকায়ত বৌদ্ধধর্ম ও নাথ-সংস্কৃতির তত্ত্ব-মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৭. লোকায়ত সর্বদেবী পদ্মা বা মনসা ও তার মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৮. লোকায়াত হিন্দুদের সঙ্করজাত দেবতা ত্রিনাথ ও তার মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

৯. ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক কারবালাযুদ্ধ ও তার বেদনা প্রকাশক আখ্যান

১০. লোকায়ত মুসলমান পীরদের কাল্পনিক জীবনী ও তাদের মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

১১. খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকদের জীবন ইতিহাস ও তাদের মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

১২. লোককথা, রূপকথা ও স্থানীয় ইতিহাস আশ্রিত মানবীয় প্রেম মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান

১৩. বাংলার গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র প্রকাশক আখ্যান

১৪. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোকে উদার জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশক আখ্যান।[৫]

বৃহত্তর দৃষ্টিতে এই শ্রেণিকরণের সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যুক্ত হতে পারে, যেমন– এদেশে বসবাসরত হিন্দুদের অন্যান্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনা; বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা, পার্বণ ও উৎসব কেন্দ্রিক কৃত্যমূলক আখ্যান পরিবেশনা। অপরাপর ক্ষুদ্র ধর্মাচারী বাঙালি ও অবাঙালিদের ধর্মাচারকেন্দ্রিক নাট্য পরিবেশনা, মাঠ ও কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কৃত্যাচার ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্রেণিগুলোর মধ্য থেকে যেসব শ্রেণির লোকনাট্যের ধারার সাথে খুব বেশি কীর্তন বা বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা হচ্ছে এবং যে প্রেক্ষাপট (পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পটভূমি) রয়েছে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করবো। লোকনাট্যেও যে কীর্তনের চর্চা হচ্ছে এবং বাঙলা লোকনাট্যের

উপাদানগত বিশ্লেষণ ও বিষয়ভেদে অঞ্চলগত পরিবেশনার পার্থক্যের কারণে এবং সময়ের বিবর্তনের ফলে চৈতন্য মহাপ্রভু বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ পালাকীর্তনের বা লীলাকীকর্তনের উপর নির্ভর করেই যে লোকনাট্য বিভিন্ন রীতি ও বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছে, তার একটি বিন্যাসগত প্রেক্ষাপট ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছি এবং একে একে বর্ণনা করেছি। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আরো স্পষ্ট ধারণা পাবো ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন কীর্তন গবেষক ও কীর্তনীয়ার সাক্ষাৎকার থেকে। ছকটি নিম্নরূপ–

বিষয়	বর্ণনাত্মক	নামসংকীর্তন	সংলাপাত্মক	নাটগীত	যাত্রা	কথন
রাধা-কৃষ্ণ ও চৈতন্য	লীলাকীর্তন ও পদাবলী	নাম সংকীর্তন	কৃষ্ণযাত্রা অষ্টকগান	মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা	ঢপযাত্রা	কিচ্ছাগান (পূর্ব ময়মনসিংহ)

লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট আলোচনার আগে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করতে হবে যে লোকনাট্যে কিভাবে গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বা এই দুটির কোনটা ব্যবহৃত হচ্ছে। লোকনাট্যের পালাকারগণ কীর্তন আঙ্গিকের পালা রচনার সময় ঠিক গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোনটি অনুকরণে পালা রচনা করেছেন তা সহজেই বোঝার উপায় নেই। কারণ গীতগোবিন্দের অনেক বিষয়ের সাথেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিল আছে। যদিও পালাকারগণ অনেক সময় শুধু রাধাকৃষ্ণকে সম্বল করে নিজের মনের মতো করে পালা রচনা করেন। সেটি রীতি বিরুদ্ধ। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে অমিত্রসুদন মিত্রের লেখনি (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র, পৃ. ২৬-৩০) থেকে বোঝা যায় যে গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক জায়গায় মিল রয়েছে। উভয় কাব্যের মধ্যে যে কেবল রচনাগত মিলই আছে তা নয়, উভয়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

গীতগোবিন্দ কাব্যটি বিভিন্ন স্বর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গ এক একটি বিশেষ নাম দ্বারা চিহ্নিত। যেমন, প্রথম সর্গের নাম 'সামোদদামোদরঃ', দ্বিতীয় স্বর্গের নাম 'অক্লেশকেশবঃ', তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুসূদনঃ' ইত্যাদি। সর্গের শেষে 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ' 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ'–এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটিও কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এক একটি খণ্ডের এক একটি নাম। যেমন প্রথম খণ্ডের নাম 'জন্ম', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'তাম্বুল', তৃতীয় 'দান' ইত্যাদি। প্রত্যেক খণ্ডের সমাপ্তিবাক্য

অনেকটা গীতগোবিন্দেরই অনুসৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জন্মখণ্ডের শেষে আছে 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং', দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে আছে 'ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং' ইত্যাদি।

গীতগোবিন্দে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তাললয়ের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও একই রীতির অনুসরণ লক্ষিত হয়।

গীতগোবিন্দ বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি-সমন্বিত নাট্যলক্ষণযুক্ত কাব্য গ্রন্থ। কবির বিবৃতি ছাড়াও গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-সখী এবং কৃষ্ণ-সখীর মধ্যে কথপোকথন আছে। গীতগোবিন্দে প্রধান চরিত্র তিনটি–রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তিন মুখ্য চরিত্র–রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বিবৃতি ব্যতীত রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-বড়াই, কৃষ্ণ-বড়াই প্রভৃতির মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে। কাব্যের গঠনগত দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলো পদ গীতগোবিন্দের অনুবাদ। এখানে শুধু কবি হিসাবে নয়, অনুবাদক-কবি হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাস কিরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে গীতগোবিন্দের কিছু আক্ষরিক অনুবাদ আছে, কিছু আছে ভাবানুবাদ। গীতগোবিন্দের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম সর্গের অন্তর্গত কোনো কোনো গীতের সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো পদের মিল আছে।

গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে :

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥

[কৃষ্ণ বিরহে অধীর শ্রীরাধা চন্দন ও চন্দ্রকিরণের নিন্দা করছেন, মলয় পবনকে বিষবৎ জ্ঞান করছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশে আছে :

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে॥

বসন্তরঞ্জন রায় এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, সর্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য রক্ষা করে রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চণ্ডীদাসেরই অনুরূপ। এখানে মূলের আদর্শ কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই একথা সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

জয়দেবের বাণীচাতুর্যের পরিচয় না মিললেও আক্ষরিক অনুবাদ হিসেবে রাধাবিরহের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত পদটি উল্লেখযোগ্য :

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।

হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে॥

গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে :

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।

স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥

[রাধা নিজবক্ষে অবিরল বর্ষিত মদনের শরাঘাত হয়ে হৃদয়মধ্যস্থিত কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য সজল আয়ত নলিনীপত্র বর্মস্বরূপ বক্ষে ধারণ করেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চতুর্থ সর্গে আছে :

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।

বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥

[রাধিকা ধ্যান কল্পনায় গড়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে কখনো বিলাপ করছেন, কখনো হাসছেন, বিষণ্ন হচ্ছেন, কাঁদছেন, কখনো বা কৃষ্ণের আবির্ভাব কল্পনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হচ্ছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই চরণের যে অনুবাদ পাই, তাতে সংস্কৃত ভাষার সেই ধ্বনিগাম্ভীর্য বা ছন্দস্পন্দন লক্ষিত হয় না। বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছেন,

তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।

হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥

এখানে মূল পদের ভাব সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে এবং অনুবাদ স্বাভাবিক হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর পরের চরণ :

ঘন বন ভৈল তার জাল সখিগণে। নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥

এটি গীতগোবিন্দের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। গীতগোবিন্দের চরণটি এইরূপ :

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে

তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।

[কৃষ্ণবিরহে রাধা ঘরকে অরণ্যতুল্য, প্রিয়সখীদিগকে জালস্বরূপ এবং নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানল সমান মনে করছেন।] 'সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে' [বনমাঝে ব্যাধজালে বেষ্টিতা হরিণীর ন্যায়] এবং 'বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে'—চিত্রকল্পের দিক থেকে মিল আছে।

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।

আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদ গীতগোবিন্দের নিম্নোদ্ধৃত পদের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ :

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্। সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥ –৪র্থ সর্গ।

[কৃষ্ণবিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হয়েছেন যে, স্তনের উপরের মনোহর হারটিকেও ভার বোধ হচ্ছে।]

জয়দেবের কাব্য-পংক্তি থেকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের আরও কিছু নমুনা দেওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পঞ্চম সর্গে :

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।

[মদনমনোহর বেশে কৃষ্ণ রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে :

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে। সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে :

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়নশরঘাতম্।

ঘটায় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

[সত্যই যদি তুমি আমার উপর কোপ করে থাক, তবে তোমার নয়নের তীক্ষ্ণশরে আমায় আঘাত করো। ভুজবন্ধনে কিংবা দশনাঘাতে যেভাবে আমায় শাস্তি দিয়ে তুমি খুশি হও তাই করো।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে :

ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে। মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মনে॥

গীতগোবিন্দের দশম সর্গ :

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্।

হসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥

[রাধার নীল নলিনাভ নয়ন দুইটি এখন কোকনদ রূপ ধারণ করেছেন। কুসুমশরদৃষ্টিতে যদি কৃষ্ণতনু রঞ্জিত করা যায় তবেই হয় রূপপূর্তি।]

বৃন্দাবনখণ্ডে :

তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন ধরে কোকনদ রূপে।

মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ হএ তোর আনুরূপে॥

জয়দেব যেখানে রাধার নয়ন 'নীলনলিন' বলে উল্লেখ করেছেন, বড়ু সেখানে লিখেছেন 'মলিন নলিন'।

আরও একস্থানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গীতগোবিন্দে বিভিন্ন সর্গের শিরোদেশে কবির উক্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলোর মিল আছে। গীতগোবিন্দে বিভিন্ন গীতের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য যেমন কবি কথা বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সেইরূপ দেখি। গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে কবি কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন :

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।

প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী॥

[যমুনাতীরে বানীরনিকুঞ্জে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট প্রেমভরে উদ্‌ভ্রান্ত মাধবকে রাধিকার সখী এসে বলল।] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখি, কবি দুই পদের ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন। যেমন,

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ্ বৃদ্ধা কপটকোবিদা॥

—তাম্বুল খণ্ড

কিংবা

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যাতটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ।

চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জ গাদ॥ —দানখণ্ড।[৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস যে জয়দেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এই সব দিক লক্ষ্য করলে সেকথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। একটা বিষয় আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, লোকনাট্যের পালাকারগণ কখনো গীতগোবিন্দের কখনো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বা কখনো এই দুইয়ের মিশ্রণে বা কখনো কোনটাই অনুসরণ না করে রাধাকৃষ্ণ নাম অবলম্বন করে নিজেদের মতো করে পালা রচনা করেন।

৬.১ পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন ও পদাবলী

পালা শব্দটি যাত্রা বা নাটকের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় কীর্তনের ক্ষেত্রেও অনেকটা তেমনই। বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলোকেই লীলা বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে লীলা হলো ভগবৎরূপের খেলা। লীলার আদি নাই অন্ত নাই, ক্লান্তি নাই দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি নিত্যধারা। ভগবতরূপের প্রকট অবস্থার সমস্ত কর্মই

লীলা। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের লীলাপ্রসঙ্গ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। এই লীলাসূত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায়।[৭] পৃথকভাবে এ গানগুলো হলো লীলাকীর্তনের আঙ্গিক–লীলা প্রকরণটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য। বিভিন্ন পদকর্তার ঐ লীলা সংক্রান্ত পদ সংগ্রহ করে গায়ক তাঁর আত্মিক অনুভূতি ও শৈল্পিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা একটি আস্বাদনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

পদাবলী কীর্তন মূলত পালাকীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগুলো পদকে সংকলিত করে ঘটনার নাটকীয় বর্ণনার উপস্থাপনকল্পে করা হয়–পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন। পদকীর্তন হলো ইদানীং প্রচলিত কীর্তনের অর্থাৎ কবি জয়দেবোত্তর যুগে প্রচলিত কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ। এরই সংস্কারপ্রাপ্ত রূপটি হলো গড়াণহাটি গানের ধারা। ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, পরপর সংযোজন করলেও স্বকীয় সত্ত্বা নষ্ট হয় না। পালাকীর্তন পর্যায় প্রকরণের সময় গানগুলো যখন সংযোজন করা হয়, প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট্যের যথার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করা হয়। তাই পদাবলী কীর্তনই হলো কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন।[৮]

লীলাকীর্তনে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে গাইতে হয় :

১) রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাইতে হয়।
২) পদ-সংকলনে শাস্ত্রীয় ক্রম রক্ষা করতেই হয়।
৩) ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজনপদাবলীর অভাব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুক গান বা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু উল্লেখ করতে হয়।
৪) আখর সংযোজন ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং রসের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হয়।
৫) শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে গান করতে হয়। প্রতিটি গানের ভণিতা গাইবার সময় পদকর্তার প্রতি সম্মান দেখাতে হয়।
৬) সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্ব মানতে হয়, অর্থাৎ যে গান যে তালে এবং যে সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই যেন গাওয়া হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন গান সংযোজন করা হয়।
৭) লীলাকীর্তন বিশ্লেষণে কেবল নায়ক-নায়িকা, সখা-সখী ইত্যাদির প্রতি সমগ্র গুরুত্ব দিলে হয় না, পরিবেশ বিশ্লেষণ ও অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয়।
৮) অনুষ্ঠানের সার্বিকতা রক্ষাকল্পে ভক্তিভাব দেখাতে হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের মনমতো দেববিগ্রহের ফটো, মালা, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

৯) চন্দন, তিলক, মালা ইত্যাদি পরাবার সাধারণ নিয়ম : প্রথমে একটি ফুল দিয়ে বাটিতে চন্দন নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, তারপর মূলগায়েন, দোঁহার ও বাদকদের তিলক, চন্দন এবং মালা পরিয়ে প্রণাম করতে হয়।

১০) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আবশ্যকীয় হলো 'মিলন'। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পর্কিত গান শেষ পর্যায়ে করতে হয় এবং এই মিলন শুনলেই বোঝা যায় গান শেষ।

১১) লীলাকীর্তনে যে কোনো সময়ে যে কোনো লীলা গাওয়া যায় না। দিনের যে অংশে কীর্তন হবে, সে অংশের নির্দিষ্ট লীলাপ্রসঙ্গ গাওয়াই বিধেয়। যেমন : নিশান্তে–কুঞ্জভঙ্গ; প্রাতে– বাল্যলীলা, দেবগোষ্ঠ, গমনগোষ্ঠ, খণ্ডিতা; পূর্বাহ্নে–খেলাগোষ্ঠ, কলহান্তরিতা, শ্রীকুঞ্জমিলন; মধ্যাহ্নে–নবোঢ়া রসোদ্‌গার, সূর্যপূজা, গোপীগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস; অপরাহ্নে–উত্তরগোষ্ঠ, পূর্বরাগ, রসোদ্‌গার, ভাবোল্লাস; সায়াহ্নে–রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ; প্রদোষে–রূপাভিসার, মিলন; নক্তলীলায়–রাসলীলা, সাক্ষাৎ আক্ষেপ, রসালস, তা ছাড়া মাথুর বিরহে ভবন এবং ভাবী পর্যায়ই প্রাতকালীন পর্যায়।

১২) ঋতুভেদে উৎসবানুযায়ী কতগুলো লীলাপ্রকরণ আছে, সেগুলো গাইতে হয়। যেমন দোলে–হোরীলীলা; ঝুলনে–ঝুলন লীলা; জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব, বসন্তে–বাসন্তীরাস; শরৎকালের পূর্ণিমায় শারদীয়া রাস। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও সামঞ্জস্যপূর্ণ পালা পরিবেশন করা হয়, প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে সেগুলো পালার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৩) লীলাকীর্তনে শ্রীখোল-সঙ্গতে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বাজাতে হয়। লীলার প্রসঙ্গ, ভাব ও রস অনুযায়ী ঠেকা, লহর, কাটান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। বাদককে দাঁড়াতে হয় এবং নৃত্যভঙ্গী দেখাতে হয়।

১৪) অষ্টকালীন লীলাকীর্তন হয় সময়োচিত নির্দিষ্ট আটটি প্রসঙ্গ নিয়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গায়ক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গান করে থাকেন।

১৫) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা, ব্রজবুলি এবং সংস্কৃত এই তিনপ্রকার ভাষা এবং আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়।[৯]

২০১৬ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার একটি আসরে 'নৌকাবিলাস' পালাকীর্তন পরিবেশন
করছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

এই লীলাকীর্তনেরই অপর নাম 'পালাকীর্তন' এবং এই 'পালাকীর্তন' শব্দটি মনে হয় বাংলাদেশের সূত্রে এসে লীলাকীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'পালা' বলতে যাত্রা, নাটক, লোকনাট্য ইত্যাদির পালা। লীলাকীর্তনে যেহেতু নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়, সেহেতুই মনে হয়, পালা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিবাসীগণ লীলাকীর্তনের পরিবর্তে পালা কীর্তনই বলে থাকেন। লীলাকীর্তনই হোক আর পালাকীর্তনই হোক, কীর্তনের এ ধারাটির সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে পরবর্তীকালে। গানগুলো যখন প্রথম রচিত হয় তখন সেগুলো পৃথক গান হিসেবেই গাওয়া হতো। তাই প্রত্যেকটি গানের পৃথক অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের সূত্রেই গানের গড়ানহাটি রূপটি পাওয়া যায়। পরে লীলাপ্রসঙ্গের পূর্ণায়ত রূপ দিতে গানগুলো খুঁজে গায়কগণ একটি ঘটনার রূপ দিয়েছেন। স্বভাবতই এর সৃষ্টি কিছু পরে এবং এ সৃষ্টি ক্ষেত্রে বা পালা প্রকরণ ক্ষেত্রে কিছুটা মঙ্গলগানের প্রভাব আছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়া লোচনদাস ছিলেন মঙ্গলগায়ক। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, লীলাকীর্তনের পূর্ণাঙ্গ রূপসৃষ্টির প্রয়োজনেই মনোহরশাহী গানের ধারা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।[১০]

পালা : বঙ্গীয় শব্দকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে পালা বলতে {সং পর্যায় > প্রা পল্লাআ > বা (পল্লা) পালী : অস পালী}। পালা শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যায়ানুসারে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয় বা গান। পালা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ ভিন্নমত পোষণ করেছেন–আসামের 'পালি' শব্দ থেকে 'পালা' শব্দের উৎপত্তি। তিনি বলেন, অষ্টদশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদ্ভবের আগে 'ওঝা

পালি’ নামে এক প্রকার সম্মিলিত সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গীত মিশ্রিত নৃত্যে ‘ওঝা’ অথবা দলনেতা নানারকম অঙ্গভঙ্গিসহ কিছু ছড়া আবৃত্তি করে এবং পালি অথবা সহযোগীবৃন্দ করতাল বাজিয়ে পদচারণাসহ গান গাইতে থাকে এবং ডায়েনা পালি অথবা প্রধান সহযোগী দলনেতার সঙ্গে কথোপকথনের রীতিতে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা করে দেয়। ঢুলিয়া অথবা ঢোল বাজনদারদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেও লোকনাট্যের উপাদান সন্ধান করে পাওয়া যায়। উৎসব উপলক্ষে তারা নানারকম শারীরিক কসরত দেখাত এবং স্থূল নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করত।[১১]

‘পালা’ শব্দের তাৎপর্য নিরূপন করতে গিয়ে ড. সেলিম আল দীন বলেন, ‘পালা সাধারণ অর্থে পরিবেশন যোগ্য কাহিনী, কোন বিস্তৃত কাহিনীর বিশেষ অংশ। মঙ্গলকাব্যে দিনে পরিবেশিত কাহিনী পর্ব দিবাপালা ও রাত্রে পরিবেশিত কাহিনী নিশিপালারূপে অভিহিত হয়। পালার অন্য নাম ‘পাট’, যেমন–ধোবার পাট।’ ঢাকা, মানিকগঞ্জ, প্রভৃতি জেলায় পালি অর্থে ‘পাইল’ যুক্ত হতে দেখা যায়, যেমন–পাইলের গান (দোঁহারের গান) এবং ‘পালি গান’ পালি বলতে দোঁহারদের দ্বারা পরিবেশিত গানকে বোঝানো হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’ অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ পালি গানের উল্লেখ আছে। এই পালি থেকে পালা শব্দের উৎপত্তি।[১২]

অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন পালাও পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের লোকনাট্যে ড. আশরাফ সিদ্দিকী ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলোতে বিভিন্নভাবে শ্রেণিভুক্ত করেছেন–খাঁটি প্রেমকাহিনীমূলক, ধর্মভিত্তিক প্রেম, রূপকপ্রণয়-গীতিকা, বিবাহোত্তর প্রেম, ঐতিহাসিক গীতিকা, দস্যু লোকনায়ক, জায়গার নাম, অরণ্যভূমির গান। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই লোকনাট্যের পালাকারগণ পালা রচনা করতেন বা করেন। বাংলা লোকনাট্যে পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পূর্ব ময়মনসিংহ গীতিকা, নোয়াখালী বা চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব লোকনাট্যের পালা আজও মানুষের মুখে মুখে তার মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ান মদিনা, নিজাম ডাকাতের পালা, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া, কমল সদাগর, পরীবানুর হাহলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৬.২ নামসংকীর্তন

অনেকে মিলে ভগবৎ-সুখ-নিমিত্ত ভগবৎ-সম্পর্কিত যে গান গেয়ে থাকেন তাই হলো কীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকে মিলে গাওয়া নামসংকীর্তনের উপর। তাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই তিনি বলেছেন–

‘চেতদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধুজীবনম্।
প্রতিপদপূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মসমর্পণং
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥’[১৩]

নামসংকীর্তনকে আশ্রয় করে সর্বকর্মে অগ্রসর হওয়া নামকে সাক্ষী রেখে সমস্ত সংকল্প করা এবং নামাশ্রয়ই এ জগতে মূল প্রাপ্তির উপায় এমন বিশ্বাস রেখে নাম কীর্তন করা কর্তব্য।[১৪]

শাস্ত্রমতে আমাদের যে চারটি যুগের কথা বলা হয়–সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি–এই চার যুগের চারটি নাম। এগুলো হল–

১। ‘নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥’

২। ত্রেতা যুগের নাম–
‘রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।’

৩। দ্বাপর যুগের নাম–
‘হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥’

৪। কলি যুগের নাম–
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’

চার যুগের এই চারটি নামেরই ত্রাণক্ষমতা আছে তাই এদের তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়। বিশেষতঃ এই কলিযুগে ‘হরেকৃষ্ণ’ এই তারকব্রহ্ম নামই কীর্তনেয়। অবশ্য চৈতন্যদেবের যুগেই আরও বিভিন্ন নামকীর্তনের শুরু হয়। যেমন–

১। ‘রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥’

২। ‘হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥'

চৈতন্যোত্তর যুগে যেসব নাম নানাভাবে ভক্তদের দ্বারা কীর্তিত হয়েছে সেগুলো হল–

১। 'জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥'

২। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।'

৩। 'রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন
রামনারায়ণ হরে জয় জয়।'

নানাবিধ নামকীর্তন নানা সূত্রে সম্প্রচারিত হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের আমল থেকে নামকীর্তন বা নগরকীর্তন হিসাবে যে নামের কীর্তন প্রচলিত হয়ে আসছে তা হল 'হরেকৃষ্ণ' তারকব্রহ্ম নাম। এই নামকীর্তনই হল পাষণ্ডদলনের মূল অস্ত্র।[১৫]

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকেই নাম-কীর্তনের দল তৈরি করা হত বেশ কয়েকজন গায়ক-বাদকের সমবিভ্যাহারে। ন্যূনতমপক্ষে দুইজন শ্রীখোল বাদক, বেশ কয়েকজন গায়ক, একজন মূল গায়ক নিয়ে পনেরো কুড়িজন লোকের একটি সম্প্রদায় হত।[১৬] প্রতিদিন আট প্রহর হিসাবে– ষোল, চব্বিশ, বত্রিশ, ছাপ্পান্ন, বাহাত্তর, এমনকি তার চেয়েও অনেক বেশী সময় ধরে অবিরত নাম-কীর্তন হয়ে থাকে। এই সংকল্পরক্ষার নিমিত্ত কমপক্ষে চারটি নাম-কীর্তনের দল প্রস্তুত রাখতে হয়। এ দলগুলো দিনে দু'ঘণ্টা এবং রাত্রে দু'ঘণ্টা করে গান করে। ফলতঃ অনায়াসে নির্দিষ্ট সময়ের গান সম্পন্ন হয়ে যায়।[১৭]

বিংশ শতকের প্রথমদিকে এ কীর্তনের ধারার কিছুটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আগে যেমন নির্দিষ্ট কয়েকটি সুরে গাওয়া হত এবং গাওয়া হত সকলে মিলে, এখন তার প্রথাগত পরিবর্তন হল। রাগসংগীতের ধারার কিছু কিছু সংমিশ্রণ হল এবং একজনের পর একজন করে গানটি গেয়ে চলে–এই বিধি করা হল।[১৮] প্রথম পর্যায়ে যারা এই নামকীর্তনে ক্লাসিক্যাল রাগের সংযোজন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন–ফরিদপুরের রাইমোহন সাহা (রাইয়া বাড়ুই), অনন্ত মাস্টার, সন্তোষ সর্দার, উজিরপুর, বরিশালের অনিল বিশ্বাস, বাকেরগঞ্জ বরিশালের মনোরঞ্জন শীল ও নিরঞ্জন শীল ঢাকা জেলার কলাকোপার শম্ভু আচার্য, ফণি কুণ্ডু, গদাধর শীল, শৈলেন সাহা, মনোমোহন বুনো, গোপাল কাপালি প্রমুখ কীর্তন শিল্পী।[১৯] বাংলাদেশের নামকীর্তনে আধুনিক প্রথায় অর্থাৎ রাগাশ্রিত নামকীর্তন পদ্ধতিতে শ্রীখোল সঙ্গতের একটি নতুন দিক উন্মোচন করেন সনাতন সাহা।[২০] সকলের প্রচেষ্টায় নামকীর্তনের সাঙ্গীতিক অংশটি খুবই সুস্পষ্ট হয়েছে এবং এর জন্য নামসংকীর্তন এখন আরও জনপ্রিয় হয়েছে, আগেকার তুলনায় যথেষ্ট গণমুখী হয়েছে। এসময়ে যারা নামসংকীর্তনকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের

মধ্যে সুপ্লব বিশ্বাস—ফরিদপুর, চাঁদ বিশ্বাস—ঝিনাইদহ, বিমল ঘরামি—পটুয়াখালি, সঞ্জয় গাইন—খুলনা, প্রদীপ মণ্ডল—গোপালগঞ্জ, সুমন চক্রবর্তী—কুমিল্লা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গোপালগঞ্জের প্রভু প্রিয়া সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়া অনিমা বাইন নামসংকীর্তন
পরিবেশন করছেন মাদারীপুর সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে। ২২-১২-২০১৯ তারিখে।

নামকীর্তন ধর্মান্ধতার বিষয় নয়, এটি একটি আচরণ মাত্র, যে আচরণের সূত্রে জাগে সামাজিকতা বোধ, জনকল্যাণে গণ-উদ্যোগের প্রেরণা, সমবায়ভিত্তিক সমাজ-সংস্কারের চেতনা, জাতিবর্ণের সংকীর্ণতা এবং হীনমন্যতা থেকে মুক্তি, শুভকর্মে দানব্রতে উদারতা, সৌহার্দ্য এবং সৌম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস এবং সর্বোপরি আনন্দের উপভোগ। এই সর্বাত্মক পরিবেশটি শান্তি ও কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণের সূত্র ধরে আত্মিক কল্যাণ, আবার আত্মিক অনুভূতির বিনিময়সূত্রে সামাজিক কল্যাণসাধন। তাই নামকীর্তন হল কীর্তনের জনপ্রিয় এবং গণমুখী প্রকরণ।[২১]

কার্তিক মাস থেকে পৌষ মাস নতুন ফসল তোলার সময়। নবান্নের এই সময়টুকুকে আহ্বান জানানো হয় গ্রাম সমাজে। কার্তিক মাস ধর্মের মাসও। তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভোর থেকে বাড়ি বাড়ি যায় এবং খোল করতাল সহ ধর্মসংগীত গায়। সাধারণত চণ্ডীদাসের পদ বা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ বা জাগতিক সুখের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের গান। প্রভাতী সংগীতও গীত হয়।[২২] রাই জাগ রাই জাগ শুক সারি বলে, ওঠো ওঠো গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল, জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধন প্রভৃতি গানগুলো উল্লেখযোগ্য।

পৌষ মাসে মোটামুটি ফসল তোলা শেষ হয়। কৃষকের ঘরে আনন্দের আমেজ। তখন খুশির আনন্দে বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাদের সামান্য পারিশ্রমিক সংগ্রহ করে। কৃষক পরিবার চাল দেয়, আলু দেয়, অন্যান্য শাক-সবজিও দেয়। কেউবা সামর্থ্য থাকলে বৈষ্ণবদের পেট ভরে খাওয়ায়। কেউ বা তাদের ধুতি-গেঞ্জি দেয় খুশি হয়ে। প্রাচীন বাংলার যজমানি ব্যবস্থার প্রতিফলন রয়েছে আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে এই প্রথাটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মধ্যে।[২৩]

নামসংকীর্তনের পৃষ্ঠপোষক ও বায়না : নামসংকীর্তনের যে কোনো দলকে বায়না করতে হলে দলের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ম্যানেজারের সাথে আলাপের ভিত্তিতে বায়নার টাকা নির্ধারিত হয়। সাধারণত কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণমন্দির বা বারোয়ারী মন্দিরের সামনে বিভিন্ন প্রহর (১ প্রহর = ৩ ঘণ্টা) ব্যাপী নামসংকীর্তন হয়ে থাকে।

মঞ্চ বা আসর : উপরে টিন বা শামিয়ানা দিয়ে মাঝখানে চারটি বাঁশের খুটি দিয়ে সেগুলো কাগজ বিভিন্ন নক্‌শা করে কেটে মঞ্চ সাজানো হয়। সাথে কাগজের ফুল ও সোলার ফুলও দেওয়া হয়। মঞ্চের মাঝখানে ভক্তদের মনমতো দেব বিগ্রহের ছবি বা রাধাকৃষ্ণের ছবি রাখা হয়। ছবিতে মালা ও তিলক, চন্দন দেওয়া হয়। আসরের চারদিকে খোলা থাকে। আর চারদিকে ভক্তদের বসার জন্য চট ও খড় বিছানো থাকে। অনেক আসরে ভক্তদের বসার জন্য শতরঞ্জি বিছানো হয়।

আলো : বর্তমান সময়ে বৈদ্যুতিক আলোতেই সাধারণত নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আসরে চারটি খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয় চারটি টিউব লাইট। বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা করে রাখেন আয়োজকগণ।

পোশাক ও সাজসজ্জা : গেরুয়া বা সাদা ধুতি ও নামাবলী অঙ্কিত উত্তরীয় পরারই নিয়ম। কিন্তু বর্তমানে কীর্তনীয়ারা ধুতি-পাঞ্জাবির সাথে বিভিন্ন রংয়ের উত্তরীয় পরিধান করেন। মুখে সামান্য পাউডার দিয়ে কপালে তিলক পরেন।

বাদ্যযন্ত্র : নামসংকীর্তনে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, বাঁশি , বেহালা, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নামসংকীর্তন গাওয়ার রীতি বা পদ্ধতি :

নামসংকীর্তনের কয়েকটি দল বায়না করা হয়। প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় দুই ঘণ্টা করে গান করেন। একটি সম্প্রদায় যখন আসরে আসে তখন মধ্যলয়ে জলদ করে কোন রাগের সুরে নামসংকীর্তন করতে করতে লাইন ধরে আসরে প্রবেশ করেন। তখন প্রথমেই থাকেন (১) ডাইনা খুলী (প্রধান শ্রীখোল বাদক) (২) তাঁর সঙ্গী করতাল বাদক, (৩) বায়য়া খুলী (২য় মৃদঙ্গ বাদক, (৪) বায়য়া খুলীর সহযোগী করতাল বাদক, (৫) মূল গায়ক (তিনিই হারমোনিয়াম বাজান), (৬) প্রধান দোঁহার (১

নাম্বান দোঁহার), (৭) ২য় দোঁহার, (৮) ৩য় দোঁহার, (৯) বাঁশি, (১০) বেহালা ও (১১) দোতারা। লাইন ধরে আসরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নামসংকীর্তন পরিবেশন করেন।

এরপর পুরোদল আসরের মাঝখানে দাড়ানোর পরে তিলক, চন্দন, মালা শিল্পীদের পরানো হয়। এগুলো পরাবার সাধারণ নিয়ম হলো প্রথমে একটি ফুল দিয়ে বাটিতে তিলক নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, তারপর মূল গায়েন, দোঁহার ও বাদকদের তিলক এবং মালা পরিয়ে প্রণাম করতে হয়।

কুমিল্লার নামকীর্তনীয়া শ্রী সুমন চক্রবর্তীর সাথে কথাপোকথন নামকীর্তন গাওয়ার রীতি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। শুরু হয় আসর বন্দনা দিয়ে। প্রহর (১ প্রহর = ৩ ঘণ্টা) অনুযায়ী কোন রাগে বিলম্বিত লয়ে আসর বন্দনা করতে হয়। আসর বন্দনা শেষ হলে হাত তুলে ভক্তদের উদ্দেশ্যে আসরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে সামান্য নৃত্য করে ভক্তদের প্রণাম জানানো হয়। তখন জলদ লয়ে কাহারবা, ঝুমুর, খোমটা তাল বাজানো হয়। বাদক জমাটে তেহাই দিয়ে এই পর্ব শেষ করেন।

এরপরে গায়ক, বাদক ধীরে ধীরে বিরাম/বিলাপ পর্বে প্রবেশ করেন। এই পর্বটি খুবই আবেগঘন। বিলম্বিত লয়ে কোন রাগের সুরে ঈশ্বরকে পাবার আকুতি ফুটে ওঠে এই বিরাম পর্বে।

বিরামের পর শুরু হয় কাটান। কাটান গাওয়া হয় মধ্যম লয়ে একটু আনন্দঘন ভাবে। এটি তিনটি ভাগে গাওয়া হয়। খাদে (নিচে) স্বর, মধ্যম স্বর ও চড়া স্বর। কাটান শেষ হলে পঞ্চম (চড়া) শুরু। পঞ্চমের কাটান উপরের পার্ট (অংশ) শুনতে অনেক সময় বিবেক গানের সুরের মতো মনে হয়।

আর একটি অংশ রয়েছে যা খুব কম নামসংকীর্তনের সম্প্রদায় করে থাকেন। সেটি হলো পঞ্চমের কাটান শেষ হলে তেওট, দশকোশী, ধামার, বিভিন্ন কীর্তনের তালে বিলম্বিত লয়ে মূল কীর্তনের সুরে কিছু সময় গাওয়া হয়। এর পরে ২ ঘণ্টা যখন প্রায় শেষ হয়ে যায় তখন বিভিন্ন শ্যামা সংগীত, লালন বা অন্যান্য ভক্তিমূলক জনপ্রিয় গান একটু দ্রুত লয়ে গাইতে গাইতে একটি দল ভক্তদের প্রণাম করে লাইন ধরে বেরিয়ে যায় এবং আর একটি দল একই নিয়মে আসরে প্রবেশ করে নামসংকীর্তন করেন। তবে একটি কথা বোলে রাখা ভাল নামসংকীর্তন যেদিন শেষ হবে তার আগের রাতে নামকীর্তনীয়ারা জগাই-মাধাই উদ্ধার, রাসলীলা প্রভৃতি পালা লোক আঙ্গিতে পরিবেশন করে থাকেন। এটি নামসংকীর্তনের রীতিবিরুদ্ধ। খুব ভোরে অর্থাৎ ৬ টার আগে নামসংকীর্তন যখন শেষ হয় তখন একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মিশ্র ললিত রাগ, ভায়রো রাগ, রামকেলী, দেবগিরি বিলাবল, কালিংরা, আহীর ভৈরব, বিভাস, ভৈরবী, ভাটিয়ার, সোহিনী, যোগিয়া, নট ভৈরব, গুণকেলী, বৈরাগী প্রভৃতি রাগ পঞ্চমে গাওয়া হয়। সুরের মুর্চ্ছনায় ভক্তবৃন্দ আরো আবেগী হয়ে ওঠেন। পরস্পর পরস্পরের সাথে আলিঙ্গনে লিপ্ত হয়। এর পরে মঙ্গল আরতি সুর বা প্রভাতী সুর দিয়ে বিভিন্ন প্রহরব্যাপী নামসংকীর্তনের সমাপ্তি হয়।

৬.৩ কৃষ্ণযাত্রা

কৃষ্ণযাত্রা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মযাত্রা। মূলে কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে শোভাযাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হতো। চৈতন্যভাগবতে আছে–

> 'কৃষ্ণযাত্রা অহর্নিশি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
> ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোনজনে'॥[২৪]

কৃষ্ণযাত্রা নাটক অর্থে কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা। 'যাত্রা পালার মুখ্য বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তার মধ্যে প্রধান ছিল কালিয়দমন। কৃষ্ণলীলার অন্যান্য কাহিনী যাত্রায় গৃহীত হলেও কালিয়দমন সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল বলে এক সময় যাত্রার নামান্তর হয়েছিল কালিয়দমন।'[২৫] ভারতচন্দ্র চণ্ডীচরিত্র নিয়ে 'সঙ্গীত নাটক' লিখতে শুরু করেছিলেন। চৈতন্য-কথাও কৃষ্ণযাত্রায় সমাদৃত ছিল।[২৬] বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও রুচি পরিবর্তনের ফলে কৃষ্ণযাত্রা ছাড়া আর কোন যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছাতে পারে নাই। কৃষ্ণযাত্রার উপরে নাটকের ও অভিনয় রীতির (সেই সঙ্গে কথকতার) প্রভাব গাঢ় হয়ে পড়ল এবং গীতাভিনয় উৎপন্ন হলো। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধারা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এসে রুদ্ধস্রোত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নতুন করে গীতনাট সৃষ্টি করলেন।[২৭] সুকুমার সেন বলেছেন, 'প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাঁর মধ্যে বিশেষ করে কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা অথবা কালিয়দমন। তার পরে চৈতন্য-যাত্রা। চণ্ডী যাত্রার নামটুকু শোনা যায়। অবশেষে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা।'[২৮]

'প্রাচীনকালের নিদর্শন খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' অনেকটা যাত্রাগানের আকারেই রচিত, কেননা তাঁর পদগুলো এমনভাবে সাজানো যে, সেগুলো অভিনয় নৃত্য সহযোগে গীত হলে তা যাত্রাগানেরই রূপ নেয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই যুগের কৃষ্ণযাত্রা পালার একটি প্রকৃষ্ট ও প্রামাণ্য নিদর্শন।[২৯] গবেষকগণ মনে করেন রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হতো মধ্যযুগে বাংলা নাটগীতে। তার মধ্যে কেবলমাত্র নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে বিষয়বস্তু অগ্রসর হয়ে যেত। এর মধ্যে 'কৃষ্ণ বিষয়ক' যেটুকু ছিল, সেটুকুই কৃষ্ণযাত্রা।[৩০]

মধ্যযুগের বাংলানাট্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন সেলিম আল দীন। তিনি বলেন, 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যাত্রা কথাটার অর্থ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মূলত যাত্রা নাট্যাদি অর্থে পরিচিতি লাভ করে।[৩১] কৃষ্ণ জন্মযাত্রা বা জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে লীলানাট্যের অভিনয় স্বয়ং চৈতন্যদেব দ্বারা সাধিত হয়েছিল। চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের কৃষ্ণ ও

রামলীলা বিষয়ক অভিনয় ছিল অনানুষ্ঠানিক, আচার্য চন্দ্রশেখরের গৃহপ্রাঙ্গণে চৈতন্যদেবের নাট্যানুষ্ঠানও তিথি নক্ষত্র বা যাত্রা উপলক্ষে পরিবেশিত হয়নি। কাজেই একথা বলা যায় যে, লীলানাট্যই বলি আর কৃষ্ণযাত্রাই বলি আনুষ্ঠানিক শোভাগমন বা উৎসব উপলক্ষ ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রভাবে সেকালে অভিনীত হতো।[৩২] চৈতন্যদেবের এই নাট্যানুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে পরিশিষ্ট-১এ।

'কৃষ্ণযাত্রা' রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গ্রন্থাবলীর সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেনের মূল্যায়নে ভিন্ন উপলব্ধি জাগ্রত হয়। তিনি কৃষ্ণকমলের পালা সম্পর্কে বলেছেন–তার 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাস' প্রভৃতি পালা যাঁরা শুনেছেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের চোখের পাতা শুকাতে পারে নাই। কোন কবি বোধ হয় এরূপ অপর্যাপ্ত করুণ রস তাঁর কাব্যে ভরপুরভাবে আনতে পারেন নাই। সেসব আসর যাঁরা প্রত্যক্ষ না করেছে, তাঁরা এই করুণ রসের মাত্রা অনুমান করতে পারবে না।[৩৩] বাংলাদেশে যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব এই কৃষ্ণকমল গোস্বামীর।[৩৪] তিনি ছিলেন পদকর্তা, পদাবলী-গায়ক ও পালা-লেখক। তিনি মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তন করতেন। কৃষ্ণকমল ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত, ভাবুক কবি, গায়ক ও অভিনেতা। কৃষ্ণযাত্রার মাধ্যমে তিনি পরিবেশন করেছিলেন সহজ সরল ভাষায় অকৃত্রিম আন্তরিক ও ভক্তিরস ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা।[৩৫] 'যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!'–এই চরণটি এখনও মানুষের মুখে মুখে জীবন্ত রয়েছে। কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে 'বৈষ্ণব পুনরুত্থানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ' পালাকার হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।'[৩৬]

কৃষ্ণযাত্রার পৃষ্ঠপোষক ও বায়না : কৃষ্ণযাত্রার যে কোনো দলকে বায়না করতে হলে যোগাযোগ করতে হয় দলের ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজারের সাথে আলাপের ভিত্তিতে বায়নার টাকা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মেলা উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের লালমনিরহাট-কুড়িগ্রামের শিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণমন্দির, সার্বজনীন দুর্গামন্দির কমিটি ও মেলা উদ্‌যাপন কমিটি সাধারণত কৃষ্ণযাত্রা আয়োজন করেন। অন্যান্য জায়গাতেও হয়, তবে সেটি খুবই নগণ্য।

কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশনা
প্রতিকী চিত্র

অনুষ্ঠানের সময় : শীতের রাত কৃষ্ণযাত্রার আসরের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। এদেশের উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক লোকায়ত পূজা, মেলা ও লোক-উৎসব সাধারণত শীতের সময় বেশি হয়। আর সেই সব অনুষ্ঠানে কৃষ্ণযাত্রা-ই বেশি চলে। কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় শুরু হয় মধ্যরাত থেকে। আসর চলে ভোর পর্যন্ত। কেননা, গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষই কৃষ্ণযাত্রার অভিনেতা-কুশীলব এবং দর্শক-শ্রোতা। তাই দিনের বেলায় তাদেরকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

মঞ্চ বা আসর : সাধারণ পালাকীর্তনের মতো টিন দিয়ে প্যান্ডেল ঘিরে কৃষ্ণযাত্রার আসর করা হয়। মঞ্চের চারদিকে চারটি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে মঞ্চের উপরে টিনের চালা দেওয়া হয়। মঞ্চে অভিনয় স্থানে পাটের চট বিছানো থাকে। মঞ্চের চারদিক থাকে খোলা। আর চারদিকে দর্শকের বসার জন্য খড় বিছানো থাকে। এক্ষেত্রে দর্শকদের বসার স্থানে মাথার উপরে শামিয়ানা টানানো থাকে। মঞ্চের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে দর্শকদের সমান্তরালে বাদ্যযন্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা থাকে।

আলো : বৈদ্যুতিক আলোতেই সাধারণত কৃষ্ণযাত্রার পালা অভিনীত হয়ে থাকে। মঞ্চের চারদিকের চারটি খুঁটিতে বেঁধে দেওয়া হয় চারটি টিউব লাইট। সাধারণ বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা করে রাখেন কৃষ্ণযাত্রার আয়োজকগণ।

সাজসজ্জা ও সাজঘর : কৃষ্ণযাত্রার সকল শিল্পীগণ চরিত্র অনুযায়ী সাজসজ্জা করে থাকে। মঞ্চের বেশ দূরে করা কাপড়ঘেরা গ্রিনরুমে বসেও তাঁরা সাজসজ্জা করে থাকেন। গ্রিনরুম থেকে মঞ্চ পর্যন্ত দুই দিকে দড়ি টানিয়ে একটি প্রবেশ-প্রস্থান পথ করে রাখা হয়। কৃষ্ণযাত্রার শিল্পীরা সেই পথ দিয়ে দৌড়ে বা হেঁটে মঞ্চে এসে এক একটি দৃশ্যের অভিনয় করে আবার সেই পথ দিয়ে গ্রিনরুমে চলে যান।

পোশাক : কৃষ্ণযাত্রার শিল্পীদের অনেক চরিত্র সাধারণ যাত্রাশিল্পীদের মতো ভাড়া করা পোশাক পরে অভিনয় করে থাকেন। যেমন নিমাই সন্ন্যাস পালায় জগাই-মাধাই চরিত্রদানকারী অভিনেতাদ্বয় সাধারণত জরির কাজ করা পোশাক ও টুপি পরে মঞ্চে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় করেন। এছাড়া, শচীমাতা চরিত্রে রূপদানকারী সাদা কাপড় পরিধান করে থাকেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া রূপদানকারী শিল্পী জড়ির কাজ করা রঙিন ওড়না ও গাঢ় রঙের শাড়ি পরে অভিনয় করেন। ধুতি পরিহিত অবস্থায় নামাবলী অঙ্কিত একটি উত্তরীয় গায়ে নিমাই চরিত্রে রূপদান করেন একজন অভিনেতা। অপরাপর চরিত্র রূপদানকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও তার চেলা ধুতি-পাঞ্জাবি ও কোট পরিধান করেন।

অভিনয় উপকরণ : অভিনয় উপকরণ হিসেবে থাকে লাঠি, প্রদীপ, মালা, পিতলের বাটি, স্টিলের বাটি, জলের বোতল ও জল। পালা অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায়।

কুশীলবদের নাম : 'কৃষ্ণযাত্রার দলে আগে যে সকল কুশীলব অভিনয় করতেন এবং বর্তমানে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের একটা করে নাম আছে। যে সকল কিশোর-যুবা শাড়ি পরে মেয়ে সেজে আসরে এসে বন্দনাগানসহ অন্যান্য যৌথ ও একক গান পরিবেশন করে থাকেন, তাঁদেরকে ছুকরি বলা হয়। আর যারা চরিত্রাভিনয় করেন চরিত্রের নাম অনুযায়ী তাদেরকে অবিহিত করা হয়, যেমন–শচীমাতা, নিমাই, নিতাই, জগাই, মাধাই, বিষ্ণুপ্রিয়া , রাধা, কৃষ্ণ, সখি ইত্যাদি। এছাড়া, কৃষ্ণযাত্রার দলে একজন ম্যানেজার, একজন মেকাপম্যান এবং প্রম্পট মাস্টার থাকেন।

বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রী : পালাকীর্তনের মতোই কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় অনুষঙ্গ রূপে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হলো হারমোনিয়াম, খোল, করতাল ইত্যাদি। এই বাজানদারদের নামও আছে, যথা–খুলি, হারমোনিয়াম মাস্টার বা হারমোনিয়াম বাদক ইত্যাদি।

'কৃষ্ণযাত্রার কুশীলব : 'কৃষ্ণযাত্রার কুশীলবদের সকলেই প্রায় উত্তরবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ। তাদের অধিকাংশ জনের নিজস্ব কোনো ভূসম্পত্তি নেই, তাদেরকে তাই অন্যের জমিতে কামলা বা মজুর হিসেবে কাজ করতে হয়। উল্লেখ্য, এই শিল্পীদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ নিরক্ষর, কিন্তু নাচ-গান ও অভিনয়ে তারা সুপটু। আসলে, দিনের বেলায় এরা পেশাজীবী চাষী, দোকানদার আর রাতের বেলায় মাস্টার, ম্যানেজারসহ নিজেদের ডেরায় অভিনয় অনুশীলন করে। অনুশীলন চলে খোলা মাঠে, বাগানে, গোয়াল ঘরে কিংবা অনুরাগীর বাড়িতে।

আসর ও পরিচালনা : কৃষ্ণযাত্রা পালা শুরু হবার আগে চারদিকে দর্শক বেষ্টিত মঞ্চের দক্ষিণ দিকের দর্শক সমতলে বসা যন্ত্রীদল কমপক্ষে দুটি পর্বে সম্মিলিতভাবে বাদ্য বাদন করে নেন। এরপর মঞ্চে আসেন উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পড়া ও গলায় কাগজের মালা দেওয়া চারজন নারী শিল্পী। মঞ্চে প্রণাম করে সারিবদ্ধভাবে আসরে দাঁড়িয়ে প্রথমত পূর্বমুখো হয়ে আসর বন্দনা শুরু করেন। তারপর তারা একে একে চারদিকে ঘুরে বন্দনা-গীত শেষ করেন এবং পুনরায় মঞ্চে প্রণাম করে অভিনয় থেকে একটু দূরে কাপড়ের ঘের দেওয়া সাজঘরে চলে যান। এরপর সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে পালার কাহিনী এগিয়ে যেতে থাকলেও দু'একটি ক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক-গীত এবং গীত-সংলাপ প্রযুক্ত হয়।

পরিবেশনারীতি : কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশনায় সাধারণত গীত, সংলাপ, নৃত্য ও অভিনয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্ণনার ব্যবহার এ ধরনের পরিবেশনায় খুব একটা চোখে পড়ে না।[৩৭]

পরিবেশ, দর্শক ও প্রচার : গ্রামীণ প্রকৃতি যাদের জন্য বিস্তার করে রেখেছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর কিছু সর্বগ্রাসী নদী। তাই তারা কেবলই হারাতে জানে। যে হারানোর বেদনার ভেতর বড় প্রিয় হয়ে ওঠে গান, আরো একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায়–নাটকের কথা। কী আশ্চর্য বিষয়–তারা যত বেশি অভাবী তত বেশি যেন বর্ণময়, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ তাদের গান, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা। তাদের দুঃখী জীবনের সঙ্গে যে নাটকগুলো অনেক বেশি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে–তার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রা অধিক জনপ্রিয়।

কৃষ্ণযাত্রার আসর আয়োজনের জন্য সাধারণত প্রচারের তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না, গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এমনিভাবে কৃষ্ণযাত্রার আসরের কথা রাষ্ট্র হয়ে যায়। খোলা মাঠেই এ ধরনের আসর বেশি হয়।

মহিলা শিল্পী : এক সময় কৃষ্ণযাত্রার আসরে মহিলারা অংশগ্রহণ করতো না। সে সময়ে ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতো, আজকাল ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও 'কৃষ্ণযাত্রা'র অভিনয় করছে। তবে, একই মঞ্চে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদেরকে দু'একটি চরিত্রে মেয়ে সেজে অভিনয় করতে দেখা যায়।[৩৮]

৬.৪ অষ্টক গান

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলায় 'নীলে'র সহযোগী আনন্দানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে 'অষ্টক গান' গ্রামবাংলার জনসাধারণকে আনন্দ দিয়ে আসছে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার গ্রামে গ্রামে এই সঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। অষ্টক গান বসন্তকালীন সঙ্গীত। চৈত্র মাসের প্রথম থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে অষ্টকের দল গান শুনিয়ে বেড়ায়। নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কৃষকগণ 'অষ্টক গান' রচনা ও গান করে। কৃষক সম্প্রদায়ের নিজস্ব সঙ্গীত হিসাবেই অষ্টক গান গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। অষ্টসখীর নাচ-গানকে 'অষ্টক-গান' বলে। গানগুলো পালা আকারে গীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও অষ্টসখীর ভূমিকায় গ্রামের কিশোর-কিশোরীগণ অংশ নেয়। সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়জন গায়ক-গায়িকা একটি দলে থাকে। এছাড়া থাকে দুইজন খোল বাদক, একজন ঢোল বাদক, একজন মাস্টার, একজন সরকার, আড়বাঁশী বাদক, জুড়ি বাদক ও কয়েকজন দোঁহার। মাস্টার হারমোনিয়াম বাজায় এবং গানের সুরও প্রয়োজনে ধরিয়ে দেন। সরকার মুখে মুখে গানের কথা উচ্চস্বরে পাঠ করে গায়ক-গায়িকাদের সুর-তাল ধরিয়ে দেন। যাত্রা গানের পোষাকের মত রাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ পোষাক পরে ঘুঙুর পায়ে নাচে এবং অল্প অভিনয় করে। গানের শুরুতে সারিবদ্ধভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পায়ে তাল রেখে এগিয়ে-পিছিয়ে নাচতে থাকে। পালানুসারে পাত্র-পাত্রীরা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের সময় সারি থেকে এগিয়ে নাটকের মতো গাইতে থাকে। দোঁহারেরা পিছন থেকে গান গায়। কিন্তু সব সময় দোঁহারের প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগ সময়ে পাত্র-পাত্রীরা দোঁহারের কাজ করেন। অষ্টক গানে নাচ, গান, অভিনয় ও বাদ্যযন্ত্রের সুসংহত রূপায়ণ দেখা যায়। তাই এটা মিশ্র শিল্প। অষ্টক গানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বর্তমানে হারমোনিয়াম, খোল, ঢোলক, আড়বাঁশী, বেহালা ও জুড়ি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে ঢাক, কাঁসি ও জুড়ি অষ্টক গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল।[৩৯]

হাসামদিয়ায় অষ্টক গান পরিবেশন করছেন পরাণ সাহা ও তাঁর দল
তারিখ : ২৮.৩.২০১৯

অষ্টক গান পালাবদ্ধভাবে গীত হয়। পালাগুলো দীর্ঘ নয়। ক্ষুদ্র অভিনয় ও সংগীতের মধ্য দিয়ে কাহিনীকেই ফুটিয়ে তোলে। পালার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আছে। কেবল ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীগুলোই যে প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়; রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের কাহিনীগুলোও অষ্টক গানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। সমাজ জীবনের অসংগতি, গ্রাম্য কাজিয়া প্রভৃতিও অষ্টক গীতিকারদের চোখ এড়ায়নি। যদিও ধর্মীয় কাব্য-কাহিনীগুলোই অষ্টক গানে মর্যাদার আসন লাভে সমর্থ হয়েছে বেশি। রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য জীবনী, সহজিয়া চণ্ডীদাসের কাহিনী ও বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনীই অষ্টক গানের বেশির ভাগ স্থান দখল করে আছে।[৪০] পালাগুলো খুব ছোট ছোট হয়। 'বস্ত্রহরণ' পালায় শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

> 'বসন দাও হে ওগো দয়াময় গৃহে গমন করি,
> মনপ্রাণ নিলে হরি আরও করলে বসন চুরি,
> আমরা কেবল ঐ দুঃখেতে মরি।[৪১]

নিচের পালাটিতে চণ্ডীদাস-রজকিনীপালায় প্রেমকাহিনী সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার হাসামদিয়া গ্রামে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী অষ্টকের দল। এই দলের প্রধান ছিলেন প্রয়াত শ্রী সুবোধ কর ও প্রয়াত পতিত পাবন সাহা। বর্তমানে দল পরিচালনায় রয়েছেন প্রয়াত সুবোধ করের বড় ছেলে গৌরাঙ্গকর ও প্রয়াত পতিত পাবন সাহার ছেলে পরাণ

সাহা। কীর্তনপ্রিয় এই গ্রামটিতে নামসংকীর্তন, পদাবলী কীর্তনের পাশাপাশি খুবই সমৃদ্ধশালী অষ্টক গান পরিবেশিত হয়। প্রয়াত সুবোধ করের লিখা 'চণ্ডীদাস-রজকিনী' এই পালাটি পরাণ সাহার কাছ থেকে সংগৃহীত। পালাটি নিম্নরূপ—

বন্দনা— আমি বন্দি মাতা, শৈল সূতা
সত্য সনাতনী।
এসো মাগো বাসুলী দেবী
ভক্তি বিঘ্ন বিনাশিনী॥

পালা শুরু

দোঁহার—

দেবী বাশুলীয়া দেশের দ্বীজ চণ্ডীদাস গোঁসাই লয়ে মনে প্রেমের অভিলাস
ও এক বরশি হাতে ঘাটে এসে দ্বীজ মাছ ধরে এসে।

রজকিনী চণ্ডীদাসকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

ঘাটে কে গো তুমি নবীন সুন্দর?
কোথায় তোমার বাস?
মনে কিবা অভিলাস?

উত্তরে চণ্ডীদাস বলছেন—

আমি ব্রাহ্মণ সন্তান,
আমি এপার বসে বাই যে বরশি
আমার মৎস্য যে ওপার,
তাইতে চাহি ওপার পানেলো।
ওসে টানে যদি টানেলো ধনি॥
থাকি আড় নয়নে চেয়েরে বরশি করি সার॥

রজকিনী বলছেন—

'আমি যখন বসন কাচি
নবীন তুমি ধরো মাছ
আর কি সময় পাওনি নবীন গো?
বসন আর কাচবো না পাটেলো ধনি॥

চিতান—

রানী ওপার বসে বসন কাচে রে তার মনে ময়লা নাহি,
বরশি বেয়ে মাছ না পেয়ে এখন ছিপে কামড়াও কেন?

মিলন—

'রূপ দেখিয়া সখিগণে,
রাই দাড়ালো শ্যামের বামে
সখিগণে দিচ্ছে উলুধ্বনি (আহা মরি মরি)॥

পালাকার এখানে চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমের মধ্যে রাধা কৃষ্ণকে কল্পনা করেছেন। এইজন্য রাধা-কৃষ্ণের মিলন দিয়েই পালা শেষ করা হয়েছে।

অষ্টক গানে রাধা-কৃষ্ণের সাজ- পোষাক

চণ্ডীদাস-রজকিনী পালার একটি বিশেষ মুহূর্ত

সুরের ক্ষেত্রে অষ্টক গানের নিজস্বতা ও বৈচিত্র্য আছে। দীর্ঘ একটানা সুর, ভাটিয়ালি ও কীর্তন সুরের প্রভাব অষ্টক গানে পড়েছে। বসন্তকালীন গান বলেই সুর চড়া গ্রামে [পঞ্চম] বাঁধা থাকে। দূরবর্তী গ্রাম থেকে ভেসে আসা চৈত্রের দুপুরে সমবেত কণ্ঠে অষ্টক গান গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই শত অভাব-অভিযোগ ভুলে এরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অষ্টকের দল নিয়ে। অষ্টক গান মূলত কৃষক সমাজমানসের সুরেলা ফসল।

৬.৫ মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা

মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা আলোচনার আগে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দে যে রাসলীলার বর্ণনা রয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। কারণ এই উভয় রাসের বিষয়বস্তুই মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। মধুর রসাত্মক লীলার মধ্যে রাসলীলাই বৈষ্ণবভক্তের চিত্তকে প্রেমরসে আপ্লুত করেছে। মধুর রসাত্মক লীলার মধ্যে রাসলীলাই বৈষ্ণবভক্তের মতে শ্রেষ্ঠ। এর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অতি সুগভীর। হরিবংশে একে বলা হয়েছে 'হল্লীসক ক্রীড়া'। হরিবংশে বর্ণিত রাসলীলা শুক্লপক্ষে শারদরাস। এখানে গোপবালক ও গোপীরা কৃষ্ণকে ঘিরে মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। ব্রজযুবতীরা পিতামাতা ও পরিজনের নিষেধ অমান্য করে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় সঙ্গীতে আকৃষ্ট গোপীদের নিয়ে তিনি রাস-মন্ডল রচনা করলে গোপীরা অনুলোম ও

প্রতিলোম গতিতে তাঁর নাম জপ করে নৃত্য করে। গৃহের আকর্ষণ তুচ্ছ করে গোপীরা রাত্রিকালে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে রমণ-ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হন। এমন কি, গৃহে আবদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণের কথাই মনে মনে চিন্তা করে মোক্ষপ্রাপ্ত হন, হরিবংশের রাসলীলা যেন কিছু পরিমাণে প্রাকৃতজন সুলভ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত। এখানে রাসলীলার কৃষ্ণ ঈশ্বর ও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। এই আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটেছে ভাগবতে। ভাগবতের রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, গোপীগণের সঙ্গে তাঁর রাসলীলা ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, এবং গোপাঙ্গনারাও একান্তভাবে কৃষ্ণভক্ত। তাঁরা কামনাশূন্যভাবেই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন। আবার পদ্মপুরাণে দেখি কৃষ্ণের রাসলীলার সহচরী গোপিনীরা রামরূপী কৃষ্ণের বরে গোপীজন্ম প্রাপ্ত দণ্ডকারণ্যের মুণিঋষি। শ্রীমদ্ভাগবত শারদরাসের বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বসন্তরাসে বর্ণিত হয়েছে।[৪২] পদ্মপুরাণ শরৎ ও বসন্ত দুই কালেই উল্লেখ করেছেন। পুরাণ কথিত রাসলীলা পাঠকালে মনে রাখতে হবে যে, আচার্য্যগণ গোপীগণের প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত করেছেন। উদ্ধবাদি পরমজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণভক্তগণ এই কামেরই কামনা করতেন। পুরাণকারগণ যখন কামের আবরণে এই প্রেমেরই বর্ণনা করেছেন, তখন ভাষাগত বা বর্ণনাগত খুঁটীনাটীর বিচার না করে তার মূল উদ্দেশ্য মনে রাখা ভাল।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীগীতগোবিন্দ উভয় গ্রন্থেই রাসলীলা বর্ণিত আছে–শারদরাস ও বসন্তরাস। সংক্ষেপে উভয় লীলার পার্থক্য আলোচনা করেছি–

শারদরাসে কাত্যায়ণী ব্রত-পরায়ণা কুমারীগণের কামনা পূর্ণ করাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রত-পরায়ণা কুমারীগণ–শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী গোপীগণ কাত্যায়নী দেবীর কাছে নন্দগোপ নন্দনকে পতিরূপে পাবার কামনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধিকা অথবা তাঁর যূতভক্তা কোন গোপী ছিলেন না। অবশ্য ব্রত সাঙ্গ দিবসে আমন্ত্রিতা হয়ে তাঁরা যমুনা পুলিনে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বস্ত্রও অপহৃত হয়েছিল।

ব্রত-পরায়ণা কুমারীগণ সকলে মিলে শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা করেছিলেন। রাসের রাত্রিতে বেণু গীতে মুগ্ধ তাঁরা অভিসারকালে কিন্তু কেউ কারো অনুসন্ধান করেন নাই। কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁরা সকলেই আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্যকে সম্পূর্ণ করবার জন্য কৃষ্ণ তাঁদেরকে ত্যাগ করেছিলেন। এবং তাঁদের পথ প্রদর্শনের জন্যই সকলের মধ্য হতে পৃথক করে শ্রীমতী রাধাকে

পথের মাঝখানে একাকী রেখে গিয়েছিলেন। যুগল পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে গোপীগণ শ্রীমতীর সঙ্গ লাভ করেন এবং তাঁরই কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ সকলকেই সন্তুষ্ট করেছিলেন। কৃষ্ণসঙ্গ লাভে সকলেই পরিতৃপ্তা হয়েছিলেন। এটাই শারদ রাস।

বসন্তরাস কিন্তু অন্যরূপ। এই লীলায় শ্রীরাধা সম্যক সচেতন রয়েছেন। এইজন্যই মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েই তাঁর তৃপ্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই, একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের অধিশ্বরী, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি একা পেতে চান না। কিন্তু তিনি দান না করলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্যের হবেন, কিরূপে অন্যের নিকট যাবেন, এ-কথা তিনি বুঝতে পারেন না। এই অভিমানেই তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট এই ইঙ্গিতটি করেছিলেন। বলেছিলেন–

'যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী'

পাতিব্রত্যে অরুন্ধতীর কি কিছু ন্যূনতা ছিল? রায় রামানন্দ বলছেন–ছিল। সতী শিরোমণি অরুন্ধতী জানতেন বশিষ্ঠ তাঁর সর্ব্বস্ব, কিন্তু তিনিও যে বশিষ্ঠের সর্ব্বস্ব এ অভিমান তাঁর ছিল না। শ্রীমতির এই অভিমান ছিল বলেই বসন্তরাসে তিনি রাস মণ্ডল ত্যাগ করেছিলেন। বসন্তরাসে শ্রীরাধাকে হানিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ এক অপূর্ব্ব বস্তু। কবি জয়দেব এই অভিমান, এই অপূর্ব্বতার উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। এই আলেখ্য বসন্তরাস।

কবি জয়দেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উভয় গ্রন্থের শ্রীশ্রীরাসলীলার বর্ণনাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা–

রাসের পঞ্চমাধ্যায়–

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতিরমিশ্রিতা।

উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥ ৯ ॥

তদেব ধ্রুব মুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০ ॥

ষাড়জী, আর্যভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈরাদী এই সপ্ত স্বরলাপের নাম জাতি। কোন গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই স্বরজাতির আলাপ করতে লাগলেন। এটি অমিশ্রিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ সাধু সাধু বলে ঐ গোপীর প্রশংসা করলেন। ঐ গোপী আবার ঐ অমিশ্র স্বরজাতি ধ্রুব তালের সঙ্গে গান করায় ভগবান অধিকতর প্রীত হলেন এবং তাঁকে বহু মানে সম্মানিত করলেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণনা–

পীনপয়োধরভারভয়েণ হরিং পরিরভ্যসরাগং।

গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগম্॥

কোন গোপবধূ অনুরাগে পীনপয়োধর ভারে আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্নীত পঞ্চম রাগে গান করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

বাগ্‌দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেব-রতি- কেলি-কথা-সমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥

এই শ্লোকটির সঙ্গে তুলনীয়–(শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়) দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসকে বলছেন–

তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘ-বিপ্লবো

যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ

শৃন্বন্তি, গায়ন্তি, গৃণন্তি সাধবঃ ॥

সেই বাক্যই জনগণের পাপ প্লাবন বিদূরিত করে, যার প্রতি শ্লোকে ভগবান অনন্তের নাম যশ অঙ্কিত থাকে। শব্দালঙ্কারাদির অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও সাধুগণ তাই শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করে থাকেন।

এই শ্লোক স্মরণ করেই জয়দেব লিখেছেন–আমার মনোমন্দির তো বাক্‌দেবতার চরিত্র চিত্রিত। অর্থাৎ আমার চিত্তপটে তো বাক্‌দেবতা সর্ব্বদা অধিষ্ঠিতা। সুতরাং আমার রচিত এই বাসুদেবরতিকলিকথা নিশ্চয়ই সকলের আদরণীয় হবে। বাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটলেও আশঙ্কার কোন কারণ নেই। এই জন্যই কবি সন্দর্ভ শুদ্ধির কথাও বলেছেন।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা পরমভাগবত শ্রীশুকদেব আসন্ন-নৃত্য সম্রাট পরীক্ষিৎকে যে বাসুদেবকঙ্কার রতির জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন জয়দেব যে সেই বাসুদেবেরই রতিকেলিকথা বর্ণনা করেছেন 'বাগদেবতা' শ্লোকে তারই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। শ্রীশুকদেব বলেছেন–

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষি-সত্তম।

বাসুদেব-কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্টিকী রতিঃ॥

শ্রীশুকদেবের বাসুদেব–কথার সারাংশ হল শ্রীশ্রীরাসলীলা। জয়দেব সেই রাসের কথা–শ্রীবাসুদেবের রতিকেলি কথাই বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই রাসনৃত্য বা রাস যাত্রার পালা রচনা করা হয়।

মণিপুরী রাসনৃত্য বা রাস যাত্রা–

মণিপুরীদের আদি নিবাস ব্রহ্মদেশ বা বর্তমানে মায়ানমার ও আসাম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বর্তমান মণিপুর রাজ্য। মূলত মণিপুর শব্দটি এসেছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নামানুসারে। এদেশের অধিবাসীরা মীতৈ বা কংলৈচা নামে পরিচিত ছিল। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেশের নাম মীতৈলৈপাককে মণিপুর নামকরণ করা হয়।[৪৩]

প্রায় আড়াইশ বছর আগে মণিপুরীদের প্রথম অভিবাসন শুরু হয় বাংলাদেশে। অর্থনৈতিক কারণে এবং স্বাভাবিক আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভাব বিনিময়ের ফলে মণিপুর থেকে অভিবাসিত মণিপুরীদের আদি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে এদেশের সমাজ রাষ্ট্রে নানা অনুষঙ্গ সংযোজিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতি এক করে নিয়েছে।[৪৪] যেসব প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও শিল্প সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মণিপুরী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক ও পার্বণিক ভিত্তিতে নিয়মিত পালিত হয়, সংকীর্তন বা পালাগান বা নৃত্যনাট্য তাঁদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের গায়েন-দোঁহারভিত্তিক গীতিনাট বা নৃত্যনাট–গীতমূলক পরিবেশনাগুলোর সাথে কিছুটা মিল থাকলেও মণিপুরীদের সংকীর্তন পালাগান একটি স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট।[৪৫]

নটপালা মূলত মণিপুরীদের বৈষ্ণব ধর্মপ্রভাবিত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশনা আঙ্গিক।[১৮৪] তারা মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনি ও বোলের সঙ্গে নিজের ভেতরে গৌরাঙ্গ প্রভুকে জাগিয়ে তোলেন। তারা বিশ্বাস করেন জাগ্রত সেই গৌরাঙ্গ প্রভুই তাদের হৃদয়ে, কণ্ঠে, জিহ্বাতে ভর করে ভক্তির ভাবকে ভক্ত-দর্শক স্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলার কিছু অংশ পরিবেশন করে থাকেন।

নটপালার পুরো পরিবেশনায় নৃত্য এবং রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পালা বা আখ্যান নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। সেদিক দিয়ে হয়তো পরিবেশনাটির নাম নটপালা হয়ে উঠেছে।[৪৬] প্রশ্ন আসতেই পারে মণিপুরী রাসনৃত্যে বা রাস যাত্রায় কি শারদরাসের অনুকরণে করা হয়, না কি বসন্তরাসের অনুকরণে করা হয়। নিচের আলোচনা থেকে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাবো।

গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর আখ্যান অবলম্বনে নটপালার বিভিন্ন পর্ব পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানী সেজে যমুনার ঘাটে রাধার পথরোধ করেন। দানখণ্ডে এ ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। মণিপুরীদের 'পথরুদ্ধ' পর্বের সূচনাংশের সাথে যার তুলনা করা যায়।[৪৭]

মণিপুরী সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো রাসনৃত্য। প্রেমরস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধা ও গোপীবৃন্দের সঙ্গে রসক্রিয়ায় মত্ত থাকতেন। গূঢ়ভাবে চিন্তা করলে রাসলীলায় অনেক কিছু উপলব্ধি করার আছে। এই নৃত্যে যেসব বিভাব অনুভাব, স্বাত্তিকভাব রয়েছে সে সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব প্রেম রসের সৃষ্টি করে।[৪৮] রাধাই মূল কান্তা-শক্তি। কৃষ্ণকে রাসাদি লীলারাস আস্বাদন করাবার জন্য রাধাই সমস্ত ব্রজ-বালারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রূপে রসে ভাবে রস-বৈদগ্ধ্যাদিতে এসব সখীদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে, এই রূপে তাঁরা কৃষ্ণকে অনন্ত রসবৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়ে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ
কায়ব্যুহ রূপ তাঁর রসের কারণ
বহু কান্তা বিনা নহে রসে উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥ (আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৮৪)

ভাগবতপুরাণে আছে শরৎকালীন রাসলীলার বর্ণনা। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা। জয়দেবের গীতগোবিন্দেও বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা আছে। এ থেকে মনে করা যেতে পারে, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তকেই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে বিদ্যাপতিও বসন্তকালীন রাসই গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবনের রাসলীলার অনুকরণে রাজা ভাগ্যচন্দ জয় সিং মণিপুরী সমাজে রাসলীলার প্রবর্তন করেন। তিনি রাসলীলার বিভিন্ন আঙ্গিক, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেও খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীকে আশ্রয় করে মনিপুরী সমাজে রাসনৃত্যের রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়।[৪৯]

মণিপুরীদের প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে মহারাসলীলা। প্রতিবছর কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে এ রাসলীলা উদযাপিত হয়।[৫০] সাধারণত দুই ধারায় মণিপুরী সাংস্কৃতিক উৎসব পালিত হয়। প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব এবং হিন্দু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসব। প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে লাই হারাওবা উৎসবই হচ্ছে রাস উৎসব। হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব মত গ্রহণের আগে তারা 'সানামাহি' বা অপোকপা ধর্মাবলম্বী ছিল। সেই

ধর্মেও বৈষ্ণব প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মত গ্রহণের পর তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব, রাসপূর্ণিমা উৎসব, দোলনযাত্রা উৎসব, রথযাত্রা উৎসব, দুর্গাপূজা উৎসব, সরস্বতীপূজা উৎসব ইত্যাদি।[৫১]

রাস যাত্রা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

রাস যাত্রার শ্রীকৃষ্ণের সাজ-পোষাক

রাধাকৃষ্ণ
২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুরে মণিপুরী সম্প্রদায়ের রাসমেলা

রাসমঞ্চ
কমলগঞ্জ রাসমেলা-২০১৯

জিনসেন হরিবংশ সংকলিত 'হরিবংশ পুরাণ' এ (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ রচিত) রাস, ছালিক্য ও আসারিত প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এই রাস মণিপুরী নৃত্যনাট্যের অন্যতম প্রধান ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত।[৫২]

মণিপুরীদের যে ঐতিহ্যবাহী নাচ রয়েছে সেগুলোও মূলত এসেছে প্রাচীন গীতনাট্য থেকে। বর্তমানে প্রচলিত সব ক্লাসিক্যাল নাচগুলোর উৎপত্তির মূলে লোকনৃত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে, এখনো করছে। ক্লাসিক্যাল নাচগুলোর জন্ম হয়েছে লোকনৃত্য বা লোকনাট্য থেকে। যেমন 'শিবালিয়া' নামে লোকনৃত্য থেকে এসেছে 'কুচিপুড়ি', সাদির নাট্য ও কুরুভঞ্জি নামে লোকপ্রভাব জাত নাচ থেকে এসেছে ভরতনাট্যম, কুড়ি প্রকার 'কলিনাচ' (কেরালার) লোকনৃত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'কথাকলি'। এভাবেই নানা লোকপ্রভাবজাত নাচ থেকে এসেছে ওড়িশী, কথক ও 'মণিপুরী' নাচ। সুতরাং এভাবে বলা যায় ভরতনাট্যমের মৌল উপাদান বা বুনিয়াদি ভঙ্গি (Basic Movement) আদাউ, কথাকলি নাচের বুনিয়াদি ভঙ্গি কলাসম্, মণিপুরীর চালী, তেমনি ওড়িশী, কুচিপুড়ি ও কথকের বুনিয়াদি ভঙ্গিগুলোও এসেছে লোকনৃত্য থেকে।[৫৩]

রাস উৎসব আসাম ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রচলিত রাস বা বসন্ত ঋতুভিত্তিক নৃত্যগীত বা নৃত্যনাট্য। রাস নৃত্যে এক বা একাধিক নারী রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান গায়, অন্য নারীরা গানের অন্তর্নিহিত ভাব অনুসারে ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে মণিপুরী রাসনৃত্যে মণিপুরী নৃত্যের ঐতিহ্যবাহী রূপসজ্জা গৃহীত হয়ে থাকে। এতে এক বালক বালককৃষ্ণরূপে রাখাল সাজে।[৫৪] অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপনকারী মণিপুরীরা আজ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান উৎসব রাসলীলার সূচনা করেন। সেই থেকে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের আদমপুর-মাধবপুরের মণিপুরীরা পায় প্রতিবছর নিয়মিত রাস উৎসব করে আসছেন।[৫৫]

পৃষ্ঠপোষক ও বায়না : রাসলীলা মণিপুরীদের ধর্মীয় কৃত্যাচার। তাই ধর্মাচার পালনই রাসলীলার ধারা প্রচলিত রাখার পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া এই সম্প্রদায়ের মণিপুরী জনসাধারণ প্রতিবছর রাসপূর্ণিমায় রাসলীলার যে স্বতঃস্ফূর্ত ও মূল আয়োজন করে থাকেন তাকে মহারাস বলা হয়। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে কৃত্যমূলক বলে এ ধরনের পরিবেশনার সঙ্গে বায়নার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিবাহরাসে বায়নার বিধান প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে রাসে অংশগ্রহণকারী পূর্ণঙ্গ একটি বাদ্যযন্ত্রী ও গায়ক দল আগে কথা বলে বায়না ঠিক করে নেয়।

অনুষ্ঠানের সময় : বাংলা বছরের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাকে রাস পূর্ণিমা বলা হয়। সেই পূর্ণিমায় মধ্যরাতে রাসলীলার মূল পর্বের সূচনা হয়। রাতের প্রহরে প্রহরে এর লীলা পরিবর্তিত হয়। সূর্য উঠার আগেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন দিয়ে একটি রাতের রাসের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মঞ্চ বা আসর : মহারাস অনুষ্ঠিত হয় মণিপুরীদের পূজামণ্ডপের সামনের স্থায়ী এক বা একাধিক জোড়মণ্ডপে। রাসলীলার জন্য মূল অভিনয়-নৃত্য স্থান বৃত্তাকারে বাঁশের চটার ঘের দিয়ে সাদা রঙের

কাগজের ফুল বা ঝালটের সাহায্যে সুন্দর করে সাজানো হয়। বৃত্তাকার অভিনয়-নৃত্য স্থানকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে দর্শক-ভক্ত বসেন। দর্শক-ভক্তদের জন্য আসরের প্রায় তিন দিক নারী ও শিশুদের জন্য বরাদ্দ থাকে, আর একদিকে পুরুষ দর্শক-ভক্ত বসেন।

আলো : রাসলীলার নৃত্য-গীত-অভিনয় যেহেতু রাতেই পরিবেশন করার নিয়ম সেহেতু রাসের জন্য আলোর সুব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা হয়। আগে হ্যাজাকের আলোতে রাস উদ্‌যাপিত হলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রসারের কারণে সাধারণত বৈদ্যুতিক টিউব লাইটের আলোতেই রাসের গীতি-নৃত্য-অভিনয় পরিবেশন করা হয়। কখনো বৈদ্যুতিক আলোর সংকট তৈরি হলে জেনারেটরের সাহায্য নেওয়া হয়।

সাজসজ্জা ও সাজঘর : রাসলীলা পরিবেশনকারী সকল শিল্পী ও নৃত্যকার মণিপুরী নৃত্য সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলঙ্কার পরে বিশেষভাবে সাজসজ্জা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত নিজ নিজ বাড়ি হতে সাজ গ্রহণ করে শিল্পী-নৃত্যকারগণ রাসমণ্ডপে আসেন। এক্ষেত্রে সাজঘর হিসেবে শিল্পী-নৃত্যকারগণ নিজ নিজ বাড়ির সাধারণ শোবার ঘরকেই ব্যবহার করে থাকেন।

অভিনয় উপকরণ: রাসলীলা নাট্যে অভিনয় উপকরণ হিসেবে প্রধানত প্রদীপ, থালা, মোমবাতি, ফুল, মালা, জল, পাতা, বর্ণিল কাপড়ের আসন, কাঁসার গ্লাস, বাঁশি, সুঁই-সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশনারীতি : রাসপূর্ণিমার দিন রাত্রি ১২টার দিকে কমলগঞ্জের পাশাপাশি কয়েকটি স্থানে প্রায় একসঙ্গে মণিপুরীদের রাসলীলার মূল পর্বের সূচনা হয়। সূচনাতেই থাকে প্রতিটি মণ্ডপের প্রবেশপথ ঘেঁষে বাদ্যকার ও গায়েন-দোঁহারদের সম্মিলিত বাদ্যের ঐক্যতান। তারপর থাকে সম্মিলিত কণ্ঠে একটি রাগিণী বা রাগাশ্রিত ভক্তিমূলক গান। যার ঠিক পর পরই শুরু হয় রাসলীলার প্রথম অংশ। প্রথমে থাকে আগমনী। আর এই আগমনীতে একটি কিশোরী রাজকীয় নাচের পোশাকে বৃন্দার ভূমিকায় মণ্ডপ প্রণাম করে নৃত্য শুরু করেন। শুরুতে এই বৃন্দা দূতি তার দুই হাতে নৃত্যের বহুবিধ ভঙ্গিমা করেন এবং তার সে হস্ত-নৃত্যের ভঙ্গিমার মধ্যে রাসধারী গায়েনবৃন্দ আগমনীর সুরে একটি বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করতে থাকেন। এর পরেই শুরু হয় মূল পালা।

বর্ণনাত্মক গীত : ‘জয় বৃন্দাবন চিন্তামণিধাম
সাজি আইলা বৃন্দাদেবী অতি মনোহর
প্রবোদ দিয়া কই হে বৃন্দ শুন বৃক্ষলতা
জাগি রহ আজি কৃষ্ণ আসিবেন হেথা।’[৫৬]

রাসপালা রয়েছে পরিশিষ্ট-২ এ।

৬.৬ ঘাটু গান

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে ঘাটু গান, ঘাডু গান, গাডু গান এবং গাটু ইত্যাদি নামে আজও এ ধরনের লোক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঘাটু গান মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যখন পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের বড় বড় হাওর বিলগুলো পানিতে ভরে থাকে, খুব কমসংখ্যক

কৃষক কৃষিকাজে যাবার সুযোগ পায়, তখন তাঁদের এই অবসর সময়টা তারা বাড়িতে বসে ঘাটু গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়। বিভিন্ন উপলক্ষ যেমন আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উৎসবে, শুভ নববর্ষের বৈশাখ মাসে শুভ হালখাতা, বৈশাখী মেলা, চড়ক পূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও এই গানের পরিবেশনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বৎসরের যে কোন সময় কোন সামাজিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যদি কেউ 'ঘাটু গানে'র অভিনয় করাতে চায় তাহলেও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এই অভিনয় হতে দেখা যায়, তবে ঘাটু গানের মূল বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণ। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রাম্য সমাজের আপেক্ষাকৃত ধনবান প্রভাবশালী শ্রেণিই এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে থাকেন।[৫৭]

'ঘাটুগানে'র দলে একজন সরকার থাকেন। তিনিই প্রধান গায়ক ও নাচের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা গ্রামের দরিদ্রতার কষাঘাতে পীড়িত পরিবারের কিশোর বয়সী ছেলেদেরকে গান গাওয়ার চুক্তি (তিন থেকে পাঁচ বছর) করে নিয়ে এসে নাচ-গান শিখিয়ে তাঁদেরকে নাচে-গানে দক্ষ করে গড়ে তোলেন। ঘাটু গানের নাচে-গানে পারদর্শী এইসব ছোকরাদের (সাধারণত বারো থেকে পনের বছর বয়সী) ভরণ-পোষণের সমস্ত খরচ দলের সরকারই বহন করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দলের সরকার কোন এক সময় ছোকরা ছিল। এক সময় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানায় যখন ঘাটু গান খুবই জনপ্রিয় ছিল, তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাচ্চা শিশুদেরকে ধরে এনে এই ঘাটু গানের দলের সরকারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হত। এরা কখনোই আর তাঁদের বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতে পারত না। 'ঘাটু গানে' পারদর্শী ছোকরাদের অন্য দলের মালিকের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা হত। ফলশ্রুতিতে দক্ষ ছোকরাকে অধিকারের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ-বিবাদ লেগে যেত। কখনো কখনো দক্ষ ছোকরার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা হত।[৫৮] ঘাটু গানে'র অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে বাকীরা সবাই কোরাস গায়ক (পাইল) হিসেবে কাজ করে থাকে। এই নিয়ে 'ঘাটু গানে'র একটি দল গঠিত।[৫৯]

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত সন্তোষ সরকার 'ঝংকার' শিল্পগোষ্ঠী নামে নিজেই একটি দল চালিয়ে থাকেন। তিনি নিজে সরকার, দুইজন ছোকরা এবং দুইজন বায়েন (যারা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক ও মন্দিরা বাজিয়ে থাকেন) নিয়ে তাঁর ঘাটু দল গঠিত। তাঁর বায়েনদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে ঢোলক, একজোড়া মন্দিরা ও করতাল উল্লেখযোগ্য।[৬০]

এছাড়াও 'ঘাটুগানে'র আরেকটি দলের সরকার হলেন হাসান আলী, গ্রাম : রাধা-কৃষ্ণপুর, থানা মধুপর, জেলা টাঙ্গাইল। তাঁর দলে তিনি নিজেই সরকার। দুইজন ছোকরা, আটজন পাইল (কোরাস গায়ক) এবং দুইজন বায়েন রয়েছে। চার থেকে পাঁচজন ছোকরা ও সমসংখ্যক বায়েনদের নিয়েও ঘাটু দল রয়েছে।এছাড়াও ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেটের ভাটির অঞ্চলে বেশ কিছু দল রয়েছে।[৬১]

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটুগানে বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা পরিচিত এবং অভিনীত উপাখ্যানটি হল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক উপাখ্যান। যে বিষয়গুলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তুর আঙ্গিকেই পরিবেশিত হয়, এসব উপাখ্যানের বেশিরভাগ কাহিনীরই শেষ হয় মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু কখনো তা মিলনকে সূচিত করে না।[৬২]

ঘাটু গানে যে সকল পালা বা খণ্ড পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–আসর, ভজন, সালাম, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলভরা, জলরূপ, ফুল তোলা, কুঞ্জ সাজানো, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদ, ভোর, মধুমাস, সখিসংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি। প্রত্যেক অঙ্ক বা খণ্ড আবার সাধারণ গান, খেয়াল গান, সামগান ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক যে অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পালা পরিবেশন করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছোকরা লুঙ্গী এবং লম্বা আলখেল্লা পরিধান করে থাকে। তাঁদের বেশভূষা-সাজসজ্জা অবিবাহিত মেয়েদের মতো । মাথায় মুকুট-পরচুলা, গলায় মালা, পায়ে আলতা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছোকরাদের মধ্যে যিনি কৃষ্ণ সাজেন তিনি ধুতি এবং হাতাকাটা কোট পরিধান করেন, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট ব্যবহার করেন এবং হাতে একটি বাঁশি রাখেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্রের অভিনয়ে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের আচার ব্যবহার্যের মতো করা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ঘাটুগানের অভিনয়ে ছোকরারা পায়ে ঘুঙুর পরে থাকে।[৬৩]

নিম্নে ঘাটু গানে পরিবেশিত রাধা-কৃষ্ণ আখ্যানের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

কৃষ্ণ মাঠে গরু চরাতে যাবে তাই তার মা'কে ডেকে তাকে সকালের খাবার দিতে বলছেন। কৃষ্ণের সঙ্গীরাও এসে তার মাকে অনুরোধ করছে যে, যেন কৃষ্ণকে সাজিয়ে দেন এবং যাওয়ার অনুমতি দেন। কেননা ইতিমধ্যেই গরুকে মাঠে চরতে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক রাধাও তখন তাঁর সখীদের সাথে জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় একে অপরকে দেখে প্রেমে পড়ে যায়। এরপর শ্রীরাধার দিনের বাকি সময়টা সারাক্ষণ প্রিয় ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে নানারকম কল্পনা, চিন্তা আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। রাতে হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে রাধা যখন ঘুমিয়ে পড়লেন স্বপ্ন দেখলেন; কৃষ্ণ কুঞ্জে এসেছেন। ভোরে পাখির কলতানে ঘুম ভাঙলে তাঁর মনের ভেতরে কৃষ্ণকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। তিনি নিজেই নিজেকে সান্তনা দিয়ে সখীদের সাথে নিয়ে ফুল তুলতে লাগলেন। এভাবে একসময় যমুনায় স্নান করে জল আনার সময় হয়ে আসে। রাধা তাঁর সখীদেরকে কৃষ্ণ আসছে কিনা বা দেখা যায় কিনা সেদিকে নজর রাখতে বললেন। যখন স্নান সেরে জল নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন কৃষ্ণ সত্যি সত্যিই তাদের পেছন পেছন অনুসরণ করছেন। কৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন এবং মনের গভীরে এক রোমাঞ্চকর তীব্র অনুভূতি অনুভব করলেন। কৃষ্ণ তাঁর এক সহচরের

কাছে জানতে চাইলেন যে, এই অপরূপা সুন্দরী রমণী কার স্ত্রী হতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণের ভেতরে রাধা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরোও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সাহস করে রাধার সাথে কথা বলতে যান; কিন্তু রাধার কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করেন। যমুনার জলে রাধার স্নান করার সময় কৃষ্ণ রাধাকে তাঁর মনের অতৃপ্তির কথা জানান।[৬৪]

উপাখ্যানটির এখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছেদের বিষয়কে নিয়ে বিরহ বা একাকীত্বের গান শুরু হয়।[৬৫] ঘাটু গানের বেশিরভাগ কাহিনী রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় লীলাকীর্তনের ভজন বা প্রার্থনা সংক্রান্ত গীত এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং কিছু গান নিজেরাই লিখে নেন। পালা কীর্তনের মতো 'ঘাটু গানে'র অভিনয় সাধারণত বন্দনা দিয়েই শুরু হয়ে থাকে। এক বা একাধিক ছোকরার সাথে কোরাস দল বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা সহযোগে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে গান পরিবেশন শুরু করে। গানের মধ্য দিয়ে তারা কোন পালা পরিবেশন করে এবং নিজেদের দলের পরিচিতি এবং দর্শকদেরকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অভিবাদন জানিয়ে থাকে।[৬৬]

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে ২০১৬ সালে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে ঘাটু পালা 'শ্যাম-রাই-কীর্তন' পরিবেশন করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

‘শ্যাম-রাই-কীর্তন’ পালার কিছু আলোকচিত্র-২০১৬ সাল
স্থান : শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, মেলাঙ্গন, ঢাকা

ঘাটু গানের আসর বন্দনা–
কথা : আবুল মনসুর (কালা মনসুর) বয়াতী

সালাম সালাম সালাম গো জানাইলাম গো
আমি সবার বিদমান (বিদ্যমান)
ওরে আসর বিদমান॥ বাহার (দোঁহার)
মুসলমানদের পতি (প্রতি) সালাম
হিন্দু ভাইদের জানাই পোরনাম (প্রণাম)
ওরে বাংলা কেতাবের মাঝে আছে
আল্লাজির নাম গো॥ বাহার (দোঁহার)[৬৭]

ঘাটু গানের দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঘাটু গানের এই প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় 'লডাক' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে দল দুটি অভিনয়ের আসরে গোল হয়ে উপবেশন করে এবং দর্শকেরা এই দুটি দলের উপবেশনকৃত বৃত্তের চারপার্শ্বে অবস্থান করে। আর বিষয়ের দিক থেকে একটি দল যদি রাধার পক্ষ নেয় তাহলে অন্যদলকে কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে আসরে উপস্থিত হতে হয় এবং তখন এক দল আরেক দলকে প্রশ্ন করে থাকে। এদের প্রশ্নগুলো রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক হয়ে থাকে কখনো কখনো অতীন্দ্রিয়বাদও বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কোন একটি দল অপর দলের করা প্রশ্নে উত্তর দিতে বা গান গাইতে ব্যর্থ হলে প্রশ্নকারী দল তাঁদের করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় এবং অপর দলের ব্যর্থতাকে দলের সরকার (গুরু হিসেবে) পরাজয় বলে মেনে নেয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরনের অভিনয় ছয় দিন-ছয় রাত ধরে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[৬৮]

মুহম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরীর মতে, ষোল শতকের প্রথমার্ধে সিলেটের অন্তর্গত আজমীর গঞ্জের বৈষ্ণববাদী আচার্য রাধা কৃষ্ণের যুগলরূপে দর্শনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভক্তির সাথে গভীর উপাসনা করতেন। সম্ভবত নিজের কোষ্ঠ (ঘর বা গৃহাভ্যন্তর) সাধনে প্রচণ্ড রকম মানসিক ইচ্ছার কারণে ছোট বালকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন যারা রাধার সাক্ষীরূপে নাচে গানে পারদর্শী ছিল। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী বলেন, 'ধীরে ধীরে তাঁর শিষ্য সংখ্যা বাড়তে লাগল ও নিম্ন শ্রেণির অনেক ছেলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বা শিষ্য করে নেওয়া হলো। এইসব ছেলেকে রাধিকার সখী সাজান হতো। ছেলেরা নীরবে নেচে ভাব প্রকাশ করতো, বিরহ সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ ও ভাবাতুর করতো। ক্রমে এই ছেলে-শিষ্যদের যোগে গড়ে উঠল গাডু গান। এভাবে মহিলার সাজে বালকদের দ্বারা

পরিবেশিত লাস্য নৃত্যের মধ্য দিয়ে ঘাটুগানের আত্মপ্রকাশ ঘটে।' গাঁড়ু গানের সম্যক বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভের পূর্বে গুরুদেবের সাধন পদ্ধতির কিছুটা সংস্কার সাধন করে একে পালাগানে পরিণত করেন। এই পালাগান বা গাঁড়ু গান ভজন, সালাম, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলভরা, জলরূপ, ফুল তোলা, কুঞ্জ সাজান, নিদ্রা, স্বপ্ন, কোকিল, বিচ্ছেদ, ভোর, মধুমাস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি অঙ্গে বিভক্ত।[৬৯]

কোন চরিত্রের সংলাপের সময় অন্য চরিত্রগুলো হয় নিশ্চুপ থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে। বিশেষ করে মহিলা পোশাকধারী যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। যার ফলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণের চরিত্রের সময় যে দুটো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা হলো পুরুষ অভিনেতা মেয়ে সেজে অভিনয় করে আবার ঐ একই ব্যক্তি পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায়ও অভিনয় করে থাকে।[৭০]

ঘাটু গান মূলত দুই পয়ারে মিলিত/রচিত লোকগান। ঘাটু গায়কেরা একে আড়াইপদী ছন্দের গীত হিসেবে জানেন। স্থায়ী + অন্তরা + মুখরা অর্থাৎ ১ + ১ + ৫ = ১টি ঘাটুগান। ঘাটু গানের মেজাজ একটু চটুল ও সহজ-সরল তালের গতি সংযোজনের কারণে আসরে পরিবেশনের সময় মানুষ একে খুব সহজেই গ্রহণ করে। শাক্ত ধারায় গীতিরীতির মতো ঘাটু গানের বিয়ষবস্তুও একেবারেই রাধা কৃষ্ণেই সীমাবদ্ধ বা নির্ধারিত।[৭১] তবে বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের উপরেও ঘাটুগান পরিবেশিত হয়। ঘাটু গানের সুরের চলন ও ধরন বোঝাতে এখানে একটি ঘাটু গানের স্বরলিপিসহ গানের উল্লেখ করা হলো–

শিল্পী : আবুল মনসুর বয়াতী
সংগ্রহ : রওশন আলম ও ফয়জুল্লাহ রোমেল

স্বরলিপিকার : আশিক সরকার
শ্যামের গান,
তাল : কাহারবা

আমার বিরহিণী গো রাই
আর কইরো না যৈবনের বড়াই।
আর কইরো না যৈবনের বড়াই
আর কইরো না যৈবনের বড়াই॥
উপরে লাল আর ভিতরে রে কাল
শিমুল ফুল তোর দেখতে রে ভাল।
শিমুল ফুলে ভ্রমর বসে না

শিমুল ফুলে ভ্রমর বসে না॥

স্থায়ী

যা না॥ ॥ {সা া গা া। পা ধা ণা ধা। মগা া গা মা। পা া পা া।
আ মার বি ০ র ০ হি ০ ণী গো রা০ ই আর কই রো ০ না ০

র্সা া ণা ধা। পা া মা গা। রসা া া া। র্পসা া র্সা ণা।
০ ০ যৈ ব নের ০ ব ০ ড়াই ০ ০ ০ হে ই আমার।

(র্সা া া গা। পা ধা ণা ধা। মগা া গা মা। পা া পধা পা।
বি০ ০ র হ ০ নি গো রা০ ই আর কই রো০ না০ ০

র্সা া ণা ধা। পা া মা গা। রসা া া া। র্পসা া সা ণ্া)।
০ ০ যৈ ব নের ০ ব ০ ড়াই ০ ০ ০ হে ই আমার।

র্সা া া রা। গা রা া া। া া া া। া া া া}॥
বি ০ ০ র হি ০ এ ০ হে ০ ০ ০ হে ই ব ল

া া পা ধা। র্সা া র্সা া। া া র্সা র্সা। সা া ণা পা।
বে শ আর কই রো ০ না ০ ০ ০ যৈ ব নে র বা ০।

ণা া ণা ধা। পা মা পা া। র্সা া ণা ধা। পা া মা গা।
ড়াই ০ আর কই রো ০ না ০ ০ ০ যৈ ব নের ০ ব ০

রসা া া া। র্পসা া র্সা ণা॥ ॥
ড়াই ০ ০ ০ হে ই আমার

অন্তরা

॥॥ { া া সা সা। গা া গা রা। গা মা পা ধা। ণা া র্সা া।
বেশ উপরে লা ল তা র ভি ত রে রে কা ০ লো ০

া া া া। নর্সা নর্সা ধনা ধনা। পা া পা পা। ধা া ণা ধা।
০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ শি মুল ফু ল তো র

পা ধপা মা পমা। গ মগা রসা া। া া গা মা। পা া পা া।
দে ০খ তে রে০ ভা ০ ল০ ০ ০ ০ শি মুল ফু ০ লে ০

। র্সা া ণা ধা। পা া মা গা। রেসা া া া। র্সা র্সা র্সা র্সা।
০ ০ ভ্র মর ব০ সে ০ না ০ ০ ০ ০ চে বোল বোল বোল

। র্সা র্সা র্সা র্সা। া া া া। া া া া। া া া া) }॥
চে বোল বোল ০ হেই য়া০রে বে শ ০ ০ বে শ বে শ

। রসা া পা পা। ধা র্সা র্সা র্সা। র্সা া র্সা র্সা। র্সা র্সা ণা পা।
না০ ০ ও রে শি মু ল ফু লে ০ ভ্র ম র ব সে ০

। ণা া ণা ধা। পা মা পা া। র্সা া ণ ধা। পা া মা গা।
না ০ শি মুল ফু ০ লে ০ ০ ০ ভ্র মর ০ ০ সে ০

। রসা া া া। পর্সা া র্সা ণা ॥॥
না০ ০ ০০ হে ই আমার

(এই গানটি যে প্রচলিত সুরে শিল্পীরা গেয়েছেন সেভাবেই স্বরলিপি করা হয়েছে। তবে 'চে বোল বোল বোল' কথাটি মূল গানের কথায় না থাকলেও শিল্পীরা গাওয়ার সময় কথাগুলো উচ্চারণ করায় এখানেও সেটি উল্লেখ করা হল)।[৭২] আপাতদৃষ্টিতে ঘাটু গানকে হালকা মেজাজের গান মনে হলেও এর মধ্যে বাংলার আবহমান কালের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৭ ঢপ যাত্রা : কীর্তন গান লৌকিক স্তরে নেমে এসে যে রূপলাভ করে, ঢপ কীর্তন তাদেরই অন্যতম। ঢপ নামকরণের কারণ হলো প্রথাগত কীর্তনের সঙ্গে কিছু সহজ সরল এবং চটুল সুরের সংযোজন করে নতুন হালকা ধরনের গান পরিবেশন করা। ঢপ কীর্তনের শিক্ষাগুরু ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। তবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী গানের সুর সৃষ্টির ব্যাপারে মধুকানের নাম সর্বাগ্রে করা উচিত। তবে এই সিদ্ধান্তের কোনো গবেষণামূলক বিচার হয়নি। বিশেষ ধরন বা ঢঙের কীর্তন সূত্রে উদ্ভুত এই সঙ্গীত প্রসিদ্ধ পালাকার ও গায়ক রূপচাঁদ চাটুর্জ্যে (১৭২২-১৭৯২) মনোহরশাহী কীর্তনাঙ্গের গান থেকে যে বিশেষ ধরনের চটুল গানের প্রচলন করেন, তা 'ঢপ' কীর্তন নামে পরিচিত।[৭৩] তবে ঢপের উদ্ভাবনে মধুসূদন কানের অবদানই বহুল স্বীকৃত। মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান যশোর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে বাংলা ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন (১৮-১৮ খ্রিঃ) এবং ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৪] তার বাবার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিলকের চার পুত্রের মধ্যে মুধুই জেষ্ঠ। পিতার দারিদ্রতার কারণে মধু লেখাপড়া শিখতে পারেন নাই। শৈশবকাল হতেই তাঁর গীত রচনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ গায়ক ছোটো খাঁ, বড় খাঁর শিষ্য হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপরে ঢাকা হতে যশোহর জেলার রাঢ়খাদিয়া

নিবাসী রাধামহোন বাউলের নিকটে এসে তিনি ঢপ-কীর্তন শিক্ষা নেন। এই ঢপ কীর্তনেই আজ তাঁর নাম অমরত্ব লাভ করেছে। কীর্তন থেকে সরে এসে 'নবীন পদ্ধতি' (সাজ পোষাক ছাড়া) নারী কণ্ঠ রূপান্তরে 'ঢপ কীর্তন' নামে খ্যাত। (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সুকুমার সেন)। ঢপ কীর্তন নতুন আঙ্গীকের হলেও এর আদ্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর পালা।[৭৫] কৃষ্ণ কীর্তনের আখ্যান নির্ভর ঢপকীর্তন থেকে ঢপযাত্রার উদ্ভব হয়েছে।[৭৬]

তবে মধুকান বা রূপচাঁদ যিনিই ঢপ সুরের প্রবর্তক হিসাবে দাবি করুন না কেন তাদের বহু পূর্বেই ঢপের অস্তিত্ব ছিল। কারণ কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে সমস্ত প্রাচীন সংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ঢপ কীর্তনের নামও পাওয়া যায়। তবে কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। ঢপ কীর্তনের প্রাচীনতা নিয়ে কোনো সন্দেহেরও অবকাশ থাকা উচিত নয়, কারণ স্বয়ং লালন ফকিরের ঢপ সুরের দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন।[৭৭] লালনের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে। তাঁর জীবিতকালে অর্থাৎ সাধক জীবনের পরিপূর্ণতার চরম সময়ে ঢপের সুর দ্বারা যদি তাঁর গান প্রভাবিত হয়েও থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ বাংলাদেশের ওই সময়ে 'ঢপ ছাড়া গীত নাই, এরকম একটি অবস্থা ছিল।'[৭৮] অষ্টাদশ শতকে এ ধারার গানে মহিলা কীর্তনীয়ার আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে পান্নাবাই, পটলবাই, ছাপান্ন ছুরী, কমলা ঝরিয়া, ললিতা বৈষ্ণবী প্রমুখেরা যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। পুরুষ গায়কদের মধ্যে লোচন দাস, দ্বারিক দাস, অঘোর দাস, শ্যাম বাউল, শ্রীদাম দাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথী রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখের নাম প্রসিদ্ধ। অনেকে রূপচাঁদ পক্ষীকে ঢপ গানের প্রণেতা বলে স্বীকার করেন। ইনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। প্রথম জীবনে কথকতার আসরে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে ঢপকীর্তনের দল গঠন করে সমগ্র রাঢ় বাংলাকে মাতিয়ে তোলেন। ইনি ডুবকী নিয়ে অভিনয়সহ গান করতেন। গানের চলন ছিল হালকা।[৭৯] রূপচাঁদ ডুবকী রচিত ঢপ যাত্রার একটি পদ—

"পাড়ার লোকে গোল করে যা
বলে গৌর কলঙ্কিনী।
যেদিন হয় মা কাজীর দলন
গৌর করে নগর কীর্তন
আচন্ডাল ব্রাহ্মণ যবন গৌর সঙ্গেতে॥"[৮০]

অন্যদিকে মধুকানের ঢপ কীর্তন পাঁচালী, কথকতা, বাউল প্রভৃতি গানের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ এনে দেয়। এই ঢপ গানকে মধুকান জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান। সমগ্র বাংলার বুকে তিনি এই গানকে ছড়িয়ে দেন। তিনি নিজে ঢপ কীর্তনের সুরে বহু পালা রচনা করেন। তার মধ্যে কলঙ্ক ভঞ্জন,

মাথুর, অক্রুর সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢপ গানকে তিনি নবরূপে রূপায়িত করেন। 'ঢপ কীর্তন' নামটি মধুকানেরই দেওয়া।[৮১] এই ঢপ কীর্তনই ঢপ যাত্রার রূপ লাভ করে।

মধুকনের ঢপ যাত্রা গানের উদাহরণ–

"কৃষ্ণ বিরহে রাধা যমুনাতীরে মূর্ছাগত। *মর্মসখীরূপ* মঞ্জরী তাকে কোলে করে বসে আছে। অপর সখীরা বলাবলি করছে :

"রাজ নন্দিনী পড়লো ধরায়
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয়।
কমলিনী আয় গো তোরা
এরাই যায় যে যমুনায়।"[৮২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান নির্ভর ঢপকীর্তন থেকে ঢপযাত্রার উদ্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, যশোরের মধুসূদন কানের অবদানে ঢপকীর্তন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

আদিতে এই ঢপকীর্তনের আসরে কৃষ্ণকাহিনী পরিবেশিত হলেও ঢপকীর্তন থেকে উদ্ভুত ঢপযাত্রার আসরে কৃষ্ণকাহিনী ছাড়াও বাংলার জনপ্রিয় আখ্যানকাব্য পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল, এমনকি স্থানীয় কিছু লোকপুরাণের (জনশ্রুত কাহিনী) কাহিনী মঞ্চস্থ হতে শুরু করে। বর্তমানে সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই সুনামগঞ্জ জেলার বেশ কিছু ঢপযাত্রার দল প্রায় নিয়মিতভাবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান বা অন্যান্য আখ্যান নির্ভর কিছু হৃদয় বিদারক ঘটনা অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকে।[৮৩]

ঢপযাত্রার আসরে প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ, যারা বিভিন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারের বাঞ্ছনায়, সন্তান কামনায় এবং রোগমুক্তি অভিপ্সা, কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য ঢপযাত্রার আয়োজন করে থাকেন।

সাধারণত বর্ষার মৌসুমে যখন চারদিকে জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং শরৎকালে কৃষকের অবসর মুহূর্তে রাতের বেলা ঢপযাত্রার অনুষ্ঠান বেশি হয়ে থাকে।

সাধারণত বাড়ির বাইরের উঠানে বা মন্দিরের (৬´) সমান মাটি উঁচু করে ঢপযাত্রার মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের তিন দিকে এবং অন্যদিকে অভিনেতাদের জন্য অল্প একটুখানি প্রবেশ পথ রেখে বাঁশের সীমানা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মঞ্চের চারদিকে দর্শকগণ মাটিতে পাটি, টুল, বেঞ্চ বা চেয়ার বিছিয়ে ঢপযাত্রার অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো যাত্রা শিল্পীদের মতো ড্রেসে মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন। অন্যান্য চরিত্র সমূহকে সাধারণ পোশাক পরেই অভিনয় করতে দেখা যায়। ঢপযাত্রার আসরে পুরুষেরাই নারী সেজে নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।

ঢপযাত্রার দলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন ম্যানেজার এবং আসর পরিচালনার প্রধান ভূমিকা পালন করেন পালা পরিচালক।

ঢপযাত্রার আসরে সাধারণত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, করতাল, মৃদঙ্গ, ক্লাওরিনেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যাত্রার আসরের মতোই ঢপযাত্রার আসরেও লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়। যাত্রার আসরের মতোই একপাশে বসে একজন লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রোম্পট করে থাকেন।

আসরের শুরুতেই নির্ধারিত পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র মঞ্চে আগমন করেন এবং নিজের চরিত্রের পরিচয় জ্ঞাপনকারী একটি আত্মবিবরণমূলক বর্ণনাত্মক সংলাপ দিয়ে তিনি মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন। এরপর পালা পরিবেশনার বন্দনা বা প্রার্থনা পর্ব উপস্থাপন করা হয়। শিল্পীরা চারদিক অবস্থান নেওয়া দর্শকের দিকে ঘুরে ঘুরে রূপ দর্শন করাতে থাকেন। এরপর প্রস্থান করলে পালা শুরু হয়। ঢপযাত্রার আসরে মহাভারতের বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান পরিবেশনায় সংলাপাত্মক অভিনয়ের রীতিই অধিক প্রচলিত।[৮৪]

২০১৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢপ কীর্তনের আসরে ছেউড়িয়া, লালন আখড়া, কুষ্টিয়া

চিত্র ধারক : উজ্জ্বল পোদ্দার

ঢপযাত্রার গান গাওয়ার বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি ছিল। পাঁচালী গানের সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের মিশ্রণ ঘটিয়ে ঢপ গান খানিকটা নাটগীতের আঙ্গিকে তৈরী করা হয়। এই গানের তৎকালীন গায়ক-গায়িকা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশেষ কুশলী শিল্পী। তাই হালকা ধরনের গান হলেও এ গান আসর জমানোরই গান।[৮৫] পূজা-পার্বণ যে কোনো অনুষ্ঠানে ঝুলন, দোল যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবে আখড়ায় বা নাটমন্দিরে ঢপযাত্রা গানের আসর বসানো হতো। মূলত পালাভিত্তিক ঢপযাত্রা পরিবেশনায় ঢপ-কীর্তন একটি কাহিনীগত ইঙ্গিত সব সময়ই নেপথ্যে থাকত। সেখান থেকে ক্রমে ঢপ-কীর্তন নাট্যনুবর্তী হয়ে ওঠে।[৮৬]

ঢপযাত্রা পালা
প্রভাস যজ্ঞ

প্রভাসের তীরে নারায়ণ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞ-স্থল সুরম্য করার ভার পেলেন। কুবের অর্থ যোগান দিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভাস-যজ্ঞে আসলেন। দেব ঋষি এবং যোগিগণ সকলেই এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হলেন। যজ্ঞে প্রত্যেক যথাযোগ্য স্থানে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পিতা নন্দ, মা যশোদা, গোপীগণ, ব্রজরাখালগণ ও বৃন্দাকে নিয়ে আসার নিমিত্ত বৃন্দাবনে পাঠালেন।

রথ নিয়ে উদ্ধবের ব্রজে আগমন–

উদ্ধব পুষ্পরথ আরোহণপূর্বক বৃন্দাবনে এসে দেখলেন–'কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ শবাকার সব।' উদ্ধব গোপ-গোপীগণের কাছে উপস্থিত হয়ে নারায়ণ-কর্তৃক প্রভাস-যজ্ঞের সংবাদ এবং যজ্ঞ-নিমন্ত্রণপত্র বৃন্দার হাতে প্রদান করলেন। বৃন্দা বললেন–আমরা সকলে মনোরথ-আরোহণে যজ্ঞ-স্থলে যাবো।

মনোরথ-আরোহণে গোপীগণের প্রভাসে গমন–

নন্দ-যশোদা আদি যতো গোপীগণ নিজ নিজ মরোরথ সাজালেন। অতঃপর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে বলে তাঁরা মনোরথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করলেন। প্রভাসে পৌঁছাতেই তাঁদের দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কৃষ্ণ নন্দকে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর চরণ ধুয়ে দিলেন তুলসী-চন্দনে। যশোদার আসন কৃষ্ণ মাথায় দিলেন। ব্রহ্মা এসে যশোদাকে চামর দুলাতে লাগলেন। ব্রজের বালককে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ আদর করতে লাগলেন।

যজ্ঞ-মঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন–

ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ-মঞ্চোপরি সিংহাসনে বসলেন। অতঃপর ব্রহ্মা নন্দ এবং বসুদেবকে বললেন,–এখন তোমরা কৃষ্ণকে পুত্র বলে ভেবো না। ভগবান জ্ঞানে তুলসী ও চন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্মে অর্পণ করো। দেবকী-যশোদাও অনুরূপ ভাবে নিবেদন করলেন। বৃন্দা বললেন, আমরা গোপিনীগণ তো শ্রীবৃন্দাবনে তুলসী-চন্দন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পদে আগেই দেহ সমর্পণ করেছি। তাই এ দেহে তো আমাদের অধিকার নাই। কোন দেহ নিয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণ পূজা করবো?

বৃন্দার প্রতি ব্রহ্মার প্রত্যুত্তর–

ব্রহ্মা বললেন,–দেহ মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের অধিকার আছে। বৃন্দা-দূতী বললেন, –আপনি ঠিকই বলেছেন। সকল দেহেই আছেন কৃষ্ণ দয়াময়। তবে অচৈতন্য জীব চৈতন্যবিহীন, চেতন ব্যতীত চৈতন্য পাওয়া যে কঠিন। সে চৈতন্য দেহে নাই–কৃষ্ণের সেবায়, সে দেহের মাঝে কৃষ্ণ দেহ নয়। যে দেহেতে কৃষ্ণ ভাব মনের গতিক, সাংসারিক বিষয় তাঁর সকলই অলীক।

পদ্ম-পুষ্পসহ গোপীগণের পরীক্ষা–

পদ্মযোনি বললেন,—বৃন্দে, তোমরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা কি ভাবে করেছিলে, কি প্রেমে কমল-পদে তোমরা দেহ সমর্পণ করেছিলে আর কৃষ্ণের কমল পদ-কমলের দলে, কমল হয়ে কেমন করে মিশালে কমলে। তোমরা যেসকল গোপী কৃষ্ণের কমল-চরণে দেহ সঁপেছো, কমল-সহ সেই সকল গোপীগণকে পরীক্ষা দিতে হবে। পদ্মপুষ্প এনে ওজন দাঁড়িতে রেখে পদ্মসহ ওজন করবো। পদ্মসহ সমান যদি তোমরা হও, তা হলে বুঝবো তোমরা দেহ সমর্পণ করেছ শ্রীকৃষ্ণের চরণে। এই বলে পদ্মযোনি হনুমানকে ইন্দ্রালয়ের পদ্ম-সরোবর হতে পদ্ম আনার জন্য পাঠালেন।

পদ্ম-অন্বেষণে মারুতির ইন্দ্রালয়ে গমন—

শ্রীরাম চিন্তা করে পবন-তনয় মনুষ্যের বেশ ধরে ইন্দ্রালয়ে চললেন। হনুমান প্রথমে পদ্ম-সরোবরে পাহারিত হস্তিদের সংঘর্ষে না গিয়ে তাদেরকে প্রভাস-যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন। হস্তিগণ তাতে কর্ণপাত না করলে হনুমান বলপূর্বক স্বীয় রূপ বিশালাকার করে রাশীকৃত পদ্ম তুলে প্রভাসের তীরে এসে উপস্থিত হলেন।

গোপীগণের পদ্মসহ ওজন—

এক পদ্মে কৃষ্ণ-নাম লিখে নিক্তির উপরে ব্রহ্মা তুললেন এবং প্রথমে বৃন্দাকে ডাকলেন। বৃন্দা রোদন করতে করতে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করিতে ওজন হতে গেলেন। বৃন্দার দু'নয়নে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবারি ঝরছিল। অতঃপর পদ্ম-পরীক্ষায় বৃন্দা জিতলেন। পদ্মযোনি এসব দেখে বিস্মিত হলেন। এভাবে চন্দ্রাবলী ও ষোলশত গোপিনী একে একে পদ্ম-পরীক্ষায় কৃষ্ণের কৃপায় জয়লাভ করলেন।

বৃন্দা-কর্তৃক পদ্মসহ দেবগণের পরীক্ষা—

বৃন্দা বললেন—পদ্মযোনি, এবার তুমি এসো পদ্মসহ ওজন করার জন্য। পদ্ম হতে কিছু ভারী হলো পদ্মযোনি। পদ্ম-পরীক্ষাতে পদ্মযোনি হেরে গেলে বিষ্ণুদেব ওজন হবার সময় পদ্ম হতে বিষ্ণু-অঙ্গ-ভার ক্ষণমাত্র হয়ে পদ্মের সমান হলো। অতঃপর পদ্ম পরীক্ষায় ভয় পেয়ে মহেশ শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করলেন। তিনি প্রথমে ভারী হয়ে পরে পরীক্ষায় পদ্মের সমান হলেন। এরপর ইন্দ্র পদ্ম-পরীক্ষায় হারলেন। চন্দ্রেরও একই দশা হলো। পবন পরীক্ষায় ক্ষণ বিলম্বে সমান হলেন। পবনও পরীক্ষায় পরাজিত হলেন। এর রূপে হুতাশনও পরাভব মানলেন।

যদুবংশীয় রানীগণের পদ্ম-পরীক্ষা—

বৃন্দা বললেন—এইবার কুব্জা মথুরার রাণীকে পদ্ম-পরীক্ষা দিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করিতে কুব্জা পরীক্ষায় পদ্মের সমান হলেন। দেবগণ হতে কুব্জার মান বাড়ল। এরপর রুক্মিণী পরীক্ষা দিতে আসলে, তাঁর পরাজয় ঘটল। অনুরূপভাবে একে একে যদুবংশীয় রাণীগণের পরীক্ষায় পরাজয় ঘটল।

মুনিগণের পদ্ম-পরীক্ষা—

মুনি পরাশর পদ্ম-পরীক্ষায় পরাজিত হলেন। অনুরূপভাবে তাঁর পুত্র ব্যাসও পরাজয় মানলেন। জহ্নু-অগস্ত্য-আদি মুনিগণও পদ্ম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। গোপী-হস্তে মুনিগণ অপমানিত হয়েছেন ভেবে তাঁরা যজ্ঞ গ্রাস করবার মন্ত্রণা করলেন। এই কথা অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ জানতে পেরে, তিনি মায়াতে বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করলেন। দেব নারায়ণ অন্নমধ্যে প্রবেশ করলেন। লক্ষ লক্ষ মুনি সব ভোজনে বসলেন।

যজ্ঞ উৎসর্গ, ভগবান-জ্ঞানে গোপ- গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ পূজা—

'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলে ব্রজের গোপ-গোপিনীবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি, যথাবিধি ভগবান-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেন। যজ্ঞস্থলে ঋষি এবং মুনিগণ জয় ধ্বনি দিচ্ছেন, পদ্মযোনি দেবপাঠ করছেন। উপস্থিত রাজা-প্রজাগণ তুলসী-চন্দন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদন করছেন। ননী-চিনি-ঘৃত-আদি এবং যথাবিধি শুক্লবস্ত্র, পট্টবস্ত্র যজ্ঞ কুণ্ডে আহুতি প্রদান করছেন। এভাবে যথারীতি যজ্ঞ সাঙ্গ হলো।

যজ্ঞ-অন্তে মুনিগণের সেবার উদ্যোগ—

পদ্ম-পরীক্ষায় অপমানিত ভেবে মুনিগণ ছল করে ভোজনে বসলেন। মুনি-মধ্যে অগস্ত্য এবং জহ্নুর অন্তর ক্রোধে জ্বলছিল। শ্রীকৃষ্ণ অন্ন গ্রহণ করার অনুরোধ করলে, অগস্ত্য একেবারে সকল অন্ন যা রান্না হয়েছে তা আনতে বললেন। দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর-বেশে অন্নেতে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ হস্তে অগস্ত্য মুনি অন্ন মুখে তুলতে গেলে, তা তুলতে পারলেন না। অগস্ত্য-আদি মুনিগণ ক্ষমা চাইলেন। কৃষ্ণ-গুণ গান করতে লাগলেন। অতঃপর সদয় হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভোজনের আজ্ঞা করলেন। গলে বাস কৃতাঞ্জলি হয়ে বনমালী সকলের নিকট গিয়ে উত্তমভাবে সেবার অনুরোধ করতে লাগলেন। নারদসহ শিব এবং যত ভূত-প্রেতগণও আনন্দে ভোজনান্তে নৃত্য করতে লাগলেন। হনুমান প্রসাদ পেলেন। শ্রীরাম-ভক্ত হনুমান—কৃষ্ণ

হতে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব হতে প্রসাদ শ্রেষ্ঠ'-এটাই প্রমান করলেন। প্রভাস-যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীরাধা গোপ-গোপীগণ বৃন্দাসহ গোলকে গমন করলেন।[৮৭]

৬.৮ কিচ্ছা গান

ভৌগোলিক সীমারেখা বিবেচনায় ময়মনসিংহ জেলার পূর্বদিকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। পশ্চিমে গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা। উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলার অবস্থান।[৮৮] ময়মনসিংহ গীতিকার মতো বিস্ময়কর লোকগাথা পরিশিলীত সঙ্গীত ভুবন, শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতির বিশাল আধার ময়মনসিংহ।[৮৯] বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতগুলোর মধ্যে রয়েছে বাউলগান, ভাটিয়ালী, কিচ্ছা পালা বা কিচ্ছা গান, কবিগান, কীর্তন, ঘাটুগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদি, ঢপযাত্রা, সঙযাত্রা, বিয়েরগান, মেয়েলিগান, বিচ্ছেদি গান, বারমাসী, পুঁথিগান, পালকিগান, ধানকাটার গান, ধানভরার গান, হাইট্টারা গান, গাইনের গীত, বৃষ্টির গান, ধোয়া গান, শিবগৌরীর নৃত্য গীত, গাজীর গান, পট গান, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি।[৯০]

ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলের বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে দেশ বিদেশের মনীষী গানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৯১] আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো প্রধানত পরিণত বয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয় বেদনা নিয়েই রচিত।[৯২]

আদিম সমাজের উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের মিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণে ময়মনসিংহ গীতিকার সমাজ গঠিত। রাষ্ট্রীয় কলকোলাহলের বাইরে সাধারণ সমাজের আনন্দবেদনার প্রতিচ্ছবি এই গীতিকাগুলো।[৯৩]

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো হচ্ছে–মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ান মদিনা। এগুলো ছাড়া ড. দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার তিন খণ্ডে প্রকাশিত চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি গীতিকাই পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত।[৯৪] পূর্ব ময়মনসিংহ ছাড়াও রয়েছে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। যেমন–নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, ভেলয়া নুরুন্নেহা ও কবরের কথা, কমল সদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ,

পরীবানুর হাইলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই যথার্থ গীতিকার মর্যাদা পেতে পারে না, নিছক বর্ণনা হিসেবে বিবেচ্য।[৯৫]

পূর্ব ময়মনসিংহ জেলায় কিচ্ছা গান নামে এক ধরনের নাট্যধারার প্রচলন রয়েছে। কিচ্ছা গান একজন গায়ক অভিনয় আঙ্গিকে বাদ্যকার ও দোঁহারদের সহযোগিতায় পালা আকারে দর্শকদের মাঝে পরিবেশন করেন। এই ধরনের পরিবেশনাকে গ্রামের মানুষ কিচ্ছা গান বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিচ্ছা গান কাহিনী ভিত্তিক সুদীর্ঘ পালাবন্দী গান, যা মৌলিকভাবে একক কণ্ঠে পরিবেশিত হতে পারে, আবার চরিত্র সমাবেশে অভিনয়ের আঙ্গিকেও রূপায়িত হয়ে থাকে। গীতাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের উপস্থিতিতে চতুর্দিক উন্মুক্ত মঞ্চে বা আসরে এই গ্রামীণ গীতিকাগুলোর ব্যাপক প্রচলন ছিল।[৯৬]

মধ্যযুগে গীতিনৃত্য সম্বলিত পালাগুলো যেভাবে অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নাট্যকলা যুক্ত ছিল। জয়দেব বিরচিত গীত গোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যগুলোতে অনুসৃত হয়েছে।[৯৭] এদেশের গীতিকাব্য থেকে মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের সর্বত্র প্রায় রচয়িতা-পালাকারদের আত্মজীবনীর একটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। আসলে, কোনো আখ্যান বা গীত পরিবেশনার প্রথমে বা শেষে রচয়িতা তার আত্মপরিচয় প্রদান করতেন।[৯৮] চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গল কাব্যসমূহ, এমন কি আলাওলের আখ্যান কাব্যেও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর বাইরে অবশ্য মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের অনুসারী ভক্তগণ তাঁদের গুরু চৈতন্যদেবের জীবনী রচনার মাধ্যমে জীবনীকাব্যের আরেকটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কিচ্ছা গান নিজের জীবন কাহিনী মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সঙ্গে যেহেতু আত্মজীবনী চর্চার সূত্র বহু যুগ আগে থেকেই বর্তমান রয়েছে সেহেতু কিচ্ছাকার–কিচ্ছাকারদের আত্মজীবনী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে।[৯৯] প্রসিদ্ধ কয়েকজন কিচ্ছাকার হলেন নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার তারাকান্দিয়া রাজীবপুর গ্রামের আব্দুল জব্বার বয়াতী ও মনসুর বয়াতী, দিঘলকুশা-রাজীবপুরের কুদ্দুস বয়াতী, কুনিহাটি গ্রামের দিলু বয়াতী, কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার নোয়াবাদ গ্রামের ইসলাম উদ্দিন, কিশোরগঞ্জের আফজাল বয়াতী ও শাহজাহান বয়াতী, ময়মনসিংহের মিলন বয়াতী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১০০]

মধ্যযুগে ধর্মকেন্দ্রিক কাহিনী পরিবেশনার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব জীবনের দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত করে কিছু কিচ্ছা কাহিনী সৃজন করতে থাকেন এবং তা গীতি-নৃত্য ও অভিনয় আকারে 'কিচ্ছা গান' নামে পরিবেশন করতে শুরু করেন। এ ধরনের পরিবেশনারীতির বিভিন্ন আখ্যান সংকলন দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় শিক্ষিতজনের কাছে প্রথমে

‘গীতিকা’ নামে স্বীকৃতি অর্জন করে। পরবর্তীকালে নতুনকালের শিক্ষিতজনের কাছে তা ‘পালাগান’ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ ধরনের পরিবেশনারীতির উদ্ভব হলেও বিকাশের মাধ্যমে তা পার্শ্ববর্তী জেলা হবিগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

পৃষ্ঠপোষক ও বায়না : সাধারণ গ্রামীণ আসরে কিচ্ছা গান পরিবেশনের জন্যে একটি দল এক রাতের আসর অনুষ্ঠান এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী বাবদ বায়না নিয়ে থাকে। গ্রামের নিম্নবিত্তের কৃষিজীবী মানুষই এ ধরনের পরিবেশনারীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া, বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার চেয়ে এই নাট্যরীতির পরিবেশনা অপেক্ষাকৃত কম সদস্য বিশিষ্ট হওয়ায় এবং এই রীতিতে কম পরিসরে, কম ব্যয়ে অধিক বৈচিত্র্যময় অভিনয় উপস্থাপন সম্ভব বলে এর প্রতি শহুরে শিক্ষিত সংস্কৃতিবানদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের সময় : বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই কিচ্ছা গানের আসর বসে থাকে। তবে, বর্ষা ও শীতের সময় এ ধরনের আসর বেশি হয়। বর্ষার সময় যখন উক্ত অঞ্চলের কৃষিজীবী লোকজন জলাবদ্ধতার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং শীত মৌসুমে ফসল কাটার পর যখন কৃষকের বিশ্রাম আসে তখনই অধিকহারে কিচ্ছা গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিচ্ছা গানের এক একটি আখ্যানকে এক একটি পালা বলা হয়। এক একটি পালা পরিবেশন সংক্ষিপ্ত সময়েও করা সম্ভব।

মঞ্চ বা আসর : সাধারণত সন্ধ্যার পর আকাশ নির্মেঘ থাকলে গাছতলায়, বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নিচে কিচ্ছা গানের আসর বসে। এছাড়া, মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর দিনে যখন গ্রামের মানুষের জীবনে দীর্ঘ অবসর থাকে তখন দিনের বেলায়ও বড় ঘরের দাওয়ায় এ ধরনের নাট্যধারার আসর বসে। দর্শক সংখ্যা এবং আয়োজকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অভিনয় স্থানে উচ্চতা নির্মাণ নির্ভর করে। অধিকাংশক্ষেত্রে ভূমি সমতলে এ ধরনের পরিবেশনারীতির আসর অনুষ্ঠিত হলেও অধিক সংখ্যক দর্শক উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকলে কিংবা আয়োজকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকলে ভূমি সমতলের এক থেকে দুই ফুট উচ্চতায় মঞ্চ নির্মাণ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মঞ্চ নির্মাণে কয়েকটি সাধারণ চৌকি বা মাটি ব্যবহার করা হয়। পালাকীর্তনের মতোই মঞ্চের একদিকে বাদ্যযন্ত্রী এবং দোঁহারগণ সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের আসরে বাদ্যযন্ত্র ও দোঁহারগণ মঞ্চের কেন্দ্রে অবস্থান করেন আর মূলগায়েন তাদের চারদিকে ঘুরে কিচ্ছা পরিবেশন করে থাকেন। পরিবেশনার স্থান হিসেবে সাধারণত মন্দির, ফসলকাটা উন্মুক্ত মাঠ, স্কুল ময়দান, হাট বা বাজারের কোন উন্মুক্ত স্থান বাড়ির উঠান প্রভৃতিই বেছে নেয়া হয়, যেমনটি হয়ে থাকে পালাকীর্তনে।

আলো : রাতের বেলায় কিচ্ছা গান পরিবেশনের জন্যে বৈদ্যুতিক আলোর সাধারণ একটি বা দুটি বাল্ব অথবা এক-দুটি হ্যাজাকের আলো ব্যবহার করা হয়।

সাজসজ্জা ও সাজঘর : কিচ্ছা গানের মূলগায়েন মুখমণ্ডলে জল ও তেল সহযোগে সাধারণ পাউডার, কিছু জরির টুকরা এবং ঠোঁটে লিপিস্টিক ব্যবহার করেন। অন্য কুশীলব কোনো প্রকার সাজগ্রহণ করেন না। মুলগায়েনের সাজ গ্রহণে আলাদা কোনো সাজঘরের প্রয়োজন পড়ে না।

পোশাক : কিচ্ছা গানের আসরে উপস্থিত কুশীলব বা দোঁহার-বাদ্যযন্ত্রীগণ তাদের প্রাত্যহিক পোশাক লুঙ্গি ও জামা পরেই সাধারণত পরিবেশনায় অংশ নিয়ে থাকেন। মূলগায়ক কিচ্ছা গান পরিবেশনে পোশাক হিসেবে শাড়ি পরিধান করেন। আর এক্ষেত্রে তারা পরনের শাড়ির আঁচলটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে কিচ্ছা গানের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়কে ফুটিয়ে তোলেন।

অভিনয় উপকরণ : পালাকীর্তনের মতো ব্যবহৃত সকল দ্রব্যসামগ্রী বা অভিনয় উপকরণ পরিবেশনায় শুরু থেকেই 'ডায়না'-এর কাছে সাজানো থাকে। গায়েন তার পরিবেশনা অনুযায়ী ডায়নার নিকট হতে এসকল দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ব্যবহার করেন এবং পুনরায় তার কাছেই রেখে দেন। এক্ষেত্রে সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়, চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয় এবং বর্ণনাত্মক গদ্য বা গীত অভিনয়ের মধ্যে দর্শকদের সামনে মূলগায়েন খুব স্বাভাবিকভাবে ডায়নার নিকট গিয়ে প্রয়োজনীয় অভিনয় উপকরণটি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ব্যবহার করেন। মূলগায়েন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনা মধ্যে দোঁহারদের গীত পরিবেশনা চলমান রেখে দর্শকদের আড়াল করে অর্থাৎ দর্শকের দিকে পিছন ফিরে কিছুটা সময় নিয়ে অভিনয় উপকরণ ব্যবহারে চরিত্রের অঙ্গ রচনা করেন। পুনরায় গীত সহযোগে দর্শকদের দিকে ঘুরে চরিত্রের বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশন করেন। একজন মুলগায়েন বা কিচ্ছাদার পালা পরিবেশনায় বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে বর্ণনাত্মক গীত অভ্যন্তরে দর্শকদের আড়াল করে ফুলের মালা, খোঁপা, রঙিন চশমা ইত্যাদি অভিনয় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে দর্শকদের মুখোমুখী হতেই আসরে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

বাদ্যযন্ত্র : কিচ্ছা গানের পরিবেশনায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সাধারণ ঢোল, জুড়ি (করতাল) হারমোনিয়াম ও আড়বাঁশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক সময় এ ধরনের আসরে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ভেল্ল বা সারিন্দা ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। সম্প্রতি কিচ্ছা গান পরিবেশনার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ক্ল্যাওরিনেটকর্নেটের পাশাপাশি নব উদ্ভাবিত কিছু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[১০১]

কুশীলবদের ভূমিকা : কিচ্ছা গানের আসরে এক একটি পালার আখ্যান একজন মূলগায়েন একাই নৃত্যসহ বর্ণনাত্মক গীত ও গদ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদ্য ও সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন। দোঁহার ও বাদ্যযন্ত্রীগণ এ সময় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ধুয়াগীত করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজ আসনে বসে থেকেই সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নিয়ে মূলগায়েনকে কিচ্ছা গান পরিবেশনে সহায়তা করে থাকেন। উল্লেখ্য, কিচ্ছা গানের মূলগায়েনকে স্থানীয় ভাষায় কিচ্ছাকার বা কিচ্ছাদার বলা হয়ে থাকে। আসলে, সে সকল মূলগায়েন গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে প্রাপ্ত কিচ্ছা-পালার বাইরে নিজ সৃজনশীলতায় নতুন নতুন আখ্যান তৈরি আসরে পরিবেশন করেন তাদেরকে কিচ্ছাকার

বলা হয়, আর যে সকল মূলগায়েক গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে প্রাপ্ত কিচ্ছা-পালা আসরে পরিবেশন করেন তাদেরকে কিচ্ছাদার বলে। ডায়না প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নিয়ে কিচ্ছা গানের আসরকে বৈচিত্র্যময় ও রসঘন করে তোলেন।

পরিবেশনারীতি : বর্তমানে কিচ্ছা গান পরিবেশনার জন্যে গ্রামীণ আসরে একজন মূলগায়েন বা কিচ্ছাকার-কিচ্ছাদার এবং কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী ও দোঁহার অবস্থান করেন। পালা পরিবেশনে দোঁহারগণ ধুয়াগীত করে মূলগায়েন বা কিচ্ছাকার-কিচ্ছাদারকে সহযোগিতা করে থাকেন। মূলগায়েনের আখ্যান পরিবেশনার ভেতর মাঝে মাঝেই দোঁহারদের সর্ব ডানে অবস্থান গ্রহণকারী দোঁহার-'ডায়না' বিভিন্ন ধরনের হাস্যরত্মক প্রসঙ্গ, চুটকি ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে আসরে রস সঞ্চার করেন।

কিচ্ছা গান পরিবেশনার শুরুতে দোঁহার-বাদ্যযন্ত্রীগণ আসরে প্রবেশ করে প্রথমেই সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাদের সেই সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ও তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছুক্ষণ নৃত্য প্রদর্শন করে। এরপরে চড়া গলায় সুর টেনে মূলগায়েন বা কিচ্ছাকার-কিচ্ছাদার বন্দনাগীত পরিবেশন শুরু করেন। বন্দনাগীতের শেষে শুরু হয় কিচ্ছা গানের মূল আখ্যান বা পালার পরিবেশনা। আখ্যান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক রীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

কিচ্ছা গানের বিভিন্ন পালা পরিবেশনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয় যে, গায়েন-কুশীলবের অভিনয়-কণ্ঠের প্রক্ষেপের সঙ্গে দর্শক-শ্রোতার মনও অবিরত সহিষ্ণু, প্রতিবাদমুখর কিংবা সজল হয়ে আসে। কিচ্ছাকার-কিচ্ছাদারের একই কণ্ঠে আসে নায়ক-নায়িকার করুণ আর্তনাদ এবং সমাজের কঠোর অনুশাসন, আসে দর্শক-শ্রোতার আনন্দাশ্রুর উপাদান। অনেক ক্ষেত্রে কিচ্ছা গান পরিবেশনায় কথোপকথন বা সংলাপাত্মক অভিনয় ছাড়াও কিছু গদ্য বর্ণনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, সে ধরনের গদ্য বর্ণনা অংশে বিশেষ একটি সুর-সঙ্গতি রক্ষা করা হয়। এ ধরনের গদ্য বর্ণনা অনুভব এবং বক্তব্যে স্পর্শসহ গানের সুরের মতোই প্রত্যক্ষভাবে তা দর্শক- শ্রোতার হৃদয়কে রঞ্জিত করে থাকে। এ গদ্য তাই কিচ্ছা গানের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যহীন নয়, আসলে অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতধারার মধ্যেও অনেক স্থানে এ ধরনের গদ্যময় অংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[১০২]

ময়মনসিংহের কিচ্ছা গান
চিত্র গ্রাহক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান

কিচ্ছা গানের আখ্যান পরিবেশনায় সাধারণত বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য-পদ্য এবং সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের পরিবেশনায় সংলাপাত্মক অভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থানরীতি ব্যতিরেকেই একজন অভিনেতা একাধিক চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয় উপস্থাপন করেন। তবে, মনে রাখা ভালো যে, বর্ণনাত্মক অভিনয়ই (গদ্য-গীত ও পদ্য) হচ্ছে এ ধরনের পরিবেশনায় প্রধানতম অভিনয় উপাদান।

পালাকীর্তনের মতোই বর্ণনাত্মক অভিনয়ে গদ্য থেকে গীতাভিনয়ে অথবা সংলাপাত্মক গদ্য থেকে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ে পরিবর্তনে বা পরিবেশনায় মূলগায়ের কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই একটি থেকে আরেকটি পরিবর্তন করেন। এক্ষেত্রে অভিনীত গীতসমূহ হারমোনিয়ামের একটি নির্দিষ্ট স্কেলে বাঁধা থাকে। ফলে গায়েন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূততার সাথে গীতাভিনয় থেকে গদ্য অভিনয়ে পরিবর্তন করে থাকেন।[১০৩]

বাংলা লোকনাট্যে কীর্তনের যে চর্চা তা আপন গতিতেই প্রবাহিত হচ্ছে এবং আপন যোগ্যতায় টিকে রয়েছে। আমরা যদি বাধা সৃষ্টি না করি তাহলে এই চর্চা ও এর প্রেক্ষাপট আরো বিকশিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। কীর্তন ও লোকনাট্য আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। কীর্তন ও লোকনাট্যের জন্ম এই মাটিতেই, বাংলার এই পবিত্র মাটির সুর-রস গ্রহণ করেই কীর্তন বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা অব্যাহত থাকবে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন, নট-নাট্য-নাটক, মিত্র এ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৯৯২, পৃ. ৮৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৩. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর কোলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ২১০
৪. Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity*, the University press limited 2000, first published 2000, p. 19

৫. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র)*, বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৬
৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : জুন ২০১৬, পৃ. ২৭-২৮
৭. ড. মৃগাঙ্গশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশন সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৫৭
৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৭
৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৮
১০. আলীম আল রাজী, *বাংলা লোকনাট্যে পালাগান, (পদ্ধতি ও প্রয়োগ)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৪৬
১১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৬
১২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৭
১৩. ড. মৃগাঙ্গশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, প্রকাশক-সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৫৩ হত
১৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৪
১৫. *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া এবং বাংলার কীর্তন গান* বই থেকে সংগৃহীত, পৃ. ৭৭ ও ৫৫
১৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৪
১৭. ড. মৃগাঙ্গ শেখর চক্রবর্তী, *বাংলায় কীর্তন গান*, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৫৫
১৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৫
১৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৬
২০. ড. মৃগাঙ্গশেখর চক্রবর্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ*, ফার্মা কেএলএম প্রা. লিঃ, প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১২৪-১২৯
২১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩০
২২. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃ. ১৪৫
২৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৬
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮
২৭. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, *ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি (সম্পাদিত)* শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোলকাতা, দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৪২৫
২৮. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রকাশকাল ভাদ্র ৯১, পৃ. ৮৬
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৩১. সুকুমার সেন, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রকাশন আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৯, প্রকাশকাল ১৯৭৫, পৃ. ৫১১
৩২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশন আগস্ট ২০০৫, ভাদ্র ১৪১২, পৃ. ৫৬

৩৩. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রকাশকাল ভাদ্র ৯১, পৃ. ৮৭

৩৪. সেলিম আল দীন, *'যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে : জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা*, ১৯৯৫-৯৫

৩৫. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮৭

৩৬. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) কৃষ্ণকমল গ্রন্থমেলা, ভট্টাচার্য এন্ড সন, কোলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ০৫

৩৭. সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি গবেষণা ৭ বর্ষ*, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৬

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১

৩৯. *বাংলা লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৪০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৩

৪১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৪

৪২. সত্যবতী গিরি, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, প্রকাশন : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৩৪

৪৩. আলীম আল রাজী, *বাংলা লোকনাট্য পালাগান*, বাংলা একাডেমি-২০১০, পৃ. ১২৪

৪৪. শুভাশিস সমীর, *'মণিপুরী পালাগান'* দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারি, শুক্রবার, ঢাকা ২০০১

৪৫. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র)*, বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৬

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৪৮. এম. এস. দোহা, *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ২২৭

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৫০. লোকসঙ্গীত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৯৩

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

৫২. ইকবাল খোরশেদ, *বাংলার লোকঐতিহ্য পরিচয়*, প্রকাশন : মূর্ধণ্য, প্রকাশকাল : বাংলাদেশ বইমেলা কোলকাতা ২০১৮, পৃ. ১০৫

৫৩. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ, প্রকাশন : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক*, চর্চাকেন্দ্র, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২৫১

৫৪. *বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা ড. দুলাল চৌধুরী, প্রকাশন : আকাদেমি অব ফোকলোর, কোলকাতা, পৃ. ১৯৩

৫৫. সাইমন জাকারিয়া, প্রণমহি বঙ্গমাতা, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৯-৫৯

৫৬. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক* (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র), বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ২৫৬

৫৭. Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity,* the University Press Limited, First Published 2000, p. 33

৫৮. আলীম আল রাজী, *বাংলা লোকনাট্যে পালাগান (পদ্ধতি ও প্রয়োগ)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৮৯

৫৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোক সংস্কৃতি*, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ১০৭

৬০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১০৭

৬১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১০৮
৬২. মো. জাহিদুল কবীর, *লোকায়ত এক জনপ্রিয় গীতিধারা প্রবন্ধ (ঘাটুগীত)*, পৃ. ১১৫
৬৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৬
৬৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৭
৬৫. Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity*, the University Press Limited first published 2000, p. 290
৬৬. আলীম আল রাজী, *বাংলা লোকনাট্যে পালাগান, (পদ্ধতি ও প্রয়োগ)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৯১
৬৭. মো. জাহিদুল কবীর, *লোকায়ত এক জনপ্রিয় গীতিধারা প্রবন্ধ (ঘাটুগীত)*, পৃ. ১১৮
৬৮. মো. জাহিদুল কবীর, *বাংলার লোকঐতিহ্য (ঘাটু গানের বিষয় ও গায়ন রীতি)*, অন্বেষা প্রকাশন, প্রকাশকাল : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, পৃ. ২৪-২৫
৬৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১৮
৭০. মোহাম্মদ সিরাজুল কাসিমপুরী, *গাঁড়ুগান*, *বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন : ৫৩*, পৃ. ১২৪
৭১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২৪
৭২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪-২৫
৭৩. মো. জাহিদুল কবীর, *বাংলার লোকঐতিহ্য (ঘাটু গানের বিষয় ও গায়ন রীতি)*, অন্বেষা প্রকাশন, প্রকাশকাল : অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৯, পৃ. ৩৬-৩৭
৭৪. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ক্রমধারা*, প্রকাশন : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল–ভাদ্র, ১৪১২
৭৫. *মধুসূদন কিন্নরের ঢপ কীর্তন*, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, প্রকাশকাল ১৯৩৬, পৃ. ১
৭৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২
৭৭. সেলিম আল দীন, *বাংলা নাট্যকোষ*, প্রকাশন–শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল– এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ. ১৮১
৭৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৮১
৭৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩
৮০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫
৮১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৭
৮২. ড. রীনা দত্ত, *বাংলা কীর্তন ও লোকসংগীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১২৩
৮৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২৪
৮৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২৪
৮৫. প্রাগুক্ত, প্রভাসখণ্ড, পৃ. ১৩৮
৮৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৬
৮৭. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৬
৮৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৭-২৮
৮৯. *লোকসঙ্গীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল : ২০০৭, পৃ.২৪৩
৯০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪৪
৯১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪৫

৯২. মাহবুবুল আলম, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ২০১৯, পৃ. ৩৪৩.

৯৩. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪৩

৯৪. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪৪

৯৫. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪৬

৯৬. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪৬

৯৭. দিনেন্দ্র চৌধুরী, *গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১১

৯৮. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১১

৯৯. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩

১০০. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩

১০১. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪

১০২. প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪

১০৩. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক(বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল–এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ৪৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্ষেত্র সমীক্ষা

কীর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন এই গবেষণা কাজে এসে পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশে কীর্তন বা এই আঙ্গিকের লোকনাট্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহের কোন চেষ্টা কেউ এ পর্যন্ত করে নাই। কীর্তনের হালহকিকত সম্পর্কে ধারণা অর্জন কিংবা বাঙলা লোকনাট্য কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট বা কীর্তনশিল্পীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টাও এ যাবৎ করা হয়নি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে কীর্তন যে এদেশে টিকে আছে সে ব্যাপারে শুধু শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে তো নয়ই, নীতিনির্ধারক মহলের কাছেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপট সুপ্রাচীন এবং গৌরবময় হলেও এ বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা, বিতর্ক ও গবেষণা হয়নি। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বড় বড় কীর্তনীয়া ও কীর্তন গবেষকদের সান্নিধ্যে যেতে। বিভিন্ন পর্যায়ে আমি তাঁদের কাছ থেকে ক্যাসেট রেকর্ডারে ও নোটবুকে টুকে সাক্ষাকার নিয়েছি এবং আমি ধন্য হয়েছি। পর্যায়ক্রমে আমি তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাঁদের মতে বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপটসহ বর্তমানে বাঙলা কীর্তন ও কীর্তনয়াদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে যা বলেছেন হুবহু তুলে ধরেছি–

সদ্য প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রীজীবশরণ দাস (শরণ), শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বাসস্থান, একচক্রা গর্ভবাস নিতাইবাড়ি, বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম-৭৩১২৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
জন্ম : ১৯৪০, রাজশাহী, বাংলাদেশ
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ২০২০, কোলকাতা
বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সাক্ষাৎকার–২রা জানুয়ারি ২০২০

বৈষ্ণব সাধক শ্রীশ্রীবশরণ দাস (শরণ)

অধ্যক্ষা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বাসস্থান–একচক্রা গর্ভবাস (নিতাইবাড়ি) বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১২৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

আমার ধ্যানজ্ঞান সবই আমার গুরুমহারাজ (শ্রী রামদাস বাবাজী), আমি সেই পরিচয়েই পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুমারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় নাম ছিল রাধিকারঞ্জন।

রাজশাহী জেলায় আমার জন্ম ১৩৪৯ বাংলা/১৯৪০ ইং সাল।

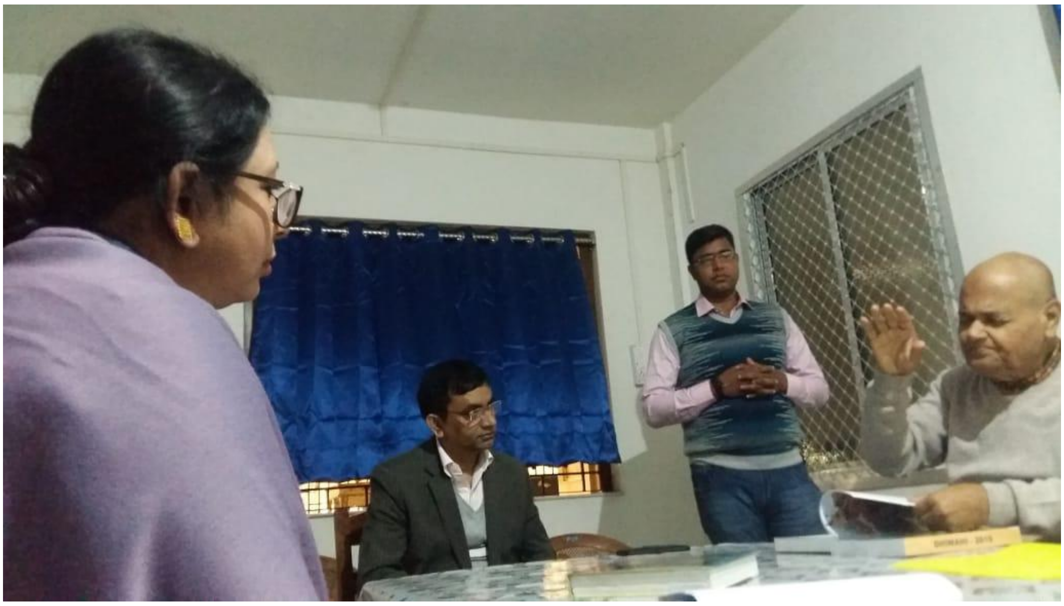

২০২০ সালের ২রা জানুয়ারি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আলোকচিত্রটি ধারণ করেছে উর্বী পোদ্দার

অনার্স প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইংরেজি সাহিত্য, এম.এ. করেছি সংস্কৃতি বিষয়ে। পরবর্তীকালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. করেছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় আমার জন্ম, বাড়ির পাশেই শ্যামসুন্দরের মন্দির। দুই ভাই, দুই বোন। ছোট সময়ই মা মারা গিয়েছেন। আমার বাবা ছোট সময় থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে পড়াশোনা করতেন। ছোট সময় রাজশাহীতে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে শুরু করেছিলাম গান শেখা। (গৃহ ত্যাগী বৈষ্ণব হওয়ার কারণে পরিবার সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারিনি)

গবেষণায় বেশি ব্যস্ত থাকি। পদাবলী কীর্তনকে আমি শ্রদ্ধা করি। যারা এখন কীর্তন করছেন মূল স্রোত থেকে তারা অনেকটা সরে এসেছেন। অর্থ লোভ বেশি চলে এসেছে। নিতাই চাঁদের অপার অনুগ্রহে আমার এই পথে আসা। তিনি তাঁর চরণে আমাকে স্থান দিয়েছেন। আমি চাই সকলেই মূল স্রোতে ফিরে আসুক।

আমার বয়স এখন ৭৮ বছর। কীর্তনের প্রকৃত রস আমি পায়ই না দুই একজন ছাড়া। সুমন আমার সন্তানের মতো (কীর্তন সম্রাট সুমন ভট্টাচার্য্য)। ও এই বিষয়টির ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। বড় বড় জায়গায় যে কীর্তন হচ্ছে তা গ্লামারে দাঁড়িয়েছে। ৪৩-এ এদেশে এসেছি। খড়দা শ্যামসুন্দরের মন্দিরে এসে উৎসবাদি করে চরণামৃত আমাকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এ পথেই আছি। মজবুত হয়ে সবাইকে গুরুমুখি করতে হবে। আমার গুরু মহারাজ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়। তিনি আমাকে সবসময় বলতেন, সবাইকে গুরুমুখী করতে নামসংকীর্তনই শেষ কথা। সবের মূলই সংকীর্তন। 'নব কৃপা আসে যায়, তবে বসে না।'

আমি খ্যাতির পিছনে ছুটি না। অর্থ আর খ্যাতির নেশা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে সবাইকে শুদ্ধ হতে হবে।

আমি যেহেতু সরাসরি গান করি না, সবাইকে উৎসাহিত করি পাপ কাজ থেকে সরে থাকতে এবং ঈশ্বরের আরাধনা করতে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন।

প্রথমেই একজন কীর্তন শিল্পীকে মানবিক হতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করি, এখানকার মানুষ এমনিতেই ধর্মে বেশি বিশ্বাস করে। যেসব লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন শিল্পী রয়েছেন তাদের অবস্থা আগের তুলতায় অনেক ভালো।

প্রতিটি শিল্পীকেই পালাকীর্তনই হোক, লোকনাট্যের পালাই হোক পরিবেশনের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে, বিষয়টি সম্পর্কে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে এবং চর্চা করতে হবে, তবেই না পরিপূর্ণতা আসবে। সমগ্র বাঙলাতেই শিল্পীদের যে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় তা বলা যাবে না। তবে কেউ কেউ পাচ্ছেন। পালাকীর্তনের পরিব্যাপ্তি অনেক বড়, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই এর পরিবেশন হয়ে আসছে। আমাদের বর্তমান সময়ে চৈতন্য বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক যে সব যাত্রা, লোকনাট্য হচ্ছে তার সাথে পালাকীর্তনের পরিবেশনার একটি বড় ধরনের সামঞ্জস্য রয়েছে। আমি যদি ওপার বাংলার কথা ধরি (বাংলাদেশ) সেখানে কৃষ্ণযাত্রা, অষ্টগান, কিচ্ছাগান সরাসরি পালাকীর্তনের সাথে জড়িত। আর আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারাটাই আমাদের কৃতিত্ব। মূল পালাকীর্তনের পাশাপাশি এসব লোকনাট্যরীতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করবো আমাদের শিল্পীরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন। অন্যান্য সংগীতের মতো কীর্তনেরও একটি বিশাল পরিব্যপ্তি রয়েছে। সেটিকে অনুশীলন করে আরো সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

আমি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে খুব ভালোবাসি। বাংলাদেশে বেশি বেশি কীর্তন চর্চা হোক এটিই আমার প্রত্যাশা।

আমার সংকলন ও সম্পাদনায় অনেক বই রয়েছে। যেমন–শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পদকল্পতরু বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বইটিতে নিত্যানন্দ প্রভু বিষয়ক স্তব স্তোত্র, মহাজন পদাবলী ও লোকগানের সমৃদ্ধ সংকলন রয়েছে।

সবশেষে একটি কথা বলি আগে মানুষ হতে হবে, তার পরেই না শিল্পবোধ আসবে। আপনি আমার কাছে এসেছেন মনে হচ্ছে আমি আমার মাকেই দর্শন করছি। আপনি একজন পরিপূর্ণ কীর্তন শিল্পী হয়ে উঠুন এটিই আমার আশীর্বাদ।

শ্রীজীবশরণ দাস মৃত্যুবরণ করেন ২০২০ সালের ২৫ আগস্ট শনিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে। তাঁর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শ্রীনিত্যানন্দের চরণে যেন ঠাঁই হয় সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীজীবশরণ দাসের সম্পাদনায় গ্রন্থমালা–

* শ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান (পরিচয় ও পরিক্রমা)।
* শ্রীনিত্যানন্দ পদকল্পতরু (বিগত পাঁচশত বৎসরের প্রকাশিত পদসংকলন)।
* শ্রীগুরু লীলা প্রসঙ্গ (বাঁকুড়া পর্ব) যুগগুরু বাবাজী মহাশয়ের পরিক্রমা কথা।
* প্রত্যঙ্গ বর্ণন ভাবামৃত (সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবা প্রমুখের রচনা সংকলন)।
* শ্রীচৈতন্য রচনা চয়ন (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যাবতীয় রচনা সংকলন)।
* শ্রীগৌরাবির্ভাব-পঞ্চশতী স্মরণিকা (দুর্লভ প্রবন্ধাদি চয়ন)।
* কওয়া কথা (বাবাজী মহাশয়ের বাণী-বিতান)।
* মনন মঙ্গল (সখীঠাকুরাণীর প্রসঙ্গ-প্রসাদ)।
* শ্রীনিত্যানন্দ জন্মলীলা কীর্তন (বিতরিত)।
* শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সূচক কীর্তন (বিতরিত)।
* শারদীয় ভাবোচ্ছ্বাস (বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখোদগীর্ণ বিতরিত)।
* হনুমান চালীশা (তুলসীদাসজীকৃত মূল ও পদ্যানুবাদ বিতরিত)।
* বাবাজী মহাশয়ের জন্মলীলা কীর্তন (বিতরিত)।
* স্মরণ-সম্পূট (নিত্যস্মরণীয় সংকলন)।
* অভিজ্ঞান (নিত্যানন্দ জন্মস্থানের প্রতীক-বিবরণ)।
* দেউটি (শ্রীহরিদাস সমাধি মঠাধ্যক্ষ নিতাইদাদার কথা) বিতরিত।
* লীলালব (বাবাজী মহাশয়ের অষ্টকালীন দিনচর্যা)।
* পানিহাটী-পরিচয় ও দণ্ডমহোৎসব (পূর্ণাঙ্গ বিবরণ)।

* চয়ন (নিত্যসূরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের কথা)। বিতরিত।
* দিক্‌দর্শন (শ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)।
* অবিমুক্তপুরে (দুইরাত্রি কাশীবাসের দিনপঞ্জী। বিন্দুমাধবাদির বিবরণ)।
* জীবাতু (ক্ষুদ্রাকৃতি নিত্যপাঠ্য সংকলন)।
* কীর্তন কমল (ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিসন্ধ্যাদি কীর্তন সংকলন)
* Sri Sri Nityananda Janmasthan-Résumé (English) Brief history.
* জয়তি তেহধিকং–বাবাজী মহাশয়ের জীবন কথা। তাঁরই বাঙ্‌ময় বিগ্রহ।
* My Master–Brief life of Revered Babaji Mahasaya
* শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান (একচক্রা পরিচয়)–প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব ভূমি, ঐতিহাসিক দিব্যপীঠ, একচক্রা ধামের মাঝে 'নিতাইবাড়ি'–কেন্দ্রিক যাবতীয় বিবরণ। প্রসঙ্গক্রমে বীরভূমে বিরাজিত যাবতীয় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবপীঠগুলোর বিবরণও এতে বর্তমান।
* জীবাতু–নিত্যপাঠ্য প্রার্থনা-বন্দনার সংকলন।
* কীর্তন কমল–ত্রিসন্ধ্যা কীর্তনীয় পদাবলীগুচ্ছ।
* শ্রীগুরু রামায়ণ–নামমূর্তি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নৈমিত্তিক লীলাবলীর ছন্দবদ্ধ পদ্য-রূপ।
* His Divine...Brief life sketch of Srimat Ramdas Babaji Mahasaya.
* কওয়া কথা–সংঘগুরু শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের বাণী-বিতান। অমোঘ কল্যাণের অমেয় আধার।
* পানিহাটি পরিচয়–উত্তর ২৪ পরগণা > পানিহাটি গ্রামের গঙ্গাতীরে ৯২৩ বঙ্গাব্দের (১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশীতে, প্রভু নিত্যানন্দের আদেশ-অনুমতে, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আয়োজনে, যে সোপকরণ দৈ-চিঁড়ের অবাধ ফলারে আপ্যায়িত হয়েছিলেন অগণন জন, সেই ঐতিহাসিক গণভোজই কালের বুকে স্বমহিমায় সুচিহ্নিত–'দণ্ড মহোৎসব' আখ্যায়। তারই পূর্ব-পর ইতিবৃত্তের সাথে সন্নিহিত আরও প্রাসঙ্গিক বিবরণ।
* শ্রীচৈতন্য রচনা চয়ন–ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্বয়ং বিরচিত ও তাঁর নামে আরোপিত রচনা-সংকলন।
* মনন-মঙ্গল–সেবা-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ললিতাদাসী সখিজীর অসমান্তরাল জীবন, আংশিক রচনাবলী ও উপদেশসমূহ।
* স্মরণ-সম্পূট–গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তজনের নিত্যপাঠ্য প্রার্থনা-বন্দনা-ত্রিসন্ধ্যা স্মরণ কীর্তনাদি।
* লীলালব–আমাদের সংঘগুরু > নামমূর্তি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলন-আলেখ্য।

* প্রসঙ্গ–মহেশ পণ্ডিত (শ্রীপাট পালপাড়া-পরিচয়)–প্রভু নিত্যানন্দের অন্যতম শিষ্য-সন্তান মহেশ পণ্ডিতের কথা-প্রসঙ্গ।

* সুস্মৃত সংগ্রহ–ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ, সুদূর দ্বারকাধাম হতে ব্রজমণ্ডলে এসে ষোলটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন–চার দেব, চার গোপাল, চার ঈশ্বর এবং চার দেবীমূর্তি। এই ষোড়শ বিগ্রহের সচিত্র সূচারু ইতিহাস।

* দিক্‌দর্শন–নিত্যানন্দ জন্মস্থান > নিতাইবাড়ির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

* দ্বাদশ গোপাল–অভিযাত্রী নিত্যানন্দের সেবকগোষ্ঠীর মাঝে সুচিহ্নিত দ্বাদশ সেনানীর জীবন ও কর্মবৈচিত্র্যের দিক্‌দর্শন।

* ধীমহি–বার্ষিক স্মরণিকা-গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গহনে প্রবেশ করলেই এর সার্থক পরিচয় পাওয়া যাবে।

* উত্তরণ–শ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

কীর্তন শিল্পীর সাক্ষাৎকার : নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর

নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর, Nirmalendu Mitra Thakur

বাবা : কালিয়াকান্ত মিত্র ঠাকুর, Kaliakanta Mitra Thakur

মা : প্রভাবতী মিত্র ঠাকুর, Prabhahati Mitra Thakur

জন্মস্থান এবং জন্ম তারিখ : ময়নাডাল, Moynadal, ২/১/১৯৫৭

স্ত্রীর নাম : কল্পনা মিত্র ঠাকুর

২০২০ সালের ২ জানুয়ারি ময়নাডাল ঘরানার কীর্তনীয়া শ্রী নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আলোকচিত্র ধারণ করা হয়। স্থান : বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম। চিত্র গ্রাহক : উর্বী

গ্রাম : ময়নাডাল, ডাকঘর : রাণীপাথর, জেলা : বীরভূম

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ,

স্কুল, কলেজ : পাঁচড়া হাইস্কুল ও কলেজ,

আমার পরিবারে আমি, আমার স্ত্রী ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

গানের হাতে খড়ি : ১৬ বছর বয়স থেকে।

আমার পরিবারে কীর্তনের সাথে জড়িত খোলবাদক-সচ্চিদানন্দ মিত্র ঠাকুর আমার দাদা, হারমোনিয়াম বাদক ও দোঁহার অঞ্জন মিত্র ঠাকুর।

শ্রী কালিয়াকান্ত মিত্র ঠাকুর

শ্রী সচ্চিদানন্দ মিত্র ঠাকুর

শ্রী নির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর

বাবা কালিয়াকান্ত মিত্র ঠাকুর (গোবিন্দ), আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। আমার বাবার নামে বাংলাদেশের দিনাজপুর শহরে 'কালিয়াকান্ত' মন্দির রয়েছে। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য শ্রীখোল বাদক।

মনোহরশাহী ও গড়ানহাটি কীর্তন করতে পছন্দ করি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন পরিবেশন করেছি। আমাকে কীর্তন সুধাকর উপাধি দেওয়া হয়েছে।

প্রচুর ছাত্র ছাত্রী আছে। তাদের নিয়মিত বিভিন্ন পদ শিখাই, আমি নিজেও পালাকীর্তন করি। এখন বয়স হওয়ার কারণে গান বেশি করতে পারছি না। প্রয়োজন মতো গান থাকলে দল গুছিয়ে নেই। একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সব জায়গায় সমানভাবে সমাদৃত হইনা। আমি চেষ্টা করি কীর্তনের সম্মানটুকু বজায় রাখতে।

আমার একজন ছাত্র খুব ভালো তৈরি হচ্ছে। দিব্যেন্দু মন্ডল, বীরভূম রাজনগর কলেজে শিক্ষকতা করছে, পাশাপাশি নিয়মিত পালাকীর্তন করছে। সে মনোহরশাহী গানের পাশাপাশি আমাদের যে গানগুলো রয়েছে সেগুলোও শিখছে। (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপিঠ, শিউরি বিদ্যাসগর কলেজ, অনার্স, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ., বি.এড. হুগলী সরকারী ট্রেনিং কলেজ) আশা করি দিব্যেন্দু নাম করবে। টোল আছে কীর্তনের। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে সেখানে।

কীর্তন শিল্পী হিসেবে সামাজি দিক থেকে আমার কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে না, আমি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নই, সামাজিক দিক থেকে শিল্পী হিসেবে অবশ্যই আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়।

কয়েকজন শিল্পী বাদে কোন শিল্পীই মোটেই ভাল নেই। গ্রাম অঞ্চলে পালাকীর্তন হলেও অন্যান্য গানের তুলনায় কীর্তন শিল্পীদের সম্মানী কম দেওয়া হয়। যার কারণে তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। আর যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তারা সঠিকভাবে কীর্তন করছে না।

বেশিরভাগ কীর্তন শিল্পীর শিক্ষার অভাব আছে, শিক্ষা অতি প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব না সংগীতের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পালাকীর্তনের পরিবেশন করার জন্যও প্রত্যেকটি শিল্পীকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে এবং দক্ষতার সাথে পরিবেশন করতে হবে।

মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব শিল্পীর নিজেরই। সুমনের (অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য) মতো সকলকে তৈরি হতে হবে। তাহলে সবাই মর্যাদা পাবে।

কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের সম্পর্ক সুনিবিড়।

পালাকীর্তন থেকে ধারণা নিয়েই লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনে অভিনয় বা নৃত্য গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্য সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে।

লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি একটি বড় বিষয়, বাচন ভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গি দুটোই সুনিপুন হতে হবে। আমি বীরভূম, বাকুড়ার বাইরে খুব কম গিয়েছি, এখানে যেসব লোকনাট্য বা আঞ্চলিকভাবে যে সকল নাটক পরিবেশি হয় বেশিভাগই পালাকীর্তনের আঙ্গিকে। আবার আমরাও কীর্তন পরিবেশনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় লোকনাট্যের আঙ্গিকে অনেক সময় পরিবেশন করি দর্শক শ্রোতাদের চাহিদা মতো। আমি চাই এই ধারা অব্যাহত থাকুক। তাহলে প্রাচীন লীলাকীর্তন হারিয়ে যাবে না। কীর্তনের চর্চা আরো বাড়াতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে কীর্তন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গান পরিবেশন করেছি। একটা বিষয় আমি বুঝেছি মানুষের শেখার ও জানার আগ্রহ খুব বেশি।

আমি যতটুকু জানি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের শিখিয়ে যেতে চাই। আগের চেয়ে এখন ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি আগ্রহী এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রতি। আমিও সাধ্যমতে চেষ্টা করছি তাদের যাতে ভালোভাবে শিখিয়ে যেতে পারি। আমি মনে করি প্রতিটি শিল্পীকে সুরুচিসম্পূর্ণ হতে হবে। পালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোষাক পড়তে হবে এবং সাজটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মনে রাখতে হবে কীর্তন অনেকগুলো চরিত্রের অভিনয়ের সমষ্টি। শিল্পীকে নৃত্য, গীতের সহযোগে অভিনয়কে দর্শকের কাছে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য শিল্পীকে যথেষ্ট অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলন ছাড়া কোন বিষয়ই পরিপূর্ণতা পায় না। আমি ময়নাডালের ইতিহাস লিখেছি। তুমি তোমার গবেষণাপত্রে সংযোজন করবে, তাহলে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা বা যারা গবেষণা করবেন জানতে পারবেন। একজন পরিপূর্ণ কীর্তন শিল্পী হও, এই আশীর্বাদ করি।

ময়নাডালের ইতিহাস

কীর্তনীয়া—শ্রীনির্মলেন্দু মিত্র ঠাকুর

প্রায় চারশত বছরের পুরানো ময়নাডালধাম, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের বৈষ্ণব সমাজের কাছে আজও বিশেষভাবে আদরের স্থান। বৈষ্ণব সমাজের কাছে এই স্থান বিশেষ আদৃত হওয়ার কারণ এখানে শ্রীমন্দিরে বিরাজমান সেই চারশত বছরের পুরানো শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধন্য নৃসিংহবল্লভ কর্তৃক ময়নাডালী কীর্তনগান ও শ্রীখোল বাজনার প্রবর্তন। আজও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারু বিগ্রহ শ্রীমন্দিরে বর্তমান এবং সেই ময়নাডালী ঘরানার কীর্তনগানও চলমান।

বর্ধমান জেলার রাজুর গ্রামের কালীচরণ মিত্র মুর্শিদাবাদের রাজার দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক সেই সঙ্গতিসম্পন্ন মিত্র মহাশয় বহুদিন অপুত্রক ছিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ করুণায় নৃসিংহবল্লভকে পুত্ররূপে পেলেন। কিভাবে পুত্র সন্তান লাভ করলেন সেটা বিস্তারের প্রয়োজন।

একদিন মিত্র পত্নী বাড়ির ভিতর পুষ্করিণীতে স্নান করছিলেন সঙ্গে দাসী ছিল। সেই দাসীকে কাঁদতে কাঁদতে মিত্র পত্নী তাঁর মনোকষ্টের কথা বলছিলেন ‘বল দাসী, পুত্র মুখ দর্শন না হলে তার মতো হতভাগিনী আর কে আছে। তার মৃত্যুই ভালো।’ দুঃখীনীর দুঃখ বুঝতে পেরে পরম দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেই মিত্রপত্নীর নিকট এসে বললেন, মা, আপনি কাঁদছেন কেন?’ কিন্তু ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নে মিত্র পত্নী নিরুত্তর রইলেন। দয়াময় প্রভু পুনরায় তাঁর মনোকষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করলে, ‘মা আপনি কাঁদছেন কেন? একবার আমার নিকট বলুন’। তখন মিত্রজায়া বললেন, বাবা আপনাকে বললে আমার কী হবে, আর আপনি এই বাড়ীর ভিতর কি করে আসলেন, শীঘ্রই এই স্থান হতে চলে যান, কারণ আমার স্বামী আপনাকে যদি দেখতে পান বা জানতে পারেন তাহলে আপনাকে তিনি অপমান করতে পারেন। মিত্র পত্নীর নিকট এই কথা শুনে দয়াময় প্রভু পুনরায় বললেন, ‘আমি যাচ্ছি তার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না, কিন্তু আপনি কি জন্য কাঁদছিলেন আমাকে অবশ্যই একবার বলুন।’ এই কথা শুনে মিত্র পত্নী বললেন, ‘বাবা! আমার মনোকষ্টের কারণ আমি অপুত্রক হতভাগিনী। বহু দিন হতে মনে বড় একটা অভিলাষ ছিল পুত্র মুখ দর্শন করে প্রাণ জুড়াব, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে হলো না।’ এইরূপে নিজ মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণকে জানিয়ে পুনরায় তাকে সেই স্থান হতে প্রস্থান করতে বললেন। পরম দয়াল ঠাকুর তখন মিত্রপত্নীর প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য বললেন–‘মা, তোমার সন্তান হবে।’ এই কথা শুনে মিত্রপত্নী রোমাঞ্চিত হলেন। ঠাকুর আরও বললেন, “মা তোমার সন্তান হবে কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। তোমার পুত্রের নাম রাখবে ‘নৃসিংহবল্লভ’ এবং সেই পুত্রকে তোমাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত না করে শ্রীপাট কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত করাবে।’ এই কথা বলে প্রভু সেই স্থান হতে অন্তর্ধান হলেন। তারপর মিত্রপত্নী সেই দাসীকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত কারো নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করে স্নানান্তে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর তাঁর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেল। এতে বাড়ীর লোকের এবং প্রতিবেশীদের আনন্দের সীমা রইল না। বহুদিন যাবৎ মিত্র মহাশয় অপুত্রক আছেন, তাঁর বিপুল ধনসম্পদপূর্ণ সংসার এতদিন নিরানন্দের ছায়ায় আবৃত ছিল। এতদিন মনে যে কষ্ট আজ সেই কষ্ট দূর হবে জেনে অর্থাৎ তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে বলে তিনি আনন্দে আত্মহারা

হলেন। এইরূপ দশমাস অতিবাহিত হলো কিন্তু মিত্রজায়া একদিনও গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। এই দশমাস তাঁর কাছে দশদিন মনে হলো। দশমাস অতিবাহিত হবার পর শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে পুত্র ভূমিষ্ঠ হলো। ভূমিষ্ঠ হবার পর চতুর্দিকে আনন্দের রোল পড়ে গেল। মিত্রভবন নিকটবর্তী মাতৃমন্দির হতে উলুধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বেজে উঠল। তৎপরে বৃদ্ধা রমণীগণ দলে দলে মিত্রভবনে এসে সদ্য প্রসুত বালককে দেখে বলাবলি করতে লাগলো তাঁরা এমন সুন্দর পুত্র জীবনে দর্শন করেন নাই। এইরূপে শ্রীলোকগণ দলে দলে পুত্রমুখ দর্শন করে যাবার পর মিত্র মহাশয় তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত পুত্র মুখদর্শন করতে আসলেন এবং পুত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে যারপর নাই আনন্দিত হলেন। বালকের মুখকান্তি হতে কি যেন এক অপূর্ব জ্যোতি বের হচ্ছিল। সেই সদ্যোজাত শিশুকে যে দেখলো সেই বিমোহিত হলো। বালকের প্রতি অঙ্গে যে সমস্ত শুভ লক্ষণার্থ জড়িত ছিল সেই সমস্ত দর্শন করে সবাই একবাক্যে বলতে লাগল এই বালক ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ হবে। মিত্র মহাশয় পুত্র মুখ দর্শন করে ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখীদের প্রচুর অর্থ দান করলেন।

নবজাতক শিশু শশীকলার ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। বালকের বয়স যখন ষষ্ঠ মাস হলো, তখন মিত্র মহাশয় পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এক বিরাট আয়োজন করলেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেন। সেই মুহূর্তে সেই ব্রাহ্মণের কথা মাতার স্মরণ হওয়াতে পুত্রের নাম রাখলেন 'নৃসিংহবল্লভ।'

যখন নৃসিংহের বয়স ১৬/১৭ বৎসর তখন তাঁদের কুলগুরু নৃসিংহবল্লভকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য আসলেন। অতঃপর মিত্র মহাশয় পুত্রের দীক্ষার জন্য সমস্ত আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সময় নৃসিংহবল্লভ দীক্ষানুষ্ঠানের সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে তার মায়ের নিকট এসে বললেন, 'হা মা–তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি শ্রীপাট কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হবো। আমার গুরুদেব তো ইনি নন।' তখন পুত্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করে সেই ব্রাহ্মণবাণী মাতৃহৃদয়ে জেগে উঠল এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে স্বামীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। মিত্র মহাশয় স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করে নিজস্ব কুলগুরুর নিকট এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে সমস্ত কথা নিবেদন করলেন এবং তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন। কুলগুরু এতে সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন।

প্রভুর কি অপার মহিমা! ঠিক সেই দিনই শ্রীপাট কান্দরার মঙ্গল ঠাকুর রাজুর গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর গ্রামে এসেছেন শুনে নৃসিংহবল্লভ উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি হতে বের হয়ে ছুটে মঙ্গল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলেন, ঠাকুরকে দেখা মাত্র নৃসিংহের মনে এক অপূর্ব ভাবের উদ্দীপনা হলো। অশ্রুস্রোতে বক্ষঃস্থল সিক্ত হতে লাগল। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হতে লাগল এবং তিনি প্রেমে গদ গদ হয়ে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করলেন। তারপর ঠাকুরকে সাথে করে নিজ ভবনে নিয়ে আসলেন। পুত্রের সাথে মঙ্গল ঠাকুরকে দর্শন করে নৃসিংহের জনক জননীর আনন্দের সীমা রইল না। জননীর পূর্বস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে জেগে উঠল। তখন তিনি সর্বান্তকরণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। 'হে করুণার সিন্ধু, যে ব্রাহ্মণের কৃপায় পুত্রমুখ দর্শন করেছি, আজ সেই সহৃদয় ব্রাহ্মণের আদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারলাম এ আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।' 'হে প্রভু তোমার মহিমা কে বুঝতে পারে। তুমি সত্য, তুমি ইচ্ছাময়, তোমারই ইচ্ছায় যা হয় তা কেউ খণ্ডন করতে পারে না।' তখন আর

বেশী বিলম্ব না করে মাতা-পিতার আজ্ঞা নিয়ে নৃসিংহবল্লভ ঠাকুরের নিকট যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

দীক্ষিত হবার পর নৃসিংহবল্লভ কি এক অপূর্বভাবে বিভোর হলেন। সবসময় কেবল 'হা গৌর, হা গৌর' বলে নৃত্য করতে লাগলেন। বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই গৌরগত প্রাণ নৃসিংহবল্লভ সব সময় গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা। গৌর বিনা আর কিছু বোঝেন না বা জানেন না। এদিকে বিষয় বাসনায়ও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। সন্তানের এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ করে মাতাপিতার সদানন্দ ভবনে যেন নিরানন্দের ছায়া পতিত হলো। তাঁদের বিপুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র নৃসিংহবল্লভ। তিনিও বিষয় সম্পত্তির প্রতি একেবারে উদাসীন। এই সমস্ত চিন্তা করে মিত্র মহাশয় ও তাঁর পত্নী অতি মনোকষ্টে জীবন যাপন করতে লাগলেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর ক্রমে নৃসিংহের পিতা-মাতা উভয়েই পরলোকগমন করলেন। যদিও নৃসিংহবল্লভ সর্বদা উদাসীন থাকলেও মাতা-পিতার সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি করতে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। প্রচুর অর্থব্যয় করে যত্ন সহকারে পিতারমাতার সৎকার শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করলেন। বহুলোক ভোজন করালেন কিন্তু তারপরেই তিনি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করে গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে দিবানিশি 'গৌর গৌর' বলে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'ময়নাবনে' এসে উপস্থিত হলেন। এই ময়নাবনই পরে 'ময়নাডাল' নামে খ্যাত হয়।

অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পিতা—স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য, মাতা—শ্রীমতি অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, জন্ম তারিখ : ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪, জন্মস্থান : বরাহনগর, কোলকাতা।

শিল্পীর নাম : অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী : শ্রীমতি প্রেমলী ভট্টাচার্য্য ও একমাত্র কন্যা রয়েছে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম—রামকৃষ্ণ শিক্ষা আয়তন বরাহনগর, স্কটিস কলেজ কোলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০১৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন, বোলপুরে পৌষ মেলায় পালাকীর্তন 'বংশীশিক্ষা' আস্বাদনের পরে আমার হাতে আশীর্বাদ স্বরূপ বই উপহার দিচ্ছেন অধ্যাপক শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য।

চিত্র গ্রাহক : মেঘনাদ

আমরা চার ভাই, তিন বোন।

৪ বছর বয়স থেকে গান শুরু করেছি। ৫ বছর বয়স থেকে কীর্তন শেখা শুরু।

১৯৭৮ সালে বাবার কাছে কীর্তন শিক্ষার হাতেখড়ি ও বিভিন্ন স্থানে কীর্তন পরিবেশন করি।

৭ বছর বয়সে প্রথম কীর্তনের রেকর্ড পালা 'যবন হরিদাস'। ১৯৮৮ সাল থেকে নীলমণি দাস মহাশয়ের থেকে মনোহরশাহী কীর্তন শিক্ষা আরম্ভ, ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কীর্তনে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। ১৯৮৮-তে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও বৃন্দাবন বণিক (উভয়েই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে শ্রীখোল ও কীর্তনের অধ্যাপক) মহাশয়দ্বয়ের কাছে বিশেষভাবে কীর্তন শিক্ষালাভ আরম্ভ করি।

ধ্রুপদ শিক্ষা গ্রহণ করেছি শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ও শেখর রায় মহাশয়ের কাছে (বেতিয়া ঘরাণা)। খেয়াল শিক্ষা গ্রহণ করেছি বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় (ভীমসেন যোশীর সুযোগ্য ছাত্র), অজিত সেন ও প্রতীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (মুনাব্বর আলি খাঁ সাহেবের ছাত্র) ইত্যাদি বিদদ্ধজনের কাছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখেছি শ্রীসুবীর মাইতি মহাশয় (সুবিনয় রায়ের সুযোগ্য ছাত্র) ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২০০১ সালে থেকে ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীখোলের অধ্যাপক), শ্রীমনোরঞ্জন কংসবনিক ও শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন দে মহাশয়ের কাছে দুর্লভ কীর্তনের শিক্ষা আরম্ভ এখনও সরস্বতী দাস মহাশয়া ও অন্যান্য কীর্তন বিশেষজ্ঞদের কাছে কীর্তন শিক্ষার্থী। হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করে কীর্তন পরিবেশন করেছি দিল্লি, মুম্বাই, জব্বলপুর ইত্যাদি স্থানে। সংস্কৃত ভাষায় 'ব্যাকরণ রত্ন' উপাধিও লাভ করেছি।

রেডিওতে বহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। ডি ডি ন্যাশনাল, ডি ডি বাংলা, তারা মিউজিক, আকাশ আট, জি বাংলা, চ্যানেল টেন, কোলকাতা ডিভি, ইটিভি ইত্যাদি চ্যানেলের বহু অনুষ্ঠানে কীর্তন পরিবেশন করেছি। আশা অডিও, বিটোফেন, ব্লেজ, রাগিনী, আর. জি. সিরিজ ও নির্ঝরের স্বপ্ন থেকে প্রায় অর্ধশত কীর্তনের ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের সহস্রাধিক স্থানে কীর্তন ও অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, যাদবপুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার কীর্তন ও অন্যান্য সঙ্গীতের উপর সেমিনার করেছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে ২০১৬ সালে তিনদিন ব্যাপী কীর্তন শিক্ষা শিবিরে শিক্ষাদান করেছি। ঐ একই বছরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে 'সঙ্গীত সম্মান' লাভ করেছি। ২০১৭ সালের ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল আমাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছে।

আমার সেজ'দা শ্রী সৌমেন ভট্টাচার্য্য আমার দলের হারমনিয়াম এবং প্রধান দোঁহার, আমার জামাইবাবু দলের শ্রীখোল বাদক শ্রী শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, আমার মেজ'দা পণ্ডিত শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচর্য্যের আলাদা দল আছে। এছাড়া আমার মেয়েসহ দাদাদের ছেলে মেয়েরা নিয়মিত কীর্তনসহ অন্যান্য গান চর্চা করে।

গড়ানহাটী এবং মনোহরশাহী দুই ঘরানার গানই আমি করি।

ছোট সময় থেকে আসরে নিয়মিত গান করি। এর পাশাপাশি কীর্তনের স্কুল রয়েছে কোলকাতা বাড়ির পাশেই নিত্যানন্দ আশ্রমে এবং বোলপুরেও ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাচ্ছি।

আমার দলে ৭ জন সদস্য রয়েছে। প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন আমার সাথে সঙ্গত করছেন এবং সুদক্ষ।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সমাজে আমার অবস্থান ভালো। শুধু আমি ভালো করলেই হবে না। এই বিষয়টিকে আরো সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবে, শিখতে পারবে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাচ্ছি এবং বাইরে আমার কীর্তনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শিখছে।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন শিল্পীদের বর্তমান অবস্থান আগের থেকে ভালো। এখন সবাই শিখে পরিবেশনের চেষ্টা করছে। তবে সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়।

বেশিরভাগ কীর্তন শিল্পীর শিক্ষার অভাব আছে। সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে এই শিল্প নিয়ে চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি অনেক বড় একটি বিষয়, অবশ্যই শিল্পীদের অনেক বেশি পড়াশুনা এবং চর্চা করতে হবে। অর্থ আর মর্যাদার অপেক্ষা না করে চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছানো যাবে।

কীর্তন ও লোকনাট্যের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই যাত্রা, লোকনাট্যের শুরু। আমরাও অনেক সময় পরিবেশনার সময় দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী লোকনাট্যের আশ্রয় নিয়ে থাকি।

কীর্তন ও লোকনাট্যে নৃত্য, গীত ও অভিনয় এই তিনটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পীদের তিনটি বিষয়েই সমান পারদর্শি হতে হবে।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লোকনাট্যের কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব আনতে হবে। অর্থাৎ বিষয় ঠিক রেখে নতুনভাবে পরিবেশন করতে হবে। তাহলে দর্শক ও শ্রোতাদের একঘেয়েমি দূর হবে।

কীর্তনের সাথে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক তাণ্ডব নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই ধারাটি লোকনাট্যের মধ্যে আনলে ভালো হবে।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কীর্তন থাকা বাঞ্ছনীয় সরকারী। বেসরকারী উদ্যোগে কীর্তনের প্রচার হওয়া দরকার। পালাকীর্তনের আঙ্গিকে বিভিন্ন লোকনাট্যের পালা রচনা ও পরিবেশন করতে হবে।

কীর্তন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার আগ্রহ বাড়ছে। মঞ্চে পরিবেশনও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরণের উপায় হচ্ছে প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।

দিল্লি, বোম্বে, মথুরা, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা, হায়দারাবাদ, শিলচর, বাংলাদেশ, ত্রিপুরাসহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই নিয়মিত কীর্তন পরিবেশন করি। আমার একটি বই আছে। কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গ। এছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা। ২০১৬ সালে (বাংলা ১৪২৩ সাল, দোল পূর্ণিমা) সাহিত্য রং বেরং প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বইটি।

প্রাচীন যে গানগুলো আছে সংরক্ষণ, শিক্ষা, প্রচার প্রসার ঘটাতে চাই।

গানের পাশাপাশি আমি অধ্যাপনা করি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে। তাঁরা খুব আগ্রহ নিয়ে শিখছে।

কীর্তন শিল্পীদের রুচীশীল ভক্তি পথের সহায়ক এমন পোশাকই পরিধান করতে হবে।

বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম গ্রন্থ গীতগোবিন্দ, সেটা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে, চৈতন্য মহাপ্রভু রুক্সিনী চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন হরণ করেন। এই বিষয়গুলো থেকেই প্রমানিত হয় যে কীর্তনে বা পদাবলীতে শুরু থেকেই অভিনয় ছিল, এখনো আছে।

সরকারী প্রচার মাধ্যমে শাস্ত্রীয়, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের পাশাপাশি কীর্তনেরও প্রচার হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত স্বরবিতান রচনা করে যেমন ঘরে ঘরে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার হয়েছে,

তেমনি স্বরলিপিসহ কীর্তনও প্রচার করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সঠিকভাবে কীর্তনের প্রচার হওয়া উচিত। তাহলেই কীর্তন বা শুদ্ধ পদাবলী বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। লোকনাট্যের ধারাটি পালাকীর্তন থেকে আসলেও নিজস্ব একটি পরিবেশন শৈলী আছে। পালাকীর্তন আঙ্গিকের যেসব লোকনাট্য রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যদি কীর্তনের ব্যকরণগত দিকটি বেশি ব্যবহার করা যায়, তাহলে লোকনাট্য আরো আকর্ষণীয় হবে এবং মানুষের জানার ও শেখার আগ্রহ বাড়বে, সৃষ্টি হবে নতুন নতুন প্রেক্ষাপট।

কীর্তন শিল্পীর নাম : ড. কঙ্কণা মিত্র

মা-বাবার নাম : শ্রীমতি চন্দনা মিত্র, শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র

জন্মস্থান/জন্ম তারিখ : কোলকাতা, ০২/০৫/১৯৬৯

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : ৭/জেড/৫ পিকনিক গার্ডেন ফার্স্ট লেন, কোলকাতা-৩৯।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ., পিএইচ ডি

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তনের অধ্যাপিকা শ্রীমতি ড. কঙ্কণা মিত্রের
সাথে সাক্ষাৎকারের ফাঁকে তোলা আলোকচিত্র
স্থান : সংগীত ভবন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম : সেন্ট নিনিয়ান্স স্কুল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পারিবারিক জীবনে স্বামী ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

কীর্তন শেখা শুরু ১৮ বছর বয়স থেকে। গানের হাতে খড়ি ৫ বছর বয়স থেকে। আমার পরিবারে পূর্ববর্তী প্রজন্মে গান বাজনার চল ছিল কিন্তু কীর্তন আমিই প্রথম চর্চা শুরু করি।

আমি কীর্তন শিখেছি শ্রী বংশীধারী চক্রবর্তী, শ্রী বৃন্দাবন বণিক, শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমতি সরস্বতী দাস ও শ্রী নিমাই মিত্রের কাছে। পদাবলী ও পালাকীর্তন করি।

বেশি সাচ্ছন্দবোধ করি মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তন করে।

পাঁচ বছর বয়স থেকে সংগীতের হাতে খড়ি। কীর্তন শুনে ভালো লেগেছিল প্রথম গুরু শ্রী বংশীধারী চক্রবর্তীর কণ্ঠে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই থেকে তাঁর কাছে শেখা শুরু। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কীর্তন বিষয়ের শিক্ষকতা শুরু ও অনেক ছাত্র ছাত্রীকে কীর্তন গানে উদ্বুদ্ধ করি। এই কাজ এখনো চলছে। নতুন একটি পদাবলী কীর্তনের দল খুলেছি 'দোহারকি' নামে। Youtube-এ এই দলের কাজ শীঘ্রই প্রচারিত হবে।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসাবে আমি চেষ্টা করি কীর্তনের আভিজাত্য বজায় রেখে শিক্ষা দিতে ও পরিবেশন করতে। কীর্তন নিয়ে গবেষণায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে। আমি নিজে UGC-এর MRP করতে সক্ষম হয়েছি, যার শিরোনাম ছিল–The Origin Development and the Present Sceherio of Pala Kirton.

ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছরই তৈরি করছি। পূর্বের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীদের কীর্তনের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়েছে।

আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তন বিষয়ের শিক্ষক, তাই শিল্পী হিসাবে আমি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ভালো স্থানে অবস্থান করি কিন্তু অন্যান্য কীর্তন শিল্পীদের এই বিষয়গুলোতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা আছে।

মফঃস্বল ও গ্রামের দিকে এখনো অনেক কীর্তনের আসর আয়োজিত হয়। কিন্তু কীর্তন শিল্পীদের প্রাপ্য অর্থ সেখানে খুবই কম। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এছাড়াও অন্যান্য সংগীত শিল্পীদের তুলনায় তাঁদের সামাজিক অবস্থানও যথেষ্ট সম্মানজনক নয়।

বিশেষ কয়েকজন ছাড়া বাকিরা খুবই অর্থ কষ্টে ভোগেন।

বেশিরভাগ কীর্তন শিল্পীর শিক্ষার অভাব আছে। অনেক কীর্তন শিল্পী প্রথাগত শিক্ষা না করেই পরিবেশন করতে আগ্রহী হন এবং করেও থাকেন।

কীর্তন শুধু পরিবেশনার বিষয় নয়, এর মধ্যে যে গভীর দর্শন আছে সেটি নিয়মিত ও দীর্ঘ চর্চা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক কীর্তন শিল্পীকেই পরিবেশনার সাথে সাথে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে।

শিল্পীদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা একেবারেই দেওয়া হয় না।

কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রাচীন ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুল প্রচলিত 'নাটগীতি' আসলে একই ধরনের লোকনাট্যের রূপ। পালাকীর্তনের অনেক শৈলী সেখান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকনাট্যে পালাকীর্তনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

'পালা' মানেই 'নাটক'। সুতরাং অভিনয়হীন নাটক তো হতে পারে না–তাই পালাকীর্তনে অভিনয় অবশ্য করণীয়। তার সঙ্গে সামান্য নৃত্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোনোটাই অতিরিক্ত প্রদর্শন করা উচিত নয়–কারণ এতে পদাবলীর ভাব ও সুর মার খেতে পারে।

লোকনাট্যের নিজস্ব একটি পরিবেশন শৈলী আছে, সেখানে কীর্তনের ব্যাকরণগত দিকটি বেশি ব্যবহার না করে ভাব ও নাট্য উপাদানটিকে যথাযথ প্রয়োগ করলে লোকনাট্য আরো আকর্ষণীয় হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে বর্তমানে আসরে যে ধরনের নৃত্য পালাকীর্তনগুলোতে প্রদর্শিত হয় সেগুলো বিশেষ কোনো নৃত্যশৈলী নয়। কীর্তনে কোনো শাস্ত্রীয় নৃত্যও পরিবেশন করা যাবে না, তবে মাঝে মাঝে 'উদ্দণ্ড নৃত্য' বা তাণ্ডব নৃত্য পালার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

'কীর্তন' চর্চা কিছুদিন পূর্বেও প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। কিন্তু এখন মানুষের কীর্তন সম্পর্কে খুব আগ্রহ দেখা দিয়েছে, ফলে কীর্তন শিক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটছে।

'কীর্তন' কোনো দিন বিলুপ্ত হতে পারে না। কারণ কীর্তন কালজয়ী। যখন যেমনভাবে মানুষের রুচি বদলেছে কীর্তন পরিবেশনায় সেইভাবে পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং পরিবর্তনশীল জগতে যে সংগীত নিজেকে কাল অনুযায়ী স্থাপন করতে পারে সেই সংগীত কোনোদিন বিলুপ্ত হয় না।

উত্তরণের উপায় হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে কীর্তন গান ও দর্শন সম্পর্কে অনেক উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আমি বাংলাদেশের বহু জেলায়, বাংলাদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারত বর্ষের বহু জেলায় সংগীত পরিবেশন করেছি। ব্যাপক সাড়া এবং সম্মান পেয়েছি।

আমার লিখা কীর্তনের বই 'The Pleasure of Rasa Kirton.' প্রকাশকাল ২০১৫ সাল, আমার বইটি কীর্তন শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারে এসেছে বলে মনে করি।

কীর্তন নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রচুর প্রাচীন কীর্তন, যা গুরুদের কাছে শেখা, সেগুলির যথাযথ Preservation I Documentation করা।

গানের পাশাপাশি আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত ভবনে কীর্তন বিভাগে অধ্যাপনা করছি।

বর্তমান সময়ে আসরের কীর্তন শিল্পীদের অনেক পরিমার্জিত হওয়া উচিত–কারণ মনে রাখতে হবে সমাজ পূর্বের থেকে অনেক বেশি রুচিশীল হয়েছে। তাদের রুচির সঙ্গে মেলে না এমন পোশাক পরিধান করা একেবারেই উচিত নয় বলে আমি মনে করি।

কীর্তন অবশ্যই এক ধরনের অভিনয়। কারণ প্রতিটি পদ এক একটি পালার অন্তর্গত, আর প্রতিটি পালার নিজস্ব প্রেক্ষিত আছে। সেই প্রেক্ষিতগুলো ফুটিয়ে তুলতে গেলে অভিনয় অবশ্যই জরুরি। কিন্তু সেই অভিনয়-এর বেশির ভাগটাই হবে Voice Modulation-এর মাধ্যমে– অঙ্গভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে নয়।

উত্তরণের পথ হচ্ছে কীর্তনের নিগূঢ় দর্শনকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যুক্ত করা, অনেক বেশি গবেষণা কার্য করা, সরকার থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিষয়টির উপর Scholarship প্রদান, প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে কীর্তন পরিবেশনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

কীর্তন শিল্পীর নাম : সাহানা ভট্টাচার্য।

মা-বাবার নাম : স্বর্গীয় বাণীকুমার মজুমদার, মুকুলা মুজুমদার।

জন্মস্থান/জন্ম তারিখ : আসানসোল, ২রা জুলাই, ১৯৬২

কোলকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতি সাহানা ভট্টাচার্য্য

স্বামীর নাম : শ্রী সম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : কোলকাতা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কীর্তন বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স সম্পূর্ণ করেছি। স্কুল ও কলেজ : শিবপুর ভবানী বিদ্যালয়, হাওড়া এবং দিনবন্ধু কলেজ, হাওড়া।

মা, স্বামী, ছেলে নিয়ে আমার পরিবার।

ছোট সময় থেকে রাধারানীর গান শুনতাম। রবীন্দ্রভারতীতে পড়তে এসে কীর্তন শেখা শুরু। স্বর্গীয়া গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় বংশীধারী চক্রবর্তী, বৃন্দাবন বণিকের কাছে শিখেছি।

এখন প্রকৃত কীর্তন হচ্ছে না, মূল ভাবভঙ্গি হচ্ছে না। বিলুপ্তি হচ্ছে না তবে বিকৃত হচ্ছে।

বাড়িতে গানের চর্চা হতো তবে শুরু করেছি মাধ্যমিকে। সংগীতে প্রভাকর কোর্স করেছি। এর পরে রবীন্দ্রভারতীতে পাড়াশোনা করেছি।

মা-বাবা খুব ভালো গান করতেন। কমলা ঝড়িয়া, কৃষ্ণ চন্দ্র দে, বৃন্দাবন বনিকের গান শুনে বড় হয়েছি।

রাধারানী ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানও শুনতাম।

মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তন করতে খুব পছন্দ করি।

অনার্স প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয়, এমএ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছি। এটিই মনে হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। আমি উড়িষ্যার জলেশ্বর মহৎসবে, মেদিনীপুরের অলংকার দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি থেকে বিশেষভাবে কীর্তন শিল্পী হিসেবে সম্মানিত হয়েছি।

সাত সদস্য বিশিষ্ট দল আছে, দক্ষ যন্ত্র শিল্পীরা আমার সাথে সঙ্গত করেন।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সমাজে অবস্থান অন্যান্য শিল্পীদের মতোই, আলাদা কিছু নয়। তবে শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত বলে একটু সম্মান বেশি পাই।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীদের কীর্তনের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়েছে।

কীর্তন শিল্পী হিসেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে সব জায়গায় সমানভাবে মর্যাদা দেওয়া হয় না, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সব কীর্তন শিল্পীরই রয়েছে, কিছু সংখ্যক কীর্তন শিল্পীরা ছাড়া। রবীন্দ্র ভারতীর একজন শিক্ষক হিসাবে আমি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ভালো আছি।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন শিল্পীদের বর্তমান অবস্থান কিছু সংখ্যক শিল্পী বাদে কারো অবস্থাই ভালো নয়। গ্রামের দিকে এখনো অনেক কীর্তনের আসর আয়োজিত হয়। কিন্তু প্রাপ্য সম্মানী দেওয়া হয় না। যার কারণে তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা লেগেই থাকে।

বেশিরভাগ কীর্তন শিল্পীর শিক্ষার অভাব আছে। তাদের এই বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করতে হবে। অনেকে প্রথাগত শিক্ষা না নিয়েই তারা পরিবেশন করেন। যার কারণে ভালো মানের

কীর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। শুধু পরিবেশন করলেই হবে না। এর মধ্যে যে গভীর দর্শন আছে সেটি চর্চা করেই ভক্তদের বোঝাতে হবে।

কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন ভারত ও তার পাশের অঞ্চলের 'নাটগীত' এক ধরনের লোকনাট্যের রূপ। পালাকীর্তনের অনেক শৈলী সেখান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকনাট্যে পালাকীর্তনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

পালাকীর্তনের অনেক শৈলী লোকনাট্য গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণযাত্রা, মণিপুরী নৃত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোকনাট্যে পালাকীর্তনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

লোকনাট্যের নিজস্ব একটি ঢং আছে। সেখানে কীর্তনের নাট্য উপাদানকে যথাযথ প্রয়োগ করলে লোকনাট্য আরো সমৃদ্ধ হবে।

কীর্তনে মণিপুরী এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়। পুরুষ শিল্পীরা পালার প্রয়োজনে 'তাণ্ডব' নৃত্য করে থাকেন।

এখন মানুষের কীর্তনের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ফলে কীর্তন শিক্ষা, চর্চা এবং শোনার দিকে মানুষের ঝোক বেশি।

কীর্তন কালজয়ী। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী কীর্তন পরিবেশনায় পরিবর্তন এসেছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান প্রজন্ম কীর্তন গান শুনতে ও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশের বহু জেলায়, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতবর্ষের প্রায় সব জেলায়ই কীর্তন পরিবেশন করেছি।

আমি কীর্তনের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছি। মূল উদ্দেশ্যই কীর্তনকে কিভাবে আরো সমৃদ্ধ করা যায়।

আমি যেগুলো গুরুদেবের কাছে শিখেছি সেগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে শিখিয়ে যেতে চাই। আমি মণিপুরী নৃত্য করি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তনের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আছি। সেখানের দায়বদ্ধতা একটু বেশি বলেই মনে করি।

শিল্পীর মার্জিত এবং রুচিশীল পোশাক পরিধান করতে হবে।

নৃত্য, গীত ও নাট্যের সমন্বয়েই পালাকীর্তন। এখানে গীত বা গানটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

কীর্তনকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যুক্ত করতে হবে, বেশি বেশি গবেষণা করতে হবে। সরকার থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিষয়টির উপর বৃত্তি প্রদান, প্রতিটি সরকারী অনুষ্ঠানে কীর্তন পরিবেশনার ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

কীর্তন শিল্পীর নাম : শ্রী দুলাল চক্রবর্তী

মা-বাবার নাম : পিতা : মৃত বঙ্গিম চক্রবর্তী, মাতা : পারুল চক্রবর্তী

জন্মস্থান/জন্ম তারিখ : পাকুল্যা, টাঙ্গাইল। ২৪ আগস্ট, ১৯৬৫

স্ত্রীর নাম : ঝর্না চক্রবর্তী

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পাকুল্যা, ডাকঘর : জাসুর্কী, উপজেলা : মির্জাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ ব্যাকরণ তীর্থ, কাব্যতীর্থ স্মৃতিতীর্থ, পৌরহিত্য, পদাবলী কীর্ত্তনীয়া ও ভাগবত আচার্য্য।

কীর্তনীয়া শ্রী দুলাল চক্রবর্তী মহাশয় সাক্ষাৎকার শেষে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।
চিত্র গ্রহাক : উর্বী

বিদ্যালয় : জাসূর্কী এনএসএজি উচ্চ বিদ্যালয়,

কলেজ : সরকারী সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।

স্বামী, স্ত্রী, মা, দুই পুত্র সন্তান, পুত্রবধূ ও একমাত্র নাতী নিয়ে আমার পরিবার।

৪০ বছর ধরে কীর্তন করছি।

গানের হাতে খড়ি ১৮ বছর বয়স থেকে। অভিরাম মন্ডল, জগদীশ চন্দ্র পাল, ধীরেন্দ্র নাথ সাহা ও অন্যান্যদের কাছে কীর্তন শিখেছি। মনোহরশাহী এবং অন্যান্য মিশ্রণের কীর্তন করতে পছন্দ করি।

ছোটবেলা থেকে এই দিকে ঝোক ছিল। পাশের গ্রামে এক ভাগবতীয় আসরে কীর্তন করেছিলাম, সেখান থেকে প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক অভিরাম মন্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়, তাঁর প্রেরণায় ও সহচর্যে কীর্তনে আসা। তখন থেকেই নিয়মিত কীর্তন করি।

আমার দলে আছে দুইজন মৃদঙ্গ বাদক, দুইজন করতাল বাদক, একজন বেহালা বাদক ও একজন হারমোনিয়ম বাদক।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সমাজে আমার অবস্থান ভালো এবং সমাজে, দেশ-বিদেশে প্রসংশিত। কীর্তনের ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে নিয়মিত তারা কীর্তন করছে।

পরিস্থিতি সার্বিক অনুকুলে থাকলে কীর্তন শিল্পীদের কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়না।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন শিল্পীদের বর্তমান অবস্থান ভালো নয়। কীর্তন শিল্পীরা কষ্টেই দিন কাটায়। কারণ, উপার্জিত অর্থ খুবই সীমিত । অনেকেই কষ্টে জীবনযাপন করে। কারণ তাদের সুনাম আছে অর্থ নাই। শিক্ষার অভাব আছে। গুরুর নৈকট্য লাভ করে না এবং তাদের গুরুর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার ইচ্ছা খুবই নগণ্য। অবশ্যই কীর্তন বিষয় নিয়ে তাদের বেশি বেশি পড়াশোনা করা উচিৎ এবং গুরু ঘরানা আয়ত্ব করা উচিৎ। সংগীত গুরুমুখি বিদ্যা এবং এই বিষয়ে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে।

শিল্পীদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা খুবই কম দেওয়া হয়। যেমন–'গানের শেষে শূণ্যবীণা পড়ে থাকে একলা'। কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের সুনিবিড় সম্পর্ক অবশ্যই আছে। কীর্তনীয়া বিভিন্ন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদের ভাবধারায় বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ করে অভিনয়ের মাধ্যমে।

আজানুলম্বিত বাহু উত্তোলন করে কীর্তনের ঢংয়ে সুর, তাল, লয় এর মাধ্যমে নৃত্য করা হয়ে থাকে। তাণ্ডব নৃত্যও করে থাকেন বিভিন্ন কীর্তনীয়া।

চর্চা অবশ্যই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে করা উচিত। আদিশ্রোত ধারা অনেকাংশেই বিলুপ্তির পথে। আমরা চেষ্টা করছি মূল কীর্তনকে ধরে রাখার।

গোড়ীয় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রভুজগদ্বন্ধু আশ্রম ও বিভিন্ন মন্দির ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কীর্তন পরিবেশন করেছি।

যদি কেউ অনুপ্রেরণায় প্রেরিত হয়ে আমার কাছে আসে তাকে শিক্ষাদান করা ও পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে ধারনা দিতে সদা প্রস্তুত। গীতা, ভাগবত আলোচনা ও ধর্মীয় আলোচনায় সবসময় ব্যস্ত থাকি।

শালীনতা বজায় রেখে ধর্মীয় রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করে কীর্তন করা কর্তব্য যেহেতু ধর্মীয় ভাবধারা অনেকাংশেই নির্ভর করে এই বিষয়গুলোর উপরে।

লীলাকীর্তন অবশ্যই এক ধরনের অভিনয়। ঘটনা প্রবাহকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে তোলা হয় অভিনয়ের মাধ্যমে।

১. নিত্য নৈমত্তিক শিক্ষাদান, ২. সঠিক গুরুর সাহচর্যে আসা ৩. ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখা ৪. আধ্যাত্ম চেতনা উপলব্ধি ৫. অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ভাবা ৬. প্রেম-ভক্তির প্রকাশ ঘটানো ৭. ধর্মীয় গোড়ামীর প্রকাশ নয়, মূল বিষয় প্রকাশ করা ৮. কীর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ভালোবাসা ৯. আদি-অনাদিকে হৃদয়স্থ করা ১০. সংগঠিত করা ও সংরক্ষিত করা। এইসব পথ অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে চললেই কীর্তন গানকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

কীর্তন শিল্পীর নাম : শ্রী অমল কুমার ব্যানার্জী

মা-বাবার নাম : বাবা : অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী, মাতা : আশালতা ব্যানার্জী

জন্মস্থান/জন্ম তারিখ : ফরিদপুর, ৩০/১১/১৯৬৬।

স্ত্রীর নাম : কৃষ্ণা রানী ব্যানার্জী

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমি ও কীর্তনীয়া শ্রী অমল কুমার ব্যানার্জী তাঁর কর্মস্থলে
তারিখ : ১৭ জুলাই, ২০২০

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : ভাগ্যকুল হরেন্দ্রলাল স্কুল এন্ড কলেজ, ভাগ্যকুল, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, ১৯ নং রাজার দেউরি, ঢাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ বি.এড. কাব্যতীর্থ

স্কুল ও কলেজ চর হাজীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর।

পারিবারিক জীবনের তিন ভাই এক বোন। আমি সবার ছোট। বাবা মৃত। মা, স্ত্রী এবং দুই ছেলে নিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছি।

আমার বয়স যখন পনেরো, তখন থেকে কীর্তন শেখা শুরু।

১৩ বছর বয়স থেকে গানের হতে খড়ি। আমার দিদি সুষুমা ব্যানার্জী গান করেন।

আমার কীর্তনের গুরু স্বর্গীয় নিত্যানন্দ রায়, ফরিদপুর।

বৈষ্ণব পদাবলী– গৌর গোবিন্দের লীলাকীর্তন করি।

আমার কীর্তন ঘরানা মনোহরশাহী। তবে বর্তমানে মিশ্রভাবে কীর্তন করতে পছন্দ করি।

জাতীয়ভাবে পুরস্কার পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধী স্বর্ণপদক এবং মাদার তেরেসা স্বর্ণপদক, মাপসাস– বাংলাদেশ পুরস্কার পেয়েছি।

ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার কীর্তনের গুরু নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে নাম কীর্তন ও লীলাকীর্তন করতাম। পরবর্তীকালে নিজেই দল করে কীর্তন করি।

আমার কীর্তনের দলে আমিসহ মোট আটজন সদস্য। দুইজন মৃদঙ্গ বাদক, একজন হারমোনিয়াম বাদক, একজন কী-বোর্ড বাদক এবং করতাল বাদকসহ তিনজন দোঁহার নিয়ে আমার দল।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সামাজিকভাবে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছি। সকলের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

নিয়মিত কীর্তন শেখাই। ৬ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী বর্তমানে কীর্তন করছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। লীলাকীর্তন শিল্পীদের বর্তমান অবস্থান আগের তুলনায় অনেক ভালো। সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরো ভালো হতো।

চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু শিল্পী স্বচ্ছল আবার কিছু অস্বচ্ছল।

বেশীর ভাগ শিল্পীর শিক্ষার অভাব রয়েছে। কীর্তন বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি গুরুর সঙ্গে থেকে সুর, তাল, ভাব ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে।

বর্তমান সময়ে শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা মোটামুটি ভালো বলে আমি মনে করি।

কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। কীর্তন মানুষের হৃদয়ের ভাব জাগ্রত করে। লোকনাট্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। কীর্তনে এক ব্যক্তি বিভিন্ন চরিত্রে, যেমন কখনো রাধা ভাবে, কখনো কৃষ্ণ ভাবে, কখনো গৌর ভাব নিয়ে কীর্তন করে।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনে নৃত্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নৃত্য করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও নৃত্য করেছেন। রাসে নৃত্য আছে।

কীর্তনে ভক্তি রসের পুরোভাবটি যেমন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের এমনকি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রেম ভক্তি রসের সৃষ্টি হয়, লোকনাট্যেও যদি এই প্রেমময় ভাবটি

প্রকাশ পায় সেটি আরো মধুর হবে এবং পৃথিবীতে মানুষে মানুষে মধুর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠবে।

গৌরীয় বৈষ্ণব ধারায় নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য, কথ্যক নৃত্য, ধামাল নৃত্য, লোক নৃত্য (গৌরীয় ভাব সমৃদ্ধ) ইত্যাদি নৃত্য লীলা কীর্তনে ব্যবহৃত হয়।

কীর্তনের চর্চা জরুরি, এর জন্য কীর্তন শিক্ষালয় প্রয়োজন। সরকারীভাবে উদ্যোগ নিলে ভালো হবে। বাংলাদেশ, ভারতের জানাশোনা কীর্তনীয়াদের দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে ভালো হবে।

কীর্তনের শুদ্ধ চর্চা ও অনুশীলন না থাকলে কীর্তন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সঠিক অনুশীলনের অভাবে বর্তমান কীর্তন কিছুটা হলেও ম্লান মনে হচ্ছে। কীর্তন গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর আনুগত্য নিয়ে কীর্তন শিখতে হয়। বর্তমান যারা কীর্তন করছে তাঁদের গুরুর প্রতি আনুগত্য নেই। এভাবে চলতে থাকলে কীর্তন শিল্পের বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে।

সঠিকভাবে কীর্তনের চর্চা, দেশ, বিদেশ থেকে ভালো কীর্তনীয়াদের এনে কীর্তন শেখানো, সরকারীভাবে কীর্তন শেখানোর ব্যবস্থা করা, কীর্তন প্রশিক্ষণালয় তৈরি করা, কীর্তন নিয়ে গবেষণা করা ইত্যাদি উত্তরণের উপায়।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কীর্তন করেছি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন করেছি।

আমার ইচ্ছা আমি যতগুলো কীর্তন পালা জানি তা একটি বই আকারে প্রকাশ করবো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি কীর্তন প্রশিক্ষণালয় গড়ে তুলবো।

আমি একজন স্কুল শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি গান করি।

কীর্তন শিল্পীদের মার্জিত পোষাক পরিধান করা উচিত। ধুতি, উত্তরীয়, চাঁদর, পাঞ্জাবি; মালা, তিলক, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহারেরই রীতি।

কীর্তনকে রসগ্রাহী, ভক্তদের হৃদয়গ্রাহী করতে মাঝে মধ্যে নাটকীয়তা বা অভিনয় এসে পড়ে।

কীর্তনের সঠিক চর্চা অনুশীলন, কীর্তন শিক্ষালয় গঠন করা, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, গুরুর আনুগত্যে থেকে কীর্তন শেখা, কীর্তনীয়াকে ভজনশীল হওয়া, যে সমস্ত গানের বই আছে সেখানে কীর্তনকে সংযোজন করা, তাহলেই আস্তে আস্তে কীর্তনের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।

কীর্তন শিল্পীর নাম : কৃষ্ণকীর্ত্তন দাস ব্রহ্মচারী (কালীপদ মণ্ডল)

মা-বাবার নাম : বলরাম মণ্ডল ও কুশুম কুমারী মণ্ডল

গ্রাম : ধোপাপাড়া, থানা : বোয়ালমারী, জেলা : ফরিদপুর, জন্ম তারিখ : ১লা এপ্রিল, ১৯৫৩ সাল।

ঢাকা ইসকন মন্দিরে সাক্ষাৎকারের ফাঁকে কীর্তনীয়া কৃষ্ণকীর্তন দাস ব্রহ্মচারীর সাথে এই চিত্রটি ধারণ করেছেন অনন্ত প্রভু
তারিখ : ১৬.১২.২০১৮

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : স্বামীবাগ আশ্রম, ইসকন, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বশিক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছি।

ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগ–পরবর্তীকালে মা ও ভাতৃ বিয়োগ। বেদনা বিধুর জীবন। লেখাপড়া ছেড়ে ১৯৭৮ সালে ইসকনে যোগদান ও প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। আমি বিবাহিত।

কীর্তন শেখা শুরু করি স্কুল জীবন থেকে বিভিন্ন হরিসভায়। কাকাদের কাছে এবং কলেজ জীবনে সংগীত শিল্পীদের সাহচর্যে কীর্তন শিখতাম।

গানের হাতে খড়ি ১২-১৩ বছর থেকে।

আমার পরিবারে কাকারা, জেঠতুত ভাই, ঠাকুর দাদা ও মা গান করতেন।

প্রথম কীর্তন গুরু অমূল্য রতন গোস্বামী, প্রখ্যাত যামিনী বাটুর্য্যে, তিনি হরিদাসের শিষ্যদের শিষ্য ছিলেন। প্রখ্যাত কীর্তন শিল্পী গীতসুধা ও কীর্তন সম্রাজ্ঞী সরস্বতী দাসের কৃপাধন্য।

রাগতাল সমন্বিত বিশুদ্ধ মার্জিত-রূপের কীর্তন করতে পছন্দ করি। গড়ানহাটী ঘরানার সাথে রাঢ়ী মিশ্রিত বেশি করি।

‘কীর্তন রসসিন্ধু’ সরস্বতী দাস কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছি। বহুদেশে কীর্তন গেয়ে সুনাম ও সম্মাননা পেয়েছি।

সঙ্গীত আমার প্রাণ আবার ভজনও বটে। সবসময় কীর্তনই সার ভেবেছি। কীর্তন ভজন এবং কীর্তনই সাধনা, কীর্তন নিয়ে বেঁচে আছি এবং থাকতে চাই।

আমার দল মূলত প্রচার দল। দলে অনেক প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ শ্রীখোল, করতাল, বেহালা, সরোদ, দোতারা বাদক ও গায়ক আছে।

একজন কীর্তন শিল্পী হিসেবে সমাজে আমার অবস্থান অত্যন্ত আকর্ষনীয় মুগ্ধকর বটে। কারো কাছে যাইনা, সম্মান চাইনা। তবে না চাইলেও প্রভু অনেক দিয়েছেন। কৃষ্ণ কথা আলোচনা ও রাধাকৃষ্ণ গুণগান যেন করে যেতে পারি শেষ দিন পর্যন্ত।

কীর্তনের ছাত্র-ছাত্রী অবশ্যই অনেকে তৈরি হয়েছে। এখনো হচ্ছে। কয়েকজন অষ্টকালীন ষোলকালীন গায়। বেতার টিভিতেও গায়। সুরেলা তাল যুক্ত গান গায়।

কীর্তন শিল্পী হিসেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমার কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নাই। ইসকনে আছি। সামাজিক অবস্থানের কথা ভাবিনা। শ্রী ভগবান চরণে রাখলেই হলো। নিজের কিছু নাই। ভগবানের মন্দিরে থাকি। কোনো চাওয়া পাওয়া নাই। প্রেম ভক্তিই একমাত্র চাওয়া পাওয়া।

যারা উচ্চাঙ্গ কীর্তন করেন তাদের বোদ্ধা শ্রোতা কম। অবশ্যই তারা সম্মানের। অশিক্ষা কুশিক্ষা ও আধুনিকতার প্রভাবে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে হয়।

আর্থিকভাবে কেউ কেউ স্বচ্ছল তবে সকলে না। বস্তু উত্তম, ব্যবসা জঘন্য। উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে অনেকে অবহেলিত। নিম্নমানের শিল্পীদের প্রভাব বেশি। শুধু লেখাপড়া নয় এ বিষয়টা প্রেম ভক্তি গ্রাহ্য, প্রভু যাকে কৃপা করেন। কীর্তন করতে হলে এই বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হবে।

তবে গুরু পরম্পরা ধারায় শিখলে অনেক দুরুহ দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজবোধ্য হয়। লেখাপড়ার মান যদি ভালো হয় তাহলে বিষয়টি সহজ হবে।

শিল্পীদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই হয়। কীর্তনীয়া ভাগবত বক্তা। পরম ভাগবত তবে সেই সাথে আচরণশীল হলে উত্তম। যে যেমন ব্যক্তি শিল্পী তার মর্যাদা তেমন।

কীর্তনের সাথে লোকনাট্যের সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। নাট সম্পর্কিত কীর্তন। কয়েকটি অঙ্গ কীর্তনের। নাটকীয়তা তার একটি। অভিনয় এটি বুঝতে সাহায্য করে, রসপুষ্ট হয়। অঙ্গভঙ্গিরও তো ভাষা আছে। তাই কীর্তন লোকনাট্য নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনে অভিনয় ও নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মৃদু বঙ্গীয় নৃত্য বিশেষ করে নিতাই গৌরের সে মধুময় নৃত্য সেটা মাধুর্য পূর্ণ। তবে আধুনিক বা বোম্বে অথবা পাশ্চাত্যের নৃত্য নয়।

কীর্তন রাধা কৃষ্ণের গুণগান সমন্বিত। লোকনাট্যের সাথে যদি কীর্তনের মিশ্রণ ঘটে সেটা মুগ্ধময় লোকগ্রাহ্য। পালাকীর্তন ভেঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা হচ্ছে, অষ্টক গান হচ্ছে। সবাই গ্রহণ করছে।

এখনতো কীর্তন ব্যান্ডের মতো গাওয়া হচ্ছে। আগে বঙ্গীয় গৌড়ীয় ধারারই নৃত্য ছিল; মহাপ্রভুর মত নেচেছেন কীর্তনীয়ারা।

কীর্তনের অবস্থা হতাশাজনক। চর্চা বলতে অতি অল্প। চর্চিত কণ্ঠানুশীল নেই। কোনমতে পালা গেয়েই অর্থানুসন্ধান। তবে প্রকৃত ভাল কীর্তনীয়ার আদর সর্বত্র। সুমনের (অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য) মতো তৈরি শিল্পী কমই আছে।

অনেকাংশে গরানহাটী ঘরানায় ঠাকুর মহাশয়ের আনুকুল্যে ১০৮টি তালের ব্যবহার ছিল। কীর্তনতো তাল লয়ের সঙ্গীত। হালকা বিষয় নয়। সকল দিকে জ্ঞান থাকতে হয়। প্রভুর ও গুরুদেবের কৃপা থাকতে হয়। কীর্তন বিলুপ্ত হবার নয়। সুমন ভট্টাচার্য্য আরো দরকার। শিক্ষকেরও মন থাকতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করার জন্য।

কাব্য সাহিত্যে, অভিনয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অনেক প্রশিক্ষক দরকার। যথার্থ মর্যাদা ও অর্থের যোগান, লুপ্তপ্রায় সম্পদের উদ্ধার এবং আধুনিক সমাজে ভক্তিবাদ প্রচার এবং আধুনিক প্রচার মাধ্যমে তা প্রচার করে আদরণীয় করে তোলা। তাহলেই উত্তরণ ঘটবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে কীর্তন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কীর্তন শুনিয়েছি এবং জনাব তোফায়েল আহম্মদও শুনেছিলেন। এছাড়া আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, আফ্রিকা, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাহ্‌রাইন, মালয়েশিয়া, শিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে কীর্তন করেছি।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের জন্য গাই। আরো শিল্পী তৈরি করা ও শুদ্ধ কীর্তনে প্রশিক্ষণ দেওয়াই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

ভাগবত বক্তৃতা করি, ধর্মসভা করি, পাশাপাশি নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বিজয় গীতি করি। অতুল প্রসাদ, রজনীকান্তের গানও করি।

পালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যে পোষাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মর্যাদা রক্ষা হয় এমন বঙ্গীয় ভক্তি উদ্দীপ্ত পোষাক পরা উচিৎ।

শুধু অভিনয়ে কীর্তন রসপুষ্ট হয় না। আরো অনেক অনুসঙ্গ প্রয়োজনীয়।

কীর্তনের শ্রোতা তৈরি করা। কীর্তন শিল্পীকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাল, সুর, লয়ে, রাগে প্রশিক্ষণ দেওয়া, কণ্ঠে সজীবতা বিশেষ করে চর্চিত কণ্ঠ, সুরেলা সুমিষ্ট কণ্ঠ হলে আকর্ষণ

বাড়ে। Online–face book-এ, youtube-এ ও টিভি চ্যানেলে কীর্তনের প্রচার বাড়াতে হবে। একমাত্র পদকীর্তনের পদ গাওয়া উচিত। কীর্তনে পদের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলামসহ, আধুনিক কবিদের গান প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে গাওয়া যেতে পারে। তবে রসভঙ্গ যেন না হয়, রসান্তর না ঘটে। তাহলেই কীর্তনের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আরো বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার

লোকনাট্য ও কীর্তনকে উৎসব কেন্দ্রিক না করে যুগ ও জনরুচির প্রতি নমনীয় হয়ে চর্চা ও পরিবেশন বৃদ্ধি করলে বাংলার মাটি থেকে গৃহীত মূল কীর্তনের সুর বা বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা কখনই বিস্তৃত হবে না। বাংলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা অব্যাহত রাখতে হলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির জটিলতা দূর করে পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন ও লোকনাট্যের স্বকীয়তা ধরে রাখতে হবে এবং কীর্তন আঙ্গিকের অনেক লোকনাট্যের পালা রচনা করে পরিবেশন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির কাছে আমাদের কীর্তনের ধারা পিছিয়ে পড়বেনা যদি আমরা সচেতন থাকি। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের লোকনাট্যে কীর্তনের যে চর্চা রয়েছে তা শুধু চলমান জীবন্ত শিল্প হিসেবে নয়, বিষয়টি এখন সমাজের কাছে মূল্য পাচ্ছে কেবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে।

গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যেসব লোকনাট্য পরিবেশিত হতো তা সবই ছিল গীতিবহুল। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিনয়কে বাণীপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই নাটকগুলো ছিল গীতিবহুল। সুতরাং একটি বিষয় আমরা আশা করতে পারি যে বিবর্তনের ধারায় লোকনাট্য কীর্তনের যে চর্চা সেটি প্রথম থেকেই ছিল, এখনো আছে এবং আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

বাঙলা লোকনাট্যে কীর্তনের চর্চা ও প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় ও বাস্তবায়ন করতে হলে সুপারিশমালা হবে নিম্নরূপ :

১. আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালীন বিষয় নিয়ে পালাকীর্তনের আঙ্গিকে বাংলার লোকনাট্যের পালাকার ও নাট্যকারগণকে উদ্যোগ নিতে পারে।

২. মাসে অন্তত একবার বা দুইবার বিভিন্ন গ্রাম, উপজেলা, জেলায় পালাকীর্তন ও লোকনাট্যের আয়োজন করতে হবে। তাহলে শিল্পমনা মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

৩. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে সংগীত বিভাগ রয়েছে সেখানে কীর্তন বিষয়টি আলাদাভাবে চালু করা হলে বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

৪. টেলিভিশন এবং বেতারে পালাকীর্তন বা এই আঙ্গিকের লোকনাট্য নিয়মিত সম্প্রচারের কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।

৫. বড় বড় শহরে নিয়মিত পালাকীর্তন ও লোকনাট্য মঞ্চায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৬. প্রতিবছর নির্দিষ্ট মৌসুমে লোকনাট্য ও পালাকীর্তনের আয়োজন করতে হবে।

৭. কীর্তন, লোকনাট্যে অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিত সম্মাননা ও পুরস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

৮. লোকনাট্য ও কীর্তনের দলকে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯. লোকনাট্য ও কীর্তনের মান উন্নয়নের জন্য শিল্পীকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পূর্ণ হতে হবে।

১০. কীর্তন ও লোকনাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতার অবসানের উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশেরই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে কীর্তন ও লোকনাট্যের তদারকি, অনুমতি প্রদান, লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে; যোগ্য দলকে লাইসেন্স প্রদান করলে মূল পালাকীর্তন ও লোকনাট্য আরো সমৃদ্ধ হবে এবং শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

১২. লোকনাট্য ও কীর্তনের নামে দৃষ্টিকটু কোন নাচ ও খারাপ অঙ্গভঙ্গি করা হলে কঠোর শাস্তি প্রদানের আইন করতে হবে।

১৩. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে, মা-বোনের সম্মান রক্ষার্থে লোকনাট্য ও কীর্তনের দলসহ ভক্ত-দর্শক-শ্রোতাদের সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সময়সীমা সারারাত না করে ২টা থেকে ৫টা, ৬টা থেকে ১০ টার মধ্যে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৪. লোকনাট্য ও কীর্তন শিল্পী উন্নয়ন শাখা গঠন করা যেতে পারে।

১৫. শিল্পীদের সম্মানী বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. পালাকীর্তন এবং লোকনাট্য যেহেতু অভিনয় সেহেতু অভিনয় নিয়ন্ত্রণের কালাকানুন 'Bengal places of Public Amusement act' ১৯৩৩, বাতিল করতে হবে।

১৭. কীর্তন বা এই আঙ্গিকের লোকনাট্যের নিগূঢ় দর্শনকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যুক্ত করা, অনেক বেশি গবেষণা কার্য করা, সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৃত্তি প্রদান, প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে পালাকীর্তন ও লোকনাট্য পরিবেশনার ব্যবস্থা করা।

১৮. পালাকীর্তন ও এই আঙ্গিকের লোকনাট্যকে সার্বজনীন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এসকল সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ লক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, বেতার, টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এসকল সুপারিশ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে লোকনাট্য ও কীর্তনের সার্বিক সংকট দূর হতে পারে। এভাবেই আমরা আমাদের লোকনাট্য ও কীর্তনের যে অতীত গৌরব রয়েছে তা ফিরে পেতে পারি। লোকনাট্যে কীর্তনের যে চর্চা রয়েছে সেটিও পরিশুদ্ধভাবে

বিস্তৃতি লাভ করবে। সমাজ এবং রাষ্ট্রই পারবে লোকনাট্য ও কীর্তনকে গণমানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে।

সংগীতের বিভিন্ন ধারা আপন গতিতেই প্রবাহিত হয় এবং আপন যোগ্যতায় টিকে থাকে। বাংলা সংগীত আমাদের সংস্কৃতিরই একটি অনেক বড় অংশ। আর সংগীতেরই অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কীর্তন বা পালাকীর্তন। এটি প্রচার বা পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোন বাধা সৃষ্টি না করি, তাহলে এই ধারাটি বিকশিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। একটি কথা ভুলে গেলে চলবেনা কীর্তন ও লোকনাট্য আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, একে পুরোদমে চর্চার ক্ষেত্রে যদি কোন বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয় তাহলে তা অপসারণের উদ্যোগ নেয়া হলে আমাদের সংস্কৃতি ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং সংস্কৃতিমনা বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা গৌরব বোধ করতে পারবো। লোকনাট্য ও কীর্তনের জন্ম এই মাটিতে, এই মাটিরই সুর-রস গ্রহণ করেই আমাদের কীর্তন আমাদের লোকনাট্য বেঁচে থাকবে অনন্ত অনন্ত কাল। বিশ্বদরবারে পৌঁছাতে পারবো আমাদের ঐতিহ্যবাহী কীর্তন ও লোকনাট্যকে নিয়ে।

পরিশিষ্ট-১
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিনীত নাটকের বর্ণনা

মধ্য পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাপক অবদান রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের গীত, অভিনয় আর নৃত্যের সমন্বিত পরিবেশনা 'গীতাভিনয়' বা লীলানাট্যেরই নামান্তর। চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের ' চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নাটকে।

শ্রীচৈতন্য যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন একদিন তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে রীতিমত আয়োজন করে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন (তথ্য সূত্র : সুকুমার সেনের বই 'নাট-নাট্য-নাটক')। অভিনয়ের তোড়জোড় ভালোই হয়েছিল কিন্তু এমন সুখের নাটক বা যাত্রা যাই বলি না কেন তার অভিনয় শেষ হবার আগেই চৈতন্যের হৃদয়ে ভাবের প্লাবন আসে। তাতে প্লট যায় ঘুলিয়ে, অভিনয়ও সম্পূর্ণ হতে পারেনি। যতটুকু হয়েছিল তার বিবরণ বৃন্দাবনদাস দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের কাছে সেটুকুই অনেক মূল্যবান। যথাসম্ভব সংক্ষেপে বৃন্দাবনদাসের পুনরাবৃত্তি করছি–

একদিন প্রভু (চৈতন্য) তাঁর বৈষ্ণব-স্বজনকে বললেন, "আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে।" অর্থাৎ আজ আমি অঙ্গবন্ধ নাটক (নাটপালা) অভিনয় করব। এই বলে তিনি সদাশিব বুদ্ধিমন্তখানকে ডেকে বললেন, তুমি অভিনয় সজ্জা ("কাচ") যোগাড় কর গে। "শঙ্খ, কাঁচুলি, পাটশাড়ি, অলঙ্কার যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার।" কে কি ভূমিকা নেবেন তাও তিনি বলে দিলেন। গদাধর পণ্ডিত সাজবেন রুক্মিণী (গদাধর করিবেন রুক্মিণীর কাঁচ), ব্রহ্মানন্দ সাজবেন 'তলবুড়ি'–রাধার সখী সুপ্রভা, নিত্যানন্দ হবেন বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল। শ্রীবাস পণ্ডিত সাজবেন নারদ, নারদের চেলা (স্নাতক) সাজবেন শ্রীরাম (শ্রীবাসের ভাই)। এই শুনে শ্রীবাসের আর এক ভাই বললেন, আমি 'দেওটিয়া' (দীপধারী) হব। তখন অদ্বৈত বললেন, কাকে নায়কের ভূমিকা দিচ্ছেন (কে করিবে পাত্র কাচ?) প্রভু বললেন, গোপীনাথ সিংহ পাত্র হবে। তারপর বুদ্ধিমন্ত খানকে তাড়াতাড়ি গোছগাছ করবার আদেশ দিয়ে প্রভু বললেন, 'নাচিবাঙ আমি।' প্রভু নাচবেন তার মানে হল তিনি রাধার ভূমিকা নেবেন। ভূমিকার তালিকা থেকে অনুমান করতে পারি যে চৈতন্যের সংকল্পিত অভিনয় ছিল রাধাবিরহ। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকায় সুখে আছেন, রাধা ব্রজে দুঃখে আছেন–কৃষ্ণকে দেখার

জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। হয়ত দুজনের ক্ষণিক মিলন হত, কিন্তু তৃপ্তি হত না। অর্থাৎ 'যা কৌমারহরঃ য এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ' ইত্যাদি শ্লোকের ভাব।

চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় কাণ্ডার ('কথিয়ার') ও চন্দোয়া টাঙানো হল। বুদ্ধিমন্ত খান অভিনয়ের দ্রব্য যোগড় করে শ্রীচৈতন্যের কাছে নিয়ে এলেন। দেখে শ্রীচৈতন্য খুশি হলেন। তিনি ঠাট্টা করে বৈষ্ণবদের সাবধান করে দিলেন।

প্রকৃতিস্বরূপা নৃত্য হইব আমার
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।

শুনে প্রথমেই অদ্বৈত মাটিতে দাগ কষে বললেন, 'আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য।' শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, 'মোর ওই কথা।' তখন হেসে চৈতন্য বললেন, তা কি হয়? 'তোমরা না গেলে নৃত্য কিসের লাগিয়া।'

যথাসময়ে দলবল নিয়ে চৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে গেলেন। বধূকে নিয়ে শচীও চললেন। তার সঙ্গে চলল 'যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।' চৈতন্য সঙ্গীদের নিয়ে সাজ করতে বসলেন। অদ্বৈত হাতজোড় করে বার বার বলতে লাগলেন, 'মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাচ কাচিবার?' চৈতন্য বললেন, সব কাচেই তো তোমার দক্ষতা, 'ইচ্ছা অনুরূপ কাচ আপনার।' অদ্বৈত আনন্দে আত্মহারা, কোন একটা ভূমিকায় লেগে থাকবার মতো তার মনের অবস্থা নয়। মোটামুটি তিনি বিদূষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ
ভ্রুকুটি[২] করিয়া বুলে শান্তিপুরনাথ।
সর্বভাবে নাচে মহা বিধূষক প্রায়
আনন্দসাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।

মুকুন্দ দত্ত অভিনয়ের শুভারম্ভ করলেন এই ছত্রটি কীর্তন করে—

রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ।

তারপর আসরে প্রবেশ করলেন কোতোয়াল বেশে হরিদাস,

মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস।
মহাপাগ শিরে শোভে ধটী পরিধানে

অঙ্গদ বলয় করে নূপুর চরণে।

হাতে লাঠি নিয়ে তিনি রঙ্গভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বলতে লাগলেন–

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান

নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম

দম্ভ[১] করি হরিদাস করয়ে আহ্বান।

হরিদাসের অভিনয় দেখে সকলে হাসতে লাগল, বললে, কে তুমি? এখানে কোটাল কেন? হরিদাস বললেন, 'আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল', 'কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল।' বৈকুণ্ঠ ছেড়ে প্রভু আজ এখানে এসেছেন, তিনি লক্ষ্মীভাবে এখন নৃত্য করবেন। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে প্রেমভক্তি লুটে নাও।

এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাথে

নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে।

একটু পরে নারদের বেশে শ্রীবাসের প্রবেশ।

মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্ব গায়

বীণা কান্ধে কুশ হস্তে[২] চারিদিকে চায়।

তার পিছনে পিছনে রামাই (শ্রীরাম) পণ্ডিত চেলা সেজে বগলে আসন, হাতে কমণ্ডুল নিয়ে এলেন। এসেই আসন বিছিয়ে দিলেন। শ্রীবাস বসলেন যেন সাক্ষাৎ নারদ। অদ্বৈত গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? এখানে কেন এলে? শ্রীবাস উত্তর দিলেন, আমি নারদ, কৃষ্ণে গায়ন। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াই। বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলুম কৃষ্ণকে দেখতে। সেখানে শুনলুম কৃষ্ণ নদীয়ায় এসেছেন, দেখলুম সব ঘর দ্বার শূন্য। শূন্য বৈকুণ্ঠপুরীতে থাকতে না পেরে ঠাকুরকে মনে করে এখানে এসেছি। প্রভু আজ লক্ষ্মীর বেশে নাচবেন। অতএব এ সভায় আমার অধিকার আছে। শ্রীবাসের কথা শুনে শ্রোতারা জয়ধ্বনি তুললো, মেয়েরা শ্রীবাসকে চিনতেই পারলো না। শচী বিস্ময়ভরে মূর্ছিত হয়ে গেলেন।

সাজঘরে চৈতন্য রুক্মিণীর বেশ ধরেছিলেন। তখনই তাঁর ভাবাবেশ হয়েছিল। সেইখানেই থেকে তিনি পিতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত রুক্মিণীর মতো আচরণ করতে লাগলেন।

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে

বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে।

নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে

পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলি লিখনে।

এদিকে আসরে কোটাল জাগ জাগ বলে ঘুরছেন, নারদের কাছে শ্রীবাস অভিনয় করছেন, নাচছেন। এই হল প্রথম প্রহর পর্যন্ত।

দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর রাধার সাজ ধরে সখী সুপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন। পিছনে পিছনে বড়াই এল।

হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান

ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।।

হরিদাস কোটাল ডাক দিয়ে বললেন, "কে সব তোমরা?" বড়াই ব্রহ্মানন্দ বললেন, আমরা মথুরা চলেছি। নারদ শ্রীবাস বললেন, তোমরা কাদের বউ? (ব্রহ্মানন্দ) সখী সুপ্রভা বললে, একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? নারদ শ্রীবাস বললেন, জানা কি অন্যায়? সুপ্রভা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ। গঙ্গাদাস (সম্ভবত কোটালের অনুচর) বললেন, আজ কোথা রাত কাটাবে? ব্রহ্মানন্দ বললেন, তুমি তো ঘর দেবে। গঙ্গাদাস বললেন, জিজ্ঞাসা করে তো মুশকিল হল। তোমরা চট করে সরে পড়।

অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ

মাতৃসম পরনারী কেনে দেহ লাজ।

অদ্বৈত রাধাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কর্তা নাচ গান খুব ভালোবাসেন। তোমরা এখানে নাচো, "ধন পাইবা প্রচুর"।

একথা শুনে গদাধর নাচ জুড়লেন। ভাবের উপযুক্ত গান ধরা হল।

রমা বেশে গদাধার নাচে মনোহর

সময় উচিত গীত গায় অনুচর।

গোপিকাবেশী গদাধরের নাচে সকলে তন্ময়, এমন সময় দেবী (আদ্যাশক্তি) বেশ ধরে চৈতন্য প্রবেশ করলেন।

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে

বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাসে।

চৈতন্যকে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। কেউই চিনতে পারলেন না। তবে বড়াই নিত্যানন্দকে দেখে অনুমান করা গেল। সকলে ভাবতে লাগলেন সমুদ্রগর্ভ থেকে কি কমলা উঠে এলেন? 'রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা?' না মহালক্ষ্মী পার্বতী এলেন? 'কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী?'

জগৎজননী ভাবে নাচে বিশম্ভর।
সময়–উচিত গীত গায় অনুচর।

চৈতন্যের তখন ভাব থেকে ভাবান্তর চলেছে।

নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন দেখিয়ে তখন।
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচেন যখনে
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী পানে।
ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে
গোকুলসুন্দরী ভাব বুঝিয়ে তখনে।
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি
সবে দেখে যেন মহা কোটি যোগেশ্বরী।...
আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ
সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গা।...
সমুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্
চতুর্দিকে হরিদাস করে সাবধান।

এমন সময় নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। শ্রীচৈতন্য ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে বসলেন বিগ্রহকে কোলে নিয়ে। অভিনয় আগেই তলিয়ে গিয়েছিল, এখন নাচও ঘুচে গেল। চৈতন্য মহালক্ষ্মীভাবে বিভোর হয়ে রইলেন। বৈষ্ণবেরা তাঁকে স্তব করতে লাগল।

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে।

সুকুমার সেন মনে করেন অভিনয়ের বিষয়টি মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' অংশের কাহিনীর মত ছিল।

পরিশিষ্ট-২
লীলা ও পালা
লীলা

রাধাবিরহ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সবশেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ'। চৈত্র মাস, শেষ বসন্ত। বড়াই-এর কাছে রাধার অনুনয়, কৃষ্ণকে এনে দাও। কিন্তু বসন্তেই তো বংশী চুরির ঘটনা নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের সন্ধি হল। কৃষ্ণ বংশী পেয়ে প্রসন্ন মনে রাধাকে ক্ষমা করলেন। তবে আবার কৃষ্ণের অদর্শনের চিত্র কেন? এখানেও বংশীখণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। নইলে ধরতে হয়, এখানে আরও এক বৎসর পরের আর একটি বসন্তের কাহিনী এসেছে।

রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে বড় আকুল হয়েছেন। বড়াইকে সেই স্বপ্নকথা বলছেন :

দেখিলোঁ প্রথম নিশী   সপনে সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে   সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে   বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী   না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পছর নিশী   মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে॥
ঈযত বদন করী   মন মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চঊঠ পহরে কাহ্নু   করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ-কোকিল নাদে   ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

পদটির ভাব, কবিত্ব এবং ছন্দোবদ্ধ জ্ঞানদাস-ভণিতার 'মনের মরম কথা' (পৃ. ১৫২-৫৩) স্বপ্নমিলনের বিখ্যাত পদটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যমুনা সম্পর্কে এখানেও কবি লিখেছেন :

যনুমা বহে খরতর ধার।

কেমতেঁ তাহাতে হইবোঁ পার ॥১০॥

হয়তো তখন চৈত্রমাসেও যমুনায় বেশ জল থাকত, গতিবেগ তীব্র হত। আর একটি পদে রয়েছে, বড়াই রাধাকে বলছেন :

বড় যতন কবিআঁ　　　চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবে দরশনে ॥৩॥

সে যুগের সমাজে চণ্ডীপূজার যে বেশ প্রাধান্য ছিল, বোঝা যাচ্ছে। রাধা-বিরহে মাঝে মাঝে কয়েকটি পদে রাধার করুণ আর্তির চিত্র কবি বেশ নিপুন হাতে এঁকেছেন। একটি উদাহরণ তুলি :

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ল॥ধ্রু॥

রাধা পূর্বে কৃষ্ণের ডাকে সাড়া দেননি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে বলছেন বড়াইকে :

যবেঁ কাহ্নু চাহিলে সুরভী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্নু গেলা কতী ॥২॥

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। সেই যে তাম্বুল খণ্ডে তিনি রাধাকে শাস্তি দিতে মুনিবেশ ধরবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন এবারে সেই নিষ্কাম যোগীর ভেক নিয়েছেন। বড়াইকে বলছেন :

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মো　বহ্মাগেআন ॥১॥
...　...　...　...
ইহা পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কেল বন্দী॥

এ ছবি তো বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগসাধনার। যে যুগে বড়ু এ-কাব্য লিখেছেন তখন এসব আচার প্রচলিত ছিল ধরা যেতে পারে। রাধা রতিমিলন প্রার্থনা করে যত অনুনয় করছেন, কৃষ্ণ ততই এড়িয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বড়াই-এর অনুরোধে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিলেন। বড়াই কৃষ্ণের কাছে বিরহিনী রাধার যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে দুটি পদ গীতগোবিন্দ থেকে অনুবাদ করা।

১. তনের উপর হারে।

আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥১॥

এটি ‘স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্’ (৪সর্গ, ৯ গীত) গানের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু শেষ দু পংক্তি কবির নতুন সংযোজন।

২. নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥
করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥১॥

এটি ‘নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনু বিন্দতি’ (৪সর্গ, ৮ গীত) এর অনুবাদ।

বড়াই এর চেষ্টায় উভয়ের মিলন হল। রাধা মিনতি করলেন, আর যেন কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গিয়ে কষ্ট না দেন। কৃষ্ণের উরুদেশে মাথা রেখে ক্ষীণা ক্লান্ত রাধা ঘুমিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার যত্ন নিতে বলে মথুরায় চলে গেলেন।

ঘুম থেকে জেগে রাধার আক্ষেপ। কিন্তু বড়াই রাধার অনুরোধে বৃন্দাবনে কেন কৃষ্ণের খোঁজ করছেন? তাকে বলেই তো কৃষ্ণ মধুরায় গেছেন। ৬০ নং পদটি প্রক্ষিপ্ত কি? অনেক বুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

বর্ষা ঋতু এসে গেল। রাধার বিরহ অসহনীয়। কবির বর্ণনাও অনুপম।

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কতনা রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥১॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কেনা বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ধ্রু॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥২॥

… … …
জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।

সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৪॥

'কদমফুল ফুটে ডাল নুইয়ে পড়েছে, এখনো বালগোপাল গোকুলে এল না। আর কত বুক ঢেকে রাখব, নিঠুর হৃদয় কানু বলে গেল না। বড়াই, আমাদের শৈশবের প্রেমকে বিগড়ে দিল। প্রাণনাথ কেন ঘরে এল না? বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলব, বাহুর শঙ্খ ভেঙে ফেলব। কানু বিনে সর্বদা পরাণ পোড়ে, বিষাক্ত-ক্ষত হরিণীর মতো।... জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এল, দক্ষিণদিক শ্যামল মেঘে ভরে উঠল। এখনো নিষ্ঠুর নন্দ-নন্দন এলো না। বাসলীগণ কবি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান করছেন।'

রাধার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বড়াই মথুরা এসে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে, 'কানাই তোমার চরিত বোঝা ভার, রাধা প্রেমামৃত আপনা থেকে হাতে পেয়ে উপেক্ষা করছ কেন?

আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ॥ধ্রু॥

'এখন না এলে পরে বিরহে কাতর হবে। তার কারণে ভাত খাওনি, এখন শাক খেতে এত যত্ন কেন? সোনার ঘট ভাঙলে জোড়া যায়, উত্তম জনের প্রেমও তদ্রুপ। যে অধম তার প্রেম মাটির ঘটের মত, ভাঙলে আর জোড়া যায় না। রাধা তার ঘরে বসে রইল, তুমিও মথুরায় এসে বসে রইলে। যাতায়াত করে আমারই প্রাণ আকুল।

অভিমানী কৃষ্ণের সুর অনেকটা নরম। বলছেন, 'বড়াই আমায় জোর কোরো না। তার নাম শুনে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। তুমি জান সে কত দূঃখ দিয়েছে। এখন মনে ইচ্ছা হয়, আর কখনো তাকে না দেখি। বড়াই তুমি ফিরে যাও, রাধার জন্যে আমায় আর জোর কোরো না।'

কাটিল ঘাঅত নেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচন তাপ না সহে মুরারী॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥

'কাটা ঘায়ে কত নেবু রস দেবে? রাধা যে কত কি বলেছে তুমিতো জান। ধন, বসতি সব ত্যাগ করতে পারি, দুঃসহ বচন তাপ সহ্য হয় না। গোকুলের বাস ত্যাগ করে মথুরায় এলাম। মনে ইচ্ছা, কংসের বিনাশ সাধন করি।'

—এখানেই পুথি খণ্ডিত। পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ মথুরা থেকে আর গোকুলে ফিরলেন কিনা জানা গেল না। কৃষ্ণের কথায় রাধার প্রতি উদাসীনতার পরিবর্তে যেন অভিমান বেশি ফুটে উঠেছে। (তথ্যসূত্র : বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' মূল পাঠের আধুনিক বঙ্গানুবাদ)

রাস যাত্রাপালা

রাগালাপ : নটপালার আসর শুরুর ডাখুলা (মৃদঙ্গ বাদক) ও পালা (করতাল বাদক)-দের সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গতের প্রথম পর্যায়ের পর আসে ইশালপার রাগালাপ এবং ডাখুলা-পালাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মিশ্রিত যন্ত্রবাদন। যে যন্ত্রবাদনের মধ্যে ইশালপা রাগালাপ করেন–

'তাই রি না তা নাই রি
তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি
তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি
তিরি রি রি রি...।'

এরকম রাগালাপের পর আসে গুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা (উল্লেখ্য, আসরে উপস্থিত সকল ভক্তই বৈষ্ণব), গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা–'জয়ও জয়ও জয়ও গৌরাঙ্গ চরণে...' আখ্যান, মনশিক্ষা এবং ফাগুখেলা।

গৌরচন্দ্রিকার পর রাধার রূপ বর্ণনা এবং রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় কথন শেষে আখ্যানে প্রবেশ করেন ইশালপা (মূলগায়েন)। তার সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অভিনয়ে অংশ নেন একজন দোঁহার (মূলগায়েনের সহযোগী) এবং কখনো কখনো পালাদের (করতাল বাদকদের) কেউ কেউ। এ পর্যায়ে মণিপুরী বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিবেশিত নটপালার 'পথরুদ্ধ' আখ্যানের কিঞ্চিৎ উদাহরণে যাচ্ছি–

বর্ণনাত্মক পদ্য : শ্রী রাধা ব্রজের মহিমা। কীর্তিশোভাময়ী। শ্রীরাধা প্রেমের মহিমা। কীর্তিশোভা দিও...রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা-দুই দেহ ধরি অন্যান্যে বিরাজ করে। সেই দুই দেহ এসো ভাবও কথা লয়ে করও গো এথায় বিরাজে। আজ গৌরাঙ্গ চাঁদ একা অবতারও লয়ে নিজ কাজ সাঙ্গ করি। সত্যযুগে ছিল ঋষি, ত্রেতাযুগে হইল রাম, দ্বাপরেতে কালা ধরিল গোপী...কলিকালে নিজ প্রিয় ভক্তগণ লইয়া উদয় হইল গৌরচাঁদ সদয়ও হইয়া।

বর্ণনাত্মক গীত : বসন্ত আগত...
মানে না মানে না মানে
মন করে উচাটন

বর্ণনাত্মক গদ্য : মধুরসের বৃন্দাবনে রাই-কানহু কুঞ্জতীরে দরশনও ভেল।

বর্ণনাত্মক পদ্য : কৃষ্ণ দেখি বহুবিধ ভাব উপর্জ্জিল॥
কিল কিঞ্চিৎ ভাবও আদি কইলো আকর্ষণ।
পলকি নিহারে ভরে চকিত নয়ন॥
লজ্জা-ভয়ে সুন্দরী পরাভদ্র করি।
কুঞ্জেরও বাহিরে চলে পদ দুইচারি॥

বর্ণনাত্মক গদ্য : হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র পথরুদ্ধ করে–

কৃষ্ণের উক্তি : শুন রাধে কমলিনী দুশোভন দিয়ে।
আমায় ছাড়ি কোথা যাবে প্রাণও প্রিয়ে॥

বর্ণনাত্মক পদ্য : রাই দেখি সুনাগরও জাগরিত হইয়া
পথরুদ্ধ করি রহে ভুজ প্রসারিয়া।

কৃষ্ণের উক্তি : কুথা যাবে প্রাণো প্রিয়ে আমাকে ছাড়িয়া।
সঙ্গেতে বান্ধিয়া লেহ মোরে প্রেমো দরদিয়া॥
রাধার প্রত্যুক্তি : ও কথা না কইও এবে পরানো মাধব।
ইষ্ট পূজারী যদি হও তবে এ কেমন স্বভাব॥
লোকো লজ্জা নাহি তোরে পুরাণো নাগরো॥...
বর্ণনাত্মক সংলাপ : কৃষ্ণ কহে-সখা নহে আমি নন্দেরো গোপাল।
বর্ণনাত্মক সংলাপ : রাই বলে-কত গোপাল দেখি পালে পাল॥...
বর্ণনাত্মক সংলাপ : ললিতা আসিয়া বলে–তুমি কুনও জন।
চিনিতে নারিনু মোরা রাখো গো কথন॥
বর্ণনাত্মক সংলাপ : হেন কালে কৃষ্ণ কহে–শুনও গো প্রাণও ললিতে
মোর নাম হরি বলে জগত-জন।
রাধা-সখী ললিতা সংলাপ : হরি শব্দে কালী চিহ্নেরে বুঝায়...
এত হরির মধ্যে তুমি কুনও হির হও
নিশ্চয় করিয়া মোরে কহিয়া যাও॥

বর্ণনাত্মক সংলাপ : হেন কালে কৃষ্ণ কহে–শুন ওহে প্রাণময়ী রাধে
মোরে আরেক নামও আছে–শুন মোরও নাম মদন মোহন।
ললিতা সংলাপ : মদন মোহন কয়ে জানিনু এখন।
তোমারও মোহিনী কুথায়॥
কৃষ্ণের সংলাপ : শুন ললিতে, বিশাখা চিত্ত চম্পকও লতা
তোরা অষ্টজনা নারী তার মধ্যে যে-জনা প্রধানও
ললিতা, সেই জগত মোহিনী ওগো–রাধা।
বর্ণনাত্মক পদ্য : রাই অঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ নাগর দুহস্ত বাড়ায়।
রাই রক্তোৎপলা দুহস্তে বারণ করে যায়...॥
কেমনি রাবন করে রাই–দিয়া তীর্যক গ্রীবা
চরণপদে ভাঙ্গে সুমধুরা...চলল চলি বলি॥
লুফে আসি কৃষ্ণ করে রাইয়ের কাঞ্চুক আকর্ষণ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে করে নিরীক্ষণ॥
বাহিরে বাম্যতা ভিতরে সুখ মন।
সুতম্বিত নাম এই ভাবও বিবিক্ষণ॥

হেনকালে রাই বলে–
রাধার গীত সংলাপ : লোকে দেখলে বলবে কী
আমি কুলবতী নারী
পথে বাধা করো না॥
কৃষ্ণের গীত সংলাপ : ওগো রাধে, লোক দেখলে বলবে ভাল
তোমায় ছাড়া রইতে নারি
শুন শুন প্রাণ পিয়ারী॥
রাধার গীত সংলাপ : পথ ছাড়ো ছাড়ো কালা

আমি কুলবতী নারী
পথে বাধা করো না॥

কৃষ্ণের গীত সংলাপ : ছাড়বো না ছাড়বো না প্রিয়ে
প্রেমময়ী রাধিকে
তোমায় ছাড়া রইতে নারি
শুন শুন প্রাণও প্রিয়ারী॥

এ রকম গীতি সংলাপের মধ্যে কখনো তারা গদ্য সংলাপ এবং বর্ণনাত্মক গদ্যে প্রবেশ করেন পরিশেষে আবার গীত সংলাপে ফিরে যান। সংলাপ বিনিময়ের এক পর্যায়ে আখ্যানে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটে। সেই মিলন বর্ণনায় আসরে উপস্থিত নারী ভক্তগণ উলু ধ্বনি দেন। আর তার মধ্যে ইশালপা বলতে থাকেন–

কত না আদর করি-রাই কোলে ধরি...
রাধাকৃষ্ণ এক স্থানে বসিয়া দুজন।
পূর্ণিত হইল শোভা ব্রজ-বৃন্দাবন॥
রত্নখচি সিংহাসনে বসিলা দুজন
মাদলে উঠিল ধ্বনি তা সনে উত্তম॥
দুহু তো সুন্দর কী দিবো তুলনা
প্রাণও দেখি কাচ্চা সোনা॥

এরপর ইশালপা একটি ছন্দযুক্ত গানে প্রবেশ করেন–

আজি কনকও লতা যেমন
দোহারও দেহ তেমন
মেঘেরও মাঝে যেন বিজুলি চমকিছে
ভানু সুতা সঙ্গে লয়ে
নিকুঞ্জ কাননে মাঝে॥
দ্বাপরকালে সোনার কমল
সোনার কমল-নীল কমল/এক স্থানে ফুটিছে...॥

নটপালা পরিবেশনের আখ্যানাংশ এখানে শেষ হলেও পরিবেশনার ইতি ঘটে ফাগুখেলা ও মনশিক্ষা দিয়ে।

ফাগুখেলা : নটপালার আখ্যানাংশ পরিবেশনার পর আসে ফাগুখেলা। এই পর্বে ডাখুলারা উন্মত্ত মৃদঙ্গ বাদন করেন। ডাখুলাদের এই মৃদঙ্গ বাদনের সাথে পালারাও করতাল বাজাতে থাকেন। মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিতে আসরে তাই নতুন এক গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। এতে ভক্ত-দর্শক-শ্রোতাদের চোখ-কান-মন আটকে যায় আসরের কেন্দ্রবিন্দুতে। কেননা, ডাখুলাদের মৃদঙ্গ বাদনের সাথে যুক্ত হতে থাকে জাদুকরি এক নৃত্য। সে নৃত্যে একটি পর্বের পর ইশালপা ও দোহার তাদের পালা পরিবেশনার মধ্যে প্রথমবারের মতো বিশ্রাম খুঁজে পান। আর দর্শকেরাও ওই সময়টাতে ভিন্নতর একটি অভিজ্ঞতা সূত্রে আসরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

মনশিক্ষা : (এ পর্বের সূচনাতেই থাকে গান–)
'হরি হরি বল মনও রাধে রাধে বল
বেথায় মানব জনব যায় বেফলে।

বহু দুঃখ করি ভাই পেয়েছি মানব...
এমনও দুর্লভও জনম পাবো কি না পাবো॥
জনমকালে বলছে তা মরণকালে দিমু তা
কিতাবের মন্ত্র তন্ত্র হরির নামও মহামন্ত্র॥'

গান শেষে মনশিক্ষা পর্বে ইশালপা বলেন–

আরে মন তুমি চল যাই সেই মথুরা বৃন্দাবনে। আর কবে-পালকিবো যথা এসবও করিয়া মনে যাবো বৃন্দাবনও ধারে...এই মনে করিয়াছি আশা। ধন-জন-পুত্র-ধায়ে এসবও করিয়া দূরে একান্ত হইয়া চলে যাবো। সব দুঃখ পরিহারি বৃন্দাবন বাস করি মাধবপুর মাতিয়া খাইবো। আরে মন তাই বলি, তুমি একবার–

হরি বোল বোল বলিয়া
দুটি বাহু তুলিয়া
চলো মন বৃন্দাবন নাচিয়া নাচিয়া।
সময় গেলে অসময়ে হরি ভজন হবে না॥

নাটপালায় একটি পালার পরিবেশনা এখানেই শেষ নয়। এরপর আবারও ফিরে আসে আকর্ষণীয় ফাগুখেলা। ফাগুখেলায় ডাখুলা-পালাদের মৃদঙ্গ-করতাল বাদনের উত্তেজনাময় ধ্বনির মধ্যে আসর শেষ হয়।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের লোকনাটক (বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র)

পরিশিষ্ট-৩
পদকার পরিচয়

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

পূর্বোক্ত পদকর্তাগণের মধ্যে প্রথমেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করা প্রয়োজন। কান্তভাবে, রসরাজ-গৌরাঙ্গের উপাসনায় আবিষ্ট-অন্তর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, বিমল-মধুর নদীয়ালীলাকে পদাবলী আকারে সঞ্জীবিত রেখে তা কলিজীবকে আস্বাদন করাতে।

'গৌর বৈ আর পুরুষ নাই,
নারী বৈ আর মানুষ নাই'

—এই ছিল তাঁর ভাব-মনন। শ্রী সরকার ঠাকুর তাঁর স্বরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত' গ্রন্থে গৌর-নিত্যানন্দের প্রতি সমভাব নির্দেশনা ও সমপ্রকাশত্বই প্রদর্শন করেছেন। তাঁর পদ সহজ-সরলভাবে ও সুখবোধ অনাড়ম্বর ভাষায়, অনুপম, সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। বৈষ্ণবীয়-রসজ্ঞ-পাঠকগণ সযৌক্তিক সত্যাসত্য নির্ণয় করবেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৪৮০/৮১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হতে পারেন।

বাসুদেব ঘোষ

শ্রীমন্ শ্রীবাসুদেব ঘোষসহ তিন ভাই-ই পদকর্তা ও সুকণ্ঠ, গায়ক। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতে বলেছেন—

'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠপাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥'

তাঁর পদাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্বও যথেষ্ট কারণ তিনি নদীয়ালীলার সাক্ষাৎদ্রষ্টা। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আনুগত্যেই তাঁর পদপ্রকাশন।

'শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥'

তাঁর পদের বাণীচিত্রগুলো প্রাঞ্জল ও সারপ্রসূ। মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়ে আগমনকালে নিত্যানন্দপ্রভুর সাথে তিনি ছিলেন।

'নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥'

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর পূর্বলীলায় বেদব্যাস ছিলেন। ১৪২৯ সালে জন্ম। ১৪৫৭ সালে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। বাংলা ভাষায় বাঙালি নায়ককে উপজীব্য করে লিখিত প্রথমতম মহাকাব্য এই চৈতন্যভাগবত। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যতীত আর অন্যপদ রচনা

করেছেন কিনা সে বিষয়ে নানামত বর্তমান। স্বনামধন্য সুকুমার সেন তিনজন (ব্রজবুলি সাহিত্য) ও শিবরতন মিত্র আঠারজন বৃন্দাবনদাসের নাম (বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক) সংগ্রহ করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্নেহচ্ছায়ে তিনি বড় হয়েছেন, ভাগবতানুশীলন করেছেন, দু'নয়নভরে নিত্যানন্দরূপ-গুণ-মহিমা দর্শন করেছেন, তাঁকে অনুভব করেছেন। নিতাই ছাড়া কিছু জানতেন না তিনি। মন্ত্রদাতা আচার্য্যগুরু নিতাইচাঁদের বিরহে তাঁর যে বিলাপ তা দেখলেই তাঁর শ্রীগুরুপ্রপন্নত্বের ছবি পাওয়া যায়–

"নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন সুখ নাহিক তাহার॥"

নিত্যানন্দপ্রভুও তাকে পারমার্থিক সামর্থ্যদানে অকৃপণ-অনুগ্রহধন্য করেছেন। ১৫১১ সালে তাঁর অন্তর্ধান হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর, নিজগুরু শ্রীমৎ নরহরি সরকার ঠাকুরের রাগমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশক–চক্ষুবিশেষ। তিনি স্বভাবকবি। তাঁর সহজ-সরল সুন্দর-সজীব পদাবলী ছন্দোমাধুর্য্যে, ভাবগৌরবে ও অর্থবৈভবে অতুলনীয়। তার লিখা 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের অনুবাদ প্রসিদ্ধ ও চিত্তরঞ্জক। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তাঁর নিত্যানন্দ বন্দনা অনুপম–

'অভিন্নচৈতন্যতনু ঠাকুর অবধূত।
শ্রীনিত্যানন্দবন্দোঁ রোহিণীক সুত॥
গৌরপ্রেম গরবে গর্গর মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার॥'

শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তাঁর রচনাস্ফূর্তি হয়–১৪৫৯ সালে, অনেকের মতে এই গ্রন্থ তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। শ্রীগুরুকৃপায় লোচনদাসের নিত্যানন্দ-মহিমাবর্ণন অলৌকিক। স্থানে স্থানে তা আমাদের মত ভোগসর্বস্বজীবনেও রেখাপাত করে–

'যেদেশে নিতাই নাই সেদেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখজনার মুখ না দেখিব॥
সংসারসুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই॥'

নরোত্তমদাস

নরোত্তমদাস বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গড়েরহাট পরগণার অধিপতি কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র। বাল্যকাল হতেই তিনি ধর্মানুরক্ত, ভোগবিলাসবিরক্ত এবং বৈরাগ্যাসক্ত ছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর করুণালাভে ধন্য হন। ১৫০৪ অথবা ১৫০৫ সালে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে ছয়টি শ্রীবিগ্রহ নিজ নিজ প্রিয়াগণের সহিত স্থাপন করে যে মহামহোৎসব সম্পাদন করেন, তাতে মা-জাহ্নবা, বীরচন্দ্র, অচ্যুতানন্দ প্রমুখ তৎকালীন সকল গৌরভক্তগণই যোগদান করেছিলেন। নরোত্তম গড়া, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা পদগুলো ব্যাকুলতা, আকুতি ও ভগবদ্‌সুখাভিলাষ-লালসায় ভরা। এগুলোর অন্তঃস্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও তথ্য সমভাবে বিদ্যমান। খেতুরীর বৈষ্ণব সম্মেলনে (Vaisnava council) স্বপ্রকাশিত গড়েরহাটী সুরে যখন নরোত্তম প্রার্থনা কীর্তন করেন, সেই সময়

প্রকট অপ্রকট সকল নিজগণ সঙ্গে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়ে নৃত্য করেন। এই বাসনাপূর্ত্তিকারিণী লীলায় সকলের পরিণতির ও পরিণতিস্বরূপের আস্বাদন ঘটে। 'প্রেমবিলাসে' পাওয়া যায় নিত্যানন্দ প্রভুর গৌরবিরহাশ্রুর দৃশ্যমান স্বরূপই নরোত্তম। নরোত্তমের নিত্যানন্দবন্দনায় তাই প্রাণের পরশ।

জ্ঞানদাস

নিত্যানন্দশাখাবর্ণনে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। তিনি মা-জাহ্নবার শিষ্য। কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করে তিনি কান্দরা গ্রামে বাস করে ভজনসাধনে ব্রতী হন। তাঁর পদলালিত্য অসাধারণ এবং তাঁর বহুপদ উত্তরকালে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হয়েছে বলে অনেকের সুচিন্তিত অভিমত। বাংলা ও ব্রজবুলি পদে তাঁর সমান দক্ষতা দেখা যায়। অনেকের মতে ১৪৪৫ হতে ১৪৫৫ সালের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। খেতুরীর উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগতিগোবিন্দ গোস্বামী

তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিলাসমূর্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আচার্য প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজ। বীরচন্দ্রপ্রভুর আশীর্বাদে গতিগোবিন্দের জন্ম। অনেকে তাঁকে গোবিন্দগতিও বলে থাকেন। গতিগোবিন্দের ভগিনী স্বনামধন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য যদুনন্দন তাঁর 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে গতিগোবিন্দের যথেষ্ট গুণগান করেছেন। তিনি একজন রসজ্ঞ পদকর্তা ও সুরগুরুকল্প পণ্ডিত ছিলেন। এ পর্যন্ত গতিগোবিন্দ রচিত, প্রামাণ্য যে তিনটি পদ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে দুটি নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমাসূচক। তিনি বীরচন্দ্র প্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'বীররত্নাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত একটি পুঁথি বরাহনগর পাঠবাড়িতে (বি ৬২ ক) আছে। নাম—'জাহ্নবাতত্ত্ব-মর্মার্থ'। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থে (১৫। ২, ২০ । ২) তাঁর দুটি পদ আছে।

শ্রীগোবিন্দদাস

তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও শীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর। বৈদ্যকুলজ চিরঞ্জীব সেন—পিতা ও মাতা—সুনন্দাদেবী। প্রথমে শ্রীখণ্ডে, তারপরে কুমারনগরে ও শেষে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শাক্ত মাতামহ দামোদর কবিরাজের আশ্রয়ে লালিত হওয়ায় বাল্যাবধি তিনি শাক্তমনোভাবাপন্ন ছিলেন। শেষে নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অগ্রজের সহায়তায় আচার্য্যপ্রভুর চরণাশ্রয় ঘটে। গোবিন্দদাস ছিলেন স্বভাব কবি। 'শ্রীরামচরিত্রগীত', 'সঙ্গীত মাধব নাটক', এবং অষ্টকালীয় ব্রজযুগললীলাত্মক 'একান্নপদ' তাঁর রচনা। স্বনামধন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী, নিত্যানন্দতনয় বীরচন্দ্রপ্রভু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বিদ্যাপতির বহু পদকে পূরণ করেছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিত্যস্মরণীয় অষ্ট কবিরাজের অন্যতম (একতম)। ব্রজবুলির পদকর্তাদের মধ্যে গোবিন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ। ছন্দোমাধুর্য্য ও অলঙ্কার প্রয়োগের সাথে সাথে যতি, তাল ও তান মাধুর্য্য তাঁকে অমর করে রেখেছে। বিলাস-বর্ণনে তিনি অনন্য।

আত্মারামদাস

তিনি শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর অনুগৃহীতজন, প্রসিদ্ধ পদকর্তা ও কীর্তনীয়া। মহাপ্রভুর সমসাময়িক। জাতিতে বৈদ্য। শ্রীপাট বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। বিখ্যাত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দদাসের তিনি পিতা।

স্বরূপদাস

তিনি একজন পদকর্তা ছিলেন। তবে যে তিনজন স্বরূপদাসের পদ সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে তিনি কোনজন তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। ভক্তিরত্নাকরে পুরুষোত্তম আচার্যের প্রশিষ্য, বিলাসাচার্যের

শিষ্য এক স্বরূপাচার্যের নাম পাওয়া যায়। আবার নরোত্তম বিলাসে জনৈক গৌরপরিকর স্বরূপের সন্ধান মেলে। হুশেনপুরবাসী, শ্রীগোবিন্দ সেবাধিকারী নরোত্তম-শিষ্য এক স্বরূপ চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়। প্রথম স্বরূপাচার্য্যই বিখ্যাত পদকর্তা আলোচ্য স্বরূপদাস বলে—অধিকাংশ গবেষকের অভিমত।

বল্লভদাস

এই নামে ৪/৫ জন পদকর্তা আছেন। কে কোন পদ রচনা করেছেন বা কি তাঁদের পরিচয়, তা নির্ণয় অসম্ভব। আলোচ্য পদকর্তা—বল্লভসেন, বল্লভাচার্য্য, বল্লভচৈতন্য, রূপানুজবল্লভ অথবা বল্লভভট্ট—কে হবেন তা বলা সম্ভব নয়।

বংশীদাস

তিনি একজন পদকর্তা। বীরভূম জেলার সদর মহকুমা সিউড়ীর রতন লাইব্রেরীতে (পুঁথি ২০৬৭) পদ পাওয়া গিয়েছে।

রাধাবল্লভদাস

তাঁর পদগুলো দেখে মনে হয় পরিপক্ব লেখনীপ্রসূত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক। সূচকপদ রচনায় তিনি করুণরস বিস্তারের সাথে সাথে ঐতিহাসিক অনেক তথ্যও পরিবেশন করেছেন। তিনি ব্যতীত আরও দুইজন রাধাবল্লভদাসের নাম পাওয়া যায়।

প্রসাদদাস

তিনি কর্ণানন্দ গ্রন্থোক্ত করণকুলোদ্ভব করুণাকরদাসের পুত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর কৃপাপাত্র। আবার রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদও এই নামে পদ রচনা করেন। 'পদচিন্তামণিমালা' সংকলন করেন।

কানুদাস

তিনি শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রশিষ্য এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাশ্রিত জন। মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দাগ্রামে বাড়ি ছিল। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন ও নীলাচলে কোনও সময় বাস করতেন।

কানুরামদাস

সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমদাসের ঔরসে কানুরামদাসের জন্ম। বাল্যকাল হতে মা-জাহ্নবা তাঁকে লালন-পালন করেন, যেহেতু মাতা-জাহ্নবা, কানুরামের গর্ভধারিণীর সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতি সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, সেই সুবাদে পদাবলী রচনায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। তবে কয়েকজন 'কানু' বা 'কানুরাম'-এর নাম পাওয়া গেছে বলে এই কানুরাম সম্পর্কে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

দীনকৃষ্ণদাস, দীনদুঃখীকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস নামক বহু ভক্তের পরিচয় বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, বৈদ্যকৃষ্ণদাস, গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাস, কালাকৃষ্ণদাস, দ্বিজকৃষ্ণদাস, দেবানন্দ ও মনোহরের ভাই কৃষ্ণদাস, বিহারীকৃষ্ণদাস, পণ্ডিত কৃষ্ণদাস, সূর্যদাসের অনুজ কৃষ্ণদাস, হোড় কৃষ্ণদাস, প্রেমী কৃষ্ণদাস, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস, লাউড়িয়াকৃষ্ণদাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস, বাণী-কৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণদাস, গায়ক কৃষ্ণদাস, সুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, রাজপুত কৃষ্ণদাস প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে গৌরপরিকর, নিত্যানন্দ শাখা, গদাধর পণ্ডিতের উপশাখা, পুজারীঠাকুরের শিষ্য, আচার্য্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন, রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, নয়নানন্দের প্রশিষ্য, দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুরক্তজন, জগন্নাথ মন্দিরের সেবক কায়স্থকুলজ ভক্ত, শ্রীহট্টের রাজবংশীয় প্রভৃতি

অনেক, স্বরূপে ভিন্ন, কিন্তু নামে এক—এমনজন আছেন। সুতরাং এই ভণিতার পদকর্তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আবার অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও ঐ সকল পদের রচয়িতা হতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

ব্রজের চিহ্নিতা যুগলসেবিকা রত্নরেখা সখির অবতার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৪২৮ সালে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ ঝামটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন এবং সেখানেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অনুগ্রহে ও অলৌকিক অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। গৌরজনের জীবন-সর্বস্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—'গ্রন্থরূপে শচীসুত'। তাঁর লিখিত পদাবলী সরল-সুন্দর এবং অনুপম ভাবব্যঞ্জক।

ঘনশ্যামদাস

ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ঘনশ্যামদাস। ঘনশ্যামের বাস মুর্শিদাবাদের রেঞাপুরে ছিল। তিনি নরহরি চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম চক্রবর্তী এবং নরহরি দাস নামে বিখ্যাত।

শিবরামদাস

তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও পদকর্তা। প্রেমবিলাসে তাঁর নাম পাওয়া যায়। নরোত্তমবিলাস রচয়িতা তাঁর বিষয়ে লিখেছেন—

জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্বস্ব যাঁহার॥ (১২ বিলাস)

শিবানন্দ

তিনি বিশিষ্ট পদকর্তা। বিখ্যাত পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁর রচিত তিনটি পদ পাওয়া যায়। অনেকের মতে শিবাই নামের ভণিতাযুক্ত পদকল্পতরুর ছয়টি পদ তাঁরই রচিত, —যেহেতু শিবাই শিবানন্দেরই অপভ্রংশ। অনেকে এই পদকর্তা শিবানন্দকে গৌরপার্ষদ কাঞ্চনপল্লীবাসী শিবানন্দ সেন থেকে অভিন্ন মনে করেন।

বলরামদাস

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাসের খ্যাতি যথেষ্ট। কিন্তু বলরাম নামে কয়েকজন থাকায় কেউ কেউ নানা সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। বৈষ্ণব বন্দনায় পাওয়া যায়—

সঙ্গীতরচক বন্দো বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥

তিনিই সম্ভবতঃ আলোচ্য পদের রচয়িতা। তবে শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য, রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য, মহাপ্রভুর রামশিঙা বাদক ভক্ত, চৈতন্যভাগবত (অন্ত্য—৫। ৭৩৪) এবং চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১। ৩৪) উক্ত বলরামদাস, প্রেমবিলাসকার বলরামদাস, উৎকলিয় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য, শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকার রচয়িতাসহ আরো অনেক বলরামদাসের নাম পাওয়া যায়।

হরিরামদাস

তিনি একজন পদকর্তা। এর বেশি এই নামধেয় জনের সম্বন্ধে জানা যায় না। অনেকে তাঁকে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রশিষ্য এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য, গোয়াস গ্রামবাসী রাঢ়ীশ্রেণির শিবাই আচার্যের পুত্র হরিরাম আচার্যের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। ভক্তিরত্নাকরে, প্রেমবিলাসে এবং কর্ণানন্দে তাঁর যে গুণ বর্ণিত আছে তা সহজেই চিত্তকে বিহ্বল করে।

সম্ভবতঃ তাঁর সম্পূর্ণ নাম রামকান্ত। অনেকের মতে তিনি দক্ষিণ-দেশীয়। আবার কেউ কেউ বলেন চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১০। ১১০) শুভানন্দের সাথে তাঁরই নাম শ্রীচৈতন্যশাখা হিসাবে বর্তমান। পদকল্পতরুর ১৫৭২ সংখ্যক পদ তাঁর রচিত হতে পারে।

হরিদাস

পদকর্তা হরিদাসের রচিত ছয়টি পদ, পদকল্পতরুতে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে ৩০১৪ সংখ্যক পদটি অপরূপ।

গৌরীদাস

তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অনুগত পদকর্তা। সম্ভবতঃ তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস অথবা পদকল্পলতিকা রচয়িতা গৌরীমোহন দাস হতে পৃথক। তাঁর প্রতিই শক্তি সঞ্চার করে নিত্যনন্দশিষ্য পুরুষোত্তম, নিত্যানন্দ প্রভুর স্তবকীর্তন করিয়েছিলেন। বৈষ্ণব বন্দনায় দেবকীনন্দনদাস সেই প্রসঙ্গ তুলেছেন।

দেবকীনন্দনদাস

তাঁকে দৈবকীনন্দনদাসও বলা হয়ে থাকে। তাঁর বৈষ্ণববন্দনা নিত্যপাঠ্য এবং তাতেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর প্রশিষ্য এবং পুরষোত্তম প্রভুর শিষ্য। এই পুরুষোত্তম সদাশিব কবিরাজের শিষ্য। ১৬১৮ সালে রচিত অনুরাগবল্লী গ্রন্থে দেবকীনন্দনের উল্লেখ আছে। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের আদেশেই কুমারহট্টে পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় করেন। দেবকীনন্দনের পূর্বনাম সম্ভবতঃ চাপালগোপাল। তবে এ বিষয়ে ক্ষীণ মতবৈষম্য আছে। ২০২ জন বৈষ্ণবের নাম যুক্ত এবং প্রায় সর্বজীবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণতি-অভিজ্ঞান—বৈষ্ণববন্দনাই দেবকীনন্দনকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

রায় অনন্ত ও অনন্তদাস

উভয়ে একই বলে অমুমিত হয়। পরিচয় সঠিক জানা যায় না। গদাধর শাখায় এবং শ্রীঅদ্বৈত শাখায় তিনজন অনন্তের নাম পাওয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈত শাখায় একজন অনন্তদাসের নাম (চৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২। ৬১) পাওয়া যায়। অভিরামদাসের শ্রীপাট পর্যটনে অণিমাসিদ্ধির অবতার অনন্তপুরীর নাম আছে। শিবরতন মিত্রের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক গ্রন্থে বৈষ্ণব পদকর্তা অনন্তদাসের নাম পাওয়া যায়।

মোহন

পদকল্পতরুতে তাঁর তিরিশটি পদ চয়ন করা হয়েছে। শ্রীরসিক মুরারির দুই শিষ্য, শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর পানিহাটিবাসী ও সীতানগরবাসী দুই কৃপাপাত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর এক শিষ্যের 'মোহন' নাম পাওয়া যায়। গোবিন্দ কবিরাজের এক বন্ধুর নামও মোহনদাস। তাঁর ব্রজবুলিতে রচিত তেইশটি পদ পদকল্পতরুতে বর্তমান। গৌরপদতরঙ্গিনীতে 'মোহন' ভণিতায় তিনটি ও 'মোহনদাস' ভণিতায় তিনটি পদ বর্তমান।

মাধবদাস

অনেক মাধব (মাধবমিশ্র, জগন্নাথানুজ মাধব, নিত্যানন্দজামাতা মাধব, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকর্তা মাধব, প্রিয়াজীর ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব, সারদাচরিতকার মাধব) থাকা সত্ত্বেও এই মাধব সম্ভবতঃ বাসুদেব ঘোষের সহোদর। শ্রীপাট দাঁইহাটে গৌরাঙ্গের শাখা বলে বৈষ্ণব আচার দর্পণে পাওয়া যায় কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়দেশে নামপ্রেম প্রচারের জন্য আসেন, তখন ইনি সঙ্গে ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে মাধবকবীন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। তবে তিনি বা মাধবচূড়াধারী ফুলিয়াবাসী মাধবদাস,

উৎকলবাসী মাধবপট্টনায়ক, অদ্বৈত শাখার মাধব পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র, চণ্ডীলীলা রচয়িতা নবীনপুরবাসী মাধব সকলেই আলোচ্য পদকর্তা হতে পৃথক। শ্রীমৎ হরিদাস দাসজীর মতে তাঁর পদসংখ্যা-১২।

দীনদাস

তিনি সম্ভবতঃ দীনহীন দাস নামে পরিচিত এবং গৌরগণোদ্দেশের আধারে 'কিরণদীপিকা' নামে এক পদ্যানুবাদ রচনা করেন।

প্রেমদাস

অনেক গবেষক মনে করেন মনঃশিক্ষা গ্রন্থকর্তা প্রেমানন্দদাস ও তিনি অভিন্ন। প্রেমদাস নামে শ্রীজীব গোস্বামীর একজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, যিনি উত্তরকালে পুরীধামে বাস করতেন। আলোচ্য পদকর্তা বংশীশিক্ষা গ্রন্থকার প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম মিশ্র-সিদ্ধান্ত বাগীশও হতে পারেন এবং এই ধারণা খুব অযুক্তিযুক্তও নয়।

সংকর্ষণদাস

তিনি একজন ব্রজবুলি ও বাংলা পদকর্তা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা এই সংকর্ষণের প্রকৃত নাম জন্মেজয় মিত্র। ১৮৬০ সালে তাঁর 'সঙ্গীতরসার্ণব' নামে গ্রন্থ প্রকাশ পায়।

যদু

যদুনন্দন আচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, যদুনন্দন দাস, যদু গাঙ্গুলি, যদুনাথ দিগ্‌বিজয়ী , যদুজীবন তর্কালঙ্কার, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ হালদার, যদুনাথ কবিচন্দ্র, যদুনাথ প্রভৃতি অনেক যদুর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে আলোচ্য পদকর্তা বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোনও বিবরণ সংগ্রহ করা না গেলেও শ্রীপাট কাটোয়াবাসী, দাস গদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, অথবা শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র সুবলচন্দ্রের শিষ্য 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থ রচয়িতা যদুনন্দন দাস এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন আলোচ্য পদকর্তা। তাঁদের উভয়েরই পদাবলী সাহিত্যে অবদান আছে।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী ৩রা এপ্রিল ১৮৭৭ সালে (মতান্তরে ১৮৭৬ সালে) জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুমারপুর গ্রামে। পূর্বের নাম ছিল রাধিকারঞ্জন। সংকীর্তনই যাঁর জীবন, আর জীবনই যাঁর সংকীর্তন, সেই সর্বকালের স্মরণীয় সন্তদের মধ্যে বরণীয় বিগ্রহ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী। নাম ও নামীর অভিন্নতা উপলব্ধি করাতে, কীর্তনের মাঝে লালীকে প্রকট করতেই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বম্ভর-নিত্যানন্দ প্রেম উপাদানে গঠিত করে। রামদাস বাবাজীর একটি বিখ্যাত পদ–

শ্রীগুরুরূপ–নিতাইরূপ।	জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ।
অখণ্ড প্রেমের খনি।	আমার নিতাই গুণমণি॥
অনঙ্গ আলিঙ্গিত বলাই।	সেই ত আমার গুণের নিতাই॥
গৌরগোবিন্দে দিয়া নিত্য আনন্দ।	নাম ধরেছে নিত্যানন্দ॥
সেবিতে গোরা রসরাজে।	সেজেছে নিতাই কতই সাজে॥
নিতাই অনন্তরূপ ধরে।	গৌরগোবিন্দের সেবা করে॥
নিতাইচাঁদের তনুখানি।	শ্রীগৌরাঙ্গের রঙ্গভূমি॥
এই কথা সুনিশ্চিত।	নিতাই উপাদানে গৌর গঠিত॥

সুখ দিতে গৌরাঙ্গধনে। কেউ নাই আমার নিতাই বিনে॥
নিতাই ওড়ন নিতাই পাড়ন। নিতাই বুকে গোরার শয়ন॥

১৯৫৩ সালে বরাহনগর পাঠবাড়ি আশ্রমে মরদেহ ত্যাগ করে নিত্যধামে গমন করেন।

পরিশিষ্ট-৪
কীর্তনে অধিক ব্যবহৃত কিছু তালের নমুনা

কীর্তনে প্রচলিত তালগুলোর প্রকারে এবং প্রয়োগে কতগুলো অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ কীর্তনাঙ্গীয় একটি পৃথক তাল পদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রথমেই তালের নামগুলো বিচার করলে দেখা যায় যে এগুলো অভিনব এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা প্রভাবিত; দাসপ্যারী, ডাঁস পাহিড়া, ললিতপ্যারী, ধামালী, চঞ্চুপুট, গঞ্জন, ধরা, কাটাধরা, পঞ্চম ইত্যাদি–৮ মাত্রা বা ষোল মাত্রায় তালগুলোর নাম বাংলা ভাষা ভিত্তক। লোফা, জপ, দোজ ইত্যাদি ছয় বা বার মাত্রার তালগুলোর নামেও একই ইঙ্গিত। একতালি, দোঠুকি, দশকোশী, তেওট, সম, যোতসোম (যতি) ইত্যাদি সাত, চৌদ্দ বা আঠাশ মাত্রার তালগুলোর নামও একই রূপ। তা ছাড়া আড়, বীরবিক্রম, শশীশেখর, রূপক, ইন্দ্রভাষ, মদনদোলা, বিষমসমুদ্র ইত্যাদি নামগুলোও ব্যুৎপত্তিগত ভাবে বাংলা ভাষা জাত বলে মনে করা যায়।

কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তালের প্রধানতঃ দুটি অঙ্গ ধরা হয়–ছুট এবং জোড়া। তালের অংশগুলোর মধ্যে একটি তালাঘাত ও অপর কয়েকটি নিঃশব্দ ক্রিয়া সংযোজনে যে স্বাভাবিক অঙ্গটি বুঝান হয় তাকেই বলা হয় ছুট। ঐগুলো সাধারণত দুই মাত্রা, চার মাত্রা বা আটমাত্রা হয়ে থাকে। প্রাচীন তাল শাস্ত্রে 'যুগ্ম তাল' বা 'যুগলতালিকা' বলে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তাই পরবর্তীকালে 'জোড়া' নামে বাঙালি পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। ছুট দুই, চার বা আটমাত্রা সমন্বিত হলে জোড়া হয় যথাক্রমে এক, দুই বা চার মাত্রা।

লোফা : অতি প্রচলিত সাধারণ তালটি হল বার মাত্রায় লোফা যার বৃন্দাবনে প্রচলিত অপর নাম জপতাল। দ্বিতীয় নামটির প্রয়োজনীয়তা এই যে লোফা নামক তালটি পশ্চিবঙ্গে বার মাত্রা হলেও পূর্ববঙ্গে এটি চৌদ্দ মাত্রা কিন্তু জপ নামের রূপান্তর নাই। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে তালটিকে গড় খেমটা বলে অভিহিত করা হয়। চারটি বিভাগ ৩।৩।৩।৩। প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগে তাল আর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে ফাঁক। লোফা তালের মধ্যগতির লয়টি–

জা গ জা। জা ঘে না। তা ক তা। তা খে টা।

বিলম্বিত গতির লয়–

খে তাত্ ঝা। তা–গুরু। দি দা ধি। না তে টে।

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) এ তালের গতিই বেশ বিলম্বিত করে একতালা নামে গাওয়া হয়। সে তালের ঠেকার বোল–

ঝা খি দাঘি। তাগ দিদ্দা দিদ্দা। তা খি দাঘি। তাকে তেরে খেটা।

দোঠুকি : দোঠুকি একটি অতি প্রচলিত তাল যার অপর নাম নন্দন তালও অনেকে বলেন। তালটি চৌদ্দ মাত্রা হলেও দুটি অঙ্গ অনুরূপ। ছন্দ ৩।৪।৩।৪ প্রথম এবং চতুর্থ মাত্রায় তালাঘাত, অষ্টম এবং একাদশ মাত্রা ফাঁক। মধ্যগতি হলে অবিকল তেওড়া বা দক্ষিণ ভারতীয় মিশ্র জাতির ত্রিপুট তালের মত হয়ে যায়। বিলম্বিত লয়ে এটি ধামারের চেহারাও কল্পনা করা যায়, কারণ এ তালের বোলটি হলো–

+ ২ ০ ০

ধি ধি ধি ধি–ধি–ধি তে টে তা – গুরুর

দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত তিন গতিতেই তালটির প্রয়োগ আছে। মনোহরশাহী কীর্তনে এটির আধিক্য আছে। তালটিকে উল্টে নিলে হয় ৪।৩।৪।৩ ছন্দ। একে বলা হয় একতালি। বৃন্দাবনের একতালি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া সূচক কীর্ত্তনের সব প্রসিদ্ধ গানই একতালিতে গাওয়া হয়। সাধারণতঃ মধ্যগতির একতালিরই বেশি প্রয়োগ। তালের বোলটি নিম্নরূপ–

+ ০ ২ ০

ঝা–তা–তা খে টা তি–ঝা–দি দি দা

দশম মাত্রার ঝা ও ষষ্ঠমাত্রার খে–এবাণী দুটিই তালটির নান্দনিক উৎকর্ষের কারণ। বাংলাদেশে প্রচলিত লোফা নামক তালটিরও একই ঝোক অর্থাৎ বড় একতালির মত চৌদ্দ মাত্রা সম্পন্ন। অন্যান্য পদ্ধতির গানে ঝোকটি আছে কিন্তু একটি তালাঘাতেই ছন্দটি প্রকাশিত এমনটি দেখা যায় না। হিন্দুস্তানী পদ্ধতির একতাল বা বাংলাদেশের একতালার থেকে তালটি সম্পূর্ণ পৃথক।

তেওট : তেওট তাল কীর্তনে বেশী প্রচলিত। তালটি চৌদ্দ মাত্রা, বিভাগ ২।২।২।২।২।২।২। তিনটি তাল–প্রথম, সপ্তম এবং একাদশ মাত্রায়। ফাঁক চারটি–তৃতীয়, পঞ্চম, নবম এবং ত্রয়োদশ মাত্রায়। তবে কীর্ত্তনাঙ্গীয় তেওট তালের রূপ বোঝার জন্য বলা যায় যে তেওড়ার তালের মার্গ পরিবর্তন করে যদি চিত্র থেকে বার্তিক করা যায় অর্থাৎ সাত মাত্রার তেওড়াকে অতি বিলম্বিত করে যদি এক আবর্তে চৌদ্দ মাত্রা করা যায় তবে তা অবিকল কীর্তনাঙ্গীয় তেওট তাল হয়। তালের ঠেকাটি দুই আবর্তে নিবদ্ধ–

+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০

ঝা খি ঝা খি–গুররর ধেই তা গেদা ঘেনে তাক দাঘি নেত খেটা।

+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০

তা - তা – গুরুর তাক তেটে তেটে খিখি তাক দাধে–দা ধেই।

অন্যান্য তালগুলোর প্রচলিত রূপ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যে কতগুলো কেবল ছুটের সাহায্যে গঠিত, একটি কেবল জোড়া দ্বারা গঠিত এবং অপরগুলো গঠিত ছুট এবং জোড়ায় সমন্বয়ে। যেমন–

২টি ছুটে–ডাঁস পাহিড়া

৩টি ছুটে –দোজ

৪টি ছুটে – গঞ্জন, ধরা, বড় দাসপ্যারী

১ জোড়া– রূপক

১ টি জোড়া + ১ টি ছুট–আড়

১ টি জোড়া + ২টি ছুট–দশকোশী

১ টি জোড়া + ৩টি ছুট–বীরবিক্রম

১ টি জোড়া + ৪টি ছুট–শশীশেখর

ডাঁস পাহিড়া : ডাঁস পাহিড়া তালটি দাসপ্যারী বা আরও বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ'র দুটি গঠন, একটি ছোট অপরটি বড়। ছোট দাসপ্যারী দুটি তালাঘাতে নিবদ্ধ আট মাত্রার তাল। একটি তালাঘাতের পর তিনটি কোশী এমন দুই বার। ঠেকা নিম্নরূপ–

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি তা তেটে তা খিউরর দাঘি নেদা গেদা। বড় দাসপ্যারী চারটি তালে নিবন্ধ। একটি তালাঘাত তিনটি কোশী এমন দুইবার–

+	০	০	০	২	০	০	০
ঝিনি	দাঘি	ঝিনি	দা	ঝিনি	দাঘি	নেতা	খেটা
৩	০	০	০	৪	০	০	০
তা	উরর	তেটা	খেটা	তা	খে	খে	।

তালটি অতি প্রচলিত এবং ভক্তগণের অতি প্রিয় বলেই মনে হয় দাসপ্যারী নামকরণ করা হয়েছে। দেব বিগ্রহের আরতিকালে যে খোল বাজান হয় তা হয় দাসপ্যারীরই দ্রুতচলন চঞ্চুপুট তালে–

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা দাঘি নেদা গেদা ঝা দাঘি নেতা খি।

ধামালি : ধামালি নামে প্রচলিত যে তালটি আছে সেটিও দাসপ্যারীর অপভ্রংশ এবং আট মাত্রা সমন্বিত।

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি দাঘি নাগ তা খি উরর ধি ধি

ধরাতাল : ধরাতালের ঠেকা চারতালে এবং আট তালে উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তালাঘাতকে অনেক সময় চাপড় বলা হয় এবং গানগুলো সাধারণতঃ চব্বিশ চাপড়ে বা বিশ চাপড়ে পাওয়া যায়। চার তালের ঠেকাটি–

+ ০ ২ ০

ঝা – খি খি তা – তা –

৩ ০ ৪ ০

খি খি তা খি তা – গুরুর

ধরা তালেরই একটি ভাঙ্গা গতিকে 'কাটা-ধরা' নামে প্রচলন করেন কীর্তনীয়া রসিকলাল আজ থেকে প্রায় দেড় শ বছর আগে। ঠেকাটি নিম্নরূপ–

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ধেৎ তেটে তেটে খিখি তাক্ ধে ইনা ধেই

৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০

তেটে তেটে তেটে তেটে তা খি খি উরর

দশকোশী : দশকোশী তালটির নাম কীর্তনের কঠিন তাল বলে সবার পরিচিত। তালটি দ্রুতগতিতে সাত মাত্রা ছোট দশকোশী নামে পরিচিত, মধ্যগতিতে চৌদ্দ মাত্রা মধ্যম দশকোশী নামে

পরিচিত এবং বিলম্বিত গতিতে আটাশ মাত্রা বড় দশকোশী নামে পরিচিত। তালটির চারটি অঙ্গ–দু'টি ছুটের পর একটি জোড়া। সাত মাত্রার বিভাগ ২।২।১।২, চৌদ্দ মাত্রার বিভাগ ৪।৪।২।৪, এবং আঠাশ মাত্রার বিভাগ ৮।৮।৪।৮। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির আড়া চৌতালের সাথে তালটির সামঞ্জস্য আছে। ছোট দশকোশীতে ব্যবহৃত বোল–

+			০	২	০	৩	৪
ঝা	–	–	ঝি নাগঝিনি ঝা –	–	ঝি নাগঝিনি	ঝা-গুরর	জাঘিনাক
০		+		০	২	০	৩
তেটে তেটে তা		– –		থি নাকথিনি তা	– –	থি নাকথিনি	তাগুরর
৪	০						
তাত্ তা খেখে							

মধ্যম দশকোশীর তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি অনেক আবর্তে গানের বন্দিশ পাওয়া যায়। মধ্যম দশকোশীর ঠেকা–

+	০	০	০	২	০	০	০
ঝা	তাখি	নেতা	খেটা	তা	তাখি	নেতা	খেটা
৩	০	৪	০	০	০		
তা	উরর	তাত	তা	খি খ	তাখি		
+	০	০	০	২	০	০	০
ধেনা	দিধি	নেদা	ধেনে	ধেনা	দিধি	নেদা	ধেনে
৩	০	৪	০	০	০		
ঝা	উরর	জাখি	নাক	তেটে	তেটে।		

বড় দশকোশীর গান খুবই ধীর প্রকৃতির, মাত্রাও বিলম্বিত। গৌর চন্দ্রিকার গান ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ গান আছে যেমন–'বিকচ সরোজ' 'কাচা কাঞ্চন', 'গোরা বড় পতিত পাবন', 'কালিয়াদমন', জয়রে জয়রে গোরা' ইত্যাদি। গড়ানহাটি ঘরানায় এ গানগুলো অনেকেই এখন লুপ্ত প্রায়। তালটির ঠেকা–

+	.	০	.	০	.	০	.
ঝাখি	ঝাখি	ঝাখি	ঝা	ঝাখি	ঝাখি	ঝাখি	ঝাগুরু
২	.	০	.	০	.	০	.
ঝাখি	তা	তাত্	তা	তাত্	তা	খিখি	তাখি
৩	.						

ঝাঝা ঝাঝা গুরর–

৪	.	০	.	০	.	০	.
ঝাখি	তা	তাত্	তা	তাত্	তা	খিখি	তাখি।

যতিতাল : তালটির ঠেকা–

+	২	০	৩		০	৪	০
ধো ধো	তাত্‌ধো	দেতাখেটা	তা	গুরুধোগা	তিনি নাও	তিনাও	–

+	০	২	০	৩	৪	০
সম–ধো খেটা	তাত্‌ধো	দেতাখেটা	ঘেনাতিনি	দাখিনেতা	ঘেনাওউরর	তেনাতিৎ

ইন্দ্রভাষ : ইন্দ্রভাষ একটি মিশ্রতাল। তালটি ছাব্বিশ মাত্রা (মধ্যগতিতে)। তালাঘাত আটটি। দুটি ছুট এবং পরপর তিনটি জোড়া প্রচলিত একটি গান পাওয়া যায়–'কোথা যাওগো গোয়ালিনী'। তালটির প্রচলিত ঠেকা–

+	০	০	০	২	০	০	০
ঝা	তাখি	নেতা	খেটা	তা	তাখি	নেতা	খেটা
৩	০	৪	০	০	০		
তা	উরর	তাত্‌	তা	খিখি	তাখি		
৫	০	৬	০	০	০		
ঝেনা	দাখি	তাক	দাধে	র্হদা	খেই		
	০	৮	০	০	০		
ঝা	উরর	তাত্‌	তা	খিখি	তাখি।		

দেবচালী : 'দেবচালী'–তালটি সাত মাত্রা–

অর্থাৎ ফাঁক সমন্বিত দু'টি তালের পর তৃতীয় তাল এবং সর্বশেষ দু'টি ফাঁক। রূপটি হয়–১ ০ ২ ০ ৩ ০ ০ রূপগত বিশ্লেষণে তেওটা তালের দ্রুতগতি অর্থাৎ 'তিওটি' তালের অনুরূপ হয়। যার ঠেকা নিম্নরূপ–

২	০	৩	০	+	০	০
ঝিনি	দাঘি	নেতা	খেটা	তা	তা	–
২	০	৩	০	+	০	০
তা	তাখি	নেতা	খেটা	ধি	ধি	–

বদসির আটটি তাল–

অষ্টতাল গুচ্ছের অন্তর্ভূক্ত–

আড়, দোজ, যতি, শশীশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক ও সম।

আড়–তালটি দ্রুতগতিতে পাঁচ মাত্রা, মধ্যগতিতে দশ এবং বিলম্বিত গতিতে কুড়ি মাত্রা। তালটি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সুর ফাঁক তালের অনুরূপ। বদসি অষ্টতালের প্রথম তাল এবং ঐ গানে ব্যবহৃত দ্রুত লয়ের ঠেকটি নিম্নরূপ–

+	০	২	৩	০
ধো	দিত্তা	ধোগা	তি	—

মধ্যগতিতে ঝা তাখি খেটা বোল দিয়ে এবং বড় গতিতে 'ঝাখি' দিয়ে বাজান হয়।

দোজ–তিনটি ছুট সম্পন্ন তাল দোজ। বদসি অষ্টতালে এ তালটির প্রয়োগ আছে। তালটি মধ্যগতিতে বার মাত্রা, তিনটি তালাঘাত। প্রতিটি তালাঘাতের পর তিনটি করে কোশী। দ্রুতগতিতে বদসি অষ্ট তালে ব্যবহৃত ঠেকা–

+	০	২	০	৩	০
ধো গুরর	ধোগগা	তিৎঝা	তিনিনাও	তিনাও	___

আবার মধ্যগতিতে ঠেকা অন্যরূপ–

+		০	০	০	২	০	০
তা	গুরুর	দাখি	নেদা	গেদা	তাউরর	তাখি	নেতা
০	৩	০	০	০			
খেটা	তা	–	খে	খে			

যতি–বদসি অষ্ট তালের তৃতীয় তাল যতি। প্রথমে জোড়া এবং পরে দু'টি তাল–এই হল তালটির রূপ। তালটির ঠেকা–

+	২	০	৩		০	৪	০
ধো ধো	তাত্‌ধো	দেতাখেটা	তা	গুররধোগা	তিনি নাও	তিনাও	–

শশীশেখর–অষ্টতালের চতুর্থ তাল শশীশেখর। পরপর দুটি ছুট, জোড়া এবং দুটি ছুট। অষ্টতালে ব্যবহৃত দ্রুতলয়ে তালটির ঠেকা–

+	০	২	০	৩	৪	০
ধো	দিত্তা	গুররধো	দিত্তা	ধোধো	তাধো	দেতাখেটা
৫		০	৬	০		
তাগুরধোগা		তিনিনাও	তিনি	___		

গঞ্জন–তালটি চারটি ছুটের, ষোল মাত্রা। একটি তালাঘাত ও তিনটি কোশী এমন চারটি অঙ্গ বৈশিষ্ট তালটি বদসি অষ্টতালের পঞ্চম তাল। বদসি অষ্টতালের অন্তর্গত দ্রুত লয়ের ঠেকা–

+	০	২	০	৩	০	৪	০
ধোগুরুর	ধোগা	তিৎঝা	নাওগুরুর	তিৎঝা	তিনিতিনি	নাও	___

পঞ্চম–বিষম পঞ্চম বলে যে তালটির উল্লেখ পাওয়া যায় তার অপর নাম পঞ্চতাল। তালটি দ্রুতগতি আট মাত্রা, গধ্যগতি ষোল মাত্রা, বিলম্বিত গতি বত্রিশ মাত্রা। তালটি একটি জোড়া একটি ছুট আবার একটি জোড়া দ্বারা গঠিত। বদসি অষ্টতালের ষষ্ঠ তাল এটি। এ পর্যায়ে ব্যবহৃত ঠেকাটি নিম্নরূপ–

+	২	০	৩	০	৪	৫	০
বোধে	তাত্‌ধো	দেতাখেটা	ধো	দিংতা	ধোগা	তি	–

+	০	২	০	০	০	+	০	২	০	০	০
ঝা	গুরু	ঝা	তেনা	তেনা	থিনি	তা	গুরুর	তা-	তেনা	তেনা	থিনি

রূপক : কীর্তনে প্রচলিত রূপক তালটি তিন ছয় বা বার মাত্রা। তালটি বদসি অষ্ট তালের সপ্তম তাল। ঐ গানে প্রয়োগের সময় দ্রুতলয়ে যে নির্ধারিত ঠেকাটি বাজে সেটি নিম্নরূপ–

+	০	২	০	০	০	+	০	২	০	০	০
ঝা	গুরু	ঝা	তেনা	তেনা	থিনি	তা	গুরুর	তা-	তেনা	তেনা	থিনি।

সম–সমতাল অষ্টতালের অষ্টম তাল। তালটির ঠেকা–

+		০	২	০	৩	৪	০
ধো	খেটা	তাত্‌ধো	দেতাখেটা	ঘেনাতিনি	দাঘিনিতা	ঘেনাওউরর	তেনাতিৎ

পরিশিষ্ট-৫
গান ও স্বরলিপি

রচয়িতা-জয়দেব
(গীতগোবিন্দ)

প্রথম সর্গ
দশাবতার বন্দনা
রাগ-মালব
তাল-রূপক

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৫॥ ধ্রুবম্

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে॥
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৯॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১০॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্॥
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১১॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্॥
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥১২॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং॥
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্॥
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১৩॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥
কেশব ধৃতকলিস্কশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১৪॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং॥
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্॥
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১৫॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভুগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১৬॥

II সা গা মা	|দদা পপা দদা মমা I	দাদা - পপা মা	|পপা মপা পপমা পঋসা I
প্র ল য়	পয়ো ধিο জο লেο	ধৃο οο ত	বাο নসি বেοο দংο
I সা ন্া দ্া	|প্া সসা ঋঋা - সসা I	সা মমা -া	|গঋা গগগা ঋঋা -সসা I
বি হি ত	ব হিο ত্রο οο	চ রিο ο	ত্রম খেοο দο οম্
I মা দা পা	|র্সর্সা র্সর্সা -র্সর্সা -র্সসা I	র্ঋা - র্ঋা র্সা	|র্ঋর্ঋর্সা ননা -দদা -পা I
কে শ ব	ধৃο ο৩ οο οο	মী স শ	রীοο রο οο ο
I র্সর্সা ননা দপা	|দপা মগা ঋঋা সসা I	দপা মগা ঋঋা	|সমা গঋা সন্া সসা I
জয় জο গο	দীο শο হο রেο	জয় জο গο	দীο শο হο রেο
II সসা দপা পা	|র্সসা র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা I	ননা দদা পপা	|র্সসা র্ঋর্ঋা র্গর্গা র্ঋর্সা I
ক্ষিο তিο রο	তিο বিপু লত রেο	তিο ষ্ঠο তিο	তο বপৃ οষ ঠেο
I র্ঋা র্সা না	|র্সর্মা র্গর্গা র্ঋর্ঋা র্সর্সা I	নর্সা -র্ঋর্ঋা র্সনা	|র্সনা নদা দপা -পমা I
ধ র ণী	ধর ণο কিο ণο	চο οο ক্রο	গο রিষ্ ঠেο οο

I ন্সা মমা গগা |দদা দদা -দপা -পপাI র্সঋা ঋর্ঋা র্সর্সা |ঋর্ঋর্সা ননা -দদা -পা I
কে০ শ০ ব০ ধৃত ০ত ০০ ০০ কু০ ০র্ম ০শ রী০০ ০র ০০ ০

I র্সর্সা ননা গপা |দপা মগা ঋঋা সসা I দপা মগা ঋঋা |সমা গঋা সন্া সসা II
জয় জ০ গ০ দী০ শ০ হ০ রে০ জয় জ০ গ০ দী০ শ০ হ০ রে০

II সা পা সা | মা মা ঋা গা I রা -া -া |সা -া -ন্া -সা I
ব স তি দ শ ন শি খ ০ ০ রে ০ ০ ০

I র্সা না দা |-পা -া -া পা I র্সা না দা | -পা পা -া -া I
ধ র ণী ০ ০ ০ ত ব ল ০ গ্ না ০ ০

I পা র্সা র্সা |র্সা র্ঋর্ঋা র্ঋা র্সা I না দা -পা | দা র্সা -র্সর্সা না I
শ শি নি ক লং ক ক লে ব ০ নি ম ০গ্ না

I না র্সা র্গা |ঋর্ঋা র্সনা -নর্সা -র্সর্সা I না র্সা না | পর্সনা দদা -পপা -মা I
কে শ ব ধৃত ০ত ০০ ০০ শু ক র রূ০০ ০প ০০ ০

I ঋর্সা নদা পর্সা |নদা পগা মমা -গগা I ননা দদা পমা |গঋা সমা গঋা -সসা I
জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০ ০০ জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০ ০০

II সা পা পা |গগা পপা গগা ঋসা I সা দা দা |পপা মগা পগা ঋসা I
ত ব ক র০ কম ল০ বরে ন খ মদ ভূ০ ত০ শৃঙ্ গঙ্

I দা পা দা |র্সর্সা সর্সা পপা -র্সর্সা I র্সা র্ঋা র্সা | ঋর্সা নদা পা -দা I
দ লি ত হি০ র০ ণ্য০ ০০ ক শি পু তনু ভৃগ্ গ ম্

I সা র্সা র্সা |র্গর্গা -র্ঋর্ঋা র্সর্সা -নর্সা I না র্সা -না | ঋর্ঋা -ননা দদা -পপা I
কে শ ব ধৃত ০০ ত০ ০০ ন র হ রি০ ০০ রূ০ ০০

I র্সা -া না |দপা মগা ঋঋ সসা II
জ ০ য় জগ দীশ হ০ রে০

II সসা সা মা |গা ঋা পগা ঋগা I সা দা দদা | পা ম সগা পপা I
ছল য় সি বি ক্র ম০ ণে০ ব লি মদ্ ভু ত বাম ন০

I পা দা সা |গগা ঋঋা স প I পা মা গা | পমা গঋা মগা ঋসা I
প দ ন খ০ ০০ নী র জ নি ত জন পা০ ব০ ন০

I মা দা পা |র্সর্সা -র্সর্সা র্গর্গা -ঋর্সা I না র্সা দা | পপা -পপা র্সর্সা -ননা I
কে শ ব ধৃত ০০ ত০ ০০ বা ম ন রূ০ ০০ প০ ০০

I র্সর্সা নদা দদা | পপা ননা দপা মমা I দদা পগা মমা | পগা গগা ঋঋা সসা II
জয় জয় জয় জগ দী০ শহ রে০ জয় জয় জয় জগ দী০ শহ০ রে০

II সা র্সা র্সা | র্ঋর্সা নদা র্সনা -দপা I সা গা মা | ননা দপা মদা পপা I
ক্ষ ত্রি য় রুধি রম য়ে০ ০০ জ গ দ পগ ত০ পা০ পং

I সা মা মা | মমা -মমা পমা গগা I সা দা মা | পমা গগা ঋঋা -ঋসা I
স্ন প য় সি০ ০০ পয় সি০ শ মি ত ভব তা০ পম্ ০০

I র্সা র্সা র্সা | র্সর্সা -র্সর্সা র্সর্সা -র্সর্সা I না র্ঋা না | র্সর্সা -ননা দদা পপা I
কে শ ব ধৃ০ ০০ ত০ ০০ ভৃ গু প তি০ ০০ রূ০ প০

I সসা পগা মমা | দপা র্সনা দদা পপা I মমা ননা দদা | গপা মগা ঋঋা সসা I
জয় জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০ জয় জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০

II সা ন্া দ্া | প্পা সসা ঋঋা সসা I সসা মা পা | মগা ঋম গগা -ঋসা I
বি ত র সি০ দিক্ষু র০ ণে০ দিক্ প তি কম নী০ য়ং ০০

I সা দা দা | পমা গগা মমা পপা I র্সা র্সা র্সা | র্ঋা -র্ঋা র্সনা -র্সর্সা I
দ শ মু খ০ মৌলি ব০ লিঙ্ কে শ ব ধৃ ০ ত০ ০০

I র্গা -র্ঋা র্গা | র্সা না র্সা -া I র্সর্সা ননা দদা | পর্সা নদা পমা গগা I
রা ০ ম শ রী র ০ জয় জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০

I দদা পপা দদা | মদা পমা গঋা সসা II
জয় জয় জয় জগ দীশ হ০ রে০

II সা ঋা সা | দপা মমা গগা পপা I সা না দদা | প্সা সা মগা মমা I
ব হ সি বপু ষি০ বিশ দে০ ব স নং জ০ ল দা০ ভং

I সা গা পা | র্সর্সা -নদা পর্ঋা সা I না দা পা | সা মা গদা পপা I
হ ল হ তি০ ০০ ভী০ তি মি লি ত য মু না০ ভম

I র্সা র্সা র্সা | র্গর্গা -পর্সা র্ঋর্ঋা র্সর্সা I পা গা পা | পপা -গনা দদা পা I
কে শ ব ধৃ০ ০০ ত০ ০০ হ ল ধ র০ ০০ রূ০ প

I র্সর্সা ননা দদা | পদা পর্সা নদা পপা I সর্সা মমা পগা | ঋসা পগা গঋা সসাII
জয় জয় জয় জগ দী০ শহ রে০ জয় জয় জয় জগ দী০ শহ০ রে০

II পপা গগা ঋসা | ন্ন্া দ্া প্প্া সা I সা দা দা | পা মা গসা পাপা I
নিন দ০ সি০ য০ জ্ঞ বি০ ধে র হ হ শ্রু তি জা০ তং

I সা গা মা | দা -পপা র্সর্সা র্সর্সা I সা র্গা র্ঋা | র্সা র্মা র্গর্ঋা র্সর্সা I

স দ য়	হৃ ০০ দ০ য়০	দ র্শি ত	প শু ঘা০ তম্
I র্সা র্সা র্সা	ননা -দদা পপা -র্সর্সা I	সা -না র্ঋা	না -দা পপা মমা I
কে শ ব	ধৃ০ ০০ ত০ ০০	বু ০ দ্ধ	শ ০ রী০ র০
I গগা পা দা	গা দা পপা মগা I	সসা গা মা	সা পা মগা ঋসা II
জয় জ গ	দী শ হ০ রে০	জয় জ গ	দী শ হ০ রে০
II সা -ননা সা	দপা দদা মগা পপা I	সা গগা পর্পা	র্সর্সা নদা পর্সা পপা I
ম্লে ০চ্ ছ	নিব হ০ নিধ নে০	ক ল০ য়০	সি০ কর বা০ লং
I না দা পা	দদা -পপা মমা গগা I	সা মা গা	দপা মগা ঋসা -সসা I
ধূ ম কে	তু০ ০০ মি০ ব০	কি ম পি	ক০ রা০ লম ০০
I র্সা র্সা র্সা	পা -র্সর্সা র্ঋর্ঋা -র্সা I	র্গা র্ঋর্ঋা র্মা	র্গা -র্ঋা র্সর্সা র্সা I
কে শ ব	ধৃ০ ০০ ত০ ০	ক ০ল কী	শ ০ রী০ র০
I র্সর্সা র্ঋর্ঋা র্সর্সা	নদা পর্সা ননা দপা I	সসা দদা পগা	সসা ঋঋা সসা সসা II
জয় জয় জয়	জগ দীশ হ০ রে০	জয় জয় জয়	জগ দীশ হ০ রে০
II সসা মমা গগা	পপা গগা সসা গগা I	র্সর্সা পপা র্ঋর্সা	পপা র্সর্সা র্ঋর্ঋা পা I
শ্রী০ জয় দেব	ক০ বে০ রি০ ০দ	মু০ দি০ ত০	মু০ দা০ র০ ০ম্
I ননা দদা -পপা	মমা ননা দদা -পপা I	র্সা র্সর্সা ননা	দপা মগা ঋসা প্সা I
শূ০ ণু০ ০০	সু০ খ০ দ০ ঙ০	শু ভ০ দং	ভ০ ব০ সা০ রম্
I র্ঋা র্ঋা র্ঋা	র্গর্গা -র্ঋর্ঋা র্সর্সা -র্সর্সা I	না র্সা পপা	র্ঋর্ঋা -র্সনা দদা পপা I
কে শ ব	ধৃ০ ০০ ত০ ০০	দ শ বি০	ধ০ ০০ রূ০ প০
I সমা মগা পপা	পর্সা র্ঋর্সা নদা পর্সা I	ননা দদা পপা	মমা গপা মগা ঋসা II
জয় ০জ য়০	জয় জগ দীশ হরে	জয় জয় জয়	জয় জগ দীশ হরে

স্বরলিপি : প্রয়াত অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
সংগীত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রচয়িতা : বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
রাগ : রামগিরী। তাল : রূপক

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে॥

তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল॥

রাধা তোর মুখ দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হন যৌবনে॥

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনের সার॥

এহা বন আদভূত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে॥

তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাকঁ না লইহ লোক কেহো সংহতী।

সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বনমাঝেঁ এবন আহ্মার॥

এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

II পদা -র্সা | নর্সা না দা দা I সা -গা পা | গগা মগা ঋঋা সা I
হে০ র চন্ দ্রা ব লী রা ০ ধা মাঝ বৃন্দা ব০ নে

I সা ন্‌া দ্‌া | প্‌দ্‌া সসা ঋঋা সা I মা -মা মা | পগা মগা ঋা সা I
কু সু ম স০ মুহে শো০ ভে স ০ ব ত০ রু০ গ ণে

I গা -া পা | পা দা পা দা I র্সা র্সা র্সর্সা | র্সা -া -ঋা র্সা I
তা ০ ত সু ল লি ত ভ্র ম রের রো ০ ০ ল

I র্সা র্গা র্গা | র্মা র্গর্গা র্ঋা র্সা I র্সা -না দা | পা দা র্ঋা র্সা I
আ ছু ক মা নুষ দে ব লো ০ ক প ড়ে ভো ল

I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা না না I দা -র্সা না | দদা দদা পা পা I
রা ০ ধা তো র মু খ দে ০ খি মাঝ বৃন্দা ব নে

I সা গা পা | দা -র্সা নদা পা I না -দা পগা | মা গা ঋা -সা I
আ জি সে স ০ ফ০ ল হ ০ ০ন যৌ ব নে ০

I সা গা পা | পপা দা পা দা I র্সা -া র্সা | সা র্সা র্ঋা র্সা I
শ প থ করি আঁ রা ধা বো ০ লোঁ এ ব চ নে

I র্সা র্গা র্গা | র্মা -র্গা র্ঋা র্সা I র্সা না -দা | পা দদা র্সা র্সা I
তো ক্ষা র আা ০ ন্ত রে কৈ লোঁ ০ এ বৃন্দা ব নে

I সসা গা গা | পপা দা পা গা I না দা পদা | না -দা পা দা I
এক ঠা য়ি থুয়ি আঁ রা ধা মা থা র০ প ০ সা র

I সসা মা মা | মা মা মা মা I গা গা পা | গা মগা ঋা সা I
ফুল প হ্র ফ ল খা অ ত্রি ভু ব নে র০ সা র

I পা গা মগা | সা গা গা গা I পা -া দা | পা গা মগা ঋসা I
এ হা বন আ দ ভূ ত আ ০ ছে থা নে থা০ নে০

I ন্া দ্া পপা | সা সা সা সা I মা -া মা | গা মগা পা পা I
আ ক্ষ ছাড়ী তা ক আ ন কে ০ হো না হিঁ জা ণে

I না না না | র্সা র্সর্ঋা র্সা র্ঋা I র্সা -না দা | গা পা না দা I
তো ক্ষা ক দে খাওঁ ল আঁ ক ০ র আ নু ম তী

I পা পা পা | দা পা গা মা I গা -া গা | ঋসা ন্সা পা গা I
ত থাঁ ক না ল ই হ লো ০ ক কেহো সং হ তী

I গা গা পা | পপা দা পা দা I র্সা -া র্সা | সা র্সা র্ঋা র্সা I
স ক ল শরী র মা ঝেঁ তো ০ ক্ষে যে ন সা র

I র্সা র্গা র্গর্গা | র্মা র্গা র্ঋা র্সা I র্সা না দা | পা -দা র্সা র্সা I
তে হ্ন সব ব ন মা ঝেঁ এ ব ন আ ০ ক্ষা র

I সা গা গা | দা দদা পা গা I না দা পদা | না -দা পা দা I
এ হা ত উ চিত হ এ তো ক্ষা র০ বি ০ লা স

I সা মা মা | মা মা মা মা I গা গা পা | গা মগা ঋা সা II II
বা স লী শি রে ব ন্দী গা ই ল চ ণ্ডী০ দা স

স্বরলিপি : প্রয়াত অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
সংগীত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রচয়িতা : জ্ঞান দাস
(বসন্ত লীলা)

রাগ : ভূপালী
তাল : ঢিমেতেতালা

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ
রজনী উজোরিল গগনহি চন্দ॥
মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর (করু) কেলি॥
এ ছে রজনী হেরি রসবতী রাই
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥
তবহি চললি ধনী কালিন্দী তীর
অপরূপ শোভন ধীর সমীর
সখীগণ সহ তহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহু মুখ ফেহ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহে দুহুঁক বিলাস॥

: স্বরলিপি :

+	২	০	৩
I গা রা সা রা	| সা -ধ্া সা রা I	গা গা গা রা	| গা ধা পা -পা I
ন ব ম ধু	মা ০ স কু	সু ম ম য়	গ ন্ ধ ০
I গা গা গা রা	| -া গ্া ধা পা I	গা গা গা রা	| সা সা সা -সা I
র জ নী উ	০ জো র ল	গ গ ণ হি	চ ন্ দ ০
I সা রা গা রা	| সা ধ্া সা রা I	গা -া গা গা	| গা -া গা -া I
ম ল য় প	ব ন ব হে	সৌ ০ র ভ	মে ০ লি ০
I পা -া পা পা	| ধা -া পা পা I	গা গা রা রা	| সরা -গপা -ধর্সা ধপা II
কো ০ কি ল	রা ০ ব ভ্র	ম র ক রু	কে০ ০০ ০০ লি০
I পা গা পা পা	| পা ধা পা ধা I	ধর্সা র্সা র্সা র্সা	| র্সা -া র্সা -া I
অ ই ছে র	জ নী হে রি	র স ব তী	রা ০ ই ০
I পা গা পা পা	| পা ধা পা ধা I	ধর্সা -র্সা র্সা র্সা	| র্সা -া র্সা -া I
স খী গ ণ	স হ ত হি	মি ০ ল ল	কা ০ ন ০

I র্সা ধা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সর্রর্গা র্গা I র্রা -র্সা ধা পা | গা -া গা -া I
স হ চ রী স হ নি০০ জ বে ০ শ ব না ০ ই ০

I র্সা ধা র্সা র্সা | র্সা -র্রা র্সর্রর্গা র্গা I র্রা র্সা ধা পা | গা -া গা -া I
দু হুঁ জ ন হে ০ র০০ ই দু হুঁ ক ব য়া ০ ন ০

I গা গা গা গা | গা গা গা গা I রা -রা রা রা | সা -া সা সা I
ত ব হিঁ চ ল লি ধ নী কা ০ লি ন্দী তী ০ র ০

I গা গা গা গা | গা গা গা পা I রা -রা রা রা | সা -া সা -া I
ত ব হিঁ চ ল লি ধ নী কা ০ লি ন্দী তী ০ র ০

I গা গা গা গা | গা গা গা পা I রা -রা রা রা | সা -া সা -া I
দু হুঁ মু খ হে র ই তে মৃ দু মৃ দু হা ০ স ০

I সা ধ্া সা সা | সা -রা সা রা I গা -পা গা রা | সরা -গপা -ধর্সা ধপা II II
অ প রূ প শো ০ ভ ন ধী ০ র স মী০ ০০ ০০ র০
জ্ঞা ০ ন দা ০ স ক হে দু হুঁ ক বি লা০ ০০ ০০ স০

জ্ঞানদাসের এই পদটি ‘ভারতবর্ষ (১৩২১ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যার ১ম বর্ষ)–স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়েছে।

রচনা : দ্বিজ চণ্ডীদাস
তাল : একতাল

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাত দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
নিরমান কৈল 'পি'
রসের সাগর, মন্থন করিতে
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে, ভিজাইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর—সার।
ধরম-করম, সরম-ভরম,
কি বা জাতি—কূল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিনামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

: স্বরলিপি :

	+			৩			৩			২			
Π	সা	গা	রা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	মা	গা	মগা	I
	পি	রী	তি	ব	লি	য়া	এ	তি	ন	আ	খ	র	০
I	রা	গা	গা	রা	সা	সা	রা	-া	রা	-া	-া	-া	I
	এ	তি	ন	ভু	ব	ন	সা	০	র্	০	০	০	
I	পা	ধা	ধনা	ধনর্সা	না	ধা	পা	র্সা	ণা	ধা	ধা	ধনর্সধপা	I
	এ	ই	মো০	র০০	ম	নে	হ	য়	রা	ত	দি	নে০০০০০	
I	পা	ধা	পা	মা	গা	মসা	রা	-া	-া	-া	-া	রা	Π
	ই	হা	ব	ই	না	হি০	আ	০	০	০	০	র্	
Π	সা	গা	রা	গা	গা	গা	গা	পা	পা	মা	গা	মগা	I
	বি	ধি	এ	ক	চি	তে	ভা	বি	তে	ভা	বি	তে০	
I	রা	গা	গা	রা	সা	সা	া	-া	রা	-া	-া	-া	I
	নি	র	মা	ণ	কৈ	ল	পি	০	০	০	০	০	
I	পা	ধা	ধনা	ধনর্সা	না	ধা	পা	র্সা	না	ধা	ধা	ধনর্সধপা	I
	র	সে	র০	সা০০	গ	র	ম	ন্থ	ন	ক	রি	তে০০০০০০	
I	পা	ধা	পা	মা	গা	মগা	রা	-া	-া	-া	-া	রা	Π
	তা	হে	উ	প	জি	লি০	রী	০	০	০	০	০	

Π	সা	গা	রা	গা	গা	গা	গা	পা	পা	মা	গা	মগা	I
	পু	নঃ	যে	ম	থ	য়া	আ	মি	য়া	হ	ই	ল০	
I	রা	গা	পা	রা	সা	সা	রা	-া	রা	-া	-া	-া	I
	তা	হে	ভি	জা	ই	ল	তী	০	০	০	০	০	
I	পা	ধা	ধনা	ধনর্সা	না	ধা	পা	র্সা	না	ধ	ধা	ধনর্সনধপা	I
	স	ক	ল০	সু০০	খে	র	এ	তি	ন	আ	খ	র০০০০০	
I	পা	ধা	পা	মা	গা	গমা	রা	-া	-া	-া	-া	া	Π
	তু	ল	না	দি	ব	যে০	কী	০	০	০	০	০	
Π	সা	গা	রা	গা	গা	গা	গা	পা	পা	মা	গা	মগা	I
	যা	হা	র	ম	র	মে	প	শি	ল	য	ত	নে০	
I	রা	গা	গা	রা	সা	সা	া	-া	রা	-া	-া	-া	I
	এ	তি	ন	আ	খ	র	সা	০	র	০	০	০	
I	পা	ধা	ধনা	ধনর্সা	না	ধা	পা	র্সা	না	ধা	ধা	ধনর্সনধপ	I
	ধ	র	ম০	ক০০	র	ম	স	র	ম	ভ	র	ম০০০০০	
I	পা	ধা	পা	মা	গা	মগা	রা	-া	-া	-া	-া	রা	Π
	কি	বা	জা	তি	কু	ল০	তা	০	০	০	০	র্	
Π	সা	গা	রা	গা	গা	গা	গা	পা	পা	মা	গা	মগা	I
	এ	হে	ন	পি	রী	তি	না	জা	নি	কি	রী	তি০	
I	রা	গা	গা	রা	সা	সা	রা	-া	রা	-া	-া	-া	I
	প	রি	না	মে	কি	বা	হ	য়	০	০	০	০	
I	পা	ধা	ধনা	ধনর্সা	না	ধা	পা	র্সা	না	ধা	ধা	ধনর্সনধপা	I
	পি	রী	তি০	বন্‌০	ধ	ন	ব	ড়	ই	বি	ষ	ম০০০০০	
I	পা	ধা	পা	মগ	গা	মগা	বা	-া	-া	-া	-া	-া	Π
	দ্বি	জ	চ	ণ্ডী	দা	সে০	ক	০	০	০	০	য়	

● দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত পদটি স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২য় বর্ষ (১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা) সংখ্যায় [পৃষ্ঠা-১৫৬]।

মেদিনীপুর বা বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের ঝুমুর গান
জয়জয়ন্তী রাগের অন্তর্গত,
তিমির অভিসারিকা পর্যায়ের গান।

লাল শালুকের ফুল ফুটে আধারাতে বঁধূ
যার সঙ্গে ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে বঁধূ
এত রাগ কিসো॥
মেঘ আঁধারি রাতে বিজলী চমকে বঁধূ
এত রাগ কিসো॥
এসো এসো এসো বঁধূ বস পালঙ্কেতে
নয়ন জলে পা ধোয়াব মুছাইব হেসে
বঁধূ এত রাগ কিসো॥
যখন তুমি কাছে থাক কথা বল হেসে বঁধূ
আমার সব দুঃখ যায় যে ঘুচে তোমারি পরশে
বঁধূ এত রাগ কিসো॥

[পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোকশিল্পী শ্রীমিহিরবরণ সিংহদেব গানটি যেভাবে গেয়েছেন, সেইভাবেই নোটেশানটি করা হলো।]

প প প	– গ ম	প ধ নি̱	– – –	প নি ধ	প – –
লা S S	ল শা S	লু কে র	ফু S S	S S S	S S ল
প ধ প	ম গ রগ	ম প প	– প –	প ধ প	ম গ রগ
ফু টে আ	S ধা S	রা তে বঁ	S ধু S	ফু টে আ	S ধা S
ম ম গ	ম রগ্ রস	ম ম গ	– ম গ	র গ্ল র	র র স
রা তে S	S S S	যা র স	S ঙ্গে যার	ভাS S S	S Sব •
নি ধ প	– – প	প র র	– র –	প ম গ	র র গরসা
• • •	•	•			
থা কে S	S S S	মা রি লে	কি S S	ছু টে বঁ	ধু S S
র গ র	স – –	সা – –	– – –		
এ ত রা	S S গ	কি সে S	S S S		

গানটি সর্বকালের সেরা উচ্চাঙ্গ বা বৈঠকী ঝুমুরের উদাহরণ। যেমন সাবলীল এর ভাষা তেমনি সুরও হৃদয়েকে স্পর্শ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গীয় কীর্তন : চাঁদ কাজী

(বাঁশির প্রতি আক্ষেপ) তাল—দোঠুকি মাত্রা-১৪

ছন্দ ৩ ।৪ ।৩ ।৪

তুমি বাঁশি বাজানো জান না
অসময়ে বাজাও বাঁশি পরান মানে না

আখর— [সময় অসময় জান না। যখন তখন বাজাও বাঁশি রাধে রাধে বলে ডাক]

আমি যখন বইসা থাকি
গুরুজনার মাঝে
আমার নাম ধইরা বাজাও বাঁশি
আমি মইরি লাজে গো
আমি মইরি লাজে॥

আখর— [আমি সরমেতে মরে যাই। যখন গুরুজনার পানে চাই তোমার বাঁশির গান শুনে]

যে ঝাড়ের বাঁশি রে তুই
ঝাড়ের নাগাল পাই
ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়ে
যমুনায় ভাসাই

আখর [আমি ভাসায়ে দিব। ঐ ঝাড়ের মূল তুলে আমি ভাসায়ে দিব। তোমার বাঁশি বাজা ঘুচাইব]

চাঁদ কাজী বলে আজি
বাঁশি কি বা দোষী
যা বাজায় মুরলীধারী
তাই তো বাজে বাঁশি॥

আখর [বলি বাঁশির কিছু নাহি দোষ। কেবল হল সঙ্গা দোষ কেন অকারণ কর রোষ]

	+			২			০			০				
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪
								ম	ম	গ|	রে	গ	সা	—
								তু	মি	S	বাঁ	S	শি	S।
	র	ম	ম।	ম	—	ম	—	প	প	সা	নি	ধ	প	ধ
	বা	S	S।	জ	S	নো	S|	জা	S	S।	নো	S	S	S।
	প	প	প।	প	প	প	ধ	ম	ম	গ	র	গ	সা	পা
	ন	S	S।	S	S	S	S|	তু	মি	S।	বাঁ	S	শি	সময়।
আখর	ম	প	প।	ম	ধ	প	ধ|	ম	ম	গ	রে	–	–	–
	অ	S	S।	স	S	ম	য়।	জা	ন	S।	না	S	S	S।

Dhaka University Institutional Repository

	সা	সা	ধ।	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	নি	ধ	ধ	প	প।
	য	খ	ন।	ত	S	খ	ন্।	বা	জা	ও।	বাঁ	S	শি	S।
	ম	ম	প।	প	–	প	–	ধ	ধ	সা	নি	নি	ধ	প
	রা	ধে	S।	রা	S	ধে	S।	ব	লে	S।	ডা	S	ক	S।

[এরপর ঘরে ফেরা যখন তখন বাজাও বাঁশি সময় অসময় জান না, বাঁশি বাজানো জান না, এরপর দ্বিতীয় লাইন পরান মানে না।]

	ম	প	প।	নি	নি	নি	নি	নি	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
	আ	মি	০।	য	S	খ	ন।	ব	ই	সা।	থা	S	কি	S।
প্রথম	র্রে	র্রে	র্গ।	র্রে	র্রে	র্সা	র্সা	নি	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	নি	নি
অন্তরা	গু	রু	S।	জ	S	না	র।	মা	ঝে	S।	S	S	আ	মার।
	নি	নি	র্সা	র্সা	সা	র্রে	র্রে	নি	নি	নি	ধ	ধ	প	প
	না	S	ম।	ধ	ই	রা	S।	বা	জা	ও।	বাঁ	S	শি	S।
	ম	প	প	ম	ধ	প	ধ	ম	ম	গ	রে	গা	সা	সা
	আ	মি	S।	ম	ই	রি	S।	লা	S	S।	জে	S	গো	S।
	র	ম	ম	প	ধ	নি	নি	ধ	ধ	ধ	প	প	প	প
	আ	মি	S।	ম	ই	রি	S।	লা	S	S।	জে	S	আ	মি।
	ম	প	প	ম	ধ	প	ধ	ম	ম	গ	রে	–	–	–
আখর	ম	র	S।	মে	S	তে	S।	ম	রে	S।	যা	ই	য	খন।
	স	স	ধ	ধ	–	–	–	ধ	ধ	নি	ধ	ধ	প	প
	গু	রু	S।	জ	S	না	র।	পা	নে	S।	চা	ই	S	S।
	ম	ম	প	প	–	–	–	ধ	ধ	র্সা	নি	নি	ধ	প
	তো	মা	র।	বাঁ	S	শী	র।	গা	S	ন্।	শু	S	নে	S।

(পরবর্তী অন্তরায় সুর প্রথম অন্তরায় অনুরূপ হবে)

Dhaka University Institutional Repository

বীরভূম অঞ্চলের মনঃশিক্ষার গান :

শ্রীগুরু চৈতন্য বলে ডাকরে আমার মন
(ওরে) এক ডাকেতে জীয়ন মরণ
শমনের ভয় হয় নিবারণ।
ওমন বসে আছ চোরের দেশে,
অমূল্য ধন নেয়রে লুটে
প্রাণটি নিতে আর কতক্ষণ॥

ও মন ষোল আনা বোঝাই করে
নিয়েছ মাল ওজন করে,
ও তোর রতি মাসা কম হইলে
কি দিয়া বুঝাই মহাজন॥

সুর	+			০			+			০		
	সা	গ	র ।	সা	রে	নি	সা	গ	গ	ম	প	গ
	শ্রী	S	গু ।	রু	S	চৈ ।	ত	ৎ	ন্য।	ব	লে	S
	গ	ম	গ	র	গ	র	সা	সা	সা	সা	ম	ম
	ডা	ক্	রে ।	আ	মা	র ।	ম	S	S।	ন্	ও	রে
	ম	ম	প	প	প	নি	নি	নি	ধ	প	ধ্	প
	এ	ক	ডা ।	কে	তে	S ।	জী	য়	ন্।	ম	র	ন্
	ম	ম	প ।	ম	গ	গ	সা	সা	গ	ম	প	প
	স	ম	S ।	নের্	ভ	য়।	হ	য়	নি।	বা	র	ন ।
	গ	ম	গ।	রে	গ	র	সা	সা	সা	সা	সা	সা
	ডা	ক্	রে ।	আ	মা	র।	ম	S	S।	ন্	ও	মন্ ।
	সা	সা	রে।	সা	সা	নি	সা	গ	–	র	গ	প
	ব	সে	S ।	আ	ছ	S ।	চো	রে	র।	দে	শে	S ।
	র	গ	ম।	গ	র	সা	প	প	প	ধ	প	প
	S	S	S ।	S	S	S ।	অ	মূ	S ।	ল্য	ধ	ন ।
	ম	প	ম।	গ	রে	রে	রে	সা	সা	–	–	–
	নে	য়	রে ।	লু	S	S ।	টে	S	S ।	S	S	S ।
	প	নি	নি।	ধ	নি	নি	নি	সা	নি	ধ	প	প
	অ	মূ	S ।	ল্য	ধ	ন।	নে	য়	রে।	লু	টে	S ।
	ম	প	প।	ম	গ	গ	সা	সা	গ	ম	প	প
	প্রা	ন	টি ।	নি	তে	S।	আ	র	ক।	ত	ক্ষ	ণ ।
	গ	ম	গ	র	গ	র	সা	–	–	–	–	–
	ডা	ক	রে ।	আ	মা	র্।	ম	S	S ।	S	S	ন্ ।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুতত্ত্বের গান

বাউল এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই 'গুরুবাদ' এক অবিচল নিষ্ঠা ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ গুরু ছাড়া উভয়ক্ষেত্রেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই গুরুতত্ত্বের গানগুলোর মধ্যেও তাই দেখা যায় বাঙালির আধ্যাত্মিক মননশীলতার প্রতিফলন। বাউল তথা বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের ওপরই গুরুতত্ত্ব গানের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গানগুলো দেখা যায় মিশ্র প্রকরণযুক্ত অর্থাৎ লোকপ্রভাব ও বৈষ্ণবীয় প্রভাবে গানগুলো তৈরি। গুরুবাদী গানের উদাহরণ দেওয়া হল যে গানকে বাউল ও বৈষ্ণব প্রার্থনা গান হিসাবে গেয়ে থাকে।

ওরে ভজ মন নিত্যনন্দ
পতি মোর গৌর চন্দ্র,
আরে প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য বল গদাধর মোর গুরু,
আমি নরহরি লীলা শুনি মন।
আর বৈষ্ণবে পদধূলি
তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পন মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মোহে
ভক্তিরস আস্বাদনে,
আর মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ।
বৃন্দাবনে তবু তারা
তাহে মোর মন ঘেরা
আর কহে দীন নরোত্তম দাস॥

সুর — তাল-দাদরা

+			০			+			০		
			।								
–	–	প ।	ম	গ	মগ	র	প	প	ম	গ	গ
S	S	ত ।	জ	ম	নS ।	নি	ত্যা	S ।	ন	ন্দ	S ।
–	–	র ।	গ	ম	গ	র	গ	ম	গ	রে	সা
S	S	প ।	তি	মো	র ।	S	S	S ।	S	S	S ।
–	–	সা	রে	রে	রে	রে	রে	রে	গ	প	ধ
S	S	গৌ।	র	চ	ন্দ্র ।	আ	রে	প্রা।	ন	মো	র ।
নি	ধ	সন।	প	ধ	–	ধ	ধ	ধ।	নি	ধ	প
যু	গ	SS।	ল	কি	S ।	শ	র	S।	রে	S	S ।
–	–	প	ধ	সা	নি	ধ	প	–	মগ	গ	মগ
S	S	প্রা ।	ন	মো	র ।	যু	গ	S।	ল	কি	SS ।
রে	রে	রে।	গ	প	র্ম	গ	মগ	র।	গ	ম	গ
শো	S	S।	র	S	S ।	S	SS	প্র।	ন	মো	র ।
রে	গ	গ।	সা	রে	রে	রে	রে	রে।	রে	রে	রে
যু	গ	S।	ল	কি	S ।	শো	S	S।	S	S	র।

(পরবর্তী অন্তরা একই রকম)

প্রভাতী বা টহলদারী গান

Dhaka University Institutional Repository

সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রকরণের মিশ্রণে যে গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে টহলদারী বা প্রভাতী গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ লোকাচার হল যে কার্তিক মাসে এবং মাঘ মাসে প্রভাতে এক ধরনের গান গেয়ে গ্রামের লোককে জাগান হয় একেই বলে টহলদারী গান। বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীরা এই গান এককভাবে গেয়ে থাকেন। এর মধ্যে একটা সহজ সরল লোকগীতির ভাব ও সুর দেখা যায়। অর্থাৎ কীর্তন ও লোক সুরের সমন্বয় এই গান তৈরি। গানগুলো আকারে খুব একটা বড় হয় না। টহলদারী গানের পদ হল :

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধন
জয় নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত মাধব মধুসূদন
জয় হৃষিকেশ হরিরাসবিহারীর
রাধানাথের রাধার মন
প্রভু বলি কে ছলিলে
বিপদ মাগিলে হইলে বব্রুবাহন
তুমি যমুনারি ঘাটে গোপী নিকটে
করিলে দান গ্রহণ॥

সুর — তাল-দাদরা

+			০			+			০		
গ	প	গ	রে	রে	রে	সা	সা	সা	ধ	নি	সা
জ	য়	গো	বি	S	ন্দ	গো	উ	র	চ	S	ন্দ
জ	য়	না	রা	য়	ন	ল	ক্ষী	S|	কা	ন্ত	S।
সা	ম	ম	ম	প	গ	ম	গ	সর	ম	ম	ম
গো	পা	S	লো	গ	S	ব	র্দ্ধ	S	ন	S	S
মা	S	ধ।	ব	ম	ধু।	সূ	দ	S|	ন	S	S।
								.	.	.	.
ম	প	গ	–	নি	নি	নি	সা	সা	সা	সা	রন
S	S	S|	S	জ	য়।	ঋ	ষি	কে।	ষ	হ	রিS।
নি	সা	নি	ধ	ধ	প	ম	ধ	ধ	প	ম	ম
রা	S	স।	বি	হা	রী।	রা	ধা	না।	ধ	রা	ধা।
গা	সা	রে	ম	–	–	সা	ম	ম	ম	ম	ম
র	ম	S।	ন	S	প্রভু।	ব	লি	কে।	ছ	লি	লে।
ম	প	ধ	ম	প	গ	ম	ধ	ধ	প	ম	প
বি	প	দ।	মা	গি	লে।	হ	ই	লে।	বা	S	S।
গ	সা	রে	ম	–	–						
ম	S	S।	ন	S	S						

পরবর্তী অন্তরা পূর্বের অনুরূপ। এই গানটিও একই সুরে—

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারি বলে।
কত নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যাম নাগরের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণী কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারি বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারি আমরা পোষাপাখি।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাথী॥
বিদ্যাপতি কহে চান্দ গেল নিজ ঠাঁই
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই।

রাসের গান
তাল-দাদরা

রাসের গানগুলোকে সাধারণত ধামালী পদ বলা হয়। নৃত্য এই গানের প্রধান অঙ্গ।

শ্যাম তোমাকে নাচতে
ছেন্না ঝেনা খেটা থোরলাগ নাগিঝিনি ঝাঁ।
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা শ্রবণের কুণ্ডল
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদক্ষ
চিত্রলেখা সপ্ত স্বরা রাহ দেখে রঙ্গ॥
তুঙ্গ বিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গ দেবী
ইন্দুরেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ভট্ট তালে যদি হার বনমালী
চূড়াবাঁশী কেড়ে লব দিব করতালী
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী
নইলে কারাগারে দিব দুখিনী শুনে হাসি॥

সুর

	+			০			+			০		
	ম	ম	ম|	গা	রে	গ|	সা	সা	রে|	গ	রে	সা
ওহে	শ্যা	ম	তো	মা	কে	S	না	চ	তে	হ	বে	S
	–	–	নি|	নি	নি	নি|	সা	সা	–|	রে	রে	–
	S	S	ঝে।	S	ন্না	S	ঝে	না	S	খে	টা	S
							.	.	.	.	.	.
	ম	ম	গ|	রে	রেগ	রস|	সা	সা	সা|	সা	সা	সা
	থোর	লাগ	নাগ	ঝিনি	ঝা	S	না	S	ন	ড়ি	বে	S

নি	র্সা	নি|	র্সা	র্সা	র্রে|	নি	র্সা	নি|	ধ	ন	–
না	S	ন।	ড়ি	বে	S	গ	S	গু|	মু	গু	S
–	–	র|	ম	প	প|	প	–	–|	মপ	ধনি	ধপ
•	•	নূ	পু	রের	ক	ড়া	ই	S	SS	SS	SS
ম	–	প|	প	–	–|	প	–	–|	ধ	প	–
না	S	ন	ড়ি	বে	S	ব	ন	S	মা	লা	S
ম	প	–|	প	নি	ধ|	প	ম	–|	গ	রে	গ
বু	ঝি	S	ব	S	ব	ড়া	ই	S|	তো	মা	য়
সা	সা	রে|	গ	রে	সা						
নাচ	চ্	তে	হ	বে	S|						

সন্ন্যাস গান

লোকনাট্য এবং কীর্তন উভয় ক্ষেত্রেই সন্ন্যাস গান একটি বিশেষ প্রচলিত সঙ্গীত। লোক ও কীর্তন উভয় ধারার প্রভাবই তাই এই গানে লক্ষ্য করা যায়–

বিদায় দেগো শচী রানী
　　আমি সন্ন্যাসেতে যাই
　　আমি এইত ভিক্ষা চাই॥
তুমি মাগো যাইয়া দেইখো গো
　　মাগো তোমার নিমাই নাই॥
নদীয়া ছাড়িয়া যাব
　　পরের মাকে মা বলিব
লোকে বলবে নিমাইয়ের কেহ নাই॥
আমি হব ভিখ্ সন্ন্যাসী
　　হব না আর গৃহবাসী
উদাসী করেছেন গোসাঁই॥
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া।
তারে রাইখো বুঝাইয়া।
মাগো তোমার চরণে জানাই প্রণাম।

সুর　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তাল-দাদরা

+			০			+			০		
–	–	গ|	প-	প	ধ|	ধ	নি	–|	ধ	নি	–
		বি|	দায়	দে	গো|	শ	চী	S|	রা	নী	S

Dhaka University Institutional Repository

নি ধপ র্সা| নি ধ প| নি ধ প| ম গ –
আ মি স| ন্ন্যা সে তে যা S ই| S S S

– – প-| ধ নি ধ| সা নি ধ| প – –
এই তো ভি ক্ষা চা S ই S S S

– – রে| স ম র্মর্রে| র্রে র্রে রে র্গ র্গ র্রে
তু মা গো যা ই য়া ত দে ই খো

সা – – – – – – – র্স| র্রর্গর্ম র্গর্গ র্রর্স
গো S S| S S S| S S মা গো SS তোS মার

সা নি নি| ধ প ম| গ – প| ধ নি নধপ
নি মা ই| না ই S S S স| ন্ন্যা সে তেSS

ধ প –| – – –| – – গ| প প ধ
যা ই S S S S S S ন দী য়া ছা

ধ নি নি| ধ নি র্সা| নধ প র্সা| নি ধ প
ড়ি য়া S যা ব S S S প রের মা কে

ধ প –| ম গ –| – – গ। প প ধ
মা ব S লি ব S S S লো কে বল্ বে

নি রে সন| পন ধ প| – – র্র| র্র র্গ র্ম
নি মা য়ের্ কেহ না ই S S তু মি মা গো

র্রে র্রে র্রে| র্গ র্গ র্রে| র্সা – –| – – –
যা ই য়া দে ই খো গো S S S S S

(বাকি অংশ পূর্বের অনুরূপ)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, প্রকাশন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯০
২. ড. রীনা দত্ত, *বাংলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬
৩. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, প্রকাশক ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট, প্রকাশকাল ১৯৮৫
৪. Boy Bimal, *Bharatiya Sangita Prasanga,* 1987 (Beng.), Calcutta, Publishing, 1996
৫. শ্রী অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, ভক্তি বেদান্ত বুক, ট্রাস্ট ১৯৮৮
৬. মনোজবিকাশ দেবরায়, *শ্রীনরত্তোম দাস ঠাকুরের পদ ও পদাবলী*, অন্বেষা প্রকাশনা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
৭. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *শ্রীমদ্ভাগবতম*, প্রকাশক : শ্রীমহানমব্রত এন্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট
৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৯৩
৯. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, নবপর্যায়, প্রকাশনা : সাহিত্যলোক, প্রকাশকাল : ১৯৬৮
১০. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, প্রকাশনা : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৮
১১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমেদ শরীফ সম্পাদিত, '*মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*' প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল : জুন ১৯৬৯
১২. অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য, *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*, সাহিত্য রং বেরং পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল : দোল পূর্ণিমা, ১৪২৩
১৩. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯
১৪. মধুসূদন কিন্নরের *ঢপ কীর্তন*, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, প্রকাশকাল : ১৯৩৬
১৫. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
১৬. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৩
১৭. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫
১৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন*, *বিশ্বভারতী*, কলিকাতা-১৭, বৈশাখ ১৩৮৯
১৯. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালীর দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪
২০. তরুন মুখোপাধ্যায়, *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, পুস্তক বিপনি, কলিকাতা-৯, নভেম্বর ১৯৯৪
২১. ড. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০
২২. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৯
২৩. ড. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীত কোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
২৪. ক্ষিতিমোহন সেন, *বেদোত্তর সংগীত*, কলিকাতা-৯, ডিসেম্বর ১৯৮৪
২৫. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুন ১৯৮৪
২৬. শ্রী অমিয় লাল সান্যাল, *প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা-৭১, বৈশাখ ১৩৫২
২৭. সুচেতা চৌধুরী, *সংগীত ও নন্দনতত্ত্ব*, আনন্দ পাবলিকেশন, কলিকাতা-৯ জুলাই ১৯৮৮
২৮. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বেদগানের প্রাকৃত রূপ*, কলিকাতা-৬, মার্চ ১৯৮৪
২৯. পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (৯ম খণ্ড)*, কলিকাতা-৯, বাংলা ১৩৯৮
৩০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *গানের ঝরনাতলায়*, অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী, বাংলা ১৩৭৩
৩২. সুকুমার রায়, *ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, কলিকাতা-১২, ১৯৯৮ (২য় মুদ্রণ)
৩৩. রাজা নওয়াব আলী খান, অনুবাদ : মকসুদুর রহমান হিলালী, *মারিফুন্না গ মা ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই ১৯৬৭
৩৪. প্রতিভা বসু, *শারদীয় মনোরমা*, দীপক মিত্র প্রকাশনা লিঃ ২৮১ মুনিগঞ্জ, ১৪০৫ বাংলা
৩৫. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)* ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫/১এ, কলেজ রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৬২
৩৬. ইদ্‌রিস আলী, নজরুল সংগীতের সুর, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা, আষাঢ়, ১৪০৪, জুন ১৯৯৭
৩৭. মোবাশ্বের আলী, রবীন্দ্রনাথ : *অন্তরঙ্গ আলোকে*, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৩৯৫
৩৮. সরদার ফজলুল করিম, *অ্যারিস্টিটল-এর 'পলিটিকস্'*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, মে ১৯৮৩, বৈশাখ ১৩৯০
৩৯. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭০০০০৯, ১৯৫৬
৪০. ব্রক্ষ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুলের রাগ ভাবনা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০৬
৪১. নীরু কুমার চাকমা, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮৩
৪২. আবদুল মতিন, *বিশ্লেষণী দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৩
৪৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা
৪৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮২ (বৈশাখ ১৩৮৯)
৪৫. ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্র সংগীত*, জেনারেল বুকস্, ৩৩ বি কালিতলা লেন, হাওড়া, বৈশাখ ১৩৭৭
৪৬. মোহাম্মদ সাইদুর (সম্পা.), লোকনাট্য, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ (ফাল্গুন ১৩৯১)
৪৭. ড. রতনকুমার মণ্ডল, *ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও তাঁর যাত্রাপালা*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া ২০০০
৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৪ (ভাদ্র ১৩৮১)
৪৯. ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, কলিকাতা, ১৯৬৩
৫০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৭২
৫১. ড. কপিলা বাৎসায়ন, ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য : বিচিত্র প্রবাহ (নারায়ণ চৌধুরী অনূদিত), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৮০
৫২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ৫ম সং, ১৯৭০
৫৩. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশনা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯
৫৪. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৫
৫৫. গীতগোবিন্দ অনুবাদ, প্রকাশক প্রতিম বসু
৫৬. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং
৫৭. জ্যোতিভূষণ চাকী, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (শ্রী গীতগোবিন্দম্‌), নবপত্র প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৫ই জুন, ২০১১
৫৮. Sushil Kumar Dey, *History of Sanskrit literature existence*
৫৯. ড. কানাইলাল রায়, ব্রক্ষ্মবৈবর্তপুরাণ প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০১২
৬০. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬১. বসন্তরঞ্জন রায়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*, দশম সংস্করণ, ১৩৮৫
৬২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি*, প্রকাশন দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৯৯
৬৩. নন্দলাল শর্মা, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অভিধান*, উৎস প্রকাশন, প্রকাশকাল অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯
৬৪. লোচন শর্মা বিরচিত, *রাগ তরঙ্গিনী*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ সম্পাদনা ও ভাষান্তর রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৩৯১
৬৫. Annada Sankar and Lila Roy, *Bengali Literature,* Published by Paschimbanga Bangal Akademi, January 2000
৬৬. কালিদাস রায়, *পদাবলী সাহিত্য*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কলকাতা ১৩৮৩
৬৭. ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা, প্রকাশন : আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, (ইসকন), ঢাকা, বাংলাদেশ
৬৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কলকাতা ১৯৫৮
৬৯. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বাংলার সংগীত মধ্যযুগ*, কোলকাতা ১৯৫৫
৭০. *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৪
৭১. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রা. লি., কলকাতা ১৯৫৮
৭২. পণ্ডিতবর–শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্', নবভারত পাবলিশার্স, কোলকাতা
৭৩. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল, জুন ২০০৭
৭৪. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড
৭৫. মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৫৯
৭৬. নরেন বিশ্বাস, *প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯
৭৭. আসকার ইবনে শাইখ, *বাংলা মঞ্চ নাট্যে পশ্চাৎভূমি*, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬
৭৮. Chhaya Chatterjee, *Santraya Sangita and Music Culture of Bengal through the ages, Vol. II,* Sharada publishing House, Delhi-110035, 1996
৭৯. সুকুমার রায়, *বাংলা সংগীতের রূপ*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ১৯৯১
৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা
৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ব্রহ্মসংগীত*, স্বরবিতান ২৫
৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ৪৬*, গীতিচর্চা-১
৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা-২*
৮৪. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ ১৯৬৬
৮৫. মনিলাল সেন, বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাস
৮৬. ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত দর্শিকা (২য় খণ্ড), নাথ ব্রাদার্স পরিবেশক
৮৭. রাজ্যেশ্বর মিত্র, বাংলা সঙ্গীত (প্রাচীন ও মধ্য যুগ), নবপত্র প্রকাশসন ৮ পাটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ, ১৩৯১
৮৮. লোচন শর্মা বিরচিত, সম্পাদনা ও ভাষান্তর, রাজ্যেশ্বর মিত্র-ভূমিকা, রাগ তরঙ্গিনী, নবপত্র কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯১
৮৯. আহমদ শরীফ, বিচিত্র চিন্তা, চৌধুরী পাবলিশার্স, প্রকাশক : খায়রুল আনাম, ২য় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৭৫
৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীত চিন্তা, *বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ সংস্করণ*, ২৫ বৈশাখ ১৩৯২
৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৯১ (বিশ্বভারতী)
৯২. মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, একাদশ মুদ্রণ, ১৯৮৯, প্রাইম পাবলিকেশন্স

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. সনৎ কুমার মিত্র, লাল ফকির, কবি ও কাব্য, পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য, কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস।
৯৪. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, বাংলার লোকসাহিত্য
৯৫. অমর পাল, দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসঙ্গীত*।
৯৬. ড. হরিপদ চক্রবর্তী, ড. গৌরী ভট্টাচার্য, লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব
৯৭. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ
৯৮. পরিতোষ ঠাকুর, ঋগ্বেদসংহিতা
৯৯. পঞ্চানন তর্করত্ন (অনুবাদ), মীমাংসা তত্ত্ব (পূর্বাভাষ)
১০০. নারদ, সঙ্গীত মকরন্দ
১০১. রঘুনন্দন, স্মৃতিশাস্ত্র
১০২. সুবোধচন্দ্র মজুমদার, *শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশন*, সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯
১০৩. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্*, ৩৮/২ ভবানীচরণ, দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা
১০৪. পৃথ্বিরাজ সেন, *অষ্টাদশ পুরাণ কাহিনী সমগ্র*, প্রকাশনা গিরিজা লাইব্রেরী, কলিকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০১৪
১০৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, কলকাতা, ১৯৮০
১০৬. শশিভূষণ দাসগুপ্তের উদ্ধৃতি, অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ
১০৭. অলকা চট্টোপাধ্যায়, *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*, জানুয়ারি ১৯৯৮
১০৮. শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, *মহাভারতের চরিতাবলী*, আনন্দ প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৩৭৩
১১০. দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৪
১১১. অমূল্যচন্দ্র সেন, *অশোকলিপি*, কোলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ২০০১
১১২. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১
১১৩. ড. কানাইলাল রায়, *বেদ রহস্য*, মাহি প্রকাশনা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১৪. Macdonell (মনীষী ম্যাকডোনাল), A vedio reader for students
১১৫. রাম স্বামী অ্যায়ার স্বরমেলকলা নিধি
১১৬. ক্ষিতি মোহন সেন, *বেদোত্তর সংগীত*
১১৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)*, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০০০
১১৮. রাজেশ্বর মিত্র, *বেদগানের প্রাকৃত রূপ*, কলিকাতা-৬, মার্চ ১৯৮৪
১১৯. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি*
১২০. রমেশচন্দ্র দত্ত, *অর্থবেদ সংহিতা*, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭
১২১. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভাগবতম*, প্রকাশনা শ্রীমহানাম ব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার স্ট্রীট, ৭ই জুলাই
১২২. Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity,* the University press limited 2000, First Published 2000
১২৩. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংস্কৃতি, ঢাকা ১৯৭৪
১২৪. মোহাম্মদ সিরাজুল কাসিমপুরী, *গাঁড়ুগান*, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন-৫৩
১২৫. মধুসূদন কিন্নরের ঢপ কীর্তন, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, প্রকাশকাল ১৯৩৬
১২৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি (সম্পাদিত) *শ্রীচৈতন্য ভাগবত*, কলকাতা দেবসাহিত্য কুটির ১৩৪২ বঙ্গাব্দ
১২৭. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, *কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী*, ভট্টাচার্য এন্ড সন, কলিকাতা ১৯১৮

Dhaka University Institutional Repository

১২৮. সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) *লোকসংস্কৃতি গবেষণা ৭ম বর্ষ*, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৪

১২৯. শুভাশিষ সমীর, *মণিপুরীদের পালাগান'* দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারি, শুক্রবার ঢাকা ২০০১

১৩০. এম.এস. *দোহা, বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ২০০৫

১৩১. *লোকসঙ্গীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০৭

১৩২. ইকবাল খোরশেদ, *বাংলার লোকঐতিহ্যের পরিচয়*, প্রকাশন মূর্ধন্য, প্রকাশকাল : বাংলাদেশ বইমেলা, কলকাতা ২০১৮

১৩৩. সেলিম আল দীন, *বাংলা নাট্যকোষ*, প্রকাশন : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮

১৩৪. দিনেন্দ্র চৌধুরী, *গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশকাল, জানুয়ারি ১৯৯৯

১৩৫. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ*, ১৩৫৭

১৩৬. শ্রীরূপ গোস্বামী, *উজ্জলনীলমণি*, ভারতী প্রকাশন, ১৩৭

১৩৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ*, ১৩৬২

১৩৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন গীতি প্রবেশিকা*, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৩৫৩

১৩৯. হরিদাস কর, *কীর্তন স্বরলিপি*, ১৯৫৫

১৪০. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *কীর্তন গীতি সংগ্রহ (১ম-৩য়)*, ১৩৩৪

১৪১. *কীর্তন মহাসম্মেলন পত্রিকা*, ১৩৫৯

১৪২. সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, *কীর্তন পদাবলী*, রঞ্জন পাবলিশিং, ১৩৪৫

১৪৩. মনুলাল মিশ্র, *কর্তাভজা ধর্মের আদিবৃত্তান্ত ও সহজতত্ত্ব প্রকাশ*, ১৩৩২

১৪৪. কবি জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, *নতুন সাহিত্য ভবন*, ১৩৭১

১৪৫. মধুসূদন তর্ক বাচস্পতি, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস*, ১৩৩৩

১৪৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*, ১৩৭৭

১৪৭. হেমচন্দ্র সরকার, *গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যদেব*, ১৯২৭

১৪৮. সতীশচন্দ্র দে, *গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী*, ১৯৩৩

১৪৯. ভুবনেশ্বর মিত্র, *গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য*, ১৩৩২

১৫০. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য*, ১৩৬০

১৫১. বিমানবিহারী মজুমদার, *গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ*, ১৯৬১

১৫২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*, ১৩৬৭

১৫৩. নীলরতন মুখোপাধ্যায়, *চণ্ডীদাসের পদাবলী*, ১৩২১

১৫৪. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *চৈতন্যদেবের প্রাত্যহিক লীলা প্রসঙ্গ*, ১৪০০

১৫৫. রজনীকান্ত গুপ্ত, *জয়দেব চরিত*, ১২৯৬

১৫৬. কানুপ্রিয় গোস্বামী, *জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম*, ১৩৪০

১৫৭. রঘুনাথ দাস গোস্বামী, *দানকেলি চিন্তামণি*, ১৯৩৭

১৫৮. রূপ গোস্বামী, *দানকেলি কৌমুদী*, হরিদাস দাস ১৯৩৫

১৫৯. রাধামোহন ঠাকুর, *পদামৃত সমুদ্র*, সংকলিত : উমা রায়

১৬০. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*, ১৯৭০

১৬১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, ১৩৫৯

১৬২. অমরচৈতন্য ব্রহ্মচারী, *বলরাম দাসের পদাবলী*, ১৩৭৯

১৬৩. মালবিকা চাকী, *বাসুদেব ঘোষের পদাবলী*, ১৩৬৮

১৬৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন গীতিকা*

Dhaka University Institutional Repository

১৬৫. মধুসূদন দাস অধিকারী, *বৈষ্ণব তত্ত্ব দীপিকা*, ১৩২১
১৬৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকার*
১৬৭. ড. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব রস প্রকাশ*, ১৩৭৯
১৬৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বৈষ্ণব রস সাহিত্য*, ১৩৫৩
১৬৯. সুকুমার সেন, *বৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ*, ১৩৭৭
১৭০. ললিতাপ্রসাদ, *বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মালা*, ১৩৪০
১৭১. বাসন্তী চৌধুরী, *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ ও সঙ্গীত সাহিত্য*, ১৯৬৮
১৭২. জীবনবল্লভ চৌধুরী, *বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী*
১৭৩. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, *বৈষ্ণব ধর্ম প্রকাশিকা*, ১৩০০
১৭৪. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীগুরু স্বরূপ*, ১৩৭৯
১৭৫. প্রিয়নাথ নন্দী, *বৈষ্ণব ধর্মের সুক্ষ্মতত্ত্ব*, ১৩১৮
১৭৬. ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, ১৯৪৫
১৭৭. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস*, ১৯৫৩
১৭৮. সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ*, ১৩৭৭
১৭৯. প্রভাত গোস্বামী, *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*, ১৯৭৫
১৮০. প্রিয়রঞ্জন সেন, *রায়রামনন্দের পদাবলী*, ১৩৫২
১৮১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*, ১৯৬১
১৮২. বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, *রস রহস্য কল্লোলিনী*, ১৩৬৮
১৮৩. মণীন্দ্রমোহন বসু, *রাগাত্মিকা পদ*, ১৯৩২
১৮৪. রবীন্দ্রলাল রায়, *রাগ নির্ণয়*, ১৩৫৭
১৮৫. রায়শেখর, *রায়শেখরের পদাবলী*, ১৯৫৫
১৮৬. ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, *রাধিকা*, ১৩০৮
১৮৭. বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, গৌড়ীয় মঠ, ১৩৬৮
১৮৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, সাধনা প্রকাশনী
১৮৯. রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, *শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী*, গৌড়ীয় মঠ, ১৯৬৬
১৯০. রূপ গোস্বামী, *শ্রীশ্রীস্তবমালা*, অপর্ণাদেবী, ১৯৮০
১৯১. প্রবোধানন্দ সরস্বতী, *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত*, গৌড়ীয় মঠ
১৯২. সনাতন গোস্বামী, *শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত*, জয়গোবিন্দদাস, ১৩১০
১৯৩. নরহরি চক্রবর্তী, *শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর*, গৌড়ীয় মিশন, ১৯৪০
১৯৪. নরহরি চক্রবর্তী, *শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়*, নবদ্বীপ, ৪৬২ গৌরাব্দ
১৯৫. পুরীদাস গোস্বামী, *শ্রীশ্রীহরিকথামৃত*, শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক
১৯৬. অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, *শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা*, ১৩১৯
১৯৭. হরিদাস দাস, *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন*, ৪৬৫ গৌরাব্দ
১৯৮. নরেন্দ্রনাথ সাহা, *শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য*, ১৯৪৭
১৯৯. অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী, *শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু*, ১৩৮৮
২০০. রমেন্দ্রকিশোর বিদ্যাবিনোদ, *শ্রীচৈতন্যদেব*, ১৯৫০
২০১. শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, *শ্রীশ্রীরামলীলা*, ১৩৬২
২০২. কৃষ্ণদাস দে, *শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব*, ১৩৫২
২০৩. চারুচন্দ্র পাকড়াশী, *শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য*, ১৩৮৬
২০৪. রামশাস্ত্রী সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা*, ১৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

২০৫. ব্রজভূষণ চক্রবর্তী, *শ্রীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীত*, ১৩৮০
২০৬. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *শ্রীচৈতন্যদেব*, ১৯৫০
২০৭. বিমানবিহারী মজুমদার, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য*, ১৩৬৮
২০৮. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, *সঙ্গীতরত্নাকর*, শাঙ্গদেব
২০৯. কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান, ১৯৭৮
২১০. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত দর্শিকা*, ১৩৭৪
২১১. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *সঙ্গীত সমীক্ষা*, ১৩৬৬
২১২. পরিতোষ দাস, *সহজিয়া গৌড়ীয় ধর্ম*, ১৯৭৮
২১৩. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *ক্ষণিদা গীত চিন্তামণি*
২১৪. পদকল্পতরু, *যতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
২১৫. Dr. M. R. Goutam, *Musical Heritage of India*
২১৬. R. K. Mookherjee, *A History of Indian Civilisition*
২১৭. Manmohon Ghosh, *Natyasastra Bharat*
২১৮. Nettle Bruno, *Music of Primitive Culture*
২১৯. H. Osbone, *Theory of Beauty*
২২০. Dr. Surendranath Dasgupta, *History of Philosophy*
২২১. Dr. Sashibhusan Dasgupta, Obscure religious cults
২২২. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity